

পুনশ্চ, গত কয়েক বৎসর হইতে যে তাঁহার পুস্তকের পর পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, তাহাও বোধ হয়, এখনকার অনেক সাহিত্য-সেবীর নয়নাকর্ষণ করিতেছে না। তাহার কারণ এই যে, সেই সকল পুস্তকের সাহিত্য-গুণ-গৌরব সত্ত্বেও তাহারা প্রধানতঃ ধর্ম-সম্বন্ধীয় পুস্তক। এখন শিক্ষিতদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের ও বৈষ্ণব ধর্মের নেহাত দুঃসময় না হইলেও, তাঁহারা সাধারণতঃ ঐ ধর্মদ্বয়ের বা যে কোন বিষয়েরই হউক, হুজুগ ও কলহ-প্রকুল দলাদলি ভিন্ন আসল ও সার তত্ত্ব বড় বেশী মনোযোগ প্রদান করেন ধর্মিয়া আমি বিশ্বাস করি না। পক্ষান্তরে অনেক সাহিত্যানুরাগী নব্য পাঠক ও লেখক, যে কোনও ধর্মই হউক,—ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক স্পর্শই করেন না। তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা বা অন্তর্মান এই যে, ধর্ম কথা যাহার সহিত সংযুক্ত, তাহা উৎকৃষ্ট ও উৎসাহ-আমোদ-প্রদ সাহিত্য নয়, হইতেই পারে না। তবে ধর্ম ? সে বিষয়, যদি একান্তই আবশ্যক হয়, পরে পশ্চাতে দেখা যাইবে, আপাততঃ তাহার কোন পার্থিব প্রয়োজনাতাব। তবে, বঙ্কিম বাবুর ধর্মালোচনা যে কিয়ৎ পরিমাণে এই শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার ছই কারণ। প্রথমতঃ সে আলোচনা, আরম্ভে, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ; দ্বিতীয়তঃ অনেকে হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, ধর্মালোচনাতেও যদি বঙ্কিম বাবুর উপভাস-রসের কিছু ভ্রামাংশ পাওয়া যায়। এই প্রয়োজনে, এবং তাৎকালিক ধর্ম-কলহান্দোলনে প্রথমতঃ তাহার পাঠক জুটিয়াছিল, কিন্তু পরে কদ জুঠে নাই।

একটি অবস্থায়, শিশির বাবুর উৎকৃষ্ট ও উপাধেয় রচনার দ্বারা যে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে

ও শিক্ষিত সমাজে সাদরে, সোৎসাহে গৃহীত, পঠিত ও আলোচিত হইতেছে না, ইহা বিষয়ের বিষয় নহে। তদ্বিন্ন, আমি ইতঃপ্রোই উল্লেখ করিয়াছি যে, যে কারণে বা কারণ পরস্পরের সমবায়ে হউক, সাহিত্য সংসারের এটা পরম ঔদাসিন্যের ও উপেক্ষার সময়। ইহার মাহাত্ম্যে বরং অপকৃষ্টেরই আদর হয়, কিন্তু উৎকৃষ্টের সহিত কেহ আলাপও কবে না। উৎকৃষ্টের প্রতি ঔদাসিন্য ও উপেক্ষাই এখন প্রচলিত। পক্ষান্তরে, শিশির বাবুর সাহিত্য অধুনাতন ইংরেজী প্রণালীর নহে, তাহা অনন্ত-তনু, বরং পূর্বতন। ইহাও এক অন্তরাব। “পূর্বতন প্রণালী” শুনিতেই সাত পুরুষ ইংরেজী-অনার্য ও এখন শিহরিয়া উঠে ; কোণের কুলবধু পবাস্ত ইংরেজী কাসনের পক্ষপাতিনী ; টিকিয়ারী ভট্টাচার্য ঠাকুর পবাস্ত “পূর্বতন প্রণালী” টিকিয়ারীতে নারাজ ; ইংরেজী কাসনে, তাহার কটিছাট চান ! ইহা এক প্রহেলিকা। কিন্তু ‘পূর্বতন’ পদার্থটা কি, তাহা কেহ বড় দেখে না, বুঝে না। অগ্রোই আতঙ্কে মরে !

কিন্তু, যাহা অধুনাতন, তাহা এত অধিক পরিমাণে এখন প্রচলিত এবং পথে ঘাটে ছড়াছড়ি যে, তাহা আর অভিনব নয়। যদি অভিনবেই তোমার এত অভিলାষ হয়, বরং যাহা পূর্বতন, তাহাই এখন অভিনব, কারণ, তাহা আর এখন কোথায়ও দেখি না। অতএব, আর কিছুমাত্র গুণগৌরব বিবেচনাধীনে গ্রহণ না করিলেও, কেবল অনন্ত-তান্ত্রিকতা বা পূর্বতনতা-জনিত অভিনবত্বের জন্ত শিশির বাবুর রচনা আমাদের দেখিতে হয়। শিশির বাবু আধুনিক যুগোৎপন্ন বাঙ্গালার অন্ধাবান বা বীলশ্রক, ঠিক জানি

না ; তবে তিনি এখনকার বাঙ্গালা বড় বেশী পড়েন নাই,—এমন কি, বন্ধিমবাবুবও কোনও পুস্তক তিনি পড়েন নাই ; ইহা শুনিয়াছি। এমন অবস্থায়, এরূপ একটা অধুনাতন রীতি অমিশ্রিত, খাঁটা ও বিশিষ্ট বাঙ্গালী কি-রূপ বাঙ্গালা লিখেন, শিশির বাবু বাঙ্গালা-সাহিত্যের অল্প সব কথা বাদে, ইহাও দেখিবার বিষয় বটে। শিশির বাবু বাঙ্গালীব গৃহ-জাত বাঙ্গালা ব্যবহার করেন, অথচ শিশির বাবু বিশিষ্ট ইংরেজী-নবিশ বাঙ্গালী। ইহাও একটু রহস্য। যৎকালে ইংবেজী ও ইউরোপীয় ভাষা মাত্র অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীব বাঙ্গালাতেও বিলাতী ভঙ্গিমা, সেই মহর্জেই একজন আজীবন ইংরেজী লেখকের বাঙ্গালা বিলাতি ভাঁজ বিরহিত খাঁটা, বাঙ্গালা, ইহা কিঞ্চিৎ চিন্তাব বিষয় নয় কি ? শিশির বাবুর বাঙ্গালা ত ইংরেজী ভাবাপন্ন নহে, বরং তাঁহার ইংরেজী, আমার বোধ হয়, ঈবং বাঙ্গালা ভাবাপন্ন। বাজাকে দেশের ও দেশের অবস্থা বুঝাইতে হয় বলিয়াই, শিশির বাবু ইংরেজীতে অগত্যা লিখেন। নহিলে, বোধ হয়, তাহা স্পর্শও করিতেন না ; এমনি বন্ধ-মূল বাঙ্গালী তিনি। অথচ উদারতায়,

অত্যাচ্ছ উদার মতের পরিপন্থীও তাঁহার নিকট পরাস্ত, তাহা তল্লিখিত সাহিত্যেই দেখিতেছি। কিন্তু, নেহাত বাঙ্গালী হওয়া, হয় ত, এখন নিন্দনীয় হইবে ; তথাচ যাহা সত্য, তাহা গোপনের প্রয়োজন কি ? কারণ শিশির কুমার ঘোষ প্রকৃত প্রস্তাবে কি প্রকৃতিব পুরুষ এবং তাঁহার প্রতিভা কি প্রকৃতিব, তাহাই দেখা আমাদের আবশ্যক। তাঁহার নিন্দা বা প্রশংসার সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই।

আমি, এই প্রবন্ধ, কেবল মাত্র আত্ম-বঙ্গিক কথায় সমাপ্ত করিলাম। অতঃপর, পরপ্রবন্ধে যাহা বলিব, তাহা কেবল এই আলোচ্য কাব্য গ্রন্থ সম্বন্ধেই বলিব। শিশির বাবুর এই গীতি-গ্রন্থ, স্বকীয় সরল স্বভাবে, আদৌ কোন বিশেষণ ব্যাখ্যার আকাঙ্ক্ষা কবেনা। তাহার সৌন্দর্য্য এত সুস্পষ্ট-দৃষ্ট যে, দেখাহারা দিতে হয় না। তথাচ উপরোক্ত নানা কারণে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। বিশেষতঃ এরূপ একটা উচ্চ কাব্য গ্রন্থের আলোচনা না হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনার সবিশেষ কলঙ্কও বটে।

শ্রীচাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

কবি বলরাম দাস ।

খ্রীষ্টোত্তরচরিতামৃতের ১১শ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

“বলরাম দাস কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী।

নিত্যানন্দ নামে হয় অত্যন্ত উদারী।”

শ্রীবলরাম দাস নিত্যানন্দের ভক্ত ও তৎপরিকর ছিলেন ; বৈষ্ণব-বন্দনা-গ্রন্থে লিখিত আছে—

“সঙ্গীত-কারক বল্লো বলরাম দাস।

নিত্যানন্দ চন্দ্রে যার অত্যন্ত বিশ্বাস।”

উভয় গ্রন্থে বর্ণিত এই বলরাম এক ব্যক্তি, উভয়ই নিত্যানন্দ-ভক্ত। বৈষ্ণব-বন্দনায় তিন প্রভুর (মহাপ্রভুর, নিত্যানন্দ, এবং অদ্বৈত) ভক্তগণের নাম পাওয়া যায়। বলরাম দাসের নামের পরেই নিত্যানন্দ শিষ্য মধ্যে মহেশ পণ্ডিত (জগদীশের ভ্রাতা), চৈতন্য-ভাগবত-কর্তা বৃন্দাবন দাস, ও কৃষ্ণদাস প্রভৃতির নাম লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণব

বন্দনার “সঙ্গীত-কারক” বলিয়া বলরামের উল্লেখ আছে; অতএব ইনিই যে স্বনাম-প্রসিদ্ধ পদকর্তা বলরাম দাস, তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব পদকর্তা বলরাম দাস নিত্যানন্দের “গণ।” বলরামও স্রী পদে আপন প্রভুর রূপ গুণ প্রকৃষ্ট রূপেই বর্ণন করিয়াছেন, তাই একটি পদ এখানে দিলে বোধ হয় অপ্রীতিকর হইবে না। বলরামের পদ—

“অনুক্ষণ অক্ষণ নয়ান ঘন ঘুরত,
চরকত লোর বিথাব।
কিয়ে ঘন অক্ষণ, বকণালয়ে সক্ষণ,
অমিষা বরিণে অনিবার।
নাচতয়ে নিতাইব চাঁদ।
সিঞ্চই প্রেম, অধারস জগজনে,
অদ্ভুত নটন স্তম্ভাদ।
পদতল ভাল, খলিত মণিমণ্ডিব,
চল হি টলমল গঙ্গ।
মেরু শিখরে কিবে, তরু অমুপামবে,
মল মল ভাব তরঙ্গ।
সতত রোরতই, গতি অতি মন্থর,
হরি বলি মুরজি বিভোব।
গেনে গেনে গোব, গোব বলি ধাবই,
আনন্দ গবজত মোর।
পামর পক্ষু, অধম লড় আতুর,
দীন অবধি নাহি নাম।
অবিরত ছলভ, প্রেম রতন ধন,
যাচি জগতে কক দান।
অতি চলনোয়, প্রেমধন বিতরণে,
নিখিল তাপ দূরে গেল।
ধীন ধীন সবহ, মনমথ পুরল,
অবলা উনমত ভেল।
ঐ ছন করণ, নয়ান অবলোকনে,
কাহ না রহ ছবদিন।
বলরাম দাস, কাহে ভেল বঞ্চিত,
দারুণ হৃদয় কঠিন।

আর একটি পদ এখানে দিতেছি, বলরাম নিত্যানন্দকে কি ভাবে দর্শন করিতেন, এই পদে তাহা বলিয়াছেন। কেবল বলরাম নহেন, সমস্ত বৈষ্ণব সমাজই তাঁহাকে ঐ ভাবে দেখিয়া থাকেন। বলরামের দ্বিতীয় পদঃ—

“পূর্ণক্স গমনে যায়, সক্ষর দিষ্টে চায়,
পদভরে মই টলমল।
সঙ্গ সিংহ গতি সিংহি, কম্পমান মেদিনী,
পাণ্ডীগণ গুনিয়া বিকল।

আয়ত অবধূত করুণার সিদ্ধ।
প্রেমে গর গর মন, করে হরি সঙ্গীর্জন,
পতিত পাবন দীনবন্ধু।
হঙ্কার করিয়া চলে, অচল মচল নড়ে,
প্রেমে ভাবে অমব সমাজে।
সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ খেলন রঙ্গে,
অলক্ষিতে কবে সব কাজে।
শেষশায়ী সঙ্ঘণ, অবতারি নারায়ণ,
যাব অংশ কলায় গমন।
রূপাসিদ্ধ ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্তা
সেই রাম রোহিনী নন্দন।
যার লীলা, লাবণ্য ধান, আগমে নিগমে গান
যাব রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পহু দেশে দেশে,
উদ্ধার করয়ে ব্রিজুবন।
যজ্ঞবৈদ্য দার, যত যত লীলা আর,
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কথ, মনোরথ সিদ্ধি হয়,
ভজ ভজ ঐপাদ চরণ।”

নিত্যানন্দের গণ ব্যতীত, অপরের লিখিত
এরূপ পদ অস্বী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পদকর্তার ২২৫১ সংখ্যক পদটিও
এখানে উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু এসকল পদ
অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই।
বলরাম নিত্যানন্দের “গণ”—নিত্যানন্দ
পরিবার, তাহার নিজের কথ্যেই তাহা
প্রমাণিত হইবে। পূর্বোক্ত পদাদি একথা-
রই পোষক মাত্র, বলরামের রচনার পারি-
পাট্য বা তাহার কবিত্ব প্রদর্শনের জন্য
উহা উদ্ধৃত হয় নাই, পাঠক অনুগ্রহ পূর্বক
ইহা স্মরণ রাখিবেন। বলরামের কবিত্বের
পরিচয় দিতে এখানে প্রয়াস পাইব না,
কেন না, বঙ্গীয় পাঠক এই প্রাচীন কবির
কবিতার সহিত বিলক্ষণ পরিচিত।

প্রেম-বিলাস একখানি প্রাচীন গ্রন্থ।
১৫২৯ শকে কর্ণানন্দ রচিত হয়, কর্ণানন্দ
প্রেম বিলাসের উল্লেখ আছে। প্রেম-বিলাস
প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্বে রচিত হয়। প্রেম-
বিলাসের রচয়িতার নাম বলরাম দাস। গ্রন্থ
শেষে নিম্ন লিখিত রূপে তিনি আত্ম পরি-
চয় দিয়াছেনঃ—

“মাতা সৌদামিনী পিতা আশ্বারাম ঈশ্বর।
অবধি কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস।
আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক।
পিতা মাতা মোহে চলি গেলা পরলোক।

অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার ।
 বাহিতে স্বপন এক দেখিল চমৎকার ॥
 জাহ্নবা দিগন্তী কহে কোন চিন্তা নাহি ।
 গড়দত্তে গিয়া মরু নহ মোর ঠান ॥
 সপ্ন দেখি খসিয়া গেলু হৃদয়মন ।
 জগদী কবিতা মোর সুপার ভাটন ॥
 বলরাম দাস নাম পুরে মোর চিত্তা ।
 এবে নিত্যানন্দ দাস ক্রীয়ে বাঁচিয়া ॥
 নিজ পরিচয় আমি কবিতু প্রাণে ।
 গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব পদে কবি নমস্কার ॥
 (পদবিবাস) ।

ইহাতে জানা যায় যে, বলরামের মাতার নাম সোদামানী এবং পিতার নাম আদ্যাবাম দাস । বলরাম ভাটিতে বৈদ্য ছিলেন, এবং বাড়ী গ্রীকণ্ডে ছিল । বলরামের গুরুদত্ত নাম নিত্যানন্দ দাস, ইহাও জানা যাইতেছে । এক্ষণে সাধারণত “ভেকধারী” বৈদ্যগোষ্ঠ গুরুদত্ত নামেই পরিচয় দেন, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী গুরুদত্ত গুরুদত্ত নাম কদাচিত্ দৃষ্ট হয় । কিন্তু পাণ্ডীন প্রাদেশিতে দেখা যায় যে পুরে বৈষ্ণব পদাবলম্বী প্রায়ই দুইটি নাম প্রাপ্ত । দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুর্ভট্টনের কথা বলিতেছি । ১—বাও । যাব হাঙ্গি বনবিষ্ণুপদে অবিপত্তি ছিলেন, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহার নতুন একটি নাম হয়, সে নাম চৈতন্য দাস । যাব হাঙ্গিবেব গুরু ইনিবাসাচার্য্য ।

“নিম্পুত্র বচন বহিষ্য দুঃসম ।
 * * *
 দেগিয়া বজ্রাব ভক্তি গহে অধিকার ।
 * * *
 বাধাবন্দ মচ দাক্ষা দিলা হৈ বৈষ্ণা ॥
 * * *
 দেগিয়া বজ্রাব চেষ্টা কহে বারে বারে ।
 * * *
 শ্রীচৈতন্যদাস নাম খুইলাম তোমার ।
 ওনিয়া বজ্রাব নেড়ে বহে অশ্রুধার ॥”

(ভক্তিরত্নাকর)

ভক্তিরত্নাকরের নবম তবঙ্গে রাজার বীরহাঙ্গির ভণিতা-যুক্ত দুইটি পদ উদ্ধৃত আছে ; এবং পদকল্পতরুর ২০৩০ সংখ্যক পদ বীরহাঙ্গির ভণিতা-যুক্ত । তিনি চৈতন্য দাস ভণিতা দিয়াও বহুতর পদ রচনা করিয়া ছিলেন, পদকল্পতরুতে সে সকল পদ সংগৃ-

হীত হইয়াছে । বহুতর ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হয় নাই । যথা—

“চৈতন্য দাস নামে যে গীত বর্ণিল ।
 বিস্তারের ডরে তাহা নাহি জানাইল ॥”

(ভক্তিরত্নাকর) ।

২—কবি প্রেমদাসেরও ঐকপ আর একটি নাম ছিল । সেইটি তাহার পিতৃমাতৃ-প্রদত্ত প্রকৃত নাম । প্রেমদাস তাহার গুরুদত্ত নাম । প্রেমদাস নামে তিনি অধিকাংশ পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া, ঐ নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত । তবে তাহার পুরুষোত্তম নামযুক্ত পদ যে নাই, তাহা নহে ; পদকল্পতরুতে পুরুষোত্তম ভণিতা যুক্ত ১২টি পদ দৃষ্ট হয় । এখানে সংখ্যার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র । প্রেমদাস তাহার পিতার কনিষ্ঠ পুত্র, তিনি আত্ম নিবরণে লিখিয়াছেন :—

‘কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম
 গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস ।
 সিদ্ধান্তবাণীশ বলি, নাম দিলা বিজ্ঞ বলি
 ব্রহ্মদাস্তে মোর অভিলাষ ॥

(বংশীশিকা) ।

ভক্তি-বজ্রাকব বচয়িতার নামও এখানে উল্লেখ করা যাউতে পারে, তাহারও দুইটি নাম ছিল, একটি ঘনশ্যাম দাস ; অপরটি নবহরি দাস । উভয় নামের ভণিতাযুক্ত তাহার বহুতর পদ আছে ।

প্রাচীন মহাজন ও পদকর্তাগণের মধ্যে একপ প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে । অতএব কবি বলরামেরও আর একটি নাম নিত্যানন্দ দাস ছিল ।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দুই স্ত্রী—বহ্নদা ও জাহ্নবা । জাহ্নবা দেবী শিষ্যাদি করিতেন । উপযুক্ত স্ত্রীলোক পুরুষকেও শিষ্য করিতে পাবেন, ইহা গুরু পরিবারে সর্বত্রই প্রচলিত আছে । কবি বলরাম জাহ্নবাদেবীরই শিষ্য । অতএব তিনি নিত্যানন্দ “পরিবার ।” এই জগুই চরিতামৃতে নিত্যানন্দ শাখা-বর্ণন পরিচ্ছেদে তাহার নাম পাওয়া যায় । পদকর্তা জ্ঞান দাস ও * ঐকপই

* বহুবব শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিখ্যাত অভিধানে সংশ্লিষ্ট “জাহ্নবা” শব্দ দ্রষ্টব্য ।

জাহ্নবা শিষ্য ছিলেন, ইহার নামও চরিতা-
মূতে আছে। বলরাম জাহ্নবা শিষ্য, প্রেম-
বিলাসে তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন, যথা :—

“মোব দীক্ষাগুরু হয জাহ্নবা ঈশ্বরী।

যে বৃণা করিলা মোরে কহিতে না পারি।”

(প্রেমবিলাস)।

তিন প্রভুর অন্তর্কানের পরই খেতরীতে
শ্রীমৎ নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ
বিগ্রহ স্থাপনোৎসব হয়। এই উৎসবে অনেক
পার্শ্বদ ভক্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই
উৎসবে জাহ্নবা দেবীর সহিত, নিত্যানন্দ
শাখাভক্ত যে যে ভক্ত গমন করেন, তাহা-
দের নামেব সহিত বলরাম দাসের নামও
পাওয়া যায়। যথা—

মুরারী, চৈতন্য, জ্ঞানদাস মহীধর।

* * *

শ্রীপদ্মেশ্বর দাস, বলরাম বিজয়ব।

শ্রীমুকুন্দ, দাস বৃন্দাবন আদি কবি ॥

(ভক্তিবাহকব)।

জাহ্নবা শিষ্য,—জাহ্নবীর অনুগামী এই
“বিজয়বর” বলরামই আমাদের প্রসিদ্ধ পদ-
কর্তা। প্রেমবিলাসেও (১৯ বিঃ) খেতরীর
উৎসব বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার জাহ্নবা-
সহ ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, এই জ্ঞাত
অত্যাশ্রয় অনুগামী ভক্তগণের নামের সহ
নিজ নাম লিখেন নাই, তবে তিনি (“আমি”)
উপস্থিত ছিলেন, স্বীকার করিয়াছেন।
অতএব চরিতামূর্তের “কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদী”
নিত্যানন্দ ভক্ত, বৈষ্ণব বন্দনায় লিখিত
“সঙ্গীতকারক” আর, ভক্তি রত্নাকরের
এই “বিজয়বর” বলরাম দাসই প্রেমবিলাস-
রচয়িতা ও প্রসিদ্ধ পদকর্তা। নতুবা উৎস-
বোপস্থিত জাহ্নবা দেবীর অত্যাশ্রয় ভক্তগণের
জ্ঞান, প্রেমবিলাসে তাঁহারও নাম থাকিত।
এই প্রসিদ্ধ কবির রচিত প্রেমবিলাস ব্যতীত
“বীরচন্দ্র চরিত” নামে আর একখানি গ্রন্থ
আছে, কিন্তু উহা আমরা অদ্যাপি দেখি
নাই, প্রেমবিলাসে উল্লেখ মাত্র পাইয়াছি।

বলরামের বিবরণ অতি অল্পই অবগত
হওয়া যায়, বাক্য কিছু জানিতে পারিয়াছি,
কিন্তু হইল। বলরাম দাস বিবাহ করিয়া-

ছিলেন কি না, কোথাও তাহার উল্লেখ
নাই। পদকল্পতরুর ২৯৩১ সংখ্যক পদে
বলরাম লিখিয়াছেন—

“তৃতীয় সময় কালে, বন্ধন সে হাতে গলে,

পুত্র কলত্র গৃহবাস।

আশা বাড়ে দিনে দিনে, তাগ নাহি হয় মনে,

হবিপদে না করিহু আশ ॥”

এই সকল কথা যদি সাধারণ ভাবে না
লইয়া, তাহার আশ্রয় পক্ষে গ্রহণ করা যায়,
তবে বলিতে হইবে যে তিনি বিবাহ করিয়া-
ছিলেন এবং পুত্র কল্যাণাদিও হইয়াছিল।
সাধারণতঃ বৈষ্ণব-গ্রন্থকর্তাদিগকে, পরকে
উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা নিজ মনকে সম্বো-
ধন পূর্বক কথা বলার রীতি দৃষ্ট হয়, সেক্ষেপ
হিসাবে উপরোক্ত কথা শুনি কবির আশ্রয়
পক্ষেই কথিত বলা যাইতে পারে। বলরা-
মের বৃদ্ধকালেব আর একটি পদ কেমন হৃদয়-
স্পর্শী, দেখুন—

“বুঢ়া কি আব গবব ধর।

এ ভব সংসার, সাগর তরিতে,

হবিনাম সাব কর ॥

পাকিল কন্তল, গায় নাহি বল,

কাকালি হইয়াছে বাঁকা।

হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি,

হুড়ি পড়ি বাবে শকা।

সন্ধ্যায় শয়ন, কাশ ঘন ঘন,

সঘনে ডাকিছে গলা।

মুদিত নয়ান, ঘুচাইয়া দেখ,

উদিত হইয়াছে বেলা ॥

যাস যে রোদন, লজি ঘনে ঘন

সঘনে পিবহি পানী।

অতয়ে বদন, ভবি বল হরি,

দাস বলরাম বাণী ॥”

এখানে বলরামের কবিত্ব বিশ্লেষণের
প্রয়াস বৃথা, তাঁহার হই একটা ভিন্ন রকমের
পদ উদ্ধৃত করিয়া সে চেষ্টা করা যাইতে
পারিত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বলরাম
অপরিচিত হইলেও, বলরাম দাসের পদ
বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অপরিচিত নহে; সুতরাং
সে চেষ্টা করা গেল না।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ।

প্রণীলা ।

(কবি-ভগিনী প্রণীলা নাগের-অকাল মৃত্যুতে)
বঙ্গ কবি-কুঞ্জে তুমি আছিলে বর্ষার
প্রভাতের পিক যেন ; বন্ধারে কেবল
ঝরিত কি আকুলতা বিষাদ ব্যথার,
করিয়া হৃদয় মন উদাস-বিহ্বল ।
বাঙ্গালার দক্ষভাগ্য—খেদে ফাটে প্রাণ !
অকালে নীরব হলো সে বন্ধার হাণ !
তু'একটা পথহার্য করণ সে তান
“প্রণীলা” “তটিনী” কপে রহিল ধরাণ !
যে ক'দিন ছিলে হেথা শুধুই কাঁদিলে
বিষাদ-অশ্রুতে বচি' ক্ষুদ্র “এ তটিনী” !
কিস্ত এই “তটিনীর” বিষাদ-সলিলে
কে বলিবে, কত জনে জুড়াবে পরানী !
যে স্মৃতি শাস্তির খুঁজে পরিশ্রান্ত হেথা,
অমর সে কবি-কুঞ্জে এবে পাবে সদা ।
শ্রীচাকচক্ষু বন্দ্যোপাধ্যায় ।

কে তুমি গাইয়ে গেলে ?

কে তুমি গাইয়ে গেলে গভীর নিশীথে,
চমকে ভাঙ্গিয়া মোর স্বপ্নের স্বপন,
বন্ধারি হৃদয় বীণা কঠিন আঘাতে,
জাগাইয়া জড়প্রাণ ঘুমে অচেতন ?

আঁধারের আবরণে কে তুমি নিষ্ঠুর
দূর দূরান্তরে থাকি,
আপনা লুকায়ে রাখি
চালিলে গো স্ববাক্যে রব স্তম্ভন ?
চমকে জাগিল প্রাণ,
সেই সুর সেই তান,
হৃদয়ে রহিল মিশি না পারি ভুলিতে ;
কে তুমি গাইয়ে গেলে গভীর নিশীথে ?

কে তুমি গাইয়ে গেলে
কেন মোরে ভাগাইলে ?
বিশ্বাস্তি স্বপন মাঝে ছিন্ন যে ডুবিয়া !
অচেতন মাঝে হায় !
ছিন্ন অচেতন প্রায়,
চেতনা, কর্তব্য, জ্ঞান, সকল ভুলিয়া ;
কেন এ মধুর তানে,
পুন জাগাইলে প্রাণে,

সেই সব স্তম্ভ স্মৃতি, উৎকর্ষা, আকুলি ?

কেন মরু হৃদয়েতে
বহাইলে নব স্রোতে
আশার তটিনী পুন আবেগে উথলি ?
অনন্তের বেলা ভুমে
পড়েছিল ঘোর ঘুমে
কল্পনার শিশুগুলি হারিয়ে চেতনা ;
উঠিল জাগিয়া তারা
হইয়া আপন হারা
শ্রামের বাশরী-রবে যথা ব্রজাঙ্গনা ;
বসন্তের আগমনে
ফুল যথা কুঞ্জবনে
ব্যাকুলিত জাগে শুনি ভ্রমর-গুঞ্জন ;
সেইরূপ হৃদে মোর
ভাঙ্গিয়া ঘুমের ঘোর
জাগিল নবীন আশা নব আলোচন ;
কর্তব্য, কল্পনা, প্রেম, সকল নূতন !

৪

কে তুমি নিশীথ কালে
সুধা বীণা বন্ধারিলে
পরান পাগল করি ভাঙ্গিলে স্বপন ?
ছুটে রুদি তোমা পানে
প্রেমিক গিরীক গানে
আকুলিত যথা জীব তরুলতাপণ !
কিস্ত না নেহারে পথ অন্ধ যে নয়ন !

৫

কে তুমি জাগিয়ে হেন
বহিলে নীরব পুন ?
দেখিতে যাতনা কিগো উদ্দেশ্য কেবল ?
রয়েছি শ্রবণ পাতি
শুনিতে সে সুধাগীতি
শুনাও ;—আকুল প্রাণ করগো শীতল ;
দেখা দাও একবার,
নয়নের অন্ধকার,
ঘূচাও,—পূরাও মম হৃদয় বাসনা ;
জাগাও অতীত স্মৃতি
উৎকর্ষা, আকুলি, শাস্তি
করগো করগো যদি দিয়েছ চেতনা ;
নীরবে নিষ্ঠুর হয়ে দিওনা যাতনা ।

শ্রীবিহারীলাল গুহ স্বাক্ষর

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

২৮। বেদান্ত-দর্শন।—মহর্ষি-বেদব্যাস কৃত উত্তর মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র। সটাক—শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত শ্রীমদ্ গোবিন্দ ভাষ্য এবং শ্রীযুক্ত শ্রীমানলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি কৃত বঙ্গানুবাদ ও গোবিন্দভাষ্য বিবৃতি সমেত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত সম্পাদিত। বেদান্ত-দর্শন সকল দর্শনের শিরোমণি। বেদান্ত-দর্শনের রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য, এই চারি সম্প্রদায়ের চারিখানি এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের একখানি, এই পাঁচখানি ভাষ্যই প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণব সমাজে বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত গোবিন্দ-ভাষ্যই বিশেষ সমাদৃত ও প্রচলিত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত-সম্পাদিত এই গ্রন্থে বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যেরই প্রাধান্য। বৈষ্ণব সমাজের দিক্ হইতে বেদান্তের যে মীমাংসা হওয়া সম্ভব, তাহা অতি বিশদভাবে, অতি পরিষ্কৃত ও উজ্জলরূপে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় এই কাজে ব্রতী হইয়া দেশের মহত্বকার করিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থ সর্বত্র সমাদৃত হইলে আমরা নিতান্ত সুখী হইব। এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে গভীর গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এই উপদেশ গ্রন্থ উপহার-প্রাপ্তি জন্ত বিশেষ বাধিত রহিলাম।

২৯। কবিতামালা।—৬ গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু কর্তৃক সংগৃহীত, মূল্য ১১, গুরুদাস বাবুর দোকান, সংস্কৃত ডিপজিটারি প্রভৃতিতে প্রাপ্তব্য। গোপাল বাবু একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুন্সেফের কাজ করিতেন। এই পুস্তকের অধিকাংশ কবিতা তাঁহার পাঠ্যাবস্থায়, ২১ হইতে ২৩ বৎসর বয়সের লেখা। কবিতাগুলি স্বদেশ-হিতৈষণায় এবং প্রেম-মাদকতায় পূর্ণ। কিন্তু সে সকল কথা বলিবার পূর্বে সংগ্রাহক মহাশয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে বলা আবশ্যিক।

গোপালবাবু এখন স্বর্গে, তাঁহার বন্ধু, অকু-ত্রিম স্নহৎ দেবেন্দ্রবিজয় বাবু তাঁহার সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্ত ব্যতিব্যস্ত। ১২৬২ সালের ৩রা চৈত্র, গোপাল বাবুর জন্ম এবং বিগত ২৫শে আষাঢ়, ১৩০৩, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পবেই দেবেন্দ্র বাবু, গোপাল বাবুর কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ত বন্ধ-পরি-কর হইবাছেন। একপনিঃপার্থ ভালবাসা এই মর্ত্যধামে বড়ই বিরল। বাপালা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেলের প্রতি তদীয় বন্ধুগণের অবহেলা এবং দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর আদর স্মরণ করিলে, যুগপৎ ঘৃণা ও শ্রদ্ধার উদয় হয়। দেবেন্দ্রবিজয় বাবু সখা-প্রেমের যে উজ্জল, মনোমুগ্ধকর চিত্র দেখাইলেন, তাহা এ দেশে অক্ষয় হউক। গোপাল বাবুর সম্রাস্ত পরি-বারের আত্মীয়বর্গ গাহা পারিলেন না—করিলেন না, দেবেন্দ্র বাবু িজ্ঞ অর্থ ব্যয়ে তাহা করিলেন; একথা স্মরণ করিলেও আনন্দ পাই। দেবেন্দ্র বাবু গোপাল বাবুর জীবন সম্বন্ধে যে কয়েকটি অমূল্য কথা এই গ্রন্থের প্রথমে লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি কথা গভীর সখা-প্রেমের পরিচয় দেয়—তাহা যেন উষ্ণ শোণিতের তবল ধারায় লিখিত, তাহা যেন হৃদয়-দ্রাবকে অঙ্কিত, তাহা যেন প্রেম-অমিয়ায় সূচিত্রিত। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষু হইতে অলক্ষিতে জল ধারা প্রবাহিত হয়, হৃদয় মনটা যেন কোন্ অদৃশ্য রাজ্যে চলিয়া যায়। আমরা গোপাল বাবুকে কখনও দেখি নাই—তবুও তাঁহার জন্ত আজ আমাদের প্রাণ আকুল। ধন্য দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর লেখনী।

সংগ্রাহক, গোপাল বাবু কবিতাগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রথম খণ্ড—মধুর ভাবময়ী কবিতা, দ্বিতীয় খণ্ড জা-তীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা দিন দিনই বঙ্গে দুর্লভ এবং দুস্তাপ্য হইতেছে। জাতির অভ্যুত্থানের পক্ষে জাতীয় সঙ্গীত এবং কবিতার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এখনকার কবিগণ সে সকল কথার কোন ধার ধারেন না, ইন্দ্ৰিয়জ প্রেম-প্রণয়ের গাথা,

অথবা ফুল বা জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্য বারমণীর
রূপ-পিপাসাতেই বিভোরে। হেম বাবুর
ভারত-সঙ্গীত, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরং,
গোবিন্দ রায়ের যমুনা-লহরীর তুল্য কবি-
তার উচ্ছ্বাস এখন থামিয়াছে, এখন ফুল-
জ্যোৎস্নার প্রবল বস্ত্রা বহিতেছে। এ জাতি
ডুবিতেছে, না উঠিতেছে, কে বলিতে পারে ?
কবিতামালার কবি বলিতেছেন—

“ভারতের পরিণাম—কি ছিল কি হলো।
কাজ কি সে পূরি স্থিতি—আহা ভুলে যাউ।
ঘটেছে যা ঘটান, কি কাজ ভাবিয়া আর,
ভুলে যাউ তাহা—যদি ভুলে স্থখ পাই।
হতাশ তিমিরে আজি আচ্ছন্ন জীবন।
আত্মহত আমি—আহা হই বিষবণ।।”

আবাব—

“দ্বিধা হও ধরপিণী। লুকাও ভিতরে,
ভারত কলঙ্কমুখ ও সুস্বাদু তব।
কি কাজ জীবনে যদি এত বিড়ম্বনা,
দুবুক ভার—ভাবতের জন
অনন্ত সাগর গর্ভে। অনন্ত সলিলে,
ডুবে থাক আশা নাম। ভাবতের বশ
ভুলে যাও স্থিতি—আর কবো না স্মরণ,
চিরদাসী ভারতের সৌভাগ্যের দিন।”

এই সকল কবিতা পড়িতে পড়িতে কবির
গভীর স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া যুক্ত,
স্তুতি এবং আশ্রয়দাতা হই। একরূপ স্বদেশ-
হিতৈষীর বীণা কেন অসময়ে নীরব হইল,
ভাবিয়া শোকে আচ্ছন্ন হই।

কবির ভারত-বিলাপের প্রতি কণায়
যে স্বদেশানুরাগ, যে খোলা হৃদয়-আবেগ
চিত্রিত হইয়াছে, তাহা এদেশে তুলন।
ইচ্ছা হয়, সমস্ত কবিতা উদ্ধৃত করি।
কিন্তু স্থান কোথায়? তাহাতে লাভই
বা কি? এই কবি যে দেশের দুঃখের
কথা ভাবিয়া ২ অনন্ত ধামে চলিয়া গিয়া-
ছেন, সে দেশে এই কবির কি আদর হইবে
না? এই কবিতামালা, পুষ্পমালার জায়
এ দেশের নরনারী সাদরে গ্রহণ করিয়া
গোপাল-ভক্তির পরিচয় কি দিবে না?
আমরা আশা-হত নই। আশা আছে, যের

যের মাতৃভক্ত গোপালের এই কবিতামালা
শোভা পাইবে,—আশা আছে, সকলের সাদর
আলিঙ্গন পাইবে।

৩০। রসলীলা।—প্রকৃতি গায়িকা।

ত্রিভুগদীশ মুখোপাধ্যায় বি-এ কর্তৃক সম্পা-
দিত ও প্রকাশিত। এ পুস্তক খানির বিস্তৃত
সমালোচনা করিতে একান্ত ইচ্ছা ছিল;
কিন্তু স্থানাভাবে তাহা হইল না। প্রেম-
বিহবল সাধু ভক্তের ভক্তির মাদকতায় এই
গ্রন্থ পূর্ণ। নমুনা দেখাইতে হইলে পুস্তক-
খানি সমস্ত তুলিয়া দিতে হয়। তাহা অসাধ্য
সাধন। পরিচয়ের জন্ত দুই চারিটা স্থান
হইতে কিছু কিছু তুলিলাম,—

১। “পথপানে চেয়ে জীবন গোঁরাশু ;

বঁধু আমার কেন এল না ?

আশা প্রপাতে হৃদয় করিল,

এ আশা কেন গেল না ?”

২। “পাগী তুই ডাকিসনে ডাকিসনারে ডাকিসনে,
সে যে পড়ে মনে।

লকায়ে আমি কবে, সেত জ্বলে গেল মোরে,

সে হতে মরি মরম আগুনে।”

৩। “পাগলিনী নাথ তুমি, পাগলিনী আমি তব,

তোমারই সোহাগে, নাথ, ফুটে ফুল নব নব।

গাঁথি বন ফুলমালা, সাজায়ে বরণ ডালা,

এসেছি তোমার কাছে কেন কেন কি তা কব।”

৪। “আমায় দংশেছে কি কাল ক্ষণী গো,

আমায় অঙ্গ হইছে ভাবী, আমি নাড়িতে যেনাশি।”

৫। “ন আলোক ন আঁধার নাহি কিছু পারাধার।

জ্ঞানময়ী মহামুখি ধবে শক্তি মূল্যধার,

জীবন মরণময়, পায় বিধ স্থিতলয়

নেহারিব মহামোহে জাগরণে।”

এই পুস্তকের প্রায় সমস্ত কবিতাই তাল
মানে গেল। সমস্ত গুলি গানে গুলি নাই,
কিন্তু মনে হয় যেন, গায়ক-লেখকের মুখে,
দুটি একটা গুলিয়াছি। যিনি ভক্তিতে পাগল,
প্রেমেতে অধীর, সেবায় কাঙ্গাল, তিনি
কাহার না ভক্তির পাত্র? এই ভক্তি-
বিরহ-মাধা গাথা, এই পাষণ সদৃশ আমরা,
ক্ষণকালের জন্তও, মোহময় সংসারের অতীত
হই, নিত্যানন্দময় ধামের যাত্রীক হই। স্ত-
রাং গায়কের এই গাথা সার্থক হইয়াছে।

নেপালের পুরাতত্ত্ব । (১০)

ললিতপট্টনের রাজা সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল ও তাঁহার বংশধরদিগের নামাক্ষিত দুই খানি শিলালিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে; তাহা হইতে রাজা সিদ্ধিনৃসিংহের উর্দ্ধতন ও অধস্তন তিন পুরুষের নাম পাওয়া যাইতেছে। অমুমান ১৬২০ খ্রীঃ সিদ্ধিনৃসিংহ ললিতপট্টনে রাজপাঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লক্ষ্মীনৃসিংহ-মল্ল কাটমাণ্ডুৰ সিংহাসনে অবস্থিত হইবা, পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ১৫৭ নেপালী সংবতে (১৬৩৭ খ্রীঃ) রাজা সিদ্ধিনৃসিংহের আদেশে ললিতপট্টনের রাবারুক্ষ-মন্দিরস্থ শিলালিপি খোদিত হয়। আমাদের অমুমান মতে সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল ১৬২০-৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসর কাল ললিতপট্টনে বাজত্ব করেন। পণ্ডিত চুড়ামণি প্রিন্সেপ সাহেবের মতে ১৬৫৪ খ্রীঃ রাজা সিদ্ধিনৃসিংহ ললিতপট্টনের রাজ্যসনে উপবিষ্ট হন। তিনি সিদ্ধিনৃসিংহের পূর্বপুরুষদিগের মধ্যো কাহারও কাহারও নাম উল্লেখ কবিত্তে পারেন নাই। তিনি ললিতপট্টনের রাজবংশের যে নামমালা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শাসনলিপি কি বংশাবলীর সাহিত মিলিতেছেন। ইহা হইতে

তাঁহার প্রকাশিত নেপালের রাজবংশাবলীর অমূলকতা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে। নামমালার ঞায় তাঁহার নির্দিষ্ট সময়ও একান্ত ভ্রান্ত বলিয়া শাসনলিপি হইতে নিঃসন্দ্বিধরূপে জানা যাইতেছে। ১৮৩৫ খ্রীঃ তিনি নেপালের নবপতিদিগের যে কালনিক নামমালা প্রকাশ কবেন, তাহা কোন মতে ইতিহাসের নিকট গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তাঁহার ভ্রমপ্রমাদ অনিবার্য্য। কাৰণ সেই সময়ে নেপালী শিলালিপির অস্তিত্ত্বের বিষয়ও কেহ অবগত ছিল না। ডাক্তার ত্র্যামলির সংগৃহীত নেপালী মুদ্রা হইতে তিনি ললিতপট্টনের রাজবংশের সময় নিকপণের যে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণরূপে বার্থ হইয়াছে।

নিম্নে ললিতপট্টনের নৃপতিদিগের নামমালা শিলালিপি হইতে গৃহীত হইয়া, প্রিন্সেপ সাহেবের প্রকাশিত নামমালার সহিত তুলিত হইল। আমাদের অমুমিত সময়ের সহিত প্রিন্সেপ সাহেবের নির্দিষ্ট সময় তুলনা কবিলেই, পাঠকবর্গ তাঁহার ভ্রম প্রমাদ সম্পূর্ণরূপে ছদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

ললিতপট্টনের বংশাবলী।

(শিলালিপি এবং বংশাবলী।)

মহেন্দ্রমল্ল (১৫৪০-৬০ খ্রীঃ)
শিবসিংহমল্ল (১৫৮০-১৬০০)
হর্বিহর সিংহমল্ল (১৬০০-২০)
সিদ্ধিনৃসিংহমল্ল (১৬২০-৬০)
শ্রীমিবাসমল্ল (১৬৬০-১৭০০)
যোগনরেন্দ্রমল্ল (১৭০০-২০)
যোগমতী
যোগপ্রকাশ (১৭২০-৩০)
বিষ্ণুপ্রকাশ (১৭৩০-৪০)
বিষ্ণুজিৎমল্ল (১৭৪০-৫০)
ভেজদরসিংহমল্ল (১৭৫০-৬০)

(প্রিন্সেপ সাহেবের নির্দিষ্ট নামমালা)

জয়ত্রৈক্ষমল্ল (১৬০০ ?)
কল্যা
সিদ্ধিনবসিংহ (১৬৫৪-৮৫ খ্রীঃ)
নির্গুণ ইন্দ্রমল্ল (১৬৮৫-৮৯)
যোগনবেন্দ্রমল্ল (১৬৮৯-৯৫)
মহীপতীন্দ্রমল্ল (১৬৯৫-৯৬)
জয়বীর মহেন্দ্র (১৬৯৬-১৭০৬)
জয়ইন্দ্রমল্ল (১৭০৬-১৫)
ছদয়নরসিংহ (১৭১৫-১৬)
কিমিনির্মলদেব (১৭১৬-২২)
জয়যোগীযোগমল্ল দেব (১৭২২-২৯)
জয়বিষ্ণুমল্ল (১৭২৯-৩১)
জয়যোগপ্রকাশ মল্লদেব (১৭৪২-৪৯)
জয়বিষ্ণুমল্ল আগনি (১৭৪৯-৫৫)

আমরা উপরে শিলালিপি হইতে সাতটা নাম গ্রহণ করিয়াছি। নিম্নতন চারিটা নাম বংশাবলী হইতে গ্রহণ করিয়াছি। কাটমাণ্ডু নগরের চারি মাইল দক্ষিণে বঙ্গমতী নামে যে বৃহৎ গ্রাম বর্তমান আছে, তথায় অবলোকিতেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই মন্দিরের তোবণদ্বাবে লোকেশ্বরের তিনটা কাংকনির্মিত প্রতিকৃতি অদ্যাপি বর্তমান আছে। সিদ্ধিনৃসিংহমণ্ডল পুত্র শ্রীনিবাসমন্ডল আদেশে ও অর্থব্যয়ে দ্বারদেশ ও তোবণ স্বর্ণমণ্ডিত করা হয়। ১৯০০ নেপালী সংবতের (১৬৭২ খ্রিঃ) মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে এই কার্য সম্পন্ন হয়। নেওবাৰী অক্ষরে ও সংস্কৃতভাষায় এই লিপি খোদিত ও রচিত হয়। বংশাবলীর মতে তিনি ১৬৫৭-১৭০১ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আনাদেব নির্দিষ্ট সময়ের অভ্রান্ততা এই ক্ষুদ্র শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

“নেপালাদ লোচন চন্দ্র সপ্তে,
শ্রীপদ্মায় শ্রীনিবাসেন রাজা।
স্বর্ণদ্বাং স্থাপিতং তোবণেন,
সাক্ষং শ্রীমল্লোক্তনাথ গৌহে ॥”

শ্রীনিবাসমন্ডল মৃত্যুব পৰ্ব তাঁহার পুত্র যোগনরেন্দ্রমন্ডল পৈতৃক সিংহাসনে আবোহণ করেন। দোলপূর্ণিমাত্ম বিষ্ণুমন্দিরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার একবিংশতি পত্নী তাঁহার চিতানলে প্রাণ বিসর্জন করেন। যোগনরেন্দ্র পুত্রশোক সম্মানস্বত্ব গ্রহণ করেন বলিয়া বংশাবলীতে বর্ণিত আছে। অনন্তর কাটমাণ্ডুর মহারাজা প্রতাপমন্ডল তৃতীয় পুত্র মহীন্দ্রমন্ডল ললিতপট্টনের সিংহাসন অধিকার করেন। বংশাবলীর এই উক্তি কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না। ইহা হইতে এই সত্য পাওয়া যাইতেছে যে, রাজা

সিদ্ধিনৃসিংহমন্ডল সময় হইতেই ললিতপট্টন অল্পাধিক পরিমাণে কাটমাণ্ডুর পদানত থাকে।

শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজা যোগনরেন্দ্রমন্ডল সিংহাসন পরিত্যাগে পৰ্ব তাঁহার কন্যা যোগমতী ললিতপট্টনে বাক্যসনে অধিষ্ঠিতা হন। এই যোগমতী দেবী ৮৮৩ নেপালী সংবতের (১৭২৩ খ্রিঃ) মাঘী শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে সোমবারে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন।

“অংক বামপ্রজ্ঞেদ্রবাক্ত বহুভিমাংসিতে পক্ষকে,
মূল চৌত্তব্যায়নে শশধবে বাসে দ্বিতীয়া তিথৌ।
গদাং বকতে স্বপাংস্তবদনা পায়ণ দেবালয়ং।
বৃহৎ গির্ধিকা সত্য দ্বিতীয়া বৃদ্ধা প্রতিষ্ঠামকবাৎ ॥”

জ্যৈষ্ঠপূর্ণ লোকপ্রকাশ মাতা যোগমতীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন। এই লোকপ্রকাশের স্বর্ণকামনায় রাজা যোগমতী ললিতপট্টনে এক পাষণময় দেবালয় নির্মিত কবাইয়া তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্তি স্থাপিত করেন। লোকপ্রকাশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগপ্রকাশের রাজত্বকালে উক্ত শিলালিপি খোদিত হয়। যে পর্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক যোগপ্রকাশ রাজ্যশাসনে অক্ষম ছিলেন, ততদিন তাঁহার মাতা যোগমতীদেবীর দ্বারাই রাজকার্য পরিচালিত হইত বলিয়া অনুমিত হয়। যোগপ্রকাশের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুপ্রকাশমন্ডল ললিতপট্টনে রাজত্ব করেন। আমরা উভয়জাতার রাজত্বকাল ১৭২০-৪০ খ্রিঃ পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকাল অনুমান করিতেছি। বিষ্ণুমন্ডল ১৮৫৭ নেপালী সংবতে মূলচকে এক ঘণ্টা স্থাপিত করেন বলিয়া বংশাবলীতে বর্ণিত আছে।

বংশাবলী হইতে জানা যাইতেছে যে,

বিষ্ণুমল্লের পর কাটমাণ্ডুর রাজকুমার রাজ্য-প্রকাশ এক বৎসর রাজত্ব করেন। রাজ্য-প্রকাশ কাটমাণ্ডুর রাজা জগজ্জয়মল্লের তৃতীয় পুত্র। বিষ্ণুমল্ল সম্ভবতঃ তাঁহাকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া, রাজ্যের ভারী উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। তাঁহার উৎপীড়নে প্রজাকুল ও অমাত্যবর্গ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে অবশেষে রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিয়া রাজ্যপ্রকাশকে পদচ্যুত করে। রাজ্যপ্রকাশের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা জয়প্রকাশ দুই বৎসরকাল ললিতপট্টনে রাজত্ব করিয়া, প্রধানদিগের দ্বারা বিতাড়িত হয়। জয়প্রকাশকে বিদূরিত করিয়া, প্রধানেরা বিষ্ণুমল্লের দৌহিত্র বিশ্বজিৎমল্লের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। চারি বৎসর পর বিশ্বজিৎমল্ল বিদ্রোহী প্রধানদিগের হস্তে নিহত হয়। অনন্তর প্রধানেরা নবকোটের রাজা দলমর্দন সাহকে ললিতপট্টনের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে। চারি বৎসর রাজত্বের পর দলমর্দনসাহ রাজ্যচ্যুত হয় এবং বিশ্বজিৎমল্লের পুত্র বা ভ্রাতৃপন তেজনরসিংহমল্ল রাজপদ প্রাপ্ত হয়। তেজনরসিংহমল্ল তিন বৎসর মাল রাজ্যাশাসন করেন। অনন্তর ললিতপট্টন নবকোটের রাজা পৃথ্বীনারায়ণের পদানত হয়।

শিলালিপির অভাবে বংশাবলী হইতে এই বিবরণ গৃহীত হইল। বংশাবলীর এই সকল উক্তি কত দূর প্রামাণিক, তাহা অবধারণের কোনও উপায় নাই। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বিষ্ণুমল্লের মৃত্যুর পর রাজ্য মধ্যে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়। আমাদের অনুমান মতে যোগনরেন্দ্রমল্লের মৃত্যুর পরেই নবকোট ও কাটমাণ্ডুর নরপতিগণের মধ্যে ললিতপট্টনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা

বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হয়। সময় সময় কাটমাণ্ডু ও সময় সময় নবকোট ললিতপট্টনে স্বীয় প্রাধিক্রম সংস্থাপিত করে।

নবকোট নগরে গোবখাবংশের আধিপত্য খ্রীষ্টাব্দ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা মেওরাবের সূর্য্যবংশীয় নরপতিদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। গোবখাবংশ প্রথমতঃ কুমায়নে ও পরে নবকোটে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ছয় শত পুরুষ রাজত্বের পর সমগ্র নেপালে তাঁহাদের অবিকার বিস্তারিত হয়। ক্রমে ক্রমে ললিতপট্টন, ভাটগাঁ ও কাটমাণ্ডুর সমবংশীয় নরপতিগণ গোবখাবংশের পদানত হয়। নেপালে গোবখাবংশের আধিপত্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে অব্যাহত রহিয়াছে। নেপালের বর্তমান মহারাজ ও অমাত্যবর্গ এই গোবখাবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। কাটমাণ্ডুর মহারাজ প্রতাপমল্লের শাসন সময়ের অবশেষে গোবখাবংশীয় উদয়সাহ নবকোটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রতাপমল্লের দ্বারা উদয়সাহ পরাজিত হইলে, গোরখাবংশের উদীয়মান প্রভুতা কিছুকালের জন্য পর্য্যদত্ত থাকে। ভাটগাঁর রাজা মহেন্দ্রমল্ল এবং ললিতপট্টনের সিন্ধুনসিংহমল্ল এই উদয়সাহের সমসাময়িক। উদয়সাহের বংশধর দলমর্দনসাহের আধিপত্য ললিতপট্টনে কিছু কালের জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। দলমর্দনসাহের পুত্র নবনারায়ণ সাহ অন্তর্য্যাম ১৭৪০ খ্রীঃ ভাটগাঁ আক্রমণ করিয়া তথায় স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। নরনারায়ণের পুত্র পৃথ্বীনারায়ণসাহ ৮৮৮ নেপালী সংবতে (১৭৬৮ খ্রীঃ) কাটমাণ্ডুর শেষ মল্লরাজ জয়প্রকাশকে পরাজিত করিয়া, সমগ্র নেপাল আপনায় পদানত করেন। মহারাজ প্রতাপমল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও

তৃতীয় পুত্র যথাক্রমে কাটমাণ্ডুর সিংহাসন অধিকার করেন। মহীন্দ্রমল্লের পর তাঁহার পুত্র ভাস্করমল্ল রাজপদ প্রাপ্ত হন। অপুত্রক অবস্থায় সংক্রামক রোগে ভাস্করমল্লের মৃত্যু হইলে, তাঁহার বিধবা পত্নীগণেব সাহায্যে নল-বংশীয় জগজ্জয়মল্ল রাজ্যলাভ করেন। কাটমাণ্ডুর শেষ রাজা জয়প্রকাশনএ এই জগতজ্জয়মল্লেরই দ্বিতীয় পুত্র।

প্রতাপমল্লের পরবর্তী কাটমাণ্ডু ব কোনও নরপতির নামাক্তিত শিলালিপি পণ্ডিত বর ভগবানলাল ইন্দ্রাজীর গবেষণায় আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজ্ঞী যোগমতী দেবীর অধস্তন ললিতপটনের কোন নাজার নামাক্তিত প্রস্তরলিপি পাওয়া যায় নাই। ভাটগাঁর অধিপতিদিগের নামাক্তিত এক-খানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদের অনুমিত সময়ের সত্যতা তাহা দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইতেছে। রাজা ভূপালেন্দ্র মল্লের মাতা রাজ্ঞী ঞ্জিলক্ষ্মী ৮১০ নেপালী সংবতে (১৬৯০ খ্রী:) কাটমাণ্ডুর রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে এক শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত বৎসরের কার্তিকী কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া তিথিযুক্ত রবিবারে সেই মন্দিরে এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়। রাজা ভূপালেন্দ্রমল্ল ভূজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে এক স্তোত্র রচনা করেন। এই স্তোত্রের শেষভাগে তিনি আপনাকে “রঘুবংশাবতার” “হুম্বজ্জ” ও “মহারাজাধিরাজ” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই শিলালিপির দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোক নিম্নে উক্ত হইল।

“নেপালাক্তিপালভালতিহাসে বিঘ্নগুণালঙ্কৃতো,
নানোদ্রেককৃতাতিরেকমহিমঃ প্রোচপ্রতাপোন্নতঃ।

দেবো বত্তনম্বো নমোদয়-লসৎকার্ত্তিপ্রচারঃ,

জিয়া ভূপালেন্দ্র ইতি প্রথামুপাগতো ভূপো বরীবর্জতে।২

নেপালাক্তে গগন-ধরণী-নাগযুক্তে, কিলোর্জে
মাসে, পক্ষে বিধুবিরহিতে, হৃদ্বিতীয়াতিখোসা।

বুড। দেবালয়মপি রনৌ ঞ্জিলক্ষ্মী প্রসন্ন।

চক্রে দেবী স্তবিধিবিদিতাং শব্দ বস্ত্র প্রতিষ্টাং ”৥৩৥

বংশাবলী ব নতে কাটমাণ্ডুর রাজা জগ-জ্জয়মল্ল ৮৫২ নেপালী সংবতে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু এই জগজ্জয় (মহীপতীন্দ্র)মল্লের নামাক্তিত ৮৬৮ নেপালী সংবতের একটা মুদ্রা আসানের অন্তর্গত বরপেটায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বংশাবলীর নির্দিষ্ট সময়ের ত্রুটি ও অমূলকতা স্পষ্টাক্ষরে জানা যাইতেছে। ভাটগাঁর রাজা ভূপালেন্দ্র (ভূপতীন্দ্র) মল্লের নামাক্তিত আর একটা মুদ্রা বরপেটায় পাওয়া গিয়াছে। তাহা ৮১৯ নেপালী সংবতে নির্দিষ্ট হয়।* এই দুই মুদ্রালিপি হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৬৯৯ খ্রী: ভূপালেন্দ্রমল্ল ভাটগাঁয় এবং ১৭৪৮ খ্রী: জগজ্জয়মল্ল কাটমাণ্ডু নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। শিলালিপির অভাবে মুদ্রালিপি আমাদের অনুমিত সময়ের সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে।

ত্রয়োবিংশতি খানি শিলালিপি হইতে নেপালের প্রামাণিক ইতিহাস যথাসাধ্য সংগৃহীত করিয়া প্রদর্শিত হইল। অতি প্রাচীন সময় হইতে গোরখাবংশের অধিকারকালের আরম্ভ পর্যন্ত নেপালের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এক্ষণে নেপালের বর্তমান অধিপতির গোরখা বংশের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া বর্তমান সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বর্তমান প্রবন্ধ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীত্বেলোকানাথ ভট্টাচার্য্য ।

আত্মা ও বাইওপ্ল্যাজম।

জনন-মরণজয়ী ব্রহ্মভূত শঙ্কবাচার্য্য একদিন কোন নৃশংস কাপালিকের ক্রূর কামনা পূরণার্থে যেষ্ট্রাক্রমে স্বীয় গ্রীবা যুগ-কাষ্ঠে বিচলিত করিয়া সহস্র বদনে বলিয়াছিলেন, “কাপালিক ! তোমার অসি যতই শাণিত হউক না কেন, আমার তিলাংশও ছেদন করিতে সক্ষম নহে; আমি জড় রাজ্যের সম্পূর্ণ অতীত, মনীয় জড়নির্ম্মোক্ত, মাত্রই তোমার করবালের ছেদনীয়।”

প্রতীত্য ভূখণ্ডের অপব একজন তরুণ পুরুষও (সক্রেটিশ) একবার ঠিক ঐরূপ একটি অপূর্ণ কথা শুনাইয়াছিলেন। তিনি হলাহল পান করিয়া যখন মৃত্যুর মধুময় আলিঙ্গনে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন তদীয় শিষ্য-বর্গ বড়ই অধীর হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের শোক মোহে অপনয়নের নিমিত্ত সক্রেটিশ বলিয়াছিলেন “তোমারা অমূলক শোকা-বেশে কেন ধৈর্য্য হারা হইতেছ? আমি যাহা আছি, তাহাই থাকিব। আমার কন্মিন কালেও ধ্বংস নাই। তোমরা এই স্থূল মাংস পিণ্ডকে “সক্রেটিস” বলিয়া কখনও মনে স্থান দিও না।”

শঙ্কর ও সক্রেটিশোক্ত কথার সত্যতা বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকে কতদূর প্রতিপন্ন হয়, তাহাই আমাদের আলোচ্য।

বিশ্ব-রহস্যভেদক বিজ্ঞান জীব-জগতের তত্ত্ব সম্বন্ধে যতদূর সন্ধান পাইয়াছে, তাহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, “Life proceeds from life” অর্থাৎ “প্রাণ প্রাণ হইতে প্রসূত।” এ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির রাজ্যে এমন একটি নিদর্শন বা প্রমাণ দেখিতে পান নাই যে, জড় পদার্থ

হইতে অজড় বা চৈতন্যের উদ্ভব হইয়াছে। ক্রিয় বা গলিত পদার্থ হইতে কীটপুঞ্জের আকস্মিক আবির্ভাব দেখিয়া স্থূলদর্শী বৈজ্ঞানিকগণ একদিন সদর্পে বলিত, “ঐ দেখ নিজীব জড় পদার্থ হইতে সজীব প্রাণীর উৎপত্তি, তবে আব জড়াতীত চৈতন্য পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ কি?” যে দৃষ্টি লইয়া “জড়োদ্ভূত চৈতন্য”বাদী এই কথা বলিতে সাহস করিত, এখন আণবীক্ষণিক দৃষ্টি প্রভাবে নগ্ন চক্ষুর সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া সে স্বীকার করিতে প্রস্তুত।

প্রকৃতি-প্রদত্ত সীমাবদ্ধ দর্শনশক্তি দ্বারা সুস্থ্য পদার্থের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা, এখন উপহাসের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অণু-বীক্ষণ বিযুক্ত হইয়া যে চক্ষু গলিত পদার্থ হইতে কীটোৎপত্তি দেখিয়া উহাকে তৎ-পদার্থের বিকান বলিয়া ভাবিয়াছিল, এখন দৃষ্টি-প্রদীপক অণুবীক্ষণের সহায়তায় সেই চক্ষু দেখিতেছে যে, “ক্রিয় পদার্থে বায়ুমণ্ডলস্থ কীটগু বা উদ্ভিদগু সমূহ পবিপৃষ্ট এবং পরি-বর্দ্ধিত হয় মাত্র। উহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উক্ত পদার্থ হইতে অনুদ্ভূত।” যে অবধি এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদবধি প্রাচীন পণ্ডিতগণের পরিপোষিত “Spontaneous generation” বা স্বতঃজননবাদ ভ্রান্তিমূলক ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত পাস্তুর অণুবীক্ষণের পরীক্ষা ব্যতীত অতি সহজ উপায়ে অবি-সম্বাদিতরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, স্বতঃ জনন সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি পদার্থের স্বাভাবিক পচন বা বিগলন প্রক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া চক্ষুর অদৃশ্য

যীটানু সমূহকেই উহার কাণে বলিয়া নির্ণয় করেন ।

‘He claimed if all germs could be excluded fermentation would be impossible. As, in the wine met with in the old city of spontaneous generation.’

To prove this he carried out experiments in pure mountain air and he showed conclusively that at that altitude of mountain where there was no germs no fermentation did occur. And therefore spontaneous generation was, as he had all along contended, a myth.

CHINESE AMERICAN
1911, 1912

অর্থঃ—“কোন পদার্থ বীজান্ত্র সমূহ হইতে বিয়ুক্ত বা অসম্পূর্ণ থাকিতে পারিলে উহার বিগলন অসম্ভব । পাশ্চাত্যে এত বোঝাবার শাস্ত্র বিকল্পে প্রাচীন স্বতঃজননবাদ পোষক প্রতিবাদ ও উপহাসের দ্বারা চাবিদিকে উশিত হয় । নিজ মতেই লক্ষ্য পতি পানন কবিবান জ্ঞান তিন বিধক বাস্তব পচন ক্রিয়ায় পরাকাশ করেন এ অবশেষে প্রমাণিত করেন যে, পক্ষতের সূক্ষ্ম প্রদে শস্ত বায় বীজাণু বিহীন বসিয়া ওখা কোন ক্রমেই কোন দ্রব্য পচিতে পারেনা । সুতরাং তাঁহার চিবপ্রতিবাদিত স্বতঃজননবাদ একটা অলীক উপকথা মাত্র ।”

এইরূপ সত্তাবজনক প্রমাণ প্রাপ্তি পব কোন বৈজ্ঞানিকই আজকাল “স্বতঃজননবাদ” স্বীকার করেন না । ব্রিটিশ বিশ্বকোষ Encyclopædia Britannica গ্রন্থের “জীবন বিজ্ঞান” প্রবন্ধে আচার্য হব্‌সলি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—

“At the present moment there is not a shadow of trust worth direct evidence that abiogenesis (or spontaneous generation) does take place or has taken place within the period during which the existence of the globe is recorded” (P 689)

তাৎপর্য এই,—বর্তমান সময়ে এরূপ কোন বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণের আভাস পাও

যা যায় নাই যে, পৃথিবীর উৎপত্তি অবধি কখনও “স্বতঃজনন” সংঘটিত হইয়াছে বা হয় ।

যদি তাহাই হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, চৈতন্য জড়পদার্থনিষ্ঠ গুণ নহে, ইহা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ বিভিন্নশক্তি ।

কিন্তু অনান্যবাদী তাহা মানে কই ? সে সম্পর্কিত সমস্তই বলিবে যে, জড়পদার্থ ব্যতীত জগতে পদার্থান্তর্যেব অস্তিত্ব নাই । বিশ্বয়ের বিষয় এই, জড়বাদী নিজীব পদার্থ হইতে সজীব পদার্থের উদ্ভূতি বিষয়ক প্রমাণ নাই, ইহা স্বীকার কবিয়াও দেহাতিগত চৈতন্য শক্তিতে অবিখ্যাত । সে দ্বারা মত সমর্থনের জন্ত বলিবে, “যদিও সজীব পদার্থ হইতেই সজীব পদার্থের উৎপত্তি ব্যতীত নিজীব পদার্থ হইতে সজীবের উদ্ভব বর্তমান জগতে দেখা যায় না, তথাপি ইহা অস্বাভাবিক, সৃষ্টির পাবস্ত্রে হবত পবমাণুপুঞ্জের অবিজ্ঞাত বাসায়নিক সংশ্লেষণে সজীব পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, এখন তাহা হইতেই প্রবাহরূপে প্রাণী-বৃহ উদ্ভূত হইয়া থাকে ।” এই স্বল্পে অবিজ্ঞাত বাসায়নিক সংশ্লেষণ বলিবার তাৎপর্য এই যে, কোন বাসায়ন বিজ্ঞান-বিগারদ পণ্ডিতই আজ পর্যন্ত বাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সজীব পদার্থ উৎপাদন বলিতে পারেন নাই । কিন্তু তবু বিশ্বাস ও ভবসা, সেই অজ্ঞাত বাসায়নিক সংশ্লেষণ তবু আবিস্কৃত হইলে, অনান্যবাদী জড় পদার্থ হইতেই চৈতন্যের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবেন । কি ছবাকাজ্ঞা !

জড়বাদী যাহাই বলুক, স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, জড়পদার্থের কোন প্রকার সংমিশ্রণ মিশ্রণেই তাহা হইতে ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তির আবর্তন হইতে পারে না । জড়শক্তি চিরদিনই অন্ধ এবং আগন্তুক শক্তির নিয়ন্ত্রণে উহা স্বতঃ পরিচালিত হইতে অসমর্থ এবং

পরতঃ চালিত হইলে স্থগিত হইতে অক্ষম। প্রাণীজগৎ যদি জড় জগতের রূপান্তর হইত, তবে তাহাতে জড়োচিত গুণ ভিন্ন আব কিছই দেখিতে পাইতাম না। প্রাণীজগতের প্রকৃতি, ধর্ম, গুণ ও নিয়ম একবার বিশেষণ করিয়া দেখা যাক।

স্থাবর উদ্ভিজ্জ হইতে আবন্ত কবিতা মনুষ্যাদি শ্রেষ্ঠ প্রাণী পর্যন্ত সমস্তের ভিতরই প্রাণের সঞ্চরণ বর্তমান। বাহ্যতে প্রাণন ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রাণীজগতের অন্তর্গত, এবং যাহাতে তাহা লক্ষিত হয় না, তাহাই সাধারণতঃ জড়জগতের অন্তর্নিবিষ্ট। এখন দেখিতে হইবে, প্রাণ কাহাকে বলে। জীবন-বিজ্ঞান বলেন—“যে শক্তি দ্বারা বাইওপ্লাজম (Bioplasm) বা জৈব-নিক বীজাণুর কার্যক্রম সংস্খিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রাণ।” বাইওপ্লাজম্ তবে কিম্বদ পদার্থ? এতদ্বত্তবে বিজ্ঞানের যাহা বক্তব্য, তাহা বিবৃত হইতেছে।

কি স্থাবর কি জঙ্গম, যাবতীয় সজীব প্রাণীর দেহেই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—

১। Germinal matter বা বীজভূত পদার্থ।

২। Nutrient matter বা পোষণসাধক পদার্থ।

৩। Formed matter বা গঠিত পদার্থ।

দেহের সর্বাংশ কোন প্রাণীবই চৈতন্য শক্তি দ্বারা আবিষ্ট নহে। সমুদ্র গর্ত হইতে একটি জীবন্ত শব্দ উদ্ভোজন কবিতা, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা কর, চেতন ও অচেতন অংশ সহজেই দেখিতে পাইবে। উহার কঠিন বহিরাংশের অভ্যন্তরস্থ চেতন শরীরাংশের সহিত সংস্রব থাকিলেও সংপূর্ণ রূপে চৈত-

ন্থেব আবেশ-বজ্জিত। শজের বহিরঙ্গ পরিণত অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সজীব অন্ত-বঙ্গের পোষণ ক্রিয়াব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তবু উহা মৃত ভুড়পিণ্ড মাত্র। নানব শব্দেব শজোব জীব অচেতন কঠিনাবরণ নাই সত্য, কিন্তু হস্ত পদেব নথব ঠিক সেইরূপ পদার্থ। এই পদার্থ সমস্ত প্রাণী-শরীরেবই চারি ভাগ অচেতনায়ক এবং এক ভাগ মাত্র চেতনায়ক।

জীবদেহ অতি ক্ষম চক্ষুৰ অগ্রাহ কোষসমূহে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক কোষেব অভ্যন্তরে পনিপোষক পদার্থেব স্রোত নিয়ত প্রবাহিত। এই সকল পদার্থ অমজানাদি বাষ্প এবং ভুক্ত অন্নবস ভিন্ন আব কিছই নহে। কোষাভ্যন্তরে পোষক উপাদান সমূহ প্রবেশ কবিতা প্রথমতঃ সজীবতা প্রাপ্ত হয়, পবে গঠিত পদার্থ রূপে পবিণত হইয়া বহির্গত হয়। প্রতি কোষেই এইকপ দুইটি অন্তর্মুখী পোষক পদার্থ লইয়া অন্তবে পবিষ্ট হয়, অপবটি বহির্মুখী গঠিত পদার্থেব বহির্নিঃসারক। পদার্থ বিজ্ঞান ও বসায়নেব অবোধা ও অননুকূতা এক প্রকাব অলৌকিক ক্রিয়া প্রভাবে কোষাভ্যন্তরে অচেতন পদার্থ সচেতনাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাই আবাব বহির্ভাগে পেশী, স্নায়, ধমনী প্রভৃতি রূপ ধারণ কবে।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জীবন-বিদ্যা বিং পণ্ডিতগণ শরীরেব কোষ ব্যুহই জাবনেব নিদান বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, আনুবীক্ষণিক দশনেব উন্নতিব সহিত সেই মত পরিত্যক্ত হইয়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কোষগর্তস্থ বাইওপ্লাজমই জীবনেব বীজভূত বলিয়া নিরূপিত হয়।

অত্যন্ত দৃষ্টি-দীপক, অনুবীক্ষণ সহ জীব

দেহের অন্তর্দেশ নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে, দেহ যন্ত্রের যাবতীয় সংবিদ্যুশীল অংশেই বাইওপ্লাজম্ ব্যাপ্ত। এক বর্গ ইঞ্চির পাঁচশত ভাগের এক ভাগেও একটী বাইওপ্লাজমের অভাব নাই। এই জৈব-নিক বীজাণু প্রতি অঙ্গেই অনুস্থিত রহিয়াছে।

১। বাইওপ্লাজমই এক মাত্র চৈত-
ন্তের আবাসক্ষেত্র।

২। শব্দেব প্রত্যেক অংশই বাইও-
প্লাজম্ প্রভাবে সংবিদ্যুশীল এবং যান্ত্রিক
বিধান যুক্ত বা Organized অর্থাৎ কোষ-
ময় হইয়া থাকে।

যান্ত্রিক বিধান-বিহীন পদার্থের সহিত
যান্ত্রিক বিধান যুক্ত পদার্থের সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য
বর্তমান। চৈতন্তের ক্রিয়া প্রভাবে পদার্থে
যান্ত্রিক বিধান-যুক্ত না হইয়া থাকিতে পারে
না। যে পদার্থে চৈতন্তের সঞ্চরণ বর্তমান
আছে, অথবা ছিল, তাহা তদিতর পদার্থ
হইতে এই লক্ষণ দ্বাবাই প্রভিন্ন হইয়া থাকে।
শব্দকে কিম্বা শব্দের বহিরাবরণ যদিও সংবিদ-
শীল নহে, কিন্তু উহা কৌশিক অর্থাৎ যান্ত্রিক
বিধান যুক্ত, যে হেতুক একদিন বাইওপ্লাজম্
রূপে সংবিদ্যুশীল ছিল। এক খণ্ড পেন্সর
অথবা লৌহ এবং শব্দের বহিরাবরণ, ইহা
দের সকলই চৈতন্ত সঞ্চাব-হীন, তথাপি
পার্থক্য এই যে, পেন্সর ও লৌহখণ্ডে যান্ত্রিক
বিধানের চিহ্ন মাত্রও নাই, কিন্তু শব্দাবরণ
সম্পূর্ণ যন্ত্রবিধান সমন্বিত। এক খণ্ড কাঠের
সহিতও লৌহ পাখানের সেই প্রভেদ।
কাঠ খণ্ড কোন দিন সজীব ছিল, কিন্তু
লৌহ ও পাখান কল্পিন কালে চৈতন্তের
ক্রিয়া-পরতন্ত্র হয় নাই।

ভোমার শরীরের মাংস, পেশী, শিরা,

স্নায়ু এবং অস্থি প্রভৃতির প্রতি পরমাণুই
বাইওপ্লাজমের বিকার। তজ্জন্ত সর্বত্রই
যান্ত্রিক বিধান যুক্ত।

১। কৌশিক বিধানের প্রতি কেন্দ্রেই
বাইওপ্লাজম অবস্থিত।

২। বাইওপ্লাজমের পরিপোষক পদার্থ
অকৌশিক (Inorganic)।

৩। এই অকৌশিক-এবং নিজ্জীব পদার্থ,
বাইওপ্লাজম্ কর্তৃক মুহূর্ত মধ্যেই চৈতনা-
য়ক রূপে পরিণত হয়। চৈতন্তভাস বর্জিত
অন্নরসের স্রোত কোষ গর্তে প্রবেশ করিল,
আর জীবন পাইল। কি অলৌকিক ব্যাপার
অন্তরীক্ষণ সংলগ্ন নৈত্রে পাঠক! একবার
চাহিয়া দেখ, অতি ক্ষুদ্র, স্বচ্ছ, পিচ্ছিল, অব-
য়ব-হীন ঐ জীবনাণু কেমন সঞ্চরণশীল!
পোষক উপাদান আশ্রয়সাং করিয়া ক্রমশঃই
উহা বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিতেছ না? বৃদ্ধি
পাইতে পাইতে নিমেষ মধ্যেই আবার দ্বিধা
বিভক্ত হইয়া পড়িল! সেই খণ্ডভূত বাইও-
প্লাজম্ পুনরায় অন্নরসে পরিপুষ্ট হইয়া
আবার খণ্ডিত হইল!

৪। প্রত্যেক বাইওপ্লাজমই পূর্ববর্তী
বাইওপ্লাজম্ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৫। একটী বাইওপ্লাজম্ হইতে এক্রূপে
অসংখ্য বাইওপ্লাজমের উৎপত্তি হয়।

৬। প্রত্যেক বাইওপ্লাজমই মৌলিক
বাইওপ্লাজমের স্থায় শক্তি সম্পন্ন।

৭। একবার মৃত হইলে বাইওপ্লাজম্
আর পুনরুজ্জীবিত হয় না।

জড় পদার্থ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার
চৈতন্তের উৎপত্তি যাহারা সমর্থন করেন,
তাহারা মনে রাখিবেন যে, রাসায়নিক প্রক্রি-
য়ার দুইটী বাষ্প (অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন)
সংশ্লিষ্ট করিয়া জল উৎপন্ন করা যায় এবং

বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পুনরুৎপাদন বাষ্প ছইটী পৃথক্ভূত করা যায়। এই রূপ বিশ্লেষণ সংশ্লেষণে যতবার ইচ্ছা জলের বাষ্পীকরণ এবং বাষ্পায়নের জলীকরণ সংসাধিত হইতে পারে, কিন্তু একটী বাইওপ্লাজম একবার বিনষ্ট হইলে কখনও কোন কৌশলে উহাকে উজ্জীবিত করা যায় না।

অনুবীক্ষণ তোমাকে অদ্রাস্ত রূপে দেখাইয়া দিতেছে যে, বাইওপ্লাজম স্পন্দন, সংকরণ, স্ব সদৃশ জীবনাগুর উৎপাদন এবং স্নায়ু পেশী ধমনী শিরা ও অস্থি প্রভৃতির গঠন অদ্ভুত দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে সমর্থ।

তত্ত্ববায়ের বয়ন-প্রণালীসমূহ ঐ দেখ শরীরস্থ বাইওপ্লাজমপুঞ্জ আশ্চর্য্য কৌশলে কোথাও পেশী, কোথাও স্নায়ু, কোথাও শিরা, কোথাও কঙ্কাল বিচিত্র শৃঙ্খলাব সহিত নির্মাণ করিয়া সত্যত ক্ষয় শীল দেহের ক্ষতিপূরণ করিতেছে!

বাইওপ্লাজমের এই সকল কার্য্যে অদ্রাস্ত জ্ঞানশক্তি দেদীপ্যমান। জীবনবিহের মাতৃ জরায়ু, ডিম্ব এবং বীজকোষ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বাইওপ্লাজমের প্রতি কার্য্য অলৌকিক জ্ঞান ও ভবিষ্যৎভবিদ্যাদিনী দৃষ্টির সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তি যেরূপ চিত্রকর ও কুলালের পূর্ব্ব-কল্পিত মানসচিত্রের আদর্শে চিত্রিত ও সংগঠিত হইয়া থাকে, প্রাণীপুঞ্জের দেহ গঠনেও বাইওপ্লাজম সেইরূপ এক অলঙ্কিত মহামনীষী চিত্রকরের মানসচিত্রানুরূপ কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। বাইওপ্লাজমের রচনা চিন্তা করিতে গেলে বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যায়।

কোন পক্ষীর অচির-প্রস্থত একটী ডিম্ব জন্ম করিয়া দেখ, কতকগুলি আকৃতিহীন পদার্থ মাত্র দেখিতে পাইবে। চারি পাচ

দিবস পর সেই পাখীর একই সময়ে প্রস্থত আর একটী ডিম্ব ভাঙ্গিয়া দেখ কত পরিবর্তন!! সেই পিচ্ছিল পদার্থগুলি বনোভূত হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, চক্ষু, পক্ষ, পদ, প্রভৃতি সর্বাঙ্গ সম্পন্ন বিহঙ্গরূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনও অবয়বের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় নাই।

জড়বাদিন! বলিতে পার ঐ পক্ষীশাবক কাহার গঠিত? তুমি বলিবে জড়শক্তি। কিন্তু একটী কথা তোমাব নিকট জিজ্ঞাস্য, যে সকল ইন্ধ্রিয়গ্রামে সমন্বিত হইয়া বিহঙ্গ-প্রাণ গঠিত হইতেছিল, তাহার ব্যবহার বা কার্য্য কি ডিম্বগর্ভে চলিতেছিল? নিশ্চয়ই না। তবে কি উহার ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত চক্ষু কর্ণাদি অভিব্যক্ত হইতেছিল? বোধ হয়, তাহাই তোমার স্বীকার্য্য। তোমার জড়শক্তি কি ভবিষ্যৎের প্রয়োজন বুঝিয়া কার্য্য কবিতো সক্ষম? জানি না, ইহার উত্তর তুমি কি দিবে। কিন্তু নিশ্চিতই জানিও, মননজ্ঞানাত্মিক পরিণামদর্শী চৈতন্ত-শক্তির কার্য্য ভিন্ন জড় পদার্থের ইচ্ছা জ্ঞানহীন অন্ধশক্তি দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। বাইওপ্লাজমের অন্তর্গর্তে লুক্কায়িত থাকিয়া সেই জ্ঞানশক্তিই এই সমস্ত রক্ষাভিনয় করিয়া থাকেন।

আর একটী বিশ্বয়জনক কথা শ্রবণ কর। রাসায়নিক পরীক্ষায় ইহা নিঃসন্দ্বিগ্নরূপে নির্ণীত হইয়াছে যে, সন্ধেষ্করক, অকশেষ্করকাদি সমস্ত প্রাণীর এবং দ্বিখণ্ডবীজী, অখণ্ডবীজী প্রভৃতি সমুদয় উদ্ভিজ্জের বাইওপ্লাজমই ঠিক এক উপাদানে নির্মিত। সদৃশ গুণযুক্ত পদার্থের ক্রিয়া সর্বত্রই সদৃশরূপ। কিন্তু বলিতে পার, একটী চটক পক্ষীর বাইওপ্লাজম হইতে একটী গৃধ উৎপন্ন হয় না

কেন ? যদি জড়পদার্থ-নিষ্ঠ জগৎই জীবদেহ গঠিত হইত, তবে এক ঔপাদানিক পদার্থ হইতে অসংখ্যজাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হইত না। তাহা যখন হয়, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, স্বাধীন ইচ্ছাবৃত্তিসম্পন্ন এক অজড়শক্তির হস্তে, কুলালের হস্তে একই মৃত্তিকায় বিচিত্র বিচিত্র প্রতিরূপ বিনির্মিত হওয়ার আশা;— বাইওপ্লাজম দ্বারা অসংখ্য আকৃতি প্রকৃতির জীবদেহ গঠিত হইতেছে। শিখণ্ডী, পেচক, সারমেয়, সিংহ, পতঙ্গ, ভূজঙ্গ, ভিত্তিভি তমা-লাদি বিচিত্র এবং বিসদৃশ প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ সেই একই হস্তের কারুকার্য। সেই অলঙ্কৃত শক্তির নিয়মেই বাইওপ্লাজম পরিচালিত এবং তদ্বিকার শরীর বিনাশশীল, কিন্তু সেই শাশ্বতী শক্তি অথবা আত্মা অক্ষয়, অব্যয়, অচ্ছদ্য, অভেদ্য, অশেষ্য এবং অপরিবর্তনীয়। ইহার ক্রিয়া যত দিন বাইওপ্লাজমে বর্তমান থাকে, ততদিনই জীবন ইহার একমাত্র Animating principle. এখানে অবশ্যই বলা উচিত যে, কেবল মাত্র আত্মার শক্তিতে বাইওপ্লাজমের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সাধিত হয় না। বাইওপ্লাজমের কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে ভৌতিক পদার্থের উপরও নির্ভরশীল। নাবিক যেরূপ বহিঃ চালনায় কর্ণ, অল্পকূল শ্রোত ও বাতাসের সহায়তার উপর নির্ভর করে, আত্মাও তদ্রূপ বাইওপ্লাজমের কার্য্য সাধনে ভূত পঞ্চকের সুধাপেক্ষী। আত্মা নাবিক স্থানীয়।

কোন কোন সজীব পদার্থের প্রাণন-

ক্রিয়া অবস্থা বিশেষে কিছু কালের জন্য অব্যক্ত ও স্থগিত থাকিতে দেখা যায়। জৈবনিক ক্রিয়ার অনুকূলতাদাধক এবং মন্দীপক কারণ অভাবেই ঐ রূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক উদ্ভিজ্জের বীজ চৈতন্তের ক্রিয়া শক্তি প্রভাবে শত শত বৎসর সজীব থাকিতে পারে; কিন্তু ভৌতিক পদার্থের সাহায্য অভাবে অর্থাৎ মৃত্তিকা জলাদির বিহীনতায় ব্যক্ত বা উদ্ভিন্ন হইতে পারেনা এবং প্রাণন-ক্রিয়াও যথাবিধানে চলে না। মণ্ডুকাদি প্রাণীও, ভৌতিক শক্তির অনুকূলতা অভাবে সজীব অথচ জৈবনিক ক্রিয়া রহিত হইয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বাস করে। এ সকল স্থলে একাকী আত্মার শক্তিতে বাইওপ্লাজমের কার্য্য চলিতে পারে না। চৈতন্ত—শক্তির সহিত ভৌতিক শক্তির পরিণয় হইলেই জৈবনিক ক্রিয়া চলিয়া থাকে।

আত্মার জ্ঞান শক্তি ভৌতিক শক্তি নিরপেক্ষ; কিন্তু জড় জগতের কার্য্য সাধন করিতে হইলে উহাকে জড় পদার্থের সহিত উদ্বাহ সূত্রে বদ্ধ হইতে হয়। জড় পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও অর্থাৎ দেহাবসামেও আত্মার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু জড় জগতের উপর প্রভাব থাকে না।

মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। মন আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; সুতরাং তাহার আলোচনা অন্য প্রবন্ধের বিষয়ীভূত।

শ্রীগুরুপ্রসন্ন সোম ।

আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণব দর্শন । (৩)

৩৫। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম বা স্বরূপস্থ / প্রকৃত আত্ম-চিন্তার—আত্ম-প্রত্যয়ের কোন নয়
কইবান পূর্বে, বিষরীর অন্তরে বৈরাগ্যজাত / কোনরূপ ক্ষুরণ হইতে থাকে। এই চিন্তা

গাঢ় পরিপাক প্রাপ্ত হইলে নিম্ন-প্রদর্শিত কোনরূপ আকারে বিকশিত হইয়া থাকে,— এইত আমি যখন যে বিষয়ের সঙ্গে মনাদি ইন্দ্রিয়যোগে মিলিত হইতেছি, তখনই আমি তদাকারে পরিণত হইয়া—সেই ইন্দ্রিয়যুক্ত বিষয়াকারে আকারিত হইয়া,—আত্ম দৃষ্টি-বিশুণ অবস্থায় বিষয়স্রোতে নীয়মান হইয়া ক্রমাগত বিষয়াস্তরের প্রতি ধাবিত হইতেছি এবং নানা ভাব ও প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কর্মক্ষেত্ররূপ-রঙ্গভূমিতে কত প্রকার অভিনয় প্রদর্শন করিতেছি। সেই বিষয়পুঞ্জ আমাকে আমার কোন পরিচয় প্রদান করিল না, আমার কোন স্বরূপ দেখিতে দিল না; অথচ তাহারা সর্বদাই আমাকে আত্মসাৎ করিয়া লইতেছে। তাহারা যেন চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা আমার জ্ঞানানুরাগাদি যথা সর্বস্ব সবলে অধিকার করিয়া লইতেছে। আমি ঠিক যেন তাহাদের ক্রীড়নক সামগ্রী—তাহাদের ক্রীত বস্তু—তাহারা যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে কখনও কাহার নিকট বিক্রয় করিতেছে, কখনও কাহারও নিকট হইতে ক্রয় করিতেছে—আমি নিজের কেহই নই। ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে, আমার নিজের অস্তিত্ব, আমি প্রকারান্তরে বুঝিতে পারি। আমি এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি যে, আমি একজন আছি; নতুবা এই জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাদি কাহার? শব্দ স্পর্শাদি, রূপ, রস, গন্ধাদির অল্পভূতি হয় কার? কিন্তু আমি কোন ক্রমে আমার নিজেকে আমার নিজের বিজ্ঞেয় বা জ্ঞানদৃষ্টির বিষয়ীভূত করিতে পারিতেছি না। আমি কি কেহই নই, কেবল মাত্র চতুর্দিকস্থ বিষয়পুঞ্জের খেলিবার খেলানা? আমার অন্তরে স্বাধীনতার অভিজ্ঞান আছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা কি

কলুর বানিয়ন্ত্রযুক্ত বলীবর্ধের স্বাধীনতার অল্পরূপ নয়? আমি যদি আমার আত্ম-স্বরূপকে আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার জ্ঞানের অভিমানের মূল্য কি? তাহা কি অন্তঃসারশূন্য বৃথা অভিমান নহে? আত্মদর্শনাভাবে আমি নিজে কে, আমি নিজে কার, আর কেই বা আমার, এ সকল স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! আমি যখন আমার আত্ম স্বরূপকে জ্ঞানগম্য করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার ঈশ্বরকে—আমার পরমাত্মাকে আমি কেমন করিয়া আমার জ্ঞান দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিব? ওটা না হইলে এটা ত কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না। আমার মানব-জন্ম বুঝি বৃথাই হইল? যাহারা সর্বদাই আমাকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহাদের নিকট আমার মনের ভাব, আমার আত্ম প্রসন্ন প্রকাশ করিলে—আমার প্রকৃত পরিচয় চাহিলে, তাহারা বিক্রপের হাসি হাসিয়া প্রস্থান করে। স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবাদি যাহারা সর্বদাই আমার প্রীতি বা মোহ উৎপাদন করিতেছে, তাহারাও আমার আত্ম প্রসন্ন শুনিলে, “ও আবার কি কথা,” বলিয়া বিস্ময়াপন্ন হয় এবং আমাকে মতিচ্ছন্ন মনে করে। আমি যে কথা বলি, তাহারা আমার সে ভাষাও ভাব কিছুই বুঝিতে পারে না। এবং তজ্জন্ত তাহাকে ‘উন্মাদ-প্রলাপ’ বলিয়া মনে করে। এই সংসারে আমি অল্পকাল ভূমি হইয়া আত্ম বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া যাইতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ভূমিও স্বচ্ছ দর্শণ হইয়া আমাকে আত্ম-সাক্ষাৎকার স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইল না। এই আদ্যন্ত-বিহীন বিষয়-ব্রাহ্মের মধ্যে এমন কি কোন নির্মল বিষয় নাই, যাহার সঙ্গে মিলিলে

যাহার স্বরূপাকারে পরিণত হইলে, আমার স্বকীয় স্বরূপ আমার দৃষ্টি পথের অতিথি হইবে? আমি ইষ্টজ্ঞানে এতদিন যে ঈশ্বরকে উপাসনাদি করিতেছি, তাঁহাকে অনুমান ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞানের অভিজ্ঞেয় বিষয় করিতে পারি কৈ? জ্ঞানের বিষয় করিবা মাত্র, আমি ঈশ্বরের স্বরূপাকারে নিশ্চয়ইত পরিণত ও আকারিত হইব—নিশ্চয়ইত মহান্ বিরাট্ পুরুষ, ও শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া দাঁড়াইব। ঈশ্বর দর্শনের পূর্বেত মানুষকে তদাকায়ে পরিণত হইতে হইবে, নচেৎ ঈশ্বর দর্শনের কোন অর্থই ত হয় না। কোন মানুষ কি এরূপ হইতে পারিয়াছে?—কোন মানুষ কি ঈশ্বরাকারে পরিণত হইয়া ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন করিয়াছে? কিন্তু ঈশ্বরাকারে পরিণত হইয়া ঈশ্বর দর্শন করিবে কে? তাহা অবশ্যই আমাদের মনবুদ্ধি বা অন্তঃকরণ নহে। বোধ হয়, আত্মাই ঈশ্বরকে—পরমা-ত্মাকে দর্শন করে; তবে আত্ম স্বরূপ অগ্রেই প্রস্ফুটিত হওয়া চাই। সাধুবা বলেন,—শাস্ত্রে বলে আত্ম-তত্ত্বের পর পরমায়াতত্ত্ব। এ কথা অসত্য বা অগ্রাহ্য নহে। আমাদের ধারণার অসাধ্যতা-হেতু পবমাত্ম-তত্ত্ব নিশ্চয়ই একেবারে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; একেবারে বিষয়ীকে তদাকারে পরিণত করিয়া, তাহার নিকট পরমাত্ম স্বরূপ উদিত হইতে পারে না। অগ্রে আত্মতত্ত্বের ক্ষুদ্র হওয়া তজ্জন্ত আবশ্যক। নচেৎ যিনি ইন্দ্রিয়াদি মনো-বুদ্ধির অপ্রাপ্য ও অবিষয়ীভূত, সেই ইন্দ্রিয়াদি মনোবুদ্ধি কিরূপে—কোন স্থানে তাঁহাকে ধারণ করিয়া, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবে? ইন্দ্রিয়গ্রামের মধ্যে সে স্বচ্ছ

নির্মল দর্পণ কোথা; যেখানে তাহার প্রতি-স্বরূপ অঙ্কিত হইলে—যেখানে তাঁহার কটো উঠিলে তিনি আমাদিগকে একেবারে স্বকীয় পরমাত্ম স্বরূপে পরিণত করিবা, আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবেন? আপাততঃ সেরূপ নির্মল দর্পণ ত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির রাজ্য-মধ্যে কোথাও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কিন্তু আবার সাধু সজ্জনেরা একবাক্যে ঈশ্বর দর্শনের সম্ভাবনার কথা বলেন। বুঝিতে পারি না, যিনি নিরাকার চৈতন্ত্য স্বরূপ, তিনি কিরূপে মানুষকে তাঁহার অতীন্দ্রিয় স্বরূপের জ্ঞানে তাহাকে সমর্থ করেন? যেমন মানুষের ইন্দ্রিয় বৃত্তির ক্ষুণ্ণ সম্পাদিত হইয়া, তাহার বহির্বিষয়ের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তেমনি কি কোন অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির উৎপত্তি হইয়া, সেই ইন্দ্রিয়া-তীত পরমবস্ত্ত সেই নবজাতীয় ইন্দ্রিয়-গ্রামের স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া, আমাদের জ্ঞানের অধিগম্য হন? এইরূপে কি আত্ম-স্বরূপ ও পরমাত্ম-স্বরূপ মানুষের দৃষ্টিপথগম্য হইয়া থাকে? কোন বিশেষ পন্থামুসারী হইয়া সাধন ভজনাদি দ্বারা এরূপ অভিনব অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্ষুণ্ণ হওয়া, নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। কোন বিষয়ের সঙ্গে একজাতীয় বা সমশ্রেণীস্থ না হইলে তাহার স্বরূপোপলব্ধি হয় না, এ কথা প্রসিদ্ধ। এইজন্তই বুদ্ধি, বহির্বিষয় বিনির্মিত অনাত্ম ইন্দ্রিয়গ্রামে আমরা শুদ্ধ তজ্জাতীয় বহির্বিষয়ই উপলব্ধি করি। তজ্জন্তই বোধ হয় অতীন্দ্রিয় মনাতীত বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্ত অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্ষুণ্ণির প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইজন্তই বুদ্ধি শাস্ত্রে বলে, নবজীবন লাভ না হইলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। পুরাতন জীবনে পুরাতন ইন্দ্রিয়-

গ্রামে ঈশ্বরের লাভ অসম্ভব । ভাল বাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন বলেন, তাঁহাদের নব ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া অনুভব হয় না, তাঁহাদের বাহ্য ব্যবহার দেখিলে ঈশ্বরের সঙ্গে তন্ময়ত্ব লাভ হইয়া, আত্ম ও পরমাশ্রয় দর্শন হইয়াছে, তাহা ত কোন ক্রমেই অসম্ভব নহইয়াছে । জগতের সামান্য সুন্দর মনোজ্ঞ বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সঞ্চর হইলে মানুষ অনেক সময় এমন আসক্ত ও অমুরক্ত হইয়া পড়ে, তাহার যে মোহশৃঙ্খল হইতে কোন ক্রমেই সহজে আপনাকে স্বতন্ত্র করিতে শক্ত হয় না; সুতরাং যিনি সকল সৌন্দর্য্যের নিদান—পরম উপাদেয়, পরম নিরঞ্জন ও পরম সারাংসার পদার্থ, তাঁহাকে দৃষ্টিপথের বিষয়ীভূতরূপে প্রাপ্ত হইলে, মানুষের অবশ্যই এমন ঐকান্তিক আসক্তি জন্মিবে, যে, তাহাতে বিষয়মোহের স্থান থাকিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না । যখন জগতেব সামান্য বিষয়ও কখনও কখনও এমন গাঢ়রূপে আমাদের অন্তরে অঙ্কিত হইয়া যায় যে, সহজে তাহার মোচন হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে, তখন সেই সারাংসার নিত্যবস্ত, জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলে, তাহা যে অবশ্যই তাহাতে সহস্র সহস্রগুণে গাঁথিয়া, বিধিয়া, লাগিয়া, জ্ঞানক্ষেপে নিত্যধন হইয়া থাকিবে, তাহাতে আর সংশয় কি ? ঈশ্বরদর্শীর পক্ষে বিষয়ান্তরের মোহে ও প্রলোভনে পতিত হওয়া এই জন্ত নিতান্ত অসম্ভব । যে সমস্ত সাধুভক্ত, তাঁহার প্রেমে আত্মহারা হইয়াছেন, তাঁহাদের ঈশ্বরদর্শন ঘটনা, অবশ্য কখনই মিথ্যা কথা নহে । যদি বর্তমান জ্ঞান-সহায় ইন্দ্রিয়-প্রায়ে, আত্ম ও পরমাশ্রয় দর্শনের কোন সম্ভাবনা না থাকে, তবে সাধুশাস্ত্রেরা অবশ্যই অস্ত্র কোব উপায়ে অতীন্দ্রিয় কোন প্রকার

নূতন ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্পন্ন হইয়া আপনানন্দর আত্মস্বরূপ ও পরমায় স্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইয়া থাকেন সে উপায়টা কি ? তাহার সন্ধান কে আমাদেরকে বলিয়া দিবে ? একজ্ঞ আর বুঝা চিন্তা করি কেন ? সেই ঈশ্বরদর্শী সাধুবাই নিশ্চয়ই তাহার সন্ধান জানেন । উপায়জ্ঞ মাত্রই অবশ্যই উপায় প্রদর্শনক্ষম হইবেন, সন্দেহ নাই । তবে, বোধ হয়, অবশ্যই তাঁহাদের সাক্ষাৎ রূপা ও অমুরগ্ৰহ লাভের অপেক্ষা করে । বাঁহারা কোন উপায় অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর স্বরূপের সঙ্গে তন্ময় হইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে তন্ময় হইতে পারিলে তাঁহার দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারে । এতদিন এ দিক সেদিক—স্বর্গ মর্ত্য পাতাল “পর্য্যন্ত পাথর বোম্বে” যে সুনির্ম্মল স্বচ্ছ দর্পণ অন্বেষণ করিতেছি, তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত সাধু সজ্জন ভিন্ন সেই দর্পণ আর কেহই হইতে পারে না । তাহিত সেই অবাস্তমনস গোচর ঈশ্বরকে সর্বাংগে জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিষয়ীভূত করিবার বুঝা চেষ্টা অপেক্ষা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত বা স্বরূপদর্শী সাধু শাস্ত্রদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া তদাকারে আকারিত হইয়া তাঁহাদের অন্তরঙ্গ অঙ্গীকার করিয়া স্বরূপদর্শন চেষ্টা একমাত্র সুসাধ্য বলিয়া বোধ হয় । অথবা উভয়বিধ পন্থার তুলনায় এই শেবোক্ত পন্থাকে অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য মনে হইলেও তাহাকে কেমন করিয়াই বা নিতান্ত সুসাধ্য বলিব ? কোন সাধু বিশেষের সঙ্গে অন্তরে ঐক্য হইয়া তন্ময়ত্বজাত দিব্যচক্ষু লাভ কখনই নিতান্ত অনায়াস-সাধ্য নহে । নিতান্ত অনায়াস সাধ্য না হইলেও তজ্জন্ত আমাদের ত নিতান্তই চেষ্টা পাইতে হইবে, নতুবা আমার অন্তরে এ ছুনিবার আত্ম প্রেমের উদয় কেন ?—আত্ম ও পরমাত্মত্ব লাভের

জ্ঞান এ ছর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কেন ? কি জ্ঞান অন্তরে এই ছর্নিবার অমুরাগের উদ্দীপনা । এতাদৃশ অমুরাগ কি দরিদ্রের ধনাকাঙ্ক্ষার ত্রায় বার্থ হইবাব জ্ঞান জন্মিয়াছে ? 'মস্তুর সাধন কিসা শবীর পতন' এইভাবে সংসঙ্গে মিলিয়া পরমধন উপার্জন করিতে হইবে । চিরকালইত সাধু সজ্জন, সাধু সজ্জনের অনুগত হইয়া অভীষ্টসিদ্ধ হইয়াছেন । ইহাত বেদান্তেরই উপদেশ যে "উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্ত বরাণ্ নিবোধত,—সদাকুরুঙ্গ লাভ করিয়া প্রবোধিত হইবে ।" নাথঃ পস্থা বিদ্যাতে-অহনায় ।" যাহাদেব অন্তরে, নিজ নিজ পরম সৌভাগ্য ও স্কৃতি বশতঃ কোন না কোন প্রকার বৈরাগ্যজাত আশ্রয় প্রশ্র উদয় হয়, তাঁহার যথা সময়ে এইরূপ কোন সংসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, সদগুরু অবেষণে অমুরাগী হইয়া থাকেন ।

৩৬। বিষয়ী এইরূপে আশ্রয় প্রশ্রের কোন প্রকার মীমাংসা করিয়া, আশ্রয় ও পরমাত্ম-তত্ত্ব লাভার্থী হয় এবং যথা কালে সদগুরুরূপ বিষয়াশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া, কৃতার্থোন্মুখ হইয়া থাকে । এই জ্ঞান জ্ঞানের অনাশ্রয় প্রকোষ্ঠে ও অপর প্রকোষ্ঠদ্বয়ে এই উভয়-বিধ স্থলেই জ্ঞানোৎপত্তির নিয়ম প্রণালী সম্বন্ধে অনেক প্রভেদ আছে । জ্ঞানের অনাশ্রয় প্রকোষ্ঠে এই জ্ঞানের উদয় স্বভাবের ক্রমেই—সতঃই শুদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ও তদাকার প্রাপ্তি হইতেই—সহজেই—বিনা আশ্রয় প্রশ্র—বিনা প্রযত্নে সম্পন্ন হইয়া থাকে । এখানে তজ্জ্ঞান বিষয়ীর বিবেক ও বৈরাগ্য, বিষয় সন্নিধানে শিষ্য ও আহুগত্য স্বীকার, তৎ-সন্নিধানে কৃপাভিক্ষা ও তাহার আহুকূলা প্রাপ্তি, এ সকল পৌরোহিত্যিক কোন আয়োজনের কিছুই

প্রয়োজন হয় না । বস্তুতঃ এই অনাশ্রয় প্রকোষ্ঠে বিষয়ীর এই জ্ঞান, কোন আয়োজন সাধন ও সাক্ষাৎ বিষয় কৃপাসাপেক্ষ নহে । এই অনাশ্রয় জাতীয় বিষয় জ্ঞান, বিনা আয়াসেই—বিনা প্রযত্নেই, বিষয় পুঞ্জের বহিরঙ্গে, ইচ্ছিয় সংযোগ মাত্রই, ব্যবহারিক ভাবে বিষয়ীর তদাকারে পরিণতি-হেতু তন্মধ্যে স্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কিন্তু জ্ঞানের আশ্রয় বা পরমাত্ম-প্রকোষ্ঠে বিষয়ীর আশ্রয় বা পরমাত্ম জ্ঞান লাভ পূর্ব্বানুরূপ স্বভাবের ক্রমেই—সতঃই সম্পন্ন হইলেও, বিনা আয়াসে, বিনা আহুগত্যে, বিনা দেহ মনঃ প্রাণার্পণে, বিনা সাক্ষাৎ কৃপানুকূলে, সহজে সম্পন্ন হইবার নহে । এখানে বিষয়ীকে পূর্ব্বের প্রতিবিম্বে জাগরিত অহং অধ্যাস বা অহং ভ্রান্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া,—সেই প্রতিবিম্বিত সত্তার—জীব সত্তার জীবত্ব সমাধি গর্ভে সমাহিত করিয়া, আশ্রয় ও পরমাত্ম-তত্ত্ব যথানুক্রমে সম্পন্ন হইতে হইবে । এখানে যথাতত্ত্ব-সম্পন্ন বিষয়ের বাহুমূর্ত্তির প্রতি চাহিবা মাত্র তৎ বহিরঙ্গে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া, যথা-কার্য্য সিদ্ধি লভনীয় নহে । এখানে বিষয়ীকে যথা-কার্য্য-সিদ্ধির উদ্দেশে বিষয়ের অন্তর-তম অন্তরঙ্গের সঙ্গে—তাহার পরা-প্রকৃতি-গত রাগ-ভাব ঘন, প্রেম-ঘন নিত্য নিরঞ্জন দেহের সঙ্গে মিলিত হইয়া—তন্ময় হইয়া তদাকারে পরিণত হইতে ও যথা-কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে ; তবেই যথাযথতত্ত্ব-সম্পন্ন হইতে সাধ্য হইবে । তাহা তাদৃশ সহজ সাধ্য ও অনায়াস লভ্য নহে ।

৩৭। এখানে দুইটা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপারের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে । বিষয়ীকে প্রথমতঃ পূর্ব্বকার হৃদয়স্থিত স্ব

ও সুপ্রতিষ্ঠিত সংসার নির্মম ভাবে ভঙ্গ করিতে হইবে। পূর্বকার অহং অধ্যাসে প্রবৃত্ত জীবোপাধি জীবাত্মরূপ প্রতিবিম্বকে নিহত, নিষ্কর্জীব বা নিঃসত্ত্ব করিয়া, তদঙ্গ-ভাসিত মনোময়, অনাত্মময়, স্বকলিত সৃষ্টির তদবস্থাপন্ন অন্তঃ প্রলয় সম্পাদন পুংসর বিষয়ীকে প্রকৃত প্রস্থাবে মুক্তাভ্যাস করিতে হইবে, ভজনে মরিয়া মরণান্তে নব জীবন লাভ করিতে হইবে। জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে এতাদৃশ কোন প্রকার ব্যাপারের প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। এইজন্ত এখন এখানে ইহা সম্পূর্ণ একটি নূতন ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ এখানে বিষয়ীকে এখন যথাযথত্ব সম্পন্ন হইবার উপযোগী সরাগ ভাব ঘন প্রেমঘন নিত্য নিরঞ্জন দেহ নির্মাণ করিবার উপযুক্ত তুরীয়-ঘন প্রকট উপকরণ স্নানগ্রীর আয়োজন করিতে হইবে, এবং যথাকালে সেই নিরঞ্জন দেহ, স্থলাদি দেহাভ্যন্তরে, সুনির্মিত হইলে, তাহাতে যথাযথ নিরঞ্জন ইন্দ্রিয়াদি সংস্থান সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাই সদগুরু সাধুর সক্রপত্ব বা তত্ত্বময়ত্ব লাভ। ইহাই তাঁহার অন্তরতম নিরঞ্জন স্বরূপটি, তদাকারে পরিণতি হেতু নিজ দেহাভ্যন্তরে সংস্থান করা। ইহাই নিজের দেহমধ্যে ভাব ঘন নিত্য নিরঞ্জন দেবমন্দির বা দিব্য দেহের প্রতিষ্ঠাগম। জীবের ত্রিতাপক্লিষ্ট জালাময় পাপময় জরা-মুক্ত দেহে নিরতিশয় সুকোমল পরম নিরঞ্জন ভগবৎ-পুষ্ণ প্রক্ষুটিত হইবার স্থলাভাব। সেখানে সেই তুরীয় পুষ্ণের নিরঞ্জন পরা-নন্দঘন প্রকাটাঙ্গ, কোন ক্রমেই তিষ্ঠিবার—দাঁড়াইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্ত ভগবানের প্রকট লীলাবিগ্রহ স্থাপনার্থে, এই মায়িক দেহের মধ্যে, নিত্য নিরঞ্জন

দেব মন্দির পূর্বাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ও অপরিহার্য। এই ভগবৎ-মন্দির বা ভগবদেহ প্রতিষ্ঠাকে আমরা একটি নূতন ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন করিলাম। এটাকে নূতন ব্যাপার বলিবার কারণ এই যে, পূর্বকার প্রতিবিম্ব প্রবেশিত জীবোপাধি বিষয়ীকে, যদিও বহু আয়োজনের পর, স্বকীয় আবাস্য স্থলাদি দেহ, যথা বিদানে নির্মাণ করিতে ও তাহাকে মনাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাম সম্পন্ন করিতে হইয়াছে; কিন্তু তজ্জন্ত যে তাহাকে ব্যাপক কাল অসংখ্য দক্ষবজ্রের সম্যক্ আয়োজন করিতে হইয়াছে, তাহা বিষয়ীর সাক্ষাৎ জ্ঞাতসারে সম্পাদিত না হওয়াতে তাহার “না প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞং” সমাধির অবস্থায় তাহা সংস্কৃত হওয়াতে; এক্ষণে তাহার ব্যবহারিক স্মরণ পথে উপস্থিত নাই। এজন্ত এখনকার সরাগ ভাবময় নিত্য নিরঞ্জন দেহ গঠন কার্য, দেহাভ্যন্তরে দিব্য মন্দির-প্রতিষ্ঠা কার্য,—বিষয়ীব পক্ষে সম্পূর্ণ একটি নূতন ব্যাপার বলিয়া, স্বীকার ও অবধারণা করিতেই হইবে। কেননা এখন বিষয়ীকে এক প্রকার সজ্ঞানে ও সাক্ষাৎ জ্ঞাতসারে, এক প্রকার স্বচেষ্টায় এত আয়োজনের যোজনা করিয়া, স্বকীয় মৃত্যু ফাঁস অহস্তে গলদেশে টানিয়া দিয়া, স্বকৃত প্রতিবিম্বিত স্বরূপের স্বয়ত্বকৃত বিয়োগ সম্পাদন করিয়া, তবে তাহাকে আত্ম ও পর-মাত্ম তত্ত্ব সম্পন্ন হইতে হইবে।

৩৮। তাই এখন এই স্বরূপজ্ঞান-ব্রট ভ্রান্ত সংস্কার দিশাহারা প্রতিবিম্বাভিমানী বিষয়ীর অন্তরে প্রকৃত আত্ম-প্রেমের ক্ষুধা হওয়া চাই, প্রকৃত বিবেক ও বৈরাগ্যের উদয় হওয়া চাই, আত্ম ও পরমাত্ম প্রভৃতি লাভের প্রকৃত পথ পাইবার জন্য ঐকান্তিকী

ব্যাকুলতার উদ্বোধন হওয়া চাই, ঐহিকের বিষয় বিভব মান সন্মম, সুখৈশ্বর্য ও ধর্ম্মা-ধর্ম্মে ওদাস্ত বুদ্ধির উদগম হওয়া চাই; প্রকৃত তত্ত্বদর্শী সদ্গুরু প্রয়োজনীয়তা প্রকৃত প্রস্তাবে উপলব্ধি হওয়া চাই; গুরু অশেষণে ঐকান্তিকতা চাই; স্মৃতি ও সৌভাগ্য চাই; তবেই চৈতন্যরূপাশ্রয়ী সদ্গুরু সঙ্গ স্তম্ভ সন্নিধান হইবে। তবেই অন্তরের অন্তরতম অন্তরঙ্গ নিরঞ্জন বিধরস্র তাঁহার অজস্র রূপাশ্রয়ে, তাহার বাহিবে বাবহারিক প্রকট ও মূর্ত্তিমান ভাবে তাহাকে সাক্ষাৎ দর্শন ও আশ্রয় দিবেন। তদনন্তর সেই মঙ্গলময় আশ্রয় প্রাপ্তির পর, বিষয়ীর আবার প্রকৃত প্রস্তাবে শিষ্যত্ব ও আনুগত্যের স্থিরতা চাই। অবলম্বিত গুরুদেহের উপর ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ভক্তি ও আস্থা চাই; তাহার নিদেশ মত নিয়ম ও প্রক্রিয়া, সাধন ও ভজনেব অনুবর্ত্তী হওয়া চাই; “পরমাশ্রয় সাধন ও ঐহিক ব্যবহার” (ক) যাবতীয় সম্বন্ধে তাঁহার আজ্ঞা অকুণ্ঠিত ও অকুণ্ঠিত চিত্তে শিরোধার্য্য করা চাই; মনোমুখিন ও বহিমুখিন ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহরহঃ অন্তর্মুখী ও গুরুমুখী হইয়া থাকা চাই; গুরুদেহের উপর ঐকান্তিকী তদেকান্তভূতি ও প্রীতি চাই, তাহার সং-সংসর্গবাসী ও অহরহঃ তাঁহার স্নেহময়ী দৃষ্টির পথবর্ত্তী ও বিষয়ীভূত হইয়া থাকা চাই, গুরুর সেবা ও শুশ্রূষায় প্রবল অনুরাগ চাই, একান্তদীন ও অধম (Negative) ভাবে গুরুর শক্তি ও প্রভাবের নিতান্ত অধীন হওয়া চাই;

(ক) পরমোষ্টি গুরুর আজ্ঞাবলম্বন করিয়া পর-মাশ্রয় সাধন ও ঐহিক ব্যবহার অবশ্য কর্তব্য হয়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পথ্য প্রদান প্রদেহের পোষণে দেখ।

সেই বাহ্যদৃষ্টিভূত অন্তরের ধনকে বাহিরে—দূরে না রাখিয়া ভক্তি ভরে অহরহঃ অন্তরে সংস্থান রাখা চাই; অন্তরে লয় করা চাই; সাধু সঙ্গ, সাধু অনুরাগ, সাধুভক্তি ও সাধু-সেবা চাই; সদ্গুরু সাধু মহাজনের অজস্র সহজ রূপা-প্রোত-পথে অহরহঃ অবস্থিত থাকা চাই; সর্বদা নানা উপায়ে গুরু-কৃষ্ণ বৈষ্ণবের সন্তোষজাত সহজ আশীর্বাদ লাভ করা চাই; তবেই জীয়েন্তে মরিয়্য, এবং মরিয়্য, ভজিয়্য, সেই সগুদ্র বা ব্রহ্মাত্মা সাধুরূপ নিরঞ্জন বিষয়-দর্পণে, বিষয়ী প্রকৃত আশ্রয় ও পরমাত্ম স্বরূপের যথানুক্রমে প্রকৃত দর্শন লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে বিষয়ী স্বকীয় বাস্তবিত্ব স্বরাট্ স্বরূপকে প্রথমে তাহার অভিনব, নিরঞ্জন, অন্তরিস্ত্রিয়ের, এবং তদনন্তর তাহার সমষ্টিভূত বিরাট অথও পরমাত্ম স্বরূপকে, সর্বদা অভিনব, নিরঞ্জন, বহিরিস্ত্রিয়ের বিষয়ীভূত করিয়া, পূর্ব্বকাম ও সিদ্ধার্থ হইয়া থাকে।

৩৯। জ্ঞানের প্রকোষ্ঠে যে আশ্রয়-স্বরূপ দর্শন হয়, সেখানে আশ্রয়-তত্ত্ব-লাভার্থী শিষ্যই বিষয়ী এবং আশ্রয় বা পরমাত্ম তত্ত্ব-সম্পন্ন সদ্গুরু বা সাধুই বিষয়। আশ্রয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ—আশ্রয় সৃষ্টির চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পর পারে, ছায়াগম অনাশ্রয় জাতীয় ব্যবহারিক জগতের (Phenomenal universe এর) পর পারে সংস্থাপিত। এই আশ্রয়কে, এই ব্যবহারিক জগতের ক্ষেত্র হইতে, তাহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ দেখাইবার, সেই স্বরূপে তাহাকে উপনীত ও প্রতীক্ষিত করিবার, প্রকট বিষয় ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পরপারস্থ—আশ্রয় হওয়া চাই। সৃষ্টি-চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্কর্ত্তী, অনাশ্রয় জাতীয় বিষয়, প্রতীক্ষিত আশ্রয়ীভূত জীবিত্য

জ্ঞানোৎপত্তির কারণ স্থল হইতে পারে, কিন্তু সেই অনায়াস জাতীয় বিষয়ের সঙ্গে, তদাকারত্ব প্রাপ্তি হেতু, সেই জাতীয় বিষয়ের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত ব্যাপ্তি বা স্বরাট স্বরূপের আত্ম বা স্বরূপ-সাক্ষাৎকাব করাইবার, কোন ক্ষমতা ও অবিকার নাই। যে নিরঞ্জন ভাবধন দেহে,—যে অবিনশ্বর ব্রহ্ম-মন্দিরে সেই এক্ষের স্বরাট্ আত্ম-স্বরূপ অনুভূত হইয়া থাকে, সৃষ্টির এই অনায়াস জাতীয় অসাব, নশ্বর বিষয় বাজ্যে, সেই ভাবধন মন্দির বা দেহ নির্মাণেব, অবিনশ্বর প্রকট উপকরণ সামগ্রী বস্তু বা সংস্থান নাই। বহির্জগতের এই অনায়াস বিষয় বাজ্যের, ইন্দ্রিয় গ্রামাভিমার্গী জীব বাজ্যের কুত্রাপি সেই নিবঞ্জন প্রকট উপকরণ সামগ্রীর আগম বা উৎপত্তি নাই। সেই অতিনব উপকরণ সামগ্রী তদতিরিক্ত স্থলে অবেষণ করিতে ও প্রাপ্ত হইতে হইবে। তাহা অবশ্যই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত বিষয় হইয়াও কাগস্থ থাকিবার প্রয়োজন, অতীন্দ্রিয় বিষয় হইয়াও ইন্দ্রিয় গ্রামস্থ থাকিবার প্রয়োজন, পারমার্থিক বিষয় হইয়াও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রস্থ থাকিবার প্রয়োজন। এমন বিষয় ব্রহ্মায়া, ভগবদায়া, সদ্গুরু বা সাধু ভিন্ন আর কোন বিষয় হইতে পারে? বিষয়ীর আত্ম-স্বরূপ বিকাশোপযোগী মন্দির নির্মাণের নিরঞ্জন উপকরণ সামগ্রী (আনন্দ-ধন চিং-ধন অনুকরণপুঞ্জ) তত্ত্বিন্ন আর কোন দেশে উৎপন্ন হইতে পারে? তত্ত্বিন্ন আর কোন দেশ হইতে তাহার আগম নির্বাহ সম্ভাবিতে পারে? যে বিষয় রত্নের সঙ্গে তদাকারত্ব হেতু বিষয়ীর স্বকীয় আত্ম-স্বরূপ, আত্ম-সমক্ষে ক্ষুদ্র লাভ করে, সে বিষয়রত্ন অবশ্যই সৃষ্টির মধ্যে ব্যাবহারিক-

ভাবে থাকিয়াও সৃষ্টির অতীত প্রদেশে, পরা প্রকৃতির ববাস্বে, বিসদৃশ ও অপ্রকট উভয়বিধ পরিণামের নিত্য-অতীত ভাব-ধন প্রেমধন নিত্য নিরঞ্জন দেব মন্দিরে নিত্য নিবঞ্জন বিগ্রহ হইয়া অচ্যুত পদে বিরাজমান।

৪০। সাধু সঙ্গনের অন্তরঙ্গ—তাবান্—যে নিত্য নিরঞ্জন উপাদানে নির্মিত হয়, এখানে তাহা বিবৃত করিবার চেষ্টা কবিব। এক কথায়, জাগ্রত বা প্রকট পরাপ্রকৃতি বা পবাপ্রকৃতি বিবিধ প্রকারে ঘনীভূত ও পবিপাক প্রাপ্ত হইয়া, সেই অপকৃত উপাদান উৎপাদন কবে। সদৃশ পবিপাকিনী প্রকৃতির ববাস্বে জাগ্রত পুরুষ প্রভাবে, ওতঃপ্রোত ভাবে—অভিনব ভাবে, জীব-দেহাভ্যন্তরে বিবিধ প্রকার পরিপাক ও প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া, তৎসঙ্গে ও তদঙ্গে সেই উপাদান একাত্মক ভাবে পরিণত। সেই নিরঞ্জন দেহ “অন্তঃ-কৃষ্ণ বহিঃগৌর”—তাহাব অন্তর চিদধন, বাহির আনন্দধন। সেই দেহ, একাবাবে একাকারে অপকৃত সমন্বয়ে, যুগল তত্ত্ব, এক অবৈত তত্ত্ব ধন পরিপাক-প্রাপ্ত ও সুবিমিশ্রিত। সমাধি-সমুদ্র হইতে ব্যাবহারিক ভাবে উথিত, জাগরিত এবং “প্রাপ্তবাবাণ্” নিবোধিত অথবা জাগ্রৎ-কুণ্ডলিনীক প্রকট পুরুষের অঙ্গ-স্পর্শ প্রাপ্ত না হইলে, এই পরাপ্রকৃতি কুত্রাপি কখনও জাগ্রত হন না। পূর্বাণে বর্ণিত আছে, যত দিন শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ পোত না হইয়াছিলেন, ততদিন তিনি চক্ষুকামীলন করেন নাই, নয়নযুগল বিক্ষারিত করিয়া চান নাই, ততদিন আর কিছুই দেখেন নাই। এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা পরাপ্রকৃতির জাগ্রতবস্থা প্রাপ্তির উপমা বা উদাহরণ-

হইয়া, সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। সমাধি-
মগ্ন অব্যক্ত অপ্রকট পুরুষের সংস্পর্শে মূল
পরমা প্রকৃতি তদবস্থাপন্ন সমাধি সমন্বিত
ও তদেকায় হইয়া যায়। ইহাই অন্তরাত্মা-
রূপে প্রতি জনের, প্রতি ব্যষ্টির এবং ব্যষ্টি-
পুঞ্জের সমষ্টিভূত স্বরূপের স্বতঃই অন্তরত্ব
আছেন। এখানে—এই সমাধির অবস্থায়
তদীয় পুরুষ সংসর্গে প্রকৃতি যদিও তদেকায়
হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বারা তাহার জাগ্রত
প্রকট অবস্থায় উপনীত হইবার স্বাভাবিক
কোন উপায় ও সম্ভাবনার সম্ভাব নাই।
বরঞ্চ সেই অপ্রকট সংস্পর্শে ব্যাপক কাল
সংগত থাকিলে, সে প্রকৃতিতে যে-কিছু
যদি-কিছু বিসদৃশ পরিণাম-নিষ্ঠ অংশ সংলগ্ন
থাকে, তাহা প্রকৃতির মূল দেহ হইতে মল-
রূপে নির্ভিন্ন হইয়া সৃষ্টি সাধন ত্রিগুণায়ক
মলিন উপাদানে পরিণত হয়; কিন্তু তদ্বারা
কোনক্রমেই তাহা জাগ্রত ভাব লাভ করিতে
সক্ষম হয় না। সদৃশ পরিণামিণী প্রকৃতির
প্রকট বা জাগ্রতভাব প্রাপ্ত হইবার যন্ত্রই
প্রস্তুতিত জীব-দেহ। একরূপ দেহ যন্ত্র ভিন্ন
অন্যত্র এই প্রকট বা জাগ্রতভাব স্ফূর্তিত
হইতে কৃত্রাপি কখনও সম্ভাবিত ও পরিদৃষ্ট
হয় না। এই দেহ যন্ত্রাভ্যন্তরে এই প্রকট
পুরুষের অঙ্গনিঃস্থত প্রকট প্রকৃতির অংশ
বিশেষ মন্ত্রশক্তি প্রভাবে জীব-দেহের মূলা-
ধারস্থ অপান-বায়ুরূপ হইলে, তাহা প্রকট
জাগ্রত পুরুষ বা তদীয় দৃষ্টি বা মন্ত্র-শক্তি
প্রভাবে অজপায়ুক্ত ও সহজ অবিরাম অভ্যন্তর
প্রণব-স্রোতে ও ঘন নাদে পরিণত হইয়া,
বিশেষ ভাবে ব্যাপক কাল বিমস্কিত, সঞ্চা-
লিত এবং বিবিধ প্রকারে পরিপাক ও প্রগা-
ঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে তাহা ভাব-দেহ
গঠনোপযোগী সন্নিপাত, পরানন্দ ঘন, নিরঞ্জন

উপকরণে পরিণত হয় এবং তাহা সূক্ষ্মাদি
পথে জীব-দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া
সর্বাবয়ব সম্পন্ন ভাবান্ধ গঠন ও তাহাকে
অভিনব ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্পন্ন করে। এতা-
দৃশ ঘনীভূত নিরঞ্জন উপকরণে ব্রহ্মাত্মা সাধু
সজ্জনগণের ভাবান্ধ বিনির্মিত হইয়া থাকে।
সমাধি সত্তা, সশর্করা স্মৃতি চক্ৰ, ভাবান্ধের
নিরঞ্জন উপকরণ সশর্করা স্মৃতি ঘনক্ষীব।
তরল চক্রে কোন গঠন কার্য্য হয় না, কিন্তু
ক্ষীরের ঘনতা প্রসূক্ত খাদ্য সামগ্রীর গঠন
হইয়া থাকে। এই নিরঞ্জন উপকরণের স্বরূপ-
গত স্বভাব-সিদ্ধ প্রগাঢ়তা হেতু পুর্বাভাব-অ-
প্রকট অব্যক্ত সমাধি সমুৎপত্তে বিলীন হই-
বার বা কোন প্রকার বিসদৃশ বিজাতীয়
পরিণাম প্রাপ্ত হইবার ছই দিকেব ছইপথ
নিত্যকালেব জন্ম অবকল্প। চক্রে যেক্রপ
অগ্নিপাকে যথোচিত ঘনীভূত ও প্রগাঢ় হইয়া
ক্ষীরহে পরিণত হইবে, তাহা পুনরায় চক্কা-
কাবে প্রত্যাবৃত্ত এবং দ্বি তক্রাদিতে
বিকৃতি প্রাপ্ত হইবার ছইপথ বন্ধ হয়, ইহা
তক্রপ। উনাই সাধু সজ্জনগণের ভাবানন্দ
চিন্ময় অন্তরঙ্গ;—এই অন্তরঙ্গই তাহাদের
অন্তরত্ব নিত্য প্রকটলোকা বিগ্রহ সংস্থাপিত।
এই বিগ্রহ হইতে নিত্য অব্যক্ত, নিত্য অক্ষয়,
নিত্য অচ্যুত, নব নব লোকা বিগ্রহ জৈবিক
দেহাভ্যন্তরে চিরদিন স্ফূর্তি লাভ করিয়া
থাকে। এই এক একটা স্পর্শমণি হইতে
যথাকালে তাদৃশ বহুসংখ্যক স্পর্শমণি সমুৎ-
পন্ন হইবার কোন বাধা নাই। যেক্রপ সূর্য্য-
দেব উত্তমণ বা মহাজনের স্থলাভিষিক্ত
(Standing in positive relation) হইয়া,
অধমণ বা খাতক ভাবাপন্ন (Standing
in negative relation) অহুগত গ্রহগণকে
উষ্ণ ও আলোকময় কিরণদানে স্বতঃই অশু-

কণ প্রতিপালন করিয়া থাকেন ; সেইরূপ, এই সমস্ত স্পর্শমণিব প্রত্যেকটি এক একটা সূর্য্যের জ্বালা সেই ভাবে অনুরূপ ভক্তবৃন্দকে, স্ব স্ব ভাবময় নিরঞ্জনদেহ নিঃসৃত ভাবধন চিত্তব কিবগজাল দ্বারা সম্মেহে সম্মেহে অনুরূপ লালনপালনাদি কবিয়া, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত কবিয়া থাকেন । তজ্জনিত সেই সময়ে, সেই সেই ভাবময় দোহ, যে বায় ও ক্ষয় হয়, তাহা মূল পদ্য প্রকৃতি অক্ষয়, নিত্য, অনন্ত, পবিত্র ভাণ্ডার হইতে অবিদ্যে অনন্তভূতকণে স্বতই পবিত্র হইতে থাকে । “দানে নৈব কস্য যতি বিদ্যাবত্ন মহাধনম্ ।” একটা অতীত প্রয়োগ হইয়া থাকিলেও, এখানে তখন পদ্যোক্ত্যাব অবস্থিতি নাই,—কোন দিকে কোন অসম্পূর্ণতা নাই ।

৪১। উদমর্গ বা মহাভবেন স্বাভি-
বিক্ত এই আত্মস্থ বিষয়ের সঙ্গে অবমণ বা
খাতক ভাবাপন্ন বিষয় পক্ষ প্রদর্শিত শুক-
শিষ্য মদ্রু নিবন্ধন তদাকারত্ব, তদেকত্ব,
তৎ অন্তবদ্ব প্রাপ্ত হইতেই এই বাষ্টি স্ববাট
আত্ম-তত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে । এই
স্ববাট আত্মজ্ঞানের এক দিকে যথা মাল-
প্রাপ্ত স্বস্থান প্রাপ্তীচ্ছ ভাবাঙ্গ-সম্পন্ন বিষয়ী
ও অপার দিকে নিবন্ধন ভাবাঙ্গ-বিহারী
সদৃশ বা সাধুসজ্জন রূপ স্বস্থান প্রত্যাগত
বিষয় । এই দুই তাব ভূমিকে আলিঙ্গন
করিয়া, প্রকৃত আত্মজ্ঞান স্রোত প্রবাহিত ।
এই উভয়ের প্রথম সাফাংকারে শিষ্যরূপ
বিষয়ী, জ্ঞানের অনাত্ম প্রকোষ্ঠে স্বকীয়
প্রতিবিস্তিত অহং অধ্যাসে আত্মবুদ্ধি স্থাপন
করিয়া, সম্পূর্ণরূপে দিশাহারা । সেই অব-
স্থায় তাহাকে গুরু আশ্রয় অবলম্বন করিতে

হয় । যেরূপ জলন্ত অগ্নি-সন্নিধান প্রাপ্ত হইলে,
জল-সিক্ত কাষ্ঠ-খণ্ড ক্রমে বিস্তৃত ও অদ্রুতা
বিমুক্ত হইয়া, জলন্ত অবস্থা লাভ করিবার
দিকে অন্তর্পথে যাত্রাবস্ত করে, ত্রয় প্রমাদ-
বিশিষ্ট বিষয়ী, আত্ম বা পবমান্ন তত্ত্ব সম্পন্ন
বিষয়ের সন্নিধান ও অনুরূপতা প্রাপ্ত হইলে,
সে স্বতঃই সম্ভাব্যে স্বকীয় স্ববাট আত্ম-
তত্ত্বাভিমুখে স্বরূপাভিমুখে মহা-প্রস্থান করি-
তে অভিলাষ কবিত্তে আরম্ভ কবে । সময়ে
সেই জলসিক্ত কাষ্ঠ খণ্ড, সেই অগ্নি-দগ্ধ কাষ্ঠ
সংসঙ্গে যখন তদাকাবে আকাবিত হইয়া,
জলন্ত অবস্থা লাভ কবে, তদন্ত সংস্রাব বিষয়ী,
সেই রূপ স্বরূপ ও স্বস্থান প্রাপ্ত বিষয়ের সাহা-
য্যে, অনুরূপতা ও সান্নিধ্যে, তদাকাবে, অনুরূপ
আকাবিত হইয়া আত্ম স্থান ও আত্মবাস
প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আত্ম-তত্ত্ব রূপ স্বরূপাভিমুখে
প্রাক্কলিত হইয়া উঠে । লৌহখণ্ড এই-
রূপে চুষক-সন্নিধান প্রাপ্ত হইলে, চুষক
প্রকৃতি লাভ কবিয়া থাকে । অথবা আত্ম-
দিব ক্ষুদ্র বৃক্ষ যেরূপ দেশ কাল ও অবস্থাব
অধীন হইয়া স্ব স্ব জাতীয় উৎকৃষ্টতব বৃক্ষা-
ন্তবেব সঙ্গে যথা বিধানে মিলিত হইলে,
সময়ে স্বজাতীয় কুলধর্ম পরিহাব পূর্বক,
সেই উৎকৃষ্টতব বৃক্ষান্তবেব কুলধর্ম ও
স্বরূপে তদাকাবিত হইয়া তাহা প্রাপ্ত
হইয়া থাকে । যিনি শিষ্য হইবেন, প্রদর্শিত
দৃষ্টান্তের অনুমত জন্মসংস্কারজন স্বভাব
পরিচ্যাগ কবিত্তে—আমিত্ব, ব্যক্তিত্ব, জাতিত্ব,
গোত্রত্ব প্রভৃতি ব্ধাসকর্ষ বিলোপ করিতে
সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া, তাহাকে গুরু আত্মগত
ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে ।

শ্রীকালীনাথ দত্ত ।

বরাবর পাহাড় ও সাত ঘর ।

গয়া হইতে ১৮ মাইল উত্তরে এবং বেলা নামক বেলগুয়ে ষ্টেশনের ১৭ মাইল উত্তর পূর্বে কতকগুলি গ্রেনাইট প্রস্তবময় পাহাড় অবস্থিত আছে। এই সকল পাহাড় কাওয়া ডোল বা কাকদোল, ববাবর ও নগর যোনি নামে খ্যাত। এই সকল পাহাড়ে প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বের প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্তিব ভগ্নাবশেষ ও মহাবাজ অশোকের শিলালিপি ও তৎসময়েব নির্মিত গুহা সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

কিছুদিন হইল, আমবা কয়েকটা বন্ধু একত্র হইয়া এই সকল পাহাড় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, তথায় একটা গুহায় মধ্যে অল্প-বক্ষ একজন বাঙ্গালী সত্যাসীর সতিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি পানী ভাষা কতক জানেন। তাঁহার নিকট আমবা শিলালিপি বিষয়ে অনেক কথা অবগত হইলাম।

কাওয়াডোল বা কাকদোল।—এই পাহাড় বেলা ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। রেলগাড় হইতেই এই পাহাড় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, এই পাহা-ডেব শৃঙ্গদেশে এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তব একরূপ ভাবে অবস্থিত ছিল যে, একটা কাক উহার উপর বসিলেই উহা দোলায়মান হইত; এজন্য ইহার নাম কাওয়াডোল বা কাক দোল। ইহার চতুর্দিকে অনেক বৌদ্ধ ও হিন্দু কীর্তিব ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের উত্তর ভাগে অনেক হিন্দু দেবমূর্তি খোদিত আছে। পূর্বদিকে একটা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাতে একটা প্রকাণ্ড ধ্যান-নিমগ্ন বৌদ্ধ মূর্তি স্থাপিত আছে।

সাতঘর।—কাকদোল পাহাড়ের ৩ মাইল উত্তর পূর্বে ববাবর নামক পাহাড় অবস্থিত। ইহার সংস্কৃত নাম প্রবর গিরি। এই পাহা-ডেব মধ্যে ৪ টি গুহা খোদিত আছে। আর অনতিদূরে নগরযোনি পাহাড়ে তিনটি গুহা আছে। এই ৭ টি গুহা আছে বলিয়া গুহাগুলি সাত-ঘর নামে খ্যাত। এই সকল গুহা বৌদ্ধ যোগীদিগের অবস্থান জ্ঞাত গ্রী: পূ: তৃতীয় শতাব্দীতে মহারাজ অশোক ও তাঁহার পৌত্র দশবথের সময় খোদিত হয়। তৎপরে গ্রীষ্টের তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে শার্দূলবর্ম্মা ও অনন্ত বর্ম্মা নামক হিন্দু নৃপতিগণ ইহাতে কাত্যায়নী মূর্তি ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। হোয়েন-সাংএব সময় এই সকল গুহা হিন্দুদিগের অধিকৃত ছিল এবং ইহাতে হিন্দুমূর্তি স্থাপিত ছিল, এজন্য তিনি ইহাদের উল্লেখ করেন নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভয়ঙ্করনাথ নামক কোন পর্য্যটক ইহা পবিদর্শন করিয়া তাঁহার নাম খোদিত করিয়া যান। তৎপরে ইহা মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। গুহাগুলির নির্য্যাস কার্য্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

(১) কর্ণবোপরগুহা—বরাবর পাহাড়ের উত্তরাংশে এই গুহা অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৪ ফিট, প্রস্থে ১৪ ফিট। এই গুহার পশ্চিমের কোণের দিকে একটা বেদী আছে। বোধ হয়, এখানে কোন মূর্তি অবস্থিত ছিল। প্রবেশদ্বারের পশ্চিম দিকে প্রাচীন পালী অক্ষরে ৫ ছত্র শিলালিপি আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, অশোক রাজার ঊনবিংশ বৎসরে (২৪৫ গ্রী: পূ:) এই গুহা খোদিত ও উৎ-

সংস্কৃত হয়। প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে পালী অক্ষরে বোধিমূলম, দরিদ্র কান্তার, কৰ্ম্মচণ্ডাল, মহীরাগসার, বিকট-তুঙ্গশিব, এই কয়েকটা নাম খোদিত আছে।

(২) সূদাম গুহা—পূর্বোক্ত গুহার দক্ষিণ দিকে এই গুহা অবস্থিত। বরাবরের সমস্ত গুহার মধ্যে এই গুহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণ বা পূর্বপার্শ্বে প্রাচীন পালী অক্ষরে লিখিত আছে “এজন পিয় দশিনা দুবারিস বসভা—(অশোক রাজার দ্বাদশ-বর্ষে)—আর বাকী কতকটা উঠিয়া গিয়াছে, এজন্য আমাদের পূর্বোক্ত সন্ধানী তাহা পড়িতে পারিলেন না। ইহার সংলগ্ন পশ্চিম দিকে আরও একটি ক্ষুদ্র গোলাকার গুহা আছে। বোধ হয়, ইহা যোগাভাসের ছিল। ইহার প্রাচীর ও ছাদের গাত্র অস-মান দেখিয়া বোধ হয় ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই।

(৩) লোমশ ঋষি গুহা—পূর্বোক্ত সূদাম গুহার ত্রায় ইহাতেও একটি ক্ষুদ্র গোলাকার গুহা সংলগ্ন আছে। ইহাও অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে পালী অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত শ্লোক আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, দুইটি যজ্ঞবর্ম্মার পোত্র অনন্ত বর্ম্মা এই স্থানে কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

(৪) বিশ্বামিত্র গুহা—এই গুহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহাতে অশোক রাজার সময়ের একটি লিপি আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, অশোক রাজার দ্বাদশবর্ষে এই গুহা খোদিত ও উৎসর্গীকৃত হয়।

(৫) নগর যোনি গুহা—বরাবর পাহাড়ের অনতিদূরে উত্তর পূর্বদিকে অনতিউচ্চ একটি পাহাড়ে এই গুহা অবস্থিত, এজন্য এই পাহাড় যোনি নামে খ্যাত। এই গুহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। প্রায় ৫৭ ফিট দীর্ঘ ও

১৯ ফিট প্রস্থ এবং ইহাদের মধ্য ভাগ ১০৮ ফিট উচ্চ। ইহার গাত্র অতিশয় পরি-কৃত ও মন্থণ। ইহা অশোক রাজার পৌত্র রাজা দশরথের সময়ে বৌদ্ধ যোগীদিগের বাসের জন্য খোদিত হয় বলিয়া প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগে পালী অক্ষরে লিখিত আছে। ইহার প্রাচীন নাম গোপিকা-কুভা বা গোপিগুহা। প্রবেশ দ্বারের পূর্বদিকে সংস্কৃত ভাষায় একটি শ্লোক আধুনিক পালী অক্ষরে লিখিত আছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, অনন্তবর্ম্মা এই স্থানে কাত্যায়নী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা এক্ষণে মুসলমান-দিগের দর্গায় পরিণত হইয়াছে। ইহার এক পার্শ্বে একটি আধুনিক ইষ্টক নির্ম্মিত বেদী আছে। কথিত আছে যে, এই বেদী এক মুসলমান পীরের বসিবার স্থান ছিল।

(৬) বাপিয়া কা কুভা বা বাপিয়া গুহা—নগর যোনি পাহাড়ে ব উত্তরদিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমির উপর এই ক্ষুদ্র গুহা অবস্থিত। ইহার নিকট একটি কূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, বোধ হয় এই জন্মই ইহার নাম বাপিয়া গুহা। ইহাতে রাজা দশরথের সময়ের খোদিত একটি লিপি আছে। তাহার শেষাংশ নগর-যোনি গুহার শিলালিপির অবিকল অনুরূপ। প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলালিপি আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে—“আচার্য্য শ্রীযোগানন্দ প্রণমতি সিদ্ধেশ্বরং।”

(৭) বদাতি কা কুভা—পূর্বোক্ত গুহার নিকটেই এই ক্ষুদ্র গুহা অবস্থিত। এই গুহাও রাজা দশরথের সময় খোদিত হয়। অনন্ত বর্ম্মা এই গুহার এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন।

সিদ্ধেশ্বর মন্দির—বরাবর পাহাড়ের

শিখরদেশে এই মন্দির অবস্থিত । বাপিয়ার গুহার শিলালিপি দেখিয়া বোধ হয়, এই মন্দির খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ কি ৭ম শতাব্দীতে আচার্য্য যোগানন্দের পূজার জন্ত অনন্তবর্ম্মার সময়ে

নির্ম্মিত হয় । এই মন্দিরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহা আছে । বোধ হয় যোগীদিগের তপস্তার জন্ত এই গুহা গুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল ।
শ্রীমোহিনীমোহন বসু ।

দার্শনিক মতভেদ । (১)

সকলেই জানেন, হিন্দুদর্শনশাস্ত্রে নানা মতভেদ আছে । বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃতি যাহারা বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই মতভেদের প্রকৃত কারণ বুঝিয়া সেই ধর্ম্মের প্রকৃতির সহিত নানা মতভেদের বিলক্ষণ সঙ্গতি দেখিতে পাইয়াছেন । দর্শনে যে নানা মতভেদ হইবে, তাহা বিচিত্র নহে ; মতভেদ না হইলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান হইত । মতভেদ হইবে কেন, তাহা বুঝা যায় ; না হইবে কেন, তাহা বুঝা যায় না । একথা সকলের নিকট যুক্তি-সিদ্ধ নহে । একথার বিরোধিনী যুক্তি এই—

বেদ বল, দর্শন বল, স "মিথাক্য ।
ঋষিবাক্য বলিয়া আপন "অভ্রান্ত ।
অভ্রান্ত ঋষিপ্রোক্ত আপ্ত বাক্য মধ্যে মতভেদ কেন হইবে ? শাস্ত্রে আপ্ত লক্ষণ এই :—

"আন্তো নামাহুতঃ সন বস্তুতত্ত্বং কাং স্তোন নিশ্চয়বান্,
রাগাদিবশাদপি নাস্থথাবাদী যঃ স ইতি চরকে পতঞ্জলিঃ ।
মঞ্জুয়া ।

"যিনি অমুভব* দ্বারা সর্ব্ব পদার্থের তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সুতরাং সমুদায় বস্তুতত্ত্বই যাহার অভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিয়াছে, রাগাদির বশীভূত হইয়াও যিনি অস্থথাবাদী নছেন, সুতরাং সর্ব্বাবস্থাতেই যিনি প্রকৃত কথা বলেন, তিনিই আপ্ত নামে অভিহিত ।"

ভগবান্ পতঞ্জলি যেরূপ আপ্তলক্ষণ করিয়া-

ছেন, তাহাতে আপ্তঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রে মতভেদ কিরূপে সম্ভবে ? আপ্তগণের মধ্যে যদি নানা মতভেদ হইল, তবে তাঁহাদের সহিত সামান্ত লোকের প্রভেদ কি ? সামান্ত জনগণেরই মতভেদ হইয়া থাকে । এই বিরোধিনী যুক্তি ক্রমে ক্রমে খণ্ডিত হইতেছে

যাহারা আমার "হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য"* নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সেই প্রবন্ধ বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাইয়া থাকিবেন । তথাপি সাধারণের বোধগম্য জন্ত সেই উত্তর আরও বিশদ করিয়া লেখা যাইতেছে ।

সেই প্রবন্ধেই দৃষ্ট হইবে, আমাদের ঋষিগণ কেহই স্বাধীন বা স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ মতের প্রণেতা ছিলেন না ; তাঁহারা সকলেই বেদেরই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন । বেদ মধ্যেই যে সমস্ত মত ও সাধনতত্ত্ব বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত নির্বিষ্ট আছে, তাঁহারা এক এক জন সেই সকল কথা গ্রহণ পৃথক বিশদরূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ।

"ব্রহ্মাণ্য ঋষিপদ্ব্যন্তঃ স্মারকা নতু কারকা ।"

শাস্ত্র বলেন, ব্রহ্ম হইতে সমস্ত ঋষিগণ পর্য্যন্ত সকলেই বেদস্মারক ছিলেন, কেহই কারক ছিলেন না ।

ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, ঋষিগণ অতী-
শ্রিয়ত্বা ছিলেন ; তাঁহারা তপস্তাবলে সমস্ত

* "গীতার প্রামাণ্য" নামক প্রস্তাবে এই অমুভব শব্দের অর্থ বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে ।

বস্তুতঃ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন।
এজ্ঞা তাঁহারা “সাক্ষাৎকৃতধর্মী” ছিলেন।
সেই “মন্ত্রদ্রষ্টা” ঋষিগণ ঘেরূপে যিনি সিদ্ধ
হইয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ সাধনপথ সাধা-
রণে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।*

ভর্জুহরিও বলিতেছেন,—

“ঋণীণামপি যজ্ঞজ্ঞানং তদপাগমহেতুকম্।”

“ঋষিদিগের সমস্ত জ্ঞানই বেদমূলক।”

সকল জ্ঞানই যদি বেদমূলক, তবে এক
বেদ হইতে এত মতভেদ হয় কিরূপে? বেদে
যখন সেই ভিন্নতার কাণ্ড রহিয়াছে, তখন
সে ভিন্নতা না হইবেই বা কেন? এই ভিন্ন-
তার কারণ বিভিন্ন অধিকার। বেদ নানা
অধিকারীর নিমিত্ত নানা পথ প্রদর্শন করি-
য়াছেন। ভর্জুহরি সেই মতভেদের কারণ
এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন:—

“তত্ত্বার্থবাদরূপাণি নিশ্চিতা স্ববিকল্পজাঃ।

একত্বিনাং বৈতিনাং চ প্রবাদা বহুধা মতাঃ।” বাক্যপদীয়

বেদের “অর্থবাদ” হইতেই কি দ্বৈতবাদ,
কি অদ্বৈতবাদ উভয়ই প্রসূত হইয়াছে।
যাহা বা অদ্বৈত ভাবের অধিকার লাভ করি-
বার যোগ্য হয়েন নাই, তাঁহারা নিশ্চয় দ্বৈত-
বাদী। তাঁহাদের সকল জ্ঞানই ঐন্দ্রিয়িক।
ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান মাত্রই সমল ও সাপেক্ষ
(Relative) ভেদজ্ঞান মাত্র। যতদিন লোক
নির্মল (Absolute) জ্ঞানে উপনীত না হয়েন,
ততদিন তাহার জ্ঞান দ্বৈতভাবে সম্পন্ন।
তিনি কোন বস্তুর প্রকৃতত্ব অবগত হইতে
পারেন না। তাঁহার বুদ্ধি ও মন এই
ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানেরই পরতন্ত্র। এইরূপ বুদ্ধি
বিশিষ্ট লোকদিগের প্রয়োজন বিবেচনা
করিয়া নানাবিধ উপদেশ আবশ্যক হইয়াছে।
এই রূপ প্রয়োজনানুসারে যে সকল উপ-

* সিদ্ধান্ত, দৈবশব্দক কাণ্ড।

দেশের আবশ্যকতা হইয়াছে, তাহাই বেদের
“অর্থবাদ” *। “অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি”তে এই
কথা আবও বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।
“আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ” কার সেই গ্রন্থোক্তবিব-
য়ের এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—

“শাস্ত্র প্রকাশক মনিগণ যে ভ্রান্ত নহেন,
তাঁহাদের মত সকল আপাত দৃষ্টান্তে পবন্যব বিবন্ধ
বলিয়া প্রতীত হইলেও কোন দমি যে তাপযাতঃ
অস্ত্র ঋষিব বিবোধী নহেন, ‘অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি’ তাহাই
বুঝাইয়াছেন।

অদ্বৈতবাদই যদি সত্যবাদ হয়, তাহা হইলে দ্বৈত
প্রতিপাদনপথ জ্ঞায় বৈশেষিকাদি ভ্রান্তমত-স্থাপক
শাস্ত্র সমূহ দ্বাৰা তৎপ্রজ্ঞাত্বের কি ইষ্টাপত্তি হইবে? না,
তাহা নয়, দ্বৈতপ্রতিপাদনপথ গ্রহণ সকল নিস্প-
য়োজনীয় নহে। জ্ঞায় বৈশেষিকাদি দ্বৈতবাদসংস্থাপক
পুণ্ডরীক ঋষি ছিলেন, ‘হতরা’, তাঁহাদের ভ্রম
হইতে পারে না। ঋষিদিগেরও ভ্রম হয় বলিলে,
অজীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; কোন ঋষিই বস্তুতঃ ভ্রান্ত
নহেন। মহর্ষিদিগের অভিপ্রায় কি, তাহা স্বদয়স্বয়ম
না হওয়াতেই লোকের মনে নানাবিধ সন্দেহ উদ্ভিত
হইয়া থাকে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, উপলব্ধি
হইবে, দ্বৈত-প্রতিপাদনপথ মহর্ষিদিগের আপাতদৃষ্টান্তে
বিবন্ধরূপে উপলভ্যমান মত সকল বিবর্তবাদেই পথ-
বিস্তৃত হইতেছে। দ্বৈতপ্রতিপাদনপথশাস্ত্রকারেরা তাৎ-
পর্য্যতঃ অদ্বৈতবাদকেই যে আদর করিতেন, এই মত-
কেই যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ মত মনে করিতেন, তাহার
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তর্ককেশরী উদয়নাচার্য্য
তাঁহার ‘আন্তরত্ববিবেক বৌদ্ধাধিকারে’ বলিয়াছেন,
বিবর্তবাদই যে সত্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই,
কিন্তু আদার ব্যাপারের জাহাজেব খবর দরকার কি।”

উদয়নাচার্য্যের অর্থ এই যে, আমি দ্বৈত-
বাদীদের জন্তই যে কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছি,
সে কার্য্যে অদ্বৈতবাদের কথা অনাবশ্যক।

* প্রয়োজন-সিদ্ধি উদ্দেশ্য করিয়া যাহা বলা যায়,
তাহাই অর্থবাদ—(কথিত) “অর্থায় প্রয়োজন সিদ্ধিরে
বাদঃ কথনম্।” জ্ঞানদর্শনে চতুর্বিধ অর্থবাদ কথিত
হইয়াছে।

এক্ষণে বোধ হয়, অনেক দূর প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের দার্শনিক মতভেদ ঋষিদিগের অজ্ঞতা, বুদ্ধিবিকৃতি বা ভ্রান্তি বশতঃ নহে; অজ্ঞজনগণকে জ্ঞানপথে আনিবার নিমিত্ত তাঁহারা বেদার্থ বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন। তাহ, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকার বলেন, সামান্য পণ্ডিতগণের মতভেদ অজ্ঞতানিবন্ধন, দার্শনিক ঋষিগণের মতভেদ অজ্ঞজনগণকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত। দর্শনের উৎপত্তিও, তদ্বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে এ বিষয় আবও পবিত্র হইয়া যাইবে।

বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যের প্রবচনভাষ্যের যে বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রাজ্ঞলকপে দর্শনসমূহের বিরোধভঞ্জন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। প্রথমে তিনি দর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন যে প্রতিভে উক্ত হইয়াছে :—

“আত্মা বা অরে ত্রৈলোক্যঃ অতথো, যন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ”—ইত্যাদি।

“শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা সৰ্ব্বদা আত্মসাক্ষাৎকার করিবে।”

আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবার নিমিত্ত এই ত্রিবিধ উপায় ক্রটিতে নিদিষ্ট হইয়াছে— শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন। অগ্রে পুরুষপদেশ-ক্রমে সমগ্র বেদ শ্রবণ, অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিবে। সমস্ত বেদ হইতে এইরূপ আত্মতত্ত্বের শ্রবণ করিয়া তৎপরে তৎসম্বন্ধে চিন্তার প্রয়োজন। চিন্তা ও যুক্তি সহকারে বেদার্থের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিলে বেদ পাঠই বৃথা। বিবিধ প্রমাণ দ্বারা পরমাত্মার অনবরত চিন্তা করাই “মনন”। মননদ্বারা সমস্ত বিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ হইলে তবে যোগ পথে পদার্পণ করা আব-

শ্যক। মননদ্বারা পরমাত্মতত্ত্বের ধারণার পর অবিশ্রামে ও অনন্তচিত্তে প্রগাঢ় ধ্যান পরায়ণ হওয়ার নাম “নিদিধ্যাসন”।

বেদোক্ত সাধন পথ এই। এইরূপ সাধন-পথ অবলম্বন করিলে তবে আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভাবিত হয়। এই পথ যতদিন অবলম্বিত হইয়াছে, ততদিনই দর্শনশাস্ত্র বিদ্যমান। যতদিন “মননের” অনুষ্ঠান হইতেছে, ততদিন বৈদিক “অর্থবাদ” আছে। ততদিন বেদেব প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ জ্ঞানান্না প্রমাণপথের চিন্তা ও উপদেশ বিদ্যমান ছিল। দার্শনিকেরা সেই সমস্ত উপদেশ স্বীকারে প্রণীত করিয়া গিয়াছেন; এবং তাহাই এক এক দার্শনিক প্রস্থানে পরিণত হইয়াছে। প্রস্থান সমূহের প্রমাণপদ্ধতিও একান্ত স্তম্ভ হইয়াছে। যে প্রস্থানের যেকোন অধিকার, তাহার প্রমাণ-পদ্ধতিও সেই রূপ হইয়াছে।

বিজ্ঞানার্চাধ্যা বলেন, কাপিল সাংখ্যের অবিকার আত্মতত্ত্বজ্ঞান; সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান কেবল বিবেকোদয়ে সম্ভব, পরমপুরুষার্থসাধন দ্বারা বিবেকোদয় হয়। এই পুরুষার্থসাধন-পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, ভগবান্ কাপিল, ক্রটির সার সঙ্কলন করিয়া পরমাত্মজ্ঞান বিষয়ে ক্রটির অবিরোধিনী নানা উপপত্তির উপদেশ করিয়াছেন। শ্রবণ দ্বারা সাংখ্য যে ক্রতিবাক্য লইয়াছেন, সেই ক্রতি সাংখ্যের নিকট আপ্তবাক্য। নানা উপপত্তি বা অনুমানমূলক যুক্তি দ্বারা সেই আপ্তবাক্যকে স্থাপন করিবার নিমিত্ত সাংখ্য সূত্ররূপ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই ত্রিবিধ যুক্তি-পথ অবলম্বন করিয়াছেন। সাংখ্য একান্ত ত্রিবিধ প্রমাণে স্বীকার করেন—শব্দ (আপ্তবাক্য), অনুমান ও প্রত্যক্ষ।

সাংখ্যের প্রতিপাদ্য নিশ্চয় ব্রহ্ম ; জ্ঞান ও বৈশেষিকের প্রতিপাদ্য সগুণ ব্রহ্ম । এজ্ঞ জ্ঞানদার্শনিকেরা আর এক অতিবিক্ত প্রমাণ গ্রহণ করিলেন । সামান্য বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানেব উপমা দিয়া নৈয়ায়িকেরা সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইলেন ।* নিশ্চয় ব্রহ্ম বিদ্যায় সামান্য বস্তুতত্ত্বের তত উপযোগিতা নাই বলিয়া কাপিলসাংখ্যে তাহা গৃহীত হয় নাই । কিন্তু সগুণ ব্রহ্মবিদ্যায় উপমান অত্যন্ত উপযোগী ।

বেদান্ত আরও কতিপয় প্রমাণ স্বীকার করেন ; যেহেতু, তাহাব অধিকার সগুণ ও নিশ্চয় উভয়ই । ব্রহ্মমীমাংসাকার পূর্ণপ্রজ্ঞ, মাধ্বাচার্য্য, বল্লভ ও রামানুজ সগুণ দ্বৈতবাদী, শঙ্কর নিশ্চয় অদ্বৈতবাদী । সৌগত ও জৈনেরা আপ্তবাক্য শব্দকে অস্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষ এবং অনুমান গ্রহণ করিলেন । চার্ব্বাকেরা কেবল প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কিছুই স্বীকার করিতে চাহেন না । তাই আপ্তবাক্য-বিরোধী নাস্তিক দর্শন ষড়বিধ হইল—চার্ব্বাক, চতুর্ধিষ বৌদ্ধ এবং জৈন বা অর্হত । আপ্তবাক্যের অবিরোধী আন্তিক দর্শনও ছয় প্রকার—জায়বৈশেষিক ভেদে দ্বিবিধ জায়, সাংখ্যপাতঞ্জল ভেদে দ্বিবিধ সাংখ্য এবং পূর্ব উত্তরভেদে দ্বিবিধ মীমাংসা দর্শন ।

সগুণ ঈশ্বর কেবল কাপিল সাংখ্যে এবং

* কাপিল সাংখ্যে নিত্য ঈশ্বরের নিরাকরণ জন্য যে সগুণ ঈশ্বরের প্রতিবেদ আছে, কুহুমাজলিকার উদয়নাচার্য্য এই প্রমাণ বলে সেই ঈশ্বরের স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন । মাধ্বাচার্য্য সর্বদর্শন সংগ্রহে সেই যুক্তির সারসঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন । বৈশেষিকে শব্দ ও উপমান গৃহীত হইয়া অনুমানান্তর্গত হইয়াছে ।

জৈমিনির পূর্বমীমাংসায় প্রতিবিদ্ধ । কপিল ঘোর জ্ঞানবাদী, জৈমিনি ঘোর কর্মবাদী । একজন জ্ঞান ; অতজন কর্ম দ্বারা মুক্তি প্রয়াসী । সগুণ ঈশ্বর নাই মানুন, আন্তিক দর্শনকাবগণ নিত্যবস্তু নিশ্চয়সত্তা পবমাদ্বার স্বীকার করিয়াছেন । শুদ্ধ উপাসনার নিমিত্ত সগুণ ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা । আন্তিক দর্শনের বিরোধভজ্ঞানায়ক বিজ্ঞানাচার্য্যের প্রসঙ্গ এক্ষণে অনায়াসে উত্থাপিত হইতে পারে ।

দর্শনে জ্ঞানের একটি সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে ; সেই সীমা ইন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে স্থাপিত । ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান বাহ্যবিষয়ের দ্বার স্বরূপ । মন ও বুদ্ধি এই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ব্যাপাবে ব্যাপ্ত থাকিয়া যতদূর গাইতে পারে, সেই স্থলে এই সীমা স্থাপিত । এই জ্ঞান-সাপেক্ষ (Relative) দ্বৈতজ্ঞান । সেই নিমিত্ত প্রকৃত বস্তুতত্ত্বাবধানে অসমর্থ । প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব কি, তাহা এই জ্ঞানের পরপারে । যোগীগণ বলেন, এই পরপারে যাইবাব একমাত্র উপায়—নিরোধ । পাতঞ্জল যোগসূত্র বলেন, এই নিরোধ কেবল চিত্তক্লয় কবিয়া সংস্কৃত হয় । চিত্তে সমুদায় ঐন্দ্রিয়িক দ্বৈত জ্ঞানের সংস্কার একেবারে বিলীন হইলে এই নিরোধ উপস্থিত হয় । তখন নির্মল ও অখণ্ড (absolute) জ্ঞানের বিকাশ হয় । নির্মল জ্ঞানের বিকাশ হইলে সমুদায় বস্তুতত্ত্ব জানা যায় ; তখন একমাত্র ব্রহ্মই প্রত্যক্ষ হইতে থাকে । এজ্ঞ এই জ্ঞানের নাম কেবল বা অদ্বৈতজ্ঞান । এই জ্ঞানই সাংক্ষাৎ মুক্তি-সাধক । এই জ্ঞানে উপনীত হইলে জীব সর্ববিৎ হয়, স্তবরাং কিছু জানিবার বাকী ও অপেক্ষা থাকে না । যোগশাস্ত্রে এই জ্ঞান-লাভের সাধনপথ নির্দিষ্ট হইয়া হইয়াছে । সাংখ্যে ঈশ্বর-নিরবলম্বযোগ, পাতঞ্জলে ঈশ্বর-

বলম্বিত যোগ। শ্রুতিতেও তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, দার্শনিকেরা সেই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া বলেন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই সেই প্রশস্ত সাধনপথ। এই প্রশস্ত সাধনপথেই কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রবণ ও মনন পর্য্যন্ত সামান্য মানসজ্ঞানের গীমা; নিদিধ্যাসন অবলম্বন করিয়া আমরা যোগপথে অগ্রসর হই। মনকে ধ্যানে নিযুক্ত ও নিমগ্ন করাই নিদিধ্যাসন; সেই ধ্যানে শ্রবণ, অবধারণ, নির্ণয়, প্রতিপন্ন ও অন্তিস্তাদি দ্বারা ধারণ করাষ্ট শ্রবণ মননের বিষয়। এই ধোষ দ্বিবিধ, সঙ্গুণ ও নিগুণ। সঙ্গুণ স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম যাওয়াই মনন ও দর্শনের বিষয়। এই সূক্ষ্মতরের এক সীমা আছে, যেখানে নিগুণ তত্ত্বের আভাস ও অধ্যাস লাভ করা যায়। সেই সীমায় আসিয়া যোগিরা নিগুণের ধ্যানে অধিষ্ঠিত হইয়েন; সম্প্রজ্ঞাত বা সামান্য ও সমাক প্রকার সর্বিকল্প জ্ঞানরাজ্য হইতে অসম্প্রজ্ঞাত বা সজ্ঞাহীন নির্বিকল্প জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ লাভ করেন।

সম্প্রজ্ঞাত হইতে অসম্প্রজ্ঞাত যোগরাজ্যে আসিবার অবস্থার যোগিদ্বিগের একযোগবল বা ঐশ্বর্যলাভ হয়। যোগশাস্ত্রে সেই যোগবল ও ঐশ্বর্যের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কোন কোন যোগী এই যোগবলে এত মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, আর নিগুণধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়েন না। পাছে সেই ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইতে হয়, তাই কাপিলসাংখ্যে সেই ঐশ্বর্যের প্রতিষেধার্থ সঙ্গুণ ঈশ্বরের অসিদ্ধতা সপ্রমাণ করা হইয়াছে; অত্র কারণে নহে! বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন:—

“এই শাস্ত্রে (সাংখ্যদর্শনে) ঐশ্বর্য বৈরাগ্যের নিমিত্তই ঈশ্বরবাদের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। যদি বৌদ্ধ-মতানুসারে নিত্য ঐশ্বর্য প্রতিষেধ না কর, তাহা হইলে পরিপূর্ণ, নিত্য, নির্দোষ ঐশ্বর্য দর্শনে তাহাতে চিত্তের অভিনিবেশ হইয়া বিবেকাত্ম্যাসের প্রতিবন্ধক হইতে পাবে, তাহাই সাংখ্যাচাৰ্য্যের অভিপ্রায়।” *

অত্রুক্ত:—

“দশম ছন্ডে, এই নিমিত্তই নিরীশ্বরবাদ ব্যবহার-সিদ্ধ হইয়াছে এবং তাহা হইলেই ঐশ্বর্য-বৈরাগ্য সম্ভাবিত। যদি ঈশ্বর স্বীকার কর, তাহা হইলেই নিত্য ঐশ্বর্যও স্বীকার করিতে হয়, হুতরাং ঐশ্বর্য-বৈরাগ্য সম্ভবে না।”

এই কাবণে সাংখ্যে ঈশ্বর (সঙ্গুণ) অসিদ্ধ। যে তত্ত্বজ্ঞান ও নিগুণতত্ত্ব সাংখ্যের প্রতিপাদ্য, পাছে সাংখ্যযোগিরা সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভে ব্যাঘাত জন্মে, তাই যোগসিদ্ধি পক্ষে ঈশ্বরবাদ অসিদ্ধ। বিজ্ঞানাচাৰ্য্য আবার বলিতেছেন:—

“বিশেষতঃ ব্রহ্মসীমানা গৃহ্যে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত ঈশ্বরই প্রতিপন্ন হইয়াছেন। সেই শাস্ত্রের ঈশ্বর-প্রতিপাদনই মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার সেই অংশের বাধ হইলে শাস্ত্রেরই অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। যে শব্দের যে উদ্দেশ্য, তাহাই সেই শব্দের অর্থ। ব্রহ্মসীমানাতে কেবল ঈশ্বর প্রতিপাদনই শাস্ত্র-কর্তার অভিপ্রেত। সাংখ্য শাস্ত্রে কেবল পূর্ববার্ষসাধন আত্মসাংস্কারের উপায় স্বরূপ প্রতিপূর্বষে বিবেচনাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত সাংখ্যশাস্ত্রের ঈশ্বর প্রতিষেধাংশের বাধ হইলে শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হয় না। যে হেতু, প্রকৃতি পুরুষ বিচারেই তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেক লাভের উদ্দেশ্য-সাধন অনিশ্চিত। বাহার যে উদ্দেশ্য, তাহার সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই সেই বাক্যের প্রামাণ্য থাকে। অতএব, সাংখ্যশাস্ত্র অপ্রমাণ না হইয়া ঈশ্বর প্রতিষেধাংশে অত্র শাস্ত্রাপেক্ষা অত্র দ্বন্দ্বল বলিতে হইবে।”

তবেই দেখা যাইতেছে, যে দর্শনকার যে অধিকারে আছেন, সেই অধিকারের যাহা

* । অন্ত্যব-বাহ্যভরে আমরা বিজ্ঞানাচাৰ্য্যের মূলের কেবল অংশাদ দিতেছি।

প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন-সিদ্ধি নিমিত্ত তাহার যুক্তিপথ অবধারিত হইয়াছে। সপ্তগ ব্রহ্মেব প্রতিপাদনে যাহারা নিযুক্ত, তাঁহারা একেবারে নিষ্প্রয়োজন নহেন; মোক্ষপথে তাঁহাদেরও গৌণভাবে প্রয়োজন। বিজ্ঞান-ভিক্ষু মতে, কেবল সাংখ্যাপেক্ষাই তাঁহা দিগেব অপকর্ষ। সাংখ্যজ্ঞান দ্বাবাই পবম বৈবাগ্য উৎপন্ন হয়, স্ততবাং এই জ্ঞানই সাক্ষাৎ মোক্ষসাধন। যে জ্ঞানের প্রতিপাদন কবা তাঁহাদিগেব প্রয়োজন, সে জ্ঞান পবম্পবা রূপে মোক্ষসাধন। সাংখ্যশাস্ত্র মতে এই দেশ্বরবাদ ব্যবহারিক এবং ঐশ্বর্য্য-বৈবাগ্য-সাধক নিবীশ্বরবাদ পাবমার্থিক; কিন্তু দেশ্বরদর্শনশাস্ত্রে সপ্তগব্রহ্মমীমাংসাই পাবমার্থিক,—গৌণভাবে পাবমার্থিক। স্ততবাং ব্যবহারিক ও পাবমার্থিক বিচাবে কি দেশ্বরবাদ কি নিবীশ্বরবাদ, উভয়ই প্রয়োজন সিদ্ধি উপযোগী বলিযা দর্শনে তাহাবা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। শুক্ল প্রয়োজনানুসাবে পবম্পব বিবোধী হইযা দাঁড়াইয়াছে। দেশ্বরবাদ কপিল সাংখ্যেব বিবোধী এবং নিবীশ্বরবাদ দেশ্বর দার্শনিকগণেব বিবোধী। এই জ্ঞান বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিতেছেন :—

“ব্রহ্মমীমাংসা ও যোগসূত্রকাব নিত্য ঈশ্বর স্বীকাব কবেন। সাংখ্য মতে ঈশ্বর স্বীকৃত নহে এবং এমতও স্বীকাব করা যায় না যে, ব্যবহারিক পাবমার্থিক ভেদে দেশ্বর নিবীশ্বরবাদ অবিকল্প।”

দার্শনিক প্রস্থানের প্রয়োজন অহু-সারে এই সপ্তগ ও নিষ্ঠূর্ণবাদ পরস্পর বিবোধী হইলেও মোক্ষার্থ তাহাবা উভয়ই প্রয়োজনীয়।

যে দর্শনকাব দেশ্বরবাদ প্রতিপাদনে নিযুক্ত, তিনি সেই বাদেবই পক্ষ সমর্থন কবিযা গিযাছেন। পাছে নিবীশ্বরবাদ দ্বাবা তাহাব প্রয়োজন ব্যর্থ হয়, তজ্জন্য নিবীশ্বরবাদেব প্রতি তিনি কটাক্ষপাত কবিযা অজ্ঞ-জনগণেব প্রবোধনার্থ নানা জল্পনাব সৃষ্টি কবিযাছেন। নিবীশ্বরবাদেও তদুপ ঘটিয়াছে। নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধি নিমিত্ত দার্শনিকগণ যে সকল জল্পনাব সৃষ্টি কবিযাছেন, তাহাতে অনেক বেদবিবাক্ত বৃথা কথাও আবশ্যকতা হইয়াছে। সেই জ্ঞান বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিযাছেন :—

“পাদিগেব জ্ঞানপ্রতিবোধেব নিমিত্ত আশ্রিত দর্শনও অংশত শ্রুতিবিকল্প অর্থ ব্যবস্থাপিত আছে এবং সেই সেই অংশেব অপ্রামাণ্যও হইলা থাক। যে অংশ শ্রুতিস্মৃতিব অবিকল্প তাহাই প্রামাণ্যপে যুগ্য বিষয় বলিযা আদৃত হইয়া থাকে। শাস্ত্র মাজেই বিবাক্ত ও অবিকল্প অর্থ বিন্যস্ত থাকে, তন্মধ্যে যে অংশ শ্রুতিস্মৃতি বিকল্প, তাহা অপ্রামাণ্যজ্ঞানে পবি-চাগ কলি। যে অংশ শ্রুতিস্মৃতিব অবিবোধী, তাহার প্রামাণ্য জানিযা গ্রহণ কবা যায়।”

শ্রী পু চিত্ত বস্তু ।

শিশির বাবুর গীতিগ্রন্থ ।

(শেষ আলোচনা ।)

মানব-স্বভাবেব যে অনন্ত মহা গীতি স্বাগত,—স্বতঃ প্রবাহিত,—জ্ঞাতে বা অজ্ঞা-তে জ্বলয়ে জ্বলয়ে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত; যে মহা গীতিব বিশ্ব-বিমোহন, ব্রহ্মাণ্ড-পরিপ্লাবী

বিপুল বিবাট উচ্ছ্বাস মানব জাতিব ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পরিণত; মহুষ্য-জীবনেব যে মহা গীতি বেদে, পুরাণে, বাইবেলে, কোরাণে, এবং আরও কত কত, স্বতন্ত্র

স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থে গীত, বিবৃত এবং বর্ণিত ;
 যে গীতি সার্বভৌমিক ও সার্বকালিক,—
 যাহা যুগ-প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে এবং প্রলয়ান্তে
 প্রবাহ রূপে নিত্য, অক্ষয় এবং অবিনষ্ট ;—
 যাহা ব্যাপ্তি ও সমাপ্তি ভাবে মনুষ্য-জন্মের
 অত্যাচ্ছ, অবিনশ্বর, অনিবারণ্য এবং অতৃপ্ত
 আকাঙ্ক্ষার বা অনুবাহকের উদ্বেজনা বা
 উচ্ছ্বাস ;—যেগীতি, মানব জাতির শৈশব,
 কৈশোর ও যৌবনাদি কাল, ও কমন, কঠোর
 করণ, উগ্র বা মধুরাদি বৃত্তি ভেদে,—গীতি
 স্মৃতি পুরাবৃত্তাদির পূর্ণাপন স্তব ভেদে, ভিন্ন
 ভিন্ন রাগে ও রাগিণীতে উৎপিত—গীত, কভু
 অক্ষট, কভু মনল, মহজ, শিল্প-চাতুরী-হীন
 শৈশবে স্তম্ভর ; কভু, উজ্জল, উন্নত, অদ্ব-
 ভেদী, প্রদীপ্ত, উগ্র, গভীর, দৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য-
 ময় ;—কভু বা মোলায়েম, মধুর, মিষ্ট ;
 করণ ; কভু ঔদাস্য বা দাস্য ভাবোদ্ভাসিত,
 কভু বাৎসল্যসখ্য-ময়, কভু কেবল অবি-
 মিশ্র মাধুর্য্য-ময় ;—যে গীতি কখন প্রথমে
 জ্ঞানোদীপ্ত, কখন ললিত স্রষ্ট-বিভাসিত,
 কখন উন্নত মহা সাগরের উত্তাল তবঙ্গ লহরী,
 কখন সমুদ্র-সঙ্কুচিত প্রেমিক প্রেমিকার সং-
 গোপন মিলন সঙ্কেতের স্মৃতি নিভৃত নিকন ;
 কখন নৈশ মৌরভ-পুলোকিত প্রস্থ-নিশ্বাস ;
 আবার কখন প্রশান্ত, প্রফুল্ল, পবিত্র, দিগন্ত-
 ব্যাপী, তপন-তরঙ্গিত, সুমহান সাম-সংগীত ;
 —পুনশ্চ, যে গীতি, কখনও ভৈরব, কখনও
 মালব, কখনও হিন্দোল, কখনও বা দীপক,
 যুগে যুগে নবীন নিঃস্বনে, নবজীবনে জাগ-
 রিত ; যুগে যুগে জীব উদ্ধারার্থে যুগাবতার
 কর্তৃক অভিনব উচ্ছ্বাসে অবতারিত ;—ঋষি
 প্রফেট, সিয়র পেয়গম্বর ও কবি কর্তৃক
 কীর্তিত—মৌলিক রাগে বা মিশ্র রাগিণীতে
 গীত ; যে গীতি প্রভাবে সলিলোপরি শিলা

ভাসিয়াছিল, অরণ্যবাসী হ্রস্ব পশু-সমাজ
 প্রেমাকৃষ্ট হইয়াছিল, পরস্পর-বিরোধী বর্ষর-
 জাতি একপ্রাণে একতা-বদ্ধ হইয়া সত্যের
 সমর্থন ও হৃঙ্কতের দমন করিয়াছিল ; পরন্তু,
 যে গীতির ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণে সঞ্চালিত,
 সন্মোহিত হইয়া,—আত্ম-বিশ্বতা ব্রজ-রমণী
 অস্বর্ণ্যম্পাদ্য কুল-কামিনী, উন্মাদিনীবৎ,
 বনে বনে ছুটিয়াছিলেন, সংসার-সমুদ্র-সতীত্ব
 পতি-সন্ততি-যথাসম্মত বিসর্জন দিয়াছিলেন,
 গায়কের অনুসন্ধানে গৃহ-বাসিনী, বন-চাণী
 হইয়াছিলেন ; লজ্জা-রূপিনীগণ বিবসনা
 উলঙ্গিনী হইয়াও আত্ম সম্বরণে,—প্রেম
 গীতির গুঞ্জরণ সম্বরণে, সমর্থ্য হন নাই ;—
 “হা ! নাথ” “হা ! নাথ !” রবে নিদাক্ষণ
 ককণ ক্রন্দনে, বিরহ-বিধুরা ব্রজ-বালিকা
 কালিন্দী সৈকত অশ্রু সিক্ত করিয়াছিলেন ;
 পনমেশ-প্রেম-পাগলিনীগণ কালিন্দী গর্ভে
 দেহ ভার বিসর্জনে উদাত্ত হইয়াছিলেন ;
 আর আত্মার যে গভীর গীতি উত্তেজনায়
 শাক্য রাজকুমার যুবরাজ অমিতাভ
 রাজ-মুকুট, রাজ সিংহাসন, সংসার স্বখ,
 সম্পদ রাশি তুচ্ছ ভূণবৎ ত্যাগ করিয়া, স্নেহ-
 পারাবার পিতা মাতাকে শোক-পারাবারে
 ভাসাইয়া, প্রেমময়ী পত্নী, নব-প্রসূত অমি-
 য়াদার পুত্র নিন্দ্রাবস্থায় পর্য্যঙ্ক-পরে পরিবর্জন
 করিয়া, নিশীথ প্রহরে পলায়ন ও মারা-বন্ধন
 সমূলে ছেদন করিয়া কষ্টা কোপিন-ক্লিষ্ট
 কঠোর সন্তান অবলম্বন করিয়াছিলেন ; পুনঃ,
 যে প্রকাণ্ড গীতির পূর্ব-রাগে, পরম পণ্ডিত-
 মণ্ডলী, দিগ্‌দেশ হইতে, ধাবিত হইয়া বৈৎ-
 লেহমের গো-গৃহে-স্থিত সদ্য-প্রসূত হৃদয়-
 শিশুকে রাজ-উপহারে, ও দেবোপচারে পূজা
 ও প্রণাম করিয়াছিলেন ; এবং যে গীতির
 পূর্ণ উচ্ছ্বাসে, সেই শিশু-সম্মানী জন্মধূম-ধ্বজ-

বনে স্বকীয় উত্তম পবিত্র শোণিত দ্বারা সমগ্র-
পৃথিবীর পাপতাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি-
লেন ; অপিচ, যে মহাগীতির মধুর মুচ্ছনায়
একদিন নবরূপ নবীন বৃন্দাবনে পরিণত হইয়া
ছিল ; 'দারু পাষণ গলিয়াছিল, বঙ্গ বিহাব,
আসাম, উৎকল গৌরাঙ্গ গানে মাতিয়াছিল
এবং সমগ্র আধ্যাত্মিক ও দক্ষিণাপথ প্রেম-হৃদা
রে প্রকম্পিত হইয়াছিল ; যে গীতিতে সাধক,
সন্ন্যাসী তাপসাদির ন্যায় সংসারী বিষয়ীও আ-
কৃষ্ট, বাহাতে পণ্ডিত মূর্খ, পুণ্যাত্মা পাপী, ব্রাহ্মণ
চণ্ডাল সকলেরই, জীবমাত্রেরই অধিকার,—
যাহা জীব মাত্রেরই গতি ; যাহাতে কেহ
সালোক্য, কেহ বা সাযুজ্য কামনা কবে, কেহ
যত্নে, কেহ অষ্টসিদ্ধি আশীর্বাদ চায়,
কেহ বা দৈনিক এক মুষ্টি অন্ন প্রার্থনা করে ;
কেহ বা কেবল সেই প্রাণেশ্বরের প্রেম
ভিক্ষা চায় ;—যে গীতি অবিচলিত আন্তি-
কতার দ্বারা নিরতিশয় নাস্তিকতার দ্বারাও
গীত,—সরস ভক্তি প্রীতির ন্যায়, শুষ্ক জ্ঞান
বিজ্ঞান দ্বারাও প্রচারিত ; যাহা, যে ভাবেই
হউক, জীবের জীবনোপায় এবং জগতের
মূল অবলম্বন-যষ্টি ;—সেই বিপুল, বিরাট,
ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী-সঙ্গীতের—সেই অসীম, অনন্ত,
অনাদি, অবিনশ্বর মহা গীতের একটা ক্ষুদ্র,
ক্ষীণ, মৃদু মধুর তরঙ্গ,—শিশির কুমার
ঘোষের এই গীতিগ্রন্থ । ইহা সুস্নিগ্ধ শিশির
বিন্দু এবং শীতল ও সুন্দর । ইহা ভগবানের
সর্ব-শক্তিমন্তর, অসীম ও অতুল ঐশ্বর্যের
সংগীত নহে,—ইহা তাঁহার নির্মল কমল-
তার নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্যময়ী গীতি ।

কুরুক্ষেত্রের সমরাজনে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ,
জ্ঞান-বিশুদ্ধ অর্জুনকে, তব জ্ঞানের
উপদেশ প্রদান করে, স্বকীয় ভগবচ্ছক্তি,
ঐশ্বর্য ও বিপুল বিশ্বব্যাপী বিরাট

বিভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন । সেই অল্প-
পম, অক্ষয় উপদেশ-গীতি, মহা কবি মহর্ষি
বাসুদেব বিরচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । বোধ
হয়, কেবল একমাত্র, বেদশাস্ত্র ব্যতীত,
সমগ্র শাস্ত্রে ও সাহিত্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় । উহা দার্শনিক
কাব্য বা কাব্যাকাব্যে দর্শন । উহা অতুল
“ফিলজপিব” গ্রন্থ কাব্যংশও উচ্চ । উহা
পণ্ডিত, জ্ঞানী, দার্শনিক, ভাবুক, ও চিন্তক-
গণেরই জ্ঞানগম্য ও চিন্তার বিষয় ; অত-
এব তাঁহাদিগেরই জ্ঞানপ্রদ, শিক্ষণীয়,
উপভোগ্য ও আলোচনীয় । উহার নিগূঢ়
তত্ত্ব, অগাঢ় বস, অতুল্যভাব এবং অতি গভীর
আধ্যাত্মিক গবেষণা সামান্তের সহজ বুদ্ধি
হইতে, সংসারী বিষয়ীজনের সংকীর্ণ জ্ঞান
হইতে—দূর, অতি দূর । পরন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়
শ্রীভগবানের অতৈশ্বর্যের ও অতোজ্জ্বল্যের
গীতি ; সে অনন্ত ঐশ্বর্য, সে অসীম নয়না-
কর ওজ্জ্বল্য, স্বরূপবুদ্ধি ক্ষীণশক্তি সাধারণ
লোকে ধারণ ও অনুধাবন করিতে পারে না ।
তদ্বারা ভীত, বিম্বিত, চমকিত, আতঙ্কিত
হয় ; বিবশ বিধাস্থ হইয়া, তাহা হইতে যেন
পলায়ন করিতে চায় । অপিচ, গীতোক্ত
অল্পপম উপদেশাবলী বিষ্ণু-অবতার মানব-রূপী
শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ-বিনিম্বিত হইলেও গীতোক্ত
ঈশ্বর পূর্ণব্রহ্ম, উপনিষদের অখণ্ড, অব্যয়,
অচিন্ত্য অপার পরমেশ্বর, মহান্ মহিমান্বিত,
নিরাকার কূটস্থ চৈতন্য ; পরন্তু গীতা-বিবৃতি-
কালে অর্জুন-সম্মুখে তদীয় দিব্য দৃষ্টিতে,
ভগবানের যে মূর্তি প্রতিভাত হইয়াছিল,
তাহা তাঁহার অপরিমেয়, হ্রস্বীকৃত্য, বিপুল,
বিশ্বব্যাপী, মার্ত্তও, বিরাটমূর্তি । সে উগ্রমূর্তি
দেখিয়া ত্রিলোক প্রবাক্ত হইয়াছিল ;
স্বয়ং অর্জুন,—বিশ্ববিজয়ী বীর অর্জুন, অত্যন্ত

আতঙ্কিত ও দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন !
অতএব অস্ত্রের আর কথা কি ? ভীতির
সহিত ভক্তিব,—শঙ্কর সহিত শঙ্কর উদ্রেক
অসম্ভব না হইলেও, আতঙ্ক ও বিশ্বাস, বোধ
হয়, মনুষ্যপ্রেম আকর্ষণ কবিত্তে পাবে না ।
অতএব ভগবানের বিবাকরূপ ও স্বরূপ, যদি
মনুষ্যজন্ম আদৌ ধারণ কবিত্তে পাবে,
তাহাতে কেবল বিশ্বাসবিষ্ট ও ভীত হয়,
তাহা সম্ভবতঃ ভালবাসিতে পাবে না ।

অনাদিমধ্যাক্তমনস্ত বীণা
মনস্তবালং শব্দং কথ্য নেত্রং ।

* * *
কপং মহন্তে বহুবক্ত নেত্রং
মহাবাহো বহুবাহুস্পাদং ।
বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকবালং ।

* * *
নভঃশুশুদী প্তমনেকবর্ণং
বায়োননং দীপ্তাশান নেত্রং ।

* * *
দংষ্ট্রাকবালানি চ তে দুপানি
দুইষ্টং কালাননং সন্নিধানি ।

ইহা ভয়ানকের ভয়ানক ! ভগবানের
গীতোক্ত এই বিশ্বকপ । পক্ষান্তরে, ভগবানের
যে অবতাব-মূর্ত্তি হইতে ঐ বিশ্বমূর্ত্তি অর্জুন
সমক্ষে অভিব্যক্ত, তাহাও চতুর্ভূজ, শঙ্খ-চক্র-
গদা-পদ্ম ধারী, কি বাট-কুণ্ডলধারী ঐশী মূর্ত্তি ।
ইহাও সামান্য প্রাণীর সম্ভবতঃ শঙ্কাপ্রদ ।
এ মূর্ত্তি পবিত্রতা ও পূজা উদ্দীপন করিতে
পারেন ; প্রেম উদ্দীপন করিতে সর্বত্র ও
সামান্যতঃ পাবেন কি না, বলা কঠিন ।
গীতোক্ত ঐশী কপ ও ঐশী স্বরূপ ও ঐশী
শক্তিও আধ্যাত্মিক সাধন উপদেশ, অত্যাচ্ছ
অত্যাগ্র এবং অত্যাশ্চর্য্য-সমবিত্ত । শ্রীমদ্ভগব-
দগীতার বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—মহাভারতোক্ত
রাজনৈতিক শ্রীকৃষ্ণ—কুরুক্ষেত্রকর্ত্তা এক-
ছত্র ভারত-সাম্রাজ্য-সংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণ ।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ “গীতা” নামে

অভিহিত হইয়াছে । উপরোক্তের অনুসরণ-
ণেই হইয়াছে । এ “গীতা”রও বক্তা এবং
উপদেষ্টা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ । কিন্তু সম্পূর্ণ
স্বতন্ত্র স্বরূপে এবং রূপে । এ গীতার ভগবা-
নেব ভাববিশ্বাসপ্রদ ঐশী শক্তি ও ঐশী ঐশ্ব-
র্য্যের গান নহে, দ্বাবাগাহ গভীর জ্ঞানাত্মক
উপদেশ নহে ;—ইহাতে শ্রীভবানের সুন্দর,
মধুর, স্নানিক, কমলীয়, কান্তরূপের ও কমল
শীতল, রসাল শাস্ত্র স্বরূপের সংগীত ;—
পরন্তু ইহাতে পরমেশ্বরের অবিমিশ্র মাধুর্য্য-
ময় প্রেমাত্মক উপদেশ । এ গীতার ভগবান
শ্রীকৃষ্ণ, মোহন, সুন্দর, প্রেমিক, বসিক, কবি,
শিল্পী, সুনিপুণ চিত্রকর, চিত্রচোর চটুল
নায়ক ; মোহনচূড়া ও মধুর মুরলীধারী স্ন-
চিকণ শ্রামচাঁদ ; রমণীয় রতন-রাস-বিহারী,
কুটিল কটাক্ষে প্রেমিক প্রেমিকার মন-প্রাণ
পরিমহনকারী সেই বিনোদ বৃন্দাবনচন্দ্র ;—
এ গীতার শ্রীকৃষ্ণ, সেই চিবস্ববর্ণীয় প্রেমলীলা-
ভূমি কাশিন্দীকুলস্থিত চিববসন্ত-বিভাসিত,
মধুগুঞ্জিত, কোকিল কুজিত নিভৃত নিকুঞ্জ-
কুটীরের কালাচাঁদ । এই অর্থে ইহা “কালা-
চাঁদ গীতা ।” বৃহত্তের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা
নহে ; তাহা বিক্রপকর তাহা “বে আদবী ।”
কিন্তু বৃহত্তের আদর্শ লইয়া ক্ষুদ্র চিবকালই
আয়োগ্যতির বা আত্মাভিব্যক্তির আয়োগ্য-
যেগী পথ প্রস্তুত বা পবিকার করে । শ্রীমদ্ভা-
গবদগীতার শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনকে নিগূঢ়
যোগ-তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন ; কালাচাঁদ-
গীতায় তিনি পঞ্চপ্রেমাসক্ত সখীকে নিগূঢ়
প্রেম-রহস্যের উপদেশ দিয়াছেন ;—সেই
উপদেশ শীতল, সরল সাহসনাপ্রদ, কাম-গন্ধ-
বিরহিত ; অথচ কামুক অপেক্ষা অধিকতর
উদ্দীপ্ত আবেগ অনুরাগবৃদ্ধ, পারমার্থিক
প্রেম-সাধনা ; তাহা বৈক্যব ধর্ম্ম মূলক, উপা-

দেয়, উচ্চ ও অতি মূল্যবান তত্ত্ব। শ্রীমন্ত-গবদগীতার সহিত এই কালাচাঁদ-গীতার কেবল নামকরণে ও উপদেশ কর্তার একত্বে, যে কিছ্ ঈষদ্ সাদৃশ্য; নহিলে শেখোক্ত প্রণমোক্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে পরি কীৰ্ত্তিত। কিন্তু, ইহাও বলা আবশ্যক যে, বাঙ্গালী বাবু-বিরচিত এই গীতা-মহর্ষি বেদ-ব্যাস বিবচিত গীতাব বা সনাতন ও সমুন্নত গীতা-মতের ও গীতা মহিমার অনুমান অতি-ক্রম কবে নাই; তাহার সহিত সামঞ্জস্যে স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া তাহারই ভক্তি-পীতি পারাবারে একটী বিমল বৈষ্ণব তবঙ্গ,— একটী অভিনব প্রেমামুরাগ-উচ্ছ্বাস উখিত করিয়াছে।

কালাচাঁদ গীতার আরাধ্য ঈশ্বর, অগ্রেই একরূপ বলিয়াছি, প্রেমিক চূড়ামণি; বহিঃ-মূর্ত্তি ও অন্তঃস্বরূপে, সুরুমার, সুললিত ও সুমধুর লাবণ্যধার। এবং সর্বোপরি তিনি,— গ্রন্থকারের নিজের কথায়—“রসিকশেখর।” তিনি রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শ-গ্রাহ্য অমিয় শব্দসম্ভার-সমন্বিত শরীরী সন্তা-সৌন্দর্য্য-শেখর-মাধুরীর অতুল নিধি,—কবিতার ও কমনীয়তার অবি-শ্রান্ত উৎস, এক কথায় মনুষ্যের কান্ত প্রবৃ-ত্তির অতীব প্রলোভনীয় পদার্থ; অতীব প্রিয়-দর্শন ও প্রীতিভাজন পুরুষ; যাহাকে দেখিবা মাত্র ও ভাবিবা মাত্র ভালবাসিতেই হইবে; নিপট কঠিন প্রাণীও ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না। পুনঃ এ ঈশ্বর প্রতি মুহূ-র্ত্তের অতি প্রত্যক্ষ, পারিবারিক ঈশ্বর, সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বন্ধু, প্রাণেশ্বর, পতি, জীবনবল্লভ, হৃদয়ের রমণীয় নিধি—বুক জুড়াইবার বিনোদ বস্তু। এ ঈশ্বর, ঈশ্ব-রাবতার অপেক্ষাও একমাত্র অতিরিক্ত মনুষ্য।

পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা তোমাবে ভূঞ্জিব।
তবে দয়াময় তোমাবে বলিব ॥
বদন হেরিব বচন শুনিব।
অঙ্গ-প্রাণ স্পর্শ আশ্বাদন লব ॥

পুনশ্চ

পিরীতি কবির কেমনে তোমায়।
যদি তুমি তাব না “কব” দয়ায়।
মানুষের মঙ্গল পিরীতি কবিতৈ।
মানুষ তোমাব হইবে হৃৎতে ॥
* * *
কপে গুণে প্রাণ কাড়িয়া লইয়া।
শীতল চরণে লও আকণ্ঠিয়া ॥
তবেত কান্দিব চরণে পড়িয়ে।
যেন নারী কান্দে পতি মুখ চেয়ে ॥
চরণ ধোয়াব আঁখি-বারি দিয়া।
প্রাণ জুড়াইব চরণ সেবিয়া ॥

ইহা ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠী, সন্দেহ নাই, এবং ইহা ভগবৎসেবাব সহজ সাধনও হইতে পাবে। কিন্তু, আমার শঙ্কা হয়, ইহা ঐশী স্বরূপের কিঞ্চিদ্ধবিক “মানবীকরণ” বলিয়া প্রতীত হইবে। তবে, অল্পাধিক পরিমাণে মানবীকরণ ব্যতীত মনুষ্যের বিশেষতঃ সাধারণ মনুষ্যের উপাত্ত ঈশ্বর এক রূপ অসম্ভব, ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না। মূর্ত্তির মানবীকরণ বা গুণের মানবীকরণ, যে দিক দিয়াই হউক, মানবীকরণ আছেই সাকার উপাসকেব জ্ঞায়, নিরাকার উপা-সকেরও আছে। তাহা যাউক। এ সম্বন্ধে, গ্রন্থকারের যুক্তি ও বিশ্বাস এইরূপ যে, ভগ-বানে মনুষ্য স্বরূপ এবং মনুষ্যাতীত স্বরূপ সমস্তই বিদ্যমান। কিন্তু মনুষ্য কেবল সেই সকল ঐশী স্বরূপের অনুসরণ ও উপা-সনা করিতে পারে, যাহা মনুষ্যের নিজ মনু-ষ্যত্বে বিদ্যমান। পরন্তু, তাহার অধিক, অতিরিক্ত ও অতীত যাহা, তাহা আদৌ মনুষ্য জ্ঞানের অনায়ত্ত। যাহা হউক, এই

বহু বিতর্কিত বিষয়ে পুনঃ তর্কে প্রবেশ করার আমার প্রয়োজন নাই। অতঃপর গ্রন্থের উপাখ্যান ও উপকরণাদির অনুসরণ করা যাইতেছে।

ভগবানের সৌন্দর্য্যানুরক্তি ও রস কো-তুক-প্রিয়তার স্মৃতিস্মারভূতি হইতে এই গ্রন্থের উৎপত্তি; পরন্তু উহার অভিব্যক্তি ও উপসংহারও ঐ দুই মধুর উপকরণে। নিভৃত গিরি-শেখরে নীল বর্ণ-রঞ্জিত এক অরণ্য-কুসুম ফুটিয়াছে। সদ্য প্রস্ফুটিত অদৃষ্টপূর্ব্ব অরণ্য-কুসুম অকস্মাৎ গ্রন্থকারের নয়নপথে পতিত; কুসুমের নীলিমা-লাবণ্যে; তাহার সুরতি-সম্পদে, তাহার কমলীয় কাস্তির চিত্র-চাতুর্য্যে গ্রন্থকার সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ। এ সৌন্দর্য্যের, এ সুসমার—এ সুললিত নীলিমার নিশ্চিন্তা কে? এই বিচিত্র চিত্র বৈচিত্র্যের বিধাতৃ কে? কে এই হৃগম স্থানে—এই সুকঠিন গিরি-শরীরে এত সূন্দর এমন কান্ত, এই অমূল্য কুসুম রত্ন, এমন বিমল বর্ণ-বৈভবে বিভাসিত করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন! বর্ণরাগ জীবন্ত, তুলিকা-রেখা অত্যন্ত সজীব! এ অতুল ফুল যে এখনি কে আঁকিয়া অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন! তিনি কে? তিনি কেমন? আ! তিনি যিনিই হউন, বড়ই সুনিপুণ শিল্পী—বড়ই সৌন্দর্য্যানুরাগী চিত্রকর, বড়ই রসিক কবি, আর মধুর কারিকর!

আপনি আঁকিয়া দেখিচ্ছে বসিয়া
নয়নে বহিছে ধারা।

* * *
ফুলিতে সুগন্ধ যতনে মাখিয়া
ফুলেতে দিতেছে ছিটে।

* * *
মনে হয় যেন ফুলে রঙ দিয়া
এই মাত্র পলায়েছে।

এইভাবে—সৃষ্টি-কার্য্য দেখিয়া স্রষ্টাকে

অনুভব ও অনুসন্ধানের “আইডিয়া” অভিনব নয়; প্রত্যুত উহা মনুষ্য-স্বভাব-বৎ বা হিমালয় পর্ব্বতবৎ পুরাতন; দৈখ্যের অস্তিত্ব সমর্থনার্থে উহা একটি প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু, উপস্থিত স্থলে ইহা অভিনব ভাবে ও সবিশেষ ব্যক্তিগত ভাবে অত্যন্তানুভূত। এবং সেই ঐকান্তিক ও আন্তরিক অনুভূতিই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থের উৎপত্তির সর্ব্ব প্রধান উপলক্ষ; এই জন্ত উহার উল্লেখ। জড়-বিজ্ঞানাধ্যায়ী ব্যক্তি গিরি-পরে নীল বর্ণের নূতন কুসুম দেখিয়া, তাহার জাতি জাতি নির্ণয় বা নির্কাচন-কল্পে যাহাই করুন, তদ্বারা কবি মাত্রেরি অল্পাধিক পরিমাণে বিমোহিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ একজন ভগবদ্ভক্ত ভাবুক যে তাহাতে ভগবৎ-সৌন্দর্য্য প্রীতি স্মৃতিস্মারভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, ইহা স্বাভাবিক। পরন্তু, এই গ্রন্থের আর একটি উপলক্ষ ঘটয়াছিল; সেটীও সহৃদয় প্রকাশক বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। সেটী গ্রন্থকার কর্তৃক ভগবানের কোতুক-প্রিয়তার অনুভূতি। যে ঘটনা হইতে উহা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ ঘটনা, একটা অকিঞ্চিৎকর তামাসা। কিন্তু, দেখিতেছি, যাহা অতি তুচ্ছ, যাহা কেবল হান্তাস্পদ তামাসা মধ্যে পরিগণিত, তাহারও মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত থাকে। পেচক জাতি অন্ধকার-প্রিয় ও অত্যন্ত গভীর প্রকৃতি বশিয়া প্রসিদ্ধ। জগতের যাতনাবাদী ও যাতনাবাদ-বিজ্ঞাপক ইংরাজী “পেসিমিষ্ট” (Pessimist) ও “পেসিমিজম” (Pessimism) প্রভৃতি শব্দ, হয়ত পেচক-প্রকৃতির গাভীর্ঘ্যাকার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পেচক অন্ধকার-

প্রবণ, প্রবীণ ও গভীর। কিন্তু, পেচক-পেচকীর পারিবারিক কলহে অতি গভীর-রেরও গাভীর্ষ্য নষ্ট হয়, পাঠক অবশ্য জানেন। পেচক-দম্পতীর কলহ, প্রেমের কি অপ্রেমের পরীক্ষা করার অবসর পাই নাই; কিন্তু, তাহা দেখিলে, বেদীস্থ আচার্য্য, যজ্ঞাহুতি-হুত-হোতা এবং এজলাসস্থ হাকিম, তিনেব কেহই হান্ত-সম্বরণ করিতে সমর্থ হন না, ইহা বলিতে পারি। একদিন আমাদের এই গীতাকারও ঐ দর্শনার দৃশ্য দেখিয়া হান্ত-ত্রহিল্লোলে হুত-গাভীর্ষ্য হইয়াছিলেন। পক্ষী-তত্ত্বাধ্যায়ী দারবিন-দোহির এই পেচক ব্যাপারে বিবর্তবাদের বে স্তরই আবিষ্কার করুন, আমাদের গ্রন্থকাব উহাতে স্রষ্টিকর্ত্তাব কোতুকপ্রিয়তা আবাদ কবিয়াছিলেন।

উপরোক্ত দুই ঘটনার, শিশির বাবুর মনোব উপর মোটের উপর ফল হইয়াছিল এই যে, তিনি হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায়, বুঝিয়াছিলেন ও বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে পরমেশ্বর পবন সুন্দর ও সৌন্দর্য্য-প্রিয় পবন রসিক ও হান্ত কোতুক প্রবণ। নির্ভয়ে তাঁহার নিকট যাওয়া যাইতে পারে; তজ্জন্ত সর্বিশেষ জ্ঞান গাভীর্ষ্যের ও উৎকট সন্ন্যাস-সাধনার প্রয়োজন হয় না। আন্তরিক প্রীতি লইয়া সরল প্রাণে একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহাকে ধরা যাইতে পারে।

ইহা অতি সরল বিশ্বাস, সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস মাত্রই সরল,—অস্তুত: সরল হওয়া উচিত ও আবশ্যিক, আমার বোধ হয়। যাহা হউক, ঐ বিশ্বাসের উপরেই প্রধানত: এই গ্রন্থের আপাদ-মস্তক গ্রন্থিত। এবং ঐ বিশ্বাস ভিত্তিভূমি করিয়া ও প্রত্যক্ষ অক্ষপাতের ঘটনাবলীকে সাক্ষ্য মাত্র করিয়া, স্রষ্টিকর্ত্তব্য, সংসার-তত্ত্ব, পরলোক-তত্ত্ব ও সাধন-তত্ত্ব প্রভৃতি এই গ্রন্থে আলো-

চিত হইয়াছে। আলোচনা এত সাদা কথায় ও সরল গাথায় করা হইয়াছে যে, তাহা সর্ববতবৎ সুখ-সেবা ও শীতল।

ইদানীং আনন্দেব সহযোগী সাহিত্যে আখ্যান-কাব্যের অত্যন্তাভাব এবং খণ্ড কাব্যের ঘটি প্রাচুর্ভাব। শিশির বাবুর এই গ্রন্থ গীতি কবিতাকাব্যে নিখিত আখ্যান-কাব্য। কালাচান্দ-গীতা একটি সুসংবদ্ধ স্বপ্ন-উপাখ্যান। উপাখ্যানে কল্পনা নৈপুণ্য-কবিত্ব-সৌন্দর্য্য ও সংগঠন কোশল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

উপাখ্যানের আবস্ত কোমল, করুণ,—হৃদয়স্পর্শী। এক তরুণ যুবক গৃহ সংসার ত্যাগ কবিয়া গহন-অবণ্যে তপস্যা নিবৃত্ত। প্রণয়িনী পত্নী, নবজাত পুত্র,—যুবকের সংসার বড় সুখে-রই সংসার ছিল। তথাচ তাহার মেহ-বন্ধন ছেদন করিয়া যুবক অবণ্যবাদী, অনসন্নাদি দ্বারা অতি কৃচ্ছ-সাধ্য তপ-ব্রতে ব্রতী। পতি-প্রাণা পত্নী পতির অশেষণে অরণ্যে উপস্থিত; যোগাসনোপবিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামীব নিকটে শিশু ক্রোড়ে কবিয়া দণ্ডায়মানা, গ্রন্থের আবস্তেই এই করুণ দৃশ্য পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত। লিপি-চিত্রের সাহায্যার্থে এই দৃশ্যের একটি তুলিকালেখ্য ও পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। উভয় চিত্রই সুন্দর কুটিয়াছে।

যুবতী পত্নী, যুবক পতিকে, গৃহে লইয়া যাইবার জন্ত—পুনঃ গৃহবাসী করিবার জন্ত-প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন; যুবক তাহাতে সম্পূর্ণ অসম্মত;—

“গৃহে যাহ তুমি আমি না যাইব”

পত্নী শিশু সন্তানটিকে স্বামী-সম্মুখে ধরিয়া প্রীতি ভরে আদরে ও কাতরে বলিতেছেন;—

“এই দেখ শিশু আমিরাছি কোলে

“চাহিছে তোমাতে জন্ম কিবা বলে।”

মাতৃ ফ্রেড্‌স্‌ এক বৎসর বয়স্ক বালক তখন অমিয়পূর্ণ আঁধারে “বাবা” বলিয়া ডাকিয়া স্বর্গীয় স্নেহা বিন্দুবৎ স্নমধুর শৈশব হাসিটা ফুটাইল। মায়ার এ মোহন আকর্ষণের বল ঐন্দ্রজালিক। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর শুদ্ধ হৃদয় তখন স্নেহ-দ্রবীভূত। সন্ন্যাসী চমকিত হইয়া চিত্রপুত্তলীবাৎ হস্ত প্রসারণ করিলেন, অজ্ঞাত আগ্রহে পুত্র কোড়ে লইয়া বার বাব তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ ভাব অধিকক্ষণ রহিল না, অবিলম্বেই আত্মত্ব হইয়া যুবক যুবতীকে বলিলেন “কেন তুমি এ নায়াজাল বিস্তার করিয়া আমার সর্বনাশ কবিতো আসিয়াছ, আমি যদি কখনও তোমার কিছু প্রিয়কাৰ্য্য করিয়া থাকি, তুমি আজ তাহা স্মরণ করিয়া এ নিষ্ঠুরতা হইতে নিবৃত্ত হও।”

এ চিত্রে স্বামী স্ত্রীর করুণ কথোপকথন স্ত্রীর স্বামী সেবা ও তব্বারী প্রীতি তত্ত্বের আভাস উপাদেয়। বর্ণনা অত্যন্ত সরল, শিল্প-কৌশলের লেশ মাত্র নাই। কেবল স্বভাবিকতার সৌন্দর্য্যেই ইহা সুন্দর।

পতিপ্রাণা পত্নী পতি-হৃদয়ের গতি অনুভবে সমর্থ হইয়া, প্রকৃত প্রেমের—প্রেমের পরাকাষ্ঠারই পরিচয় দিলেন, পতির ধর্ম্মাহুষ্ঠানে প্রতিবন্ধক হইলেন না। পতির আদেশানুসারে গৃহে প্রত্যাগমনে প্রস্তুত হইলেন।

“হেন কালে শিশু “বাবা বাবা” বলে।

ঢাকিল শিশুর বদন অঞ্চলে।”

“চুম্বকর বাপ বিরক্ত ক’রনা।

“ধ্যান-ভঙ্গ হবে ও বলে ডেক না।

গলায় বসন প্রণাম করিল।

শিশু কোলে করি আশ্রমে আইল।”

সন্ন্যাসী ধ্যান নিমগ্ন—যুগপৎ স্বপ্ন-নিমগ্ন;
স্বপ্ন সরস, স্নমধুর, স্নদীর্ঘ। এই স্বপ্ন কাহিনী

কবির স্বকপোল-কল্পিত, ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বোপদেশের সহিত কাব্যরস ও কাব্যানন্দ আছে। ইহাকে বৈষ্ণব সাধন প্রণালীর একটি রূপক বলিলেও বলা যাইতে পারে; কিন্তু দৃষ্টতঃ ইহাকে রূপক বলিয়া বোধ হইবে না, এবং রূপক স্বরূপ ব্যাখ্যা না করিলেও চলে। সুদূর জ্ঞাতিত্বে এ উপাখ্যান কিয়ৎ পরিমাণে “পিলগ্রিমস প্রগ্রেস” ও ঈশ্বরাত্মায় “প্রবোধ-চক্রোদয়ের” শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।

মাধু স্বপ্ন দেখিলেন “পঞ্চসখী সভা।”
সখা সভার সংগঠন এই রূপ;—

“ভূগন মোহিনী রূপরস গণি

শৈশব যৌবন মেলা।

মাধবী তলাষ কুসুম শযায়

অচেতন নববালা।

বসিয়া নিকটে করিছে বীজন

কপবতী একজন।

বালায় বদনে তবঙ্গ খেলিছে

করিছে তা নিরীক্ষণ।

আব তিন নাবী ক্রমে তথি এল

কোথা হতে নাহি জানি।

দেখিছে চাহিয়া বসি চারিভিতে

মুখে কাক নাহি বাণী।

রমণীক মেলা দৈবে মিলিয়াছে

কেহ কায়ে নাহি চিনে।

অচেতন বালা দেখে সবে চাহি

সেবা করে এক মনে।”

স্ব স্ব প্রাণেশ্বরের বিচ্ছেদে, পরস্পরে অপরিচিতা পঞ্চ সখী পাঁচ দিক্ হইতে এক স্থানে আসিয়া, ঘটনাক্রমে মিলিত হইয়াছেন। এবং একে একে আপন আপন জীবন কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। উপাখ্যানের এ গঠনটুকু কিয়ৎ পরিমাণে পারস্য “চাহার দরবেসের” মত বলা যাইতে পারে।

এই “পঞ্চসখী” বৈষ্ণব সাধন প্রণালীর

রস পঙ্কের সাধিকা। প্রথমাসখী,—“রস-
রঙ্গিনী” দ্বিতীয়া,—“কাদ্রালিনী” তৃতীয়া,—
“কুলকামিনী” চতুর্থী,—“প্রেম-তরঙ্গিনী”
পঞ্চমা—“সজ্জল নয়না”। ইহাদের স্ব স্ব
জীবন কাহিনীর বিবৃতি তাঁহাদের সাধন
প্রণালীরই প্রতিকৃতি। “সাধন প্রণালী”
জুনিয়াই কেহ শঙ্কায় শিহরিবেন না। এই
সাধন প্রণালীর প্রতিকৃতিতে কল্পনার এমনি
স্বকুমার ক্রীড়া ও কাব্য রসের এমনি মধুব
তরঙ্গ যে, উহা নবজ্ঞাসের মত চিত্তাকর্ষণে
সমর্থ। শিশির বাবু যে কল্প রসিক লোক,
তাহা এ গ্রন্থ পাঠে ও বিলক্ষণ বুঝা যায়। তা,
এত গুলি, বড় কম নয় পাঁচ পাঁচটি যুবতী,
রূপ রসবতী নায়িকার মন্যস্থলে যখন আরও
একটি অনুপমা মহানায়িকা কেল্লীভূতা,
আর যখন সর্ববিধ নায়কের অবিনায়ক স্বয়ং
শ্রীকৃষ্ণ ইহার মহানায়ক, তখন তুচ্ছ নব-
ন্যাসের তরল রসের সহিত ইহার প্রগাঢ়
নিম্মল রসের তুলনা করাও তত সম্ভব নহে।

আমি, সখী সভার কথা কহিতেছিলাম।
সখীদের মধ্যে “সুস্নিগ্ধ” চোখ চাওয়াচাছি
হইয়া ক্রমে সখ্যভাব উপস্থিত হইল। অচে-
তন বালা” চেতন হইলে—

“পুছে এক সাধি”

“কেন অচেতন

কিবা নাম কোথা ঘব।

কাহার হৃদয়

শীতল করহ

কোথা তব প্রাণেশ্বর?

এ ঘোর বিপিনে

আইলে কেমনে

কেন হলে অচেতন

যদন কমল

প্রফুল্ল নেহারি

পেয়েছ কি প্রাণধন?”

কিন্তু, এ সখীটি সাতিশয় লজ্জা-শীলা।
ইনি প্রেমতরঙ্গিনী, প্রেমাবেশে ও হৃদয়ো-
জ্ঞানসে অহরহই অরস। অতএব তজ্জন্যই
বোঝা যায়, এত বড় প্রেম-তর-প্রসঙ্গ কেন

প্রীতিকর উত্তর দিয়া উঠিতে পারিলেন না,
দিতে সাহসীই হইলেন না। প্রশ্নের উত্তরে
“ধীরে ধীরে” পুনঃ প্রশ্ন করিলেন।

“তোবা কেগো ধনি ভুবন মোহিনী

পবিচয় দে গো মোরে।”

বড়ই মুদ্রিল উপস্থিত হইল। কে
আগে আপন কাহিনী কহিবে! সকলেই
ত প্রায় সমাবস্থাপন্ন। রসবঙ্গিনী সর্বপ্রাণে
আপন কথা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে
বুঝা যাইতেছে যে, তিনি কিঞ্চিৎ অবিক
শক্তিশালিনী বটে।

রসবঙ্গিনী সৌন্দর্য্যভিলাষিনী, রূপ-বিমুগ্ধা
শান্তরস; ফুলটী ফুটিয়া, পাপড়ীটি উঠিয়া,
বঙটী হাসিয়া তাহার চিত্র মন আকর্ষণ করে;
সর্বত্রই প্রকৃতির প্রফুল্ল প্রশান্ত সৌন্দর্য্য
তিনি মোহিত হন এবং সে সৌন্দর্য্যের শিল্প-
করকে খুঁজেন। খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন
সেই শিল্পকে সহজেই পুষ্পবাটিকায় উপবিষ্ট
ধৃত করিলেন এবং শিল্পীসহিত শোভামুগ্ধার
এক সুস্নিগ্ধ শান্ত সখ্যক সংস্থাপিত হইল।
তাৎপর্য্য—শান্তরস জড় জগতের শাস্তি সৌ-
ন্দর্য্যে প্রথমতঃ আকৃষ্ট হইয়া শেষে জগত-
পতির সহিত ঘনিষ্ঠ সখ্যক সংবদ্ধ হয়। রঙ্গি-
নীর কাহিনীতে সুখশোক, যোগ-বিয়োগ,
ইহকাল, পরকাল, কামনা ও সাধনা প্রভৃতি
মানব জীবনের ও মানবধর্ম্মের বহুজটিল সম-
স্রায় সামঞ্জস্যের চেষ্টা আছে, তাহা শিক্ষা-
সাস্ত্রনা-প্রদ। কিন্তু তাহার কিছুই এস্থলে
স্পর্শ করিবার স্থান ও সময় আমার নাই।

সৌন্দর্য্য-শোভাময় বিপিনে রসবঙ্গিনীর
নিকট “রসিক-শেখর” আসেন, আলাপ
করেন, উপদেশ দেন; আর রঙ্গিনী তথায়
থাকিয়া,—

“প্রতি পদে দেখি

ভার করিগিরি।

স্বখেতে বিভোর

স্বরে সুরে সরি।”

দ্বিতীয়া : সখী ;—কান্সালিনী, দাস্ত রসের
সাধিকা,

“তোর যোগ্য হব তাঁর কাছে রব
বসিব পালঙ্ক তলে ।

চট্টা রাজ্য পদ জনয়ে ধবিষা
দুঃপ্ৰভাব দিব কেলে ॥”

কিন্তু, কান্সালিনী আপনাব কুরুপের জ্ঞাত
কুণ্ঠিতা । এ কুরুপের অর্থ,—জদয় মনের
মলিনতা ।

“সুবেশ করিতে আননী আ গতে
বসিল গোরব করি ।

আবনী চাহিতে ৮ষ হল চিতে
আপন বদন হেবি ॥

এত কুরুপিনী কত নাহি জান
জদয় শুকায়ে গেল ।

অথবা দপণ মলিন হয়েছে
তাঁহে মুখ হেন হল ॥”

না, দর্পণ মলিন হয় নাই । কান্সালিনী যতই
যত্নে দর্পণ মাজ্জিত কবেন, কুরুপ ততই
অবিকতর কদম্ব হইয়া উঠে ! বণ বসন্তাদি
আহা কতই ক্ষত । খড়্গরিপুং সংগ্রহ ক্ষত চিহ্ন
অঙ্গে, বদনে বিভাসিত । একপ কুরুপ লইয়া
কিরূপে কান্সালিনী সেই পরম সুন্দরের
নিকট ঘাইবেন ! কান্সালিনী কত বত নিয়ম
উপবাস কঠোরতা কবিলেন ; কিন্তু কিছুতেই
মনের মালিগুরুপ কুংসিং মূর্ত্তি ঘুচিল না ।

“হসুদ মাখিয়া রোদ বসে রই ।

তাঁহাতে বরণ আর মন্দ হব ।

বেশম মাখিয়া পুণ্ড্রম হব ।

মলিন বরণ কিছুতে না যায় ॥

বাঁকা অঙ্গ ধুই কবি কোব করি ।

পূর্ণ মত হয় গেই দেই ছাড়ি ॥”

তাহার পর ভক্তি-রূপিনী যমুনার নির্মল
জলে নিয়মিত অঙ্গ মার্জনা করিয়া কুরুপা
কান্সালিনী সুরূপা সুন্দরী হইলেন । তখন
‘সুন্দর’ স্বরং তাঁহার নিকট উপস্থিত হই-
লেন । সুন্দরী দেবার নিরত ।

“কুল শয্যা যতনে বিছাই ।

নিজা যান হুখে হরি, পদ সেবি মুখ হেরি,
হুখে রাগি অবশে ঘুমাই ।

পাঁছ সিংহাসনে বসে রাজ্য পা মুছাই কেশে,
সেই থুলা অঙ্গের চন্দন ॥”

শাস্ত-জ্ঞানী ভক্তির বড় পক্ষপাতী
নহেন । অতএব কান্সালিনীর এই স্বামী
দেবা কাহিনী রস-রঙ্গিনীর কাণে কিছু কঠিন
বাজিল । সৌন্দর্য্য-সোহাগ-বিলাসিনী রস-
রঙ্গিনী, বোধ হয়, এক মাত্রা এখনকার
স্বাধীনতা সম্বাদিকারবাদিনী New woman,
অতএব কান্সালিনীর দাক্ষণ দাসীত্বের সংবাদে
তিনি শিহরিয়া বলিলেন,—“ছিছি সে
কেমন লো ! তোর কথা শুনে যে হেসে
মরি ! এক দিকে এমনতর “ঠাকুরালী”
আর এক দিকে এমনতর দাসীত্বের কথা
শুনে যে বাঁচিলে ! ছিছি কপালখানা !
কর্ভুর প্রিয় আর দাসীত্ব দাতা

“এমন গুরু মুখেতে আঙুন
যাবে এত কর ভয় ॥”

“তা, ভাই, কি করে তুই তোর হাবুটার
এতটা হাকিমি-গিরি হজম করিস একবার
বল না ? উত্তরে কান্সালিনী কহিতেছেন—

“ও তার বুক হতে শীতরণ মধু ।

সেত বুক দিয়াছিল, আমি পদ মাগি নিছ,

তাঁহাতে ছুঁখিত আমাব বঁধু ॥

ও তাব পদতলে করি আমি বাস ।

বুকে যদি সখি বাই, পড়ি পড়ি হয় ভয়,

চরণে নাহিক সেই ত্রাস ॥

ও তার হিয়া মাঝে প্রেমগুণ জলে ।

মোর বুক প্রেম নাই বজুর প্রেমে দুঃখ পাই

তাই যাই শিক্ত, পদতলে ॥”

পুনশ্চ, কান্সালিনী কহিতেছেন ;—

কেশে পদ মুছাইতে বাই ।

পাঁছ মোর ধরে হাতে আমি বলি এই কেশ

কিবা অপরাধী তুয়া পার ॥

একবার মুছায় দেখে সখি ।

তুমি ত মুছাও নি সখি, আমি মুছাইয়া থাকি
দেখ দেখি কেবা বড় স্বখী।”

উপসংহারে

“সবে যেতে চায় তার বৃকে।

আমি যদি বৃকে যাই পদ সেবা নাহি হয়,
পদ সেবা ভার দিব কাকেরে।”

বিরহ ব্যতীত প্রেমে তরঙ্গ উঠে না ;
প্রেম প্রথর, প্রগাঢ় ও পবিত্র হয় না।
পরন্তু, প্রেম ব্যতীত পরমেশ্বরের সহিত
সহবাস সুখও কখন সুখদ নয়। বৈষ্ণব ধর্ম-
মতানুসারে দাসত্বপ্রাপ্তি ভক্তের নিকট ভগ-
বান নিয়ত উপস্থিত থাকেন। কিন্তু, বিরহ-
অবিচ্ছিন্ন মধুর প্রেমের অভাবে, সে উপ-
স্থিতির উপভোগ্যতাও ক্রমে কমিয়া যায়।
প্রেমের মধুর রস-বিহীন দাস্য রস মাত্র উপ-
জীব্য ভক্তের নিকট ভগবান ক্রমশঃ অল্প
ভোগ্য inertia হইতে পারেন। এই কাঙ্গালি-
নীর ভাগ্যে তাহাই শেষে ঘটয়াছিল। তৎকালে
তিনি প্রেমের পরিবর্তনার্থে বিরহ-বর লইতে
বাধ্য হইয়াছিলেন অর্থাৎ বিধাতা কাঙ্গালি-
নীর কল্যাণার্থেই সেই বরের ব্যবস্থা করিয়া-
ছিলেন। তাই এখন কাঙ্গালিনী—

“বৃকে যারে আমি রাখি কোথা পলাইল সখি
খুঁজি বেড়াই বিপিন মাঝারে।”

কিন্তু, ভাবুক ভক্ত কি সাধক ভক্তের
একথা সহজে শুনিবার পাত্র! আর, বিরহ
রস-বিলাসী ভক্তে ভগবানের বিভূতি কি
কখনও কম হইতে পারে! অতএব উপ-
রোক্ত উক্তির উত্তরে—

“বলে বলরাম দাসে স্বাপিয়া রাখিয়া বাসে
কেন কাকি দিতেছ সখীরে।”

তৃতীয়া সখী, কুলকামিনী। ইহার ভক্তি
ও প্রেম সংমিশ্রিত সাধন। কুলকামিনীর
সংগঠনে কবি, কল্পনা নৈপুণ্যের সবিশেষ
প্রয়োগ দিয়াছেন। স্বামী জীর প্রণয়ের

আকারে ভগবানের সহিত সাধকের শটন
শটন সংযোগ, এই কুলকামিনীর কাহিনীতে
অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। কুল-
কামিনী কহিতেছেন—

শৈশবে বিবাহ নাহি চিনি নাথ
কাণে শুনি, নাহি জানি।

যৌবন অল্পবে মনে হ'ল তারে
কিসে পাব অনুমানি।

পতি পবদেশ না জানি উদ্দেশ,
আমি ভাসি নিরাশয়।

ভবণ পোষণ করে কোনজন
কিসে ধর্ম বন্ধা হয়।”

কুলবালা, “খেলায় ধূলায়” কখন এ
কথা ভুলে যান; কখন আবার খেলা ধূলা
ছাড়িয়া বিবলে বসিয়া ভাবেন। লজ্জা-
রূপিনী কুল-কামিনী লজ্জায় পতি-কথা
কাহাকে স্মরণীতেও পারেন না। ক্রমে লজ্জা
পরিহার করিয়া নিকদ্দেশ পতি সংবাদ সক-
লকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নানা জনে নানা
কথা বলিল। কেহ বলিল, মন্ত্রোষধি কর;
ছিটা ফোঁটা তত্ত্ব মন্ত্র হোম যজ্ঞ কর। কেহ
বলিল, হরিনাম জপ কর। কুলকামিনী সবই
করিলেন কিছুতে কিছু হইল না। পতি
আসিলেন না। সংবাদও আসিল না।

“পুনঃ ভাবি পতি নহে সর্প জাতি
মন্ত্রে বশ হবে কেনে?”

আর কেবল নাম জপ করিয়াই বা কি
হইবে! তাহাতে কেবল কণ্ঠ শুকাইয়া
যায়; নির্দিষ্ট সংখ্যার কত বাকী আছে,
তাহারই দিকে মন ধায়। পরন্তু, সংসারে
চিন্তাস্তরে মগ্ন থাকিয়া

“তার নাম লই আন কথা কই;

সতীথে কলঙ্ক হয়।”

তারপর কুলকামিনী আর কিছু না করে
কেবল পতি চিন্তা আরম্ভ করিলেন। পতির

উদ্দেশ্যে প্রেমের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । “তুমি কেমন, তুমি কোথায় আছ, তুমি আছ কি হয় তুমি নাই” ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন । কিন্তু,

“না পাই উদয় তবু স্মৃতি ভোর
পতি চিত্তা বড় মধু ।”

এক এক দিন “সুবোধ করিয়া, সিদ্ধব পরিয়া,” পথে যাইয়া বসিয়া থাকেন ; যদি পতি আসেন । পতি আসেন না , অভাগিনী কাঁদিয়া প্রত্যাগমন করেন । তারপর এক দিন

“অঁচল পাতিয়া ভ্রামতে শুইয়া
কান্দি আমি শূন্য যবে ।”

এমন সময়ে, পতি-মিলনের আশ্রয় মুহূর্ত্তের ভিত্তি, অপ্রাপ্ত ভগবানের সহিত মগ্ন হইল । সে অপ্রাপ্ত “যবে সত্য ভাবি আনন্দ উথলে , মিথ্যাভাবি যদি ভাসি অঁখি ভলে ।” তারপর

‘কবিতা শ্রবণ বিচিত্র বসন
সিন্দূরব-কোটা দিয়া ।

বিবিধ গহনা মুবতার মালা,
দিল মোরে পাঠাইয়া ॥

কলম কাগজ পড়িবার পুঁথি
পাঠা য.ছ সেই মনে ।

লিখিতে পড়িতে হইবে আমার
ভাবিলাম মান মনে ।”

তাহার পর কুলকামিনীর কুলিন স্বামীর নিকট হইতে এক পত্র আসিল । কিন্তু সন্দেহ ঘুচে না । ইহা কাহার প্রেবিত বস্ত্রালঙ্কার, কাহার প্রেবিত পত্র, কেহ ত প্রবন্ধনা করে নাই ? স্বামীর পত্র থানিতে লিখিত:—

“যাইতে না পারি এত কথ ছত্র ।

পাঠানু তোমারে উপদেশ পত্র ॥

চাহ অলঙ্কার পাঠাব তোমারে ।

যদি চাহ মোরে যাইব সত্বরে ॥

তেমন হইব যেমন হইবে ।

যে রূপ বাঞ্ছা সে রূপে পাইবে ।”

সুতরাং শরীর মন স্থান্য করিতে লাগি-

লেন । কিন্তু, কুল কামিনীর সেই প্রবাসী স্বামীর রূপখানি কেমন ? কখন ত তিনি তাঁকে দেখেন নাই । আর কেমনতর রূপ লাভণ্যই বা কুলকামিনী কামনা করেন ? কাজেই দিবানিশি তাঁহার ছবি “মুছি আর আঁকি, আঁকি আর মুছি” এইরূপ চলিতে লাগিল ।

“যেন সেই ছবি জীবন পাইয়া
সপ্রেম নয়নে চায় ।”

প্রিয়তমের আগমন-আশায় কত কত বাব উদ্যোগ হইল । কত বিলাস-বস্ত্র, কত বাসব সজ্জা হায় বৃথা হইল ! কত ভাল ভাল গাঁথা মালা শুকাইয়া গেল । তাহার পরে,— বর্হাদিনেব বিবহ ব্যাখার পবে সেই কটিন-হৃদয় আব আমি বিবেচনা কবি, বহুপল্লীক ও বটে,— কুলিনী আসিলেন,— বিদেশীর বেশে । কিন্তু, কামিনী কখনও স্বামী দেখেন নাই । বড়ই বিভ্রাট উপস্থিত হইল । বিদেশী বলিলেন “আমি তোমার স্বামী নই । তাঁহার প্রেপিত পরিচারক ; তোমার রক্ষণাবেক্ষণ ও আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি । বল, কি করিতে হইবে ?” এ আরও যে বিপদ ! কামিনী কি করিবেন ! বিদেশী পরপুরুষের পানে তাকান না ; তাঁহার পরিচালনায় চলেন না । কিন্তু, বিদেশী ব্যক্তি সর্বদাই ছায়াবৎ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেন, কামিনীর কাণের কাছে ঘুন ঘুন করেন হায় ! কুলবালার এ কি জালা ! বিদেশী ব্যক্তিটী স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবার জন্ত কত স্থানে—কত দেব দেবীর নিকট কামিনীকে লইয়া গেলেন । কিন্তু, কাহাকেই কামিনীর প্রাণ চাহিল না ; কাহাকেই তিনি প্রাণনাথ স্বামী রূপে গ্রহণ করিলেন না । অতঃপর প্রকৃত প্রাণেশ্বরের সহিত সন্ধিলন হইল।

তখন অতীতের জন্ত কামিনীর আক্ষেপ
উপস্থিত হইল ;—

“আছে কিনা আছে সমুদ্র মিছে
রহিব কি হব লয় ।

ইহাই ভাবিয়া তোমা না ভজিয়া
জীবন করিহু ক্ষণ ॥”

উত্তরে কামিনীর কর্তাটী কহিতেছেন ;—

——“বলি প্রিয়া শুন ॥

সন্দেহ কেবল পিরীতি বন্ধন

সন্দেহ জীবের বহুমূল্য ধন

বিরোধ সন্দেহ যদি না বহিত ।

তবে কি সংসার সরস হইত ॥”

চতুর্থী সখী প্রেম-তরঙ্গিনী, কেবল মাত্র
অবিমিশ্র প্রেম দ্বারা পরমেশ্বরের পরিচা-
রিকা। ইনিই “মাধবীতলায়” অচেতন
অবস্থায় ছিলেন। পরন্তু, পঞ্চমা—সজল-
নয়না প্রাণেশ্বর ত্রীকৃষ্ণকে সম্যকপে সংপ্রাপ্তা
রমণী। ইহারও স্ব স্ব সমুন্নত সাধন কাহিনী
বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু, কর্কশ হস্তে,
আমি তাহার বিমল সৌন্দর্য্য-বিভূতি বিলো-
ড়িত করিব না। রুচি হয়, পাঠক নিজেই
তাহার অনুসন্ধান করিবেন।

পরন্তু, পঞ্চ-সখী-সভায় সম্মানীয় উপ-
স্থিতি। এই চিত্রে শিশির বাবু পরিহাস
রসিকতার সহিত পরমার্থ তত্ত্বের পরিপাটী
মিশ্রণ করিয়াছেন। সাধুর সহিত সখীদের
কৃষ্ণ কথার একটু আলোচনা হইতেছে।
সাধু বলিতেছেন ;—

“উপবাস করি, শরীর শুকাও,
তবে কৃষ্ণ-কৃপা পাবে।

কৃষ্ণের করুণা, জন্মে বাড়ি যাবে,
যত দেহ শীর্ণ হবে ॥”

সাধু-মুখে এ সংবাদ শুনিয়া সুলক্ষ্মীরা ত
অবাক, বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন।

“মোরা দুঃখ পাব, কৃষ্ণ সখী হবে,
এত কষ্ট হতে পারে।

দুঃখের কাহিনী, শুনিতেই তিনি,
কাদি হন আশ্রহার।

দুঃখ মোবা নিব, তারে কাদাইব,
এতজন কেমন ধাবা ॥”

সাধু হাসিয়া বলিতেছেন “বাছা সকল !
তোমরা বালিকা, সে বৃহৎ ব্যাপারের কি
বুঝিবে ? তা, ঐ চাঁচর চুলের রাশি রাখলে
ত চোল্বে না,—বার উপর তোমাদের
অত যত্ন—

কেশের মমতা ঘুচাইতে হবে

মুড়াইতে হবে নাথা।

তুলসী তলাতে মন্তক কুটিলে

ভুট হবে কৃষ্ণ পিতা ॥”

সৌন্দর্য্য-সেবী রসরঙ্গিণী, এ কথায়,
সর্কাগ্রেই শিহরিয়া বলিলেন। “না ঠাকুর,
সেটা হতে পারছিল না,—

“কেশ ঘুচাইব, বেণী না বাধিব,
কোথা গুঁজি খোব চাপা।

মালতীর মালা, চিকণ গাখিয়া,
কেমনে বেড়িব খোঁপা ॥

সে ভঙ্গিম বেণী, বসিক শেখর
দেখি যত সুখ পাবে।

তার মন জানি, রসে যত সুখ,
উপবাসে তা না হবে ॥”

কাজালিনী কহিলেন।

“রাস্তাপদ ধুই, নয়নের জলে,
মুছাইয়া থাকি কেশে।

কেশ মুছাইব, বন্ধ পদ ধুয়ে,
বল মুছাইব কিসে ?”

অতপর রস-শক্তি-রূপিনী রাধিকার উৎ-
পত্তি, কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্মিলন, বৃন্দা-
বন লীলা রহস্ত, সাধুর সাধনা-সিক্তি প্রভৃতি
যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব ও নিগূঢ় রস-মাধুর্য্য
এই গ্রন্থে আছে, তাহা আমি স্পর্শ মাত্র
করিলাম না। তাহা কেবল সম্ভোগেরই
বিষয়,—সমালোচনার নহে।

ঐঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ।

জীবন ।

ও কার বিরাট ছায়া
 আবরিল বিশ্বকারা ?
 অসাড় বিশ্বের স্পন্দ শুনা নাহি যায় ;
 মহা নীরবতা ল'য়ে,
 উঠিল সজীব হ'য়ে,
 কালান্তর অন্ধকার নিশীথ ধবায় ।
 কে আছে না আছে ভবে ?
 কে ছিল হেথায় কবে ?
 এ যে শুধু নীরবতা, শুধু অন্ধকার ।
 বিশ্ব যেন বিশ্ব নয়,
 অশান সমাধিময়,
 সচেতনে অচেতন, সবে শব্দাকার ।
 এ মহা-ঘুমের দেশে
 কে এসে ধরিল কেশে
 আগিয়া চাহিয়া ভাবি—এ কি সে ভুবন ?
 এই কি জীবের বাস ?
 জীব অঁধারের দাস ?
 এমনি কি ঘুমাইতে মানব জীবন ?
 আগিয়া ঘুমায় কেহ,
 নড়ে কি না নড়ে দেহ ;
 আগিয়া স্বপন দেখে, জানে না কি করে,
 অলস ঘুমের ঘোরে,
 আছে যেন বেঁচে ম'রে ;
 জীবন কি এরি তরে ? জীব এরি তরে ?

২

খেয়ে ঘুমাইয়ে মরে,
 সে ত পশুতেও করে ;
 পশুতে মানবে তবে প্রভেদ কি নাই ?
 জীবনে জীবন নাই,
 ঘুম ঘোর সর্বদাই ;
 মানব জীবন তাই ? কে বলিবে তাই ?

এমনি নিয়ত কত,
 নদীর প্রবাহ মত,
 জীবন প্রবাহ কত উঠিয়া মিলায় ।
 কেই বা গণনা করে ?
 কে তাদের নাম ধরে ?
 খুঁজে দেখ ইতিহাস, চিহ্ন নাহি তার ?
 এমনি জীবন যার
 কিবা আশা আছে তার,
 কেন সে বাড়ায় মিছে আর ভব-ভার ?
 স'রে যাক, স'রে যাক,
 তার স্থান শূন্য থাক ;
 যোগ্যতর কতজন পশ্চাতে তাহার ।

৩

মানব জীবন যার
 ইচ্ছা-জ্ঞান ভাবে তার
 কেশ হতে নখাবধি পূর্ণ নিরবধি ;
 শত ঝড় বয়ে যাক,
 সম্মুখে পর্কিত থাক,
 পড়ুক সে মরুভূমে, শুকাবে সে নদী ।
 মানব জীবন যার
 চরিত্রে জীবনে তার
 ঘুচে ভব-অন্ধকার মূর্তি প্রাণ পায় ;
 তার মনোভাব যত
 আকারেতে পরিণত ;
 কাল-স্রোতে কীর্তি-সেতু রচিয়া সে যার ।
 সে কীর্তিতে কীর্তিমান
 থাকে চির মূর্তিমান ;
 এ ধরণী গরবিনী তারে বক্ষে লয়ে ;
 তাহারি গুণের কথা
 ইতিহাসে যথা তথা ;
 বংশ পরম্পরা ধন্য তার কথা ক'রে ।

সম্মুখে ঐ তরুণ
 কেন এত মনোহর ?
 কিবা ইতিহাস তার ? কেন সে এমন ?
 ক্ষুদ্র এক বীজ-কণা
 প্রসারি অযুত ফণা
 দিগন্ত ছাইতে চার, পরশে গগন ।
 আলোক উত্থাপ লবে,
 কর্ণে বর্ষণ সরে,
 যুগ-যুগান্তর হতে ধরণী প্রস্তুত ;
 প'ড়ে বীজ ভূমিতলে,
 ফেটে গেল কুতূহলে,
 দেখিতে দেখিতে তার অঙ্কুর প্রসূত ।
 কি এক হুজু'র টানে,
 কে তারে টানিয়া আনে,
 আর কি সে বাধা মানে ? আর স্থির রয় ?
 ছই মুখ উজ্জ্বল নীচে
 ছুটে যায় আগে পিছে,
 এ দেয়, ও পিয়ে রস পরিপুষ্ট হয় ।
 দিন নাই, রাত নাই,
 এক কথা—ছুটে যাই ;
 কেন সে এতই ছুটে আকাশের পানে ?
 সে দিন সে ক্ষুদ্রতম,
 আজ সে অরণ্য গম,
 আজ সে জুড়ায় প্রাণ ফল ছায়া দানে ।
 এমনি এমনি যেন,
 মানব জীবন হেন ;
 আরন্তে সে কত ক্ষুদ্র ? কিবা পরিণাম !
 সেদিন স্মৃতিকা-ঘরে,
 আজ সে মহাসমরে !
 আশা আকাঙ্ক্ষার তার কোথায় বিরাম ?
 সে জীব আসিবে ব'লে,
 রাখিয়া গেলেন চ'লে,
 বস ঘেষে ঘত সাধু জ্ঞানী মহাজন,

জীবন-আলোক কত,
 আলোক-তন্তুর মত,
 চরিত্র উত্থাপ কত, কত সত্য-ধন ।
 সে আলোকে, সে উত্থাপে,
 সে মহাশক্তির চাপে,
 জীব বীজ ফাটে যবে, জীবন সফল ;
 ফাটলে বিজয় তাব,
 দিজহে, বোজহে সার,
 না ফাটলে প'চে যায়, বীজত বিফল ।
 অঙ্কুর উদ্গত যবে,
 আর কি সে ঘুমে রবে ?
 পান করে সত্য রস পায় বিশেষ যত ;
 সেই রসে পুষ্ট হ'য়ে,
 সে সব আদর্শ ল'য়ে,
 অনন্ত উন্নতি তরে আকুল সে কত ।
 যতই বাড়িয়া যায়,
 ততই বাড়িতে চায় ;
 আপনাকে আপনাতে পারে না রাখিতে
 আশ্রয় বিকশিত হ'য়ে,
 জীবন চরিত্র ব'য়ে
 ফুটে সে বাহির হয়, পারে না ঢাকিতে ।
 সে আশ্রয়-ছায়া তলে,
 কত জীব দসে দলে,
 আদিয়া জুড়ায় কত তাপ-তপ্ত মন ।
 এমন জীবন যথা,
 নিশ্চয় নিশ্চয় তথা,
 জীবন প্রসব করে মানব জীবন ।

৬

তবে জীব যুগ-ধোরে
 কি ভাবিছ চূপ করে ?
 জীবন গৌলন্দ্যময়, ভাবিছ কি তাই ?
 মিছে কথা, ভুলে যাও,
 যুগাবে কি ? আগ, চাপ ;
 জীবন কর্তব্যময়, তাকি মনে নাই ?

দায়িত্বের মহাভার
 বুঝিবে কবে বা আর ?
 দেখনি কি কাল-দূত ঘেরে চারি দিক ?
 কি করিতে ভবে এলে ?
 কি বল করিয়া গেলে ?
 হিসাবের ছই দিক হয়েছে কি ঠিক ?
 আপনি ও আপনার,
 বুঝেছিলে, এই সার !
 গাণ্ডী দিয়ে বন্দী হ'লে আপনাবি ঘরে !
 কবিবার কিছু নাই ?
 ঘুমায়ে পড়িছ তাই ?
 মানব জীবন পেলে শুধু এরি তরে ?
 ঘুমাও ঘুমাবে কত.
 শোও শুতে পার যত ;
 তোমারি প্রকৃতি হবে বিদ্রোহী তোমার ;
 সে দিন স্রুদূরে নয়,
 ধীরে অগ্রসব হয় ;
 কিছুতেই তার হাতে নাহিক নিস্তার,
 প্রকৃতির প্রতিশোধ
 কে করিবে প্রতিবোধ ?
 বা তোমার প্রায়শ্চিত্ত, করিতেই হবে ;
 তুমি চাও, নাহি চাও,
 ভয়েই পলাতে যাও,
 একওণে শত গুণ জোর ক'রে লবে ।
 তবে ও গাণ্ডীতে আজ,
 পড়ুক পড়ুক বাজ,
 ভেঙ্গে যাক, মুছে যাক, সীমা রেখা তার ;

বাঁচ কিছা মরে যাও,
 খেটে যাও, খেটে যাও,
 সর্বস্ব তোমার দাও চবণে ধরার ।
 সেই ত বেঁচেও মরে,
 যে বাঁচে নিজের তরে ;
 নিজেরি বিষেতে নিজে জ'লে পড়ে মরে ;
 সেই ত মবেও বাঁচে
 সে গড়া দেবত্ব ছাঁচে,
 যে বাঁচে যে খাটে—মরে জগতের তরে ।
 রাখিবার তরে নয়,
 জীবন হারাতে হয় ;
 বিপরীত শাস্ত্র তার, কয় জন মানে ?
 রাখিলে পচিয়া যায়,
 হারালে কিরিয়া পায় ;
 পেতে গেলে দিতে হয়, কে না ইহা জানে ?
 যে যত করিবে ব্যয়,
 তার তত তোলা রয় ;
 অমরত্ব তারি তরে চির-অঙ্গীকার ,
 যে যত করে না ব্যয়,
 তার তত হয় ক্ষয় ,
 ক্রমি-কীট-ভোজ্য সে যে, কিবা মূল্য তার ?
 তবে এ জীবন নিয়ে,
 কে রহিবে ঘুমায়ে ?
 কেবা তার প্রাণ দিয়ে করিবে না কাজ ?
 জয়ী হ'ক নাই হ'ক ;
 কীর্ত্তি র'ক নাই র'ক ;
 তবু যুঝে ম'রে যাবে, কিবা ভয় লাজ ?
 শ্রীকালীনাথ ঘোষ ।

ইউরোপ-ভ্রমণ । (৩)

গোথা খাল ।

জোতে বোর্জ * হইতে ষ্টকহল্ম + পর্য্যন্ত
 একটা খাল-পথ করিবার জন্ত বহুকাল হইতে

* Goteborg স্থানীয় নাম ; ইংরাজীতে Gothenburg বলে ।
 + Stockholm.

চেষ্টা হয় । পূর্বে ছই একবার উদ্যোগও
 হইয়াছিল, কিন্তু অল্প আরম্ভ হইয়াই বন্ধ
 হয় । শেষে ইংরাজ-ইঞ্জিনিয়ার টেলফোর্ড *
 সাহেবের সহকারিতায় স্থানীয় বিশ্বকর্মা

* Thomas Telford.

প্লাটেন * সাহেব কর্তৃক ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ২২ বৎসরের অনবরত পরিশ্রম দ্বারা বিপুল অর্থ ব্যয়ে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই খাল সমাপ্ত হয়। ৭৮টী ছোট বড় দ্বদ মধ্যে পাওয়াতেই বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

পালাস্ + জাহাজে আমরা নানা দেশীয় ৩০।৩৫ জন যাত্রী বেলা ১২টার সময় আরোহণ করি। কাপ্তেন সুইড জাতীয়, বড় রসিক পুরুষ; ইংরাজী ভাষা বেশ জানিতেন, এবং সিঙ্গাপুর পিনাং প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে অনেকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন; সুতরাং আমাদের ভাব গতিক কতকটা তাঁহার গোচর ছিল। জাহাজে আমরা দুই জন মাত্র প্রাচ্য জীব—পঞ্জাবী বুলাকিরাম ও আমি। জাহাজে উত্তিবার ২ ঘণ্টা পরে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন হইল। এইখানে প্রথম স্মোর্গাস ‡ প্রথা দেখিলাম। খানায় টেবিল সাজান হইলে, সেখানে বসিবার পূর্বে, ভোক্তাগণ পার্শ্বস্থ এক টেবিলে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করতঃ গলা ভিজাইয়া লইয়া থাকেন। এই সময়ে এক প্রকার অতি তীব্র রকমের সুরা অল্প পরিমাণে সকলেই গলাধঃকরণ করেন। বোধ হয়, ক্ষুধা উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই জলযোগ ও সুরাপান। ইহা শেষ করিয়া টেবিলে সাধারণ ভাবে সকলে ভোজনে বসেন। সুইডেন দেশের সর্বত্র এই নিয়ম প্রচলিত। গটেনবর্গে টাবল-ডোটে § আহার আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই, তাই সেখানে উহা দেখিতে পাই নাই। ভোজনাঙ্কে প্রাচীন

বোহস * দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে দেখিতে ৩½ টার সময় প্রথম কপাটে † উপস্থিত হওয়া গেল। বাঁহারা কখন এ দেশের খালে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার কপাটের ব্যবস্থা অনারাসেই বুঝিবেন। খালের সম্মুখে উচ্চ বা নীচ সমতলের কোন নদী, হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় উপস্থিত হইলে, কপাটের বন্দোবস্ত ভিন্ন খালের জল পরিমাণ ঠিক রাখা যায় না। কপাট পার হইয়া ২০০ হস্ত প্রশস্ত একটা প্রপাতের পার্শ্ব দিয়া বেলা ৫ টার সময় বিখ্যাত ট্রন-হাটান ‡ প্রপাতের নিকট আসা গেল। লক্ প্রবেশের পূর্বে যাত্রীগণ সকলেই জাহাজ হইতে নামিলাম। হাঁটিয়া না দেখিলে এই বিখ্যাত রমণীয় স্থানের দৃশ্য উপভোগ করা যায় না।

ট্রন হাটান প্রপাতের কথা পূর্বে অনেক পর্গাটকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ইহা খ্যাতিতে নাএগেরার নীচেই, এখন স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল যে, দৃশ্যটি বড় সহজ ব্যাপার নয়। প্রপাত না বলিয়া ইহাকে ৪০০ হাত পরিসরের রাপিড্ শ্রেণী বলিলে ঠিক হয়। § প্রথম প্রপাত ২৩ ফিট মাত্র খড়াই। ত্রিশী প্রভাব ব্যতীত এই ভয়ঙ্কর অপ্রতিহত শক্তিকে আর কিছুতেই অবরোধ করিতে পারে না। প্রপাতের পূর্বধারে অনেক গুলি করাতের কল ও অন্যান্য কারখানা উহা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। একটা কারখানা হইতে ধাবমান স্রোতের অতি নিকট পর্য্যন্ত একটা মঞ্জ ‖

* Batzar Bogeslaus Von Platen.

† SS“Pallas”.

‡ Smorgas.

§ Table d'hôte অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে সকলের একত্র ভোজন।

* Bohus ruins.

† Lock —কপাট।

‡ Trolhattan Falls.

§ A series of tremendous rapids.

‖ Platform.

প্রস্তুত হইয়াছে। প্রপাতের ঠিক মাঝে একটা ও কিঞ্চিৎ নিম্নে আর একটা দ্বীপ আছে; সেতু দ্বাৰা তথায় যাতায়াত হয়। এই সেতুর মাঝখানে দাঁড়াইয়া নৌচকার ও চাবি দিকেব কোলাহলনব ভলকীড়া দেখিতে বড়ই চমৎকার। কিন্তু এই অতীব বন্দীরা দৃশ্য উপভোগেব হস্ত বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য প্রয়োজন। ঠিক নৌচ ১০ ফিট খাড়া প্রপাত, তাহার ও চাবি দিকেব ভলকী ভীষণ শব্দ দ্বারা আবেগিত হইয়া কদগোচর হয় না। সেতুর তৎপন্ন বোধ হইল না, ভাদ্রিয়া পড়িলে কি দশা উপস্থিত হয়, এ অবস্থায় স্থির চিত্তে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা সহজ পরীক্ষা নয়।

সুন্দর অপবাক্সে চাবি দিকেব কল কারখানা, ভীষণ অথচ মনোবম জলকেলি, লবের ইঞ্জিনিয়ারি কোশল প্রভৃতি পরিদর্শন করতঃ কয়েক ঘণ্টা বিশেষ আনন্দ সম্ভোগান্তে আমরা পুনরায় ডাহাজে উঠিয়া বাহি ৯টাব সময় বেনবর্গ* হ্রদ ভাবলগ্নী বেনর্সবোর্জ† নগরে উপনীত হইলাম। ঠিক এই স্থান হইতে গোথানদী বাহি হইয়াছে। নগরটীতে ৬ হাজার মাত্র লোকের বাস, ছোট জাহাজ, কিন্তু চাবি দিকেব নৌকা ও জাহাজাদি গতি-বিধি মধ্যস্থান বলিয়া একটু গুলুগুলা বোধ হইল। এখানে রাত্রি ৯ টাব সময় উত্তর পশ্চিম দিকে ‡ সূর্যাস্ত হইল, এবং ঠিক পশ্চিমে চন্দ্র দেখা দিলেন।

হ্রদের মধ্যে অনেকগুলি কাঠের মাড় ও ছুই এক খানা জাহাজ দেখা গেল। হ্রদটী ৫০ ক্রোশ দীর্ঘ ও স্থানে স্থানে ২৪।২৫ ক্রোশ প্রস্থ, সমুদ্র বলিয়া ভ্রম হয়; কখন কখন

ঝড়টুও পাওয়া যায়। মানুষের বসতি ছুই চারিটা দ্বীপ ও আছে।

এই হ্রদ অতিক্রম করিয়া পুনরায় খালে প্রবেশ করতঃ পবদিন মধ্যাহ্ন দুই বাইকেন হ্রদ* বাহিয়া কার্লসবোর্জ† নগরে নৌচ বেটুর্গ-হ্রদ‡ পড়া গেল। বাইকেন হ্রদে প্রবেশের পূর্বে একস্থানে খানসী চকাকাব হইয়াছে। এইখানে, কাপ্পেন বলিলেন, আমরা এখন খালপথেব সমোচ্চ স্থানে উঠিয়াছে। তন্নদিশন স্বরূপ তাহে এক পণ্ড প্রস্তবে § খোদিত আছে “দুন্দ হইতে ৩০৮ ফিট উচ্চ”। বাইকেন হ্রদটা পূর্ব ছোট, কিন্তু উত্তর তাবস্থ ক্ষেত্রাদি ও বৃন্দনভাসমূহ এমনি সুন্দর ভাবে সাজান যেন চাবি দিকেব দৃশ্য ঠিক একখানি ছবি। বেটুর্গ হ্রদ ৪০ ক্রোশ লম্বা ও ৬ ক্রোশ চোড়া। বাইকেন অপেক্ষা এই হ্রদের জল ১২ ফিট নীচে, লক্ষ হইতে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাববর্তী দৃশ্য মনোবম ও জল অতি পরিষ্কার কিন্তু প্রায়ই বিঘ্ন ব্যাহত হইত। কার্লসবোর্জে একটা প্রাচীন চূর্ণ ও সামরিক বিদ্যালয় আছে। হ্রদের পশ্চিম পাশে একটা সুন্দর পাহাড় ও মধ্যে অনেকগুলি দ্বীপ থাকতে এই স্থানটীর শোভা বদ্ধিত করিয়াছে। কার্লসবোর্জের অপর পারে বাদ্‌স্তেনা¶ নামক পুৰাতন নগর ও ৬ শত বৎসরের একটা প্রাচীন মঠ ॥ প্রথমে ইহা একটা বাস্তু (৫) ছিল, এখানে অনেক রাজা কারাবাদ করিয়াছেন।

এই স্থান হইতে অল্পদূর আসিয়া পুনরায় খাল পাওয়া গেল। প্রবেশ করিবার সময় পাঁচ কপাটের লক্ষ পার হইতে অনেক সময়

* Lake Venun. † N. N. W.
† Venersborg.

* Lake Viken. † Karlsborg.

‡ Lake Vettern.

§ Granite obelisk.

@ Castle.

Wadstena Monastery

লাগিবে, এইজন্ত আমরা সকলে নামিয়া মুতাল* পর্য্যন্ত পবত্রজে চলিলাম। পথে দেশীয় নিম্নশ্রেণীর বালকেণা দাবারণ ভাবে সেলাম দ্বারা ও বালিকাগণ হাঁটু ভাঙ্গিয়া আমাদের সকলকে অভিবাদন করিতে লাগিল। ইহাতে বুঝা গেল, এদেশেব ছোট লোকেরাও বিনয়া ও সভ্য। এই ১৩০০০খাল খালপথের মুতাল মধ্যস্থান। ইহাব সম্মি কটে খালের ধারে পিঞ্চকম্বা প্লাটেন মহাঘর সমাবিহান। মুতাল সুইডেন দেশেব প্রবান কলকারখানার স্থান। এখানকাব লেস† অতি প্রসিদ্ধ।

সন্ধ্যা ৭টার সময় (বৈকাল বলিলে ভাল হয়, কারণ তখনও ২১ ঘণ্টা বেশ বেলা আছে) আবার পাঁচ কপাটের লক দ্বারা আর এক হুদ‡ পড়া গেল। ৫ ক্রোশ লম্বা এই জলাশয় পার হইয়া যে খাল পাওয়া গেল, তাহা অনেকটা দূর পর্য্যন্ত চতুর্দিকেএ জমি অপেক্ষা বহু উচ্চে চলিয়াছে; আমরা বেশ নীচের দিকে তাকাইয়া ক্ষেতখোলা দেখিতে দেখিতে জাহাজ ভাঙ্গাইয়া চলিলাম,—এ এক সম্পূর্ণ অভিনব অভিজ্ঞতা সন্দেহ নাই, আর কোথাও এরূপ দৃশ্য ঘটিয়াছে, বলিয়া বোঝ হয় না। ইহার পরেই ১৬ কপাটের লক দ্বারা ১২০ ফিট নীচে নামিয়া জাহাজ রক্ষণ § হুদে পড়িল। প্রায় ২ ক্রোশ লম্বা এই হুদ পার হইয়া অল্প খানিকটা খাল বাহিয়া একটা অতি ক্ষুদ্র জলাশয় অতিক্রম করতঃ পুনরায় কতদূর ধালে গিয়া মেমণ নামক স্থানে আসিয়া শেষ লক পার হওয়া গেল। এই খানে একখানি মার্কেল পাথরে খোদিত

আছে “ঈশ্বর স্বয়ং গৃহ নির্মাণ না করিলে মান্নিবেব সকল চেষ্টা ব্যথা।” বাস্তবিক বিবাতা না সহায় হইলে এ সমস্ত কাব্য ক্ষুদ্র মান্নিবেব দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অদত্তব। এইখানে আমবা খাল পথের নিম্নত বিধান গ্রহণ করিলাম। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। খাল পাবাপার হইবাব জন্ত পথিমধ্যে বহুস্থানে এক একটা স্থালোকেব জিহ্মাণ ছোট ছোট কাঠেব পুল আছে; জাহাজ আনিলে তাহার। একটি কল ঘুবাইয়া পুল খুলিয়া দেয় এবং পরে জড়িয়া লয়।

পর দিন প্রাতে আমরা সমুদ্রেব খাড়িতে ভাসিলাম। ক্রমে মধ্যাহ্নে যখন জাহাজ বন্টিকে* পড়িল, তখন বিলক্ষণ সমুদ্র-দোলন আরম্ভ হওয়ায় অনেককে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। বন্টিক সাগরের এই অংশটাতে বহুসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। বৈকালে একটা ছোট খাল দিয়া মালারণ† হুদে প্রবেশ করা গেল। ইহার অপর নাম “সহস্র দ্বীপের হুদ”, বাস্তবিক এই ৩৩ ক্রোশ দীর্ঘ জলাশয়ে ১৪০০ দ্বীপ আছে। ইহার বহুসংখ্য ক্ষুদ্র হম্মোদ্যানাদি সুশোভিত। আমাদের জাহাজ যখন দ্বীপগুলির পাশ দিয়া চলিতে লাগিল, দ্বীপস্থ বালকবালিকাগণ রুমাল উড়াইয়া অমানিগকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এই প্রেমের দৃশ্য দ্বারা জদয়ে এক নূতন ধরণের আনন্দ অম্লভূত হইল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার সময় সুইডেনের রাজধানীর প্রাসাদ ভজনালয়াদির চূড়া দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে আমরা ষ্টকহলমে উপনীত হইলাম।

* Motala.

† ace.

* Lake Boren.

§ Lake Roxen.

¶ Mem.

* Baltic Sea.

† Lake Malaren—“The lake is one of the most entrancing and delightful regions in Europe”.

—Richard Lovett, M.A.

খাল ভ্রমণ সুবাইল ; যাত্রীগণের মধ্যে দুই চারি জন সম্বন্ধে কিছু বলিয়া উহার বৃত্তান্ত শেষ করিব। ইতিপূর্বে পঞ্জাবী ভ্রাতা বুলাকিরাম শাস্ত্রীর বিষয়ে ক্রিষ্ণিৎ বলা হইয়াছে। এবারে আর কয়েক জনের কথা বলিব। যাত্রীগণ মধ্যে একটি আমেরিকান দল ছিল। ৭৮টি যুবতী কুমারী ও দুইটি প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী ইউরোপ ভ্রমণে একত্রে আমেরিকা হইতে বাহিব হইয়া এই পথে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ ভাষার প্রতি বিশেষ দিগ্বেষ প্রকাশ করিতেন, এমন কি, ইংরাজ নাম পর্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ইহাদের মধ্যে এক জন অত্যন্ত হাস্যামোদ-প্রিয় ছিলেন ; খানার টেবিলে, আরামের স্থানে, ডেকের উপরে সদা সর্বদা নানাবিধ হাস্য কৌতুকের গল্প দ্বারা যাত্রীগণকে আমোদিত করিতে তাঁহার আলস্ত ছিল না। কয়েক জন আমেরিকান পুরুষও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের বিশেষত্ব আর কিছুই ছিল না, কেবল ভোজনের সময় ভাল ভাল আহারীয় দ্রব্যাদি হাড়েখলের ত্রায় তাড়া-তাড়ি হাত বাড়াইয়া আত্মসাৎ করিতে তাঁহারা বড়ই মজ্জ্বত ছিলেন। তাঁহাদেরব দৌরায়ে ভাল ফলমূল আর কাহারও পাইবার জো ছিল না। ইংরাজ যাত্রীগণ হাঁ করিয়া তাঁহাদের কাণ্ড দেখিতেন, আর অবাক হইয়া থাকিতেন। বলা বাহুল্য, এই মার্কিন যাত্রীগণ ভদ্রলোক।

আর এক জনের কথা বলিয়া পালাস জাহাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। আমার পক্ষে ইনি যাত্রীগণ মধ্যে প্রধান ছিলেন। সমস্ত অবকাশ কাল আমি ইহার সহিত কথোপকথন দ্বারা রুশিয়া সম্বন্ধে

সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত থাকিতাম। ইনি অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় ৬ আড্‌মিরাল কোজাক-র ভিশের * বিধবা পত্নী। আড্‌মিরাল মহাশয় বহুকাল মধ্য আশিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। আমুর নদীস্থ একটা দ্বীপ তাঁহার নামে অভিহিত। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ৭০ বৎসব বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। রুশ-মহিলার বয়স আড্‌মিরাল অপেক্ষা ২৪ বৎসর মাত্র কম হইবে ; কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ। ইনি অতি মহদয়, আমাদের দেশের গিন্নিবান্নি গোছের লোক। ইংরাজী ও ফরাসি ভাষা উত্তম রূপে জানিতেন, ইতিহাস ও সাধারণ সাহিত্যাদিতে বিলক্ষণ দখল ছিল। ষোড়শবর্ষীয় একমাত্র পুত্র তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট † রাধিয়া তাঁহাকেও বেশ ইংরাজী শিখান হইয়াছে। বালক ব্লাডিমির ‡ খুব লম্বা চোড়া ছোকরা গোঁপ দাড়ির অভাব দ্বারাই টের পাওয়া যাইত, নতুবা ২৫২৬ বৎসরের জোয়ানের মত আকার প্রকার। ব্লাডিমির মায়ের মত সদাশয় শান্ত প্রকৃতি। এই মাননীয় মহিলার সঙ্গে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা রুশিয়া সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে। পরিচয়ের পর আমার প্রশ্ন মত তিনি যে সকল উত্তর দিলেন, তাহা অতি প্রাজ্ঞ ও সারগর্ভ, ভরসা করি পাঠক-গণ উহা দ্বারা রুশিয়ার প্রকৃত অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

প্রশ্ন—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রুশিয়ার কিরূপ লালসা ?

উত্তর—তোমাদের দেশের উপর আমাদের কোন প্রকার কুদৃষ্টি নাই।

* Admiral Kozakervitch.

† Governess.

‡ Vladimir Petrrovetch Kozakervitch.

প্র—তবে যে সর্বদা শুনা যায়, মধ্য-আশিয়াতে রাজ্য বিস্তার কেবল ভারতবর্ষ আক্রমণের উদ্দেশ্যে। পিটার সম্রাট * এ সম্বন্ধে আপনার উইলে মন্তব্য প্রকাশ কবির গিয়াছেন, এবং ইদানীং সেনাপতি † স্কুবেলফ ‡ যেরূপ তাঁহার মতলব প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ত আশঙ্কা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি ত স্পষ্ট বলিয়াছেন “আমাদের শেষ উদ্দেশ্য বিপুল আশিয়াটিক অধিবাসী দল প্রস্তুত করত তদ্বারা তৈমুরলঙ্গের মত রক্তপাত ও লুটপাট করিতে করিতে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা।”

উ—(সহাস্ত বদনে) “পিটারের উইল ত আমার বিবেচনার জাল। আর সেনাপতি বাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সে সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ওরূপ আপনাপন মনের কথা বলা অতি সহজ ব্যাপার। তিনি মধ্য-আশিয়ার প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার নিজের ওরূপ খেয়াল হইতে পারে; কিন্তু সাম্রাজ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। আমাদের ঘরের অবস্থা এত খারাপ যে, সর্বপ্রথমে তাহা ঠিক করা নিতান্ত কর্তব্য। যে বৃহজ্জা হাতে করা হইয়াছে, তাহাই সামলাইবার আমাদের ক্ষমতা নাই, এখন আর বেশী দখল করিবার কথা মনে আনাই পাগলামী। আসল কথা টাকা, আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়; সে দিকে উন্নতির চেষ্টা

এখন অতীব গুরুতর ভাবে প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজধানী হইতে বরাবর সাইবিরিয়ার * ভিতর দিয়া কামটস্কাটকার † সীমা পর্য্যন্ত রেলপথ প্রস্তুত করা আগে চাই; ইহা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। ‡ সাইবিরিয়া প্রদেশে যে সকল ধনরত্ন আছে, তাহা করতলস্থ করিতে গেলে ঐ প্রকাণ্ড রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রশান্ত সাগর পর্য্যন্ত রেলপথ অত্যাশ্চর্য। ঐ রেলপথ চলিলে সাইবিরিয়ার ধনে সাম্রাজ্যের বিলক্ষণ ধনী হইবার সম্ভাবনা আছে। উহাতে আরও এক বিশেষ লাভ এই হইবে যে, প্রশান্ত সাগরের ভাবে বন্দব নিষ্পত্তি করত ওখানে নৌ-সেনা স্থাপনের ব্যবস্থা হইবে। বর্তমান সময়ে নৌ-সেনা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ অজ্ঞবিধা ভোগ কবিতে হইতেছে; রুশিয়ার উত্তর ও পশ্চিমদিকস্থ সমস্ত জল বাহুর মাস ব্যবহারের উপায় নাই, শীতের কয়মাস ঐ সকল স্থান বরফময় হয়। এই কারণে প্রশান্ত সাগর ভিন্ন আমাদের আর এমন কোন জল নাই, যেখানে বারমাস জাহাজ রাখিবার সুন্দররূপ ব্যবস্থা হইতে পারে। ওরূপ অবস্থায় বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমাদের দেশের উপর এখন আমাদের লোভ করা কিরূপ দেখায়।”

“আমাদের সাম্রাজ্যের প্রধান দোষ এই যে, প্রধান প্রধান কর্মচারীগণ সাধারণের মত গ্রহণ না করিয়া নিজেদের মনের মত এক একটা ধামখেয়ালি প্রস্তাব করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না। রুশিয়ার সম্রাটগণের নামে যে সকল কলঙ্ক পৃথিবীতে

* Peter the Great.

† General Skobellof.

‡ “It will be in the end our duty to organise masses of Asiatic cavalry, and to hurl them into India under the banner of blood and pillage as a vanguard as it were, thus reviving the times of Tamerlane.” ইংরাজিতে এই ভাবে লিখিত আছে।

* Siberia.

† Kamaschka.

‡ কয়েক বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

প্ৰচািনিক হটয়া থাকে, বাস্তবিক তাঁহার
হয় ত তাহাব কিছুই জানেন না। বাহি-
বেল লোকে মনে করে, আমাদেব স্বেচ্ছা-
চাপী সম্রাট, আপনাব ইচ্ছা মত যাহা ইচ্ছা
তাহাই বলেন, কাহাবও কথায কর্পাত কেনে
না; প্রকৃত পক্ষে তাহার ঠিক বিপরীত।
সম্রাট যদি সদভিপ্রায়ে কিছু কবিতে প্রবৃত্ত
হন, এবং তাঁহাব পবিসদবর্গ যদি দেখেন,
তাহাতে তাঁহাদেব কোন প্রকাব স্বার্থহানির
সম্ভাবনা, অননি তাঁহাবা নানা উপায়ে সম্রা-
টেব হস্ত অববোব কবিতে চেষ্টা পান।
একটা দৃষ্টান্ত বলি। ভরসা করি তুমি ফিন-
লণ্ড * যাইবে, সেখানে গিয়া শুনিবে।
ফিনলণ্ডে স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রচলিত,
এবং তাহাদেব দত্ত কর সম্রাট দেশের হিতো-
দ্দেশে তাহাদিগকে ফেরত দেন, বলিয়া
সর্বদাই আমাদেব মন্ত্রীসমাজে কোলাহল—
কেন ফিনলণ্ড সমগ্র রুশ সাম্রাজ্যেব নিয়ম
বহির্ভূত থাকিবে?—এইরূপে সকল কাজেই
জানিবে মন্ত্রীবর্গেবই হাত, জার † বেচাবির
কেবল ছর্নাম মাত্র।”

প্রঃ—গত বৎসর (১৮৯০) ইংলণ্ডে
একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। জনৈক
পণ্ডিতা রুশ মহিলা কর্তৃক উহা আপনাদেব
সম্রাটকে লেখা হব। তাহাতে সাম্রাজ্যেব
অনেক কলঙ্ক প্রচার করা হইয়াছে। পত্র
খানির কথা কি সমস্ত ঠিক? উহা আপ-
নাকে পড়িয়া শুনাই।

Addressed by Madame Tchebrikova,
a popular Russian authoress of good family
to the Czar of Russia.

“Your Majesty;—The laws of my coun-
try punish free speech. All that is honour-
able in Russia is condemned to see thought
persecuted by an arbitrary Administration.
We witness the moral and physical mas-

sacre of youth, the spoliation and flagellation
of a people condemned to remain speech-
less. But liberty, Sir, is the primordial
necessity of a people, and sooner or later
the hour will come when the citizens,
having, under the tutelage, exhausted
their patience will raise their voices, and
then your authority will have to yield.

There are also in the lives of indivi-
duals moments when they are ashamed
of their silence, and then they dare to
risk all that is dear to them, so as to say
to the person who holds in his hands all the
power and all the strength, the person
who could put an end to so much evil
and so much shame. “Look at what
you allow to take place, look at what you
are doing either consciously or not.”

The Russian Emperors are obliged
to see and hear only what their function-
aries, the Tchinnovniki, allow them to see.
The latter form a thick wall between the
Czar and the Zemsties—that is the mil-
lions of inhabitants who are not in the
employ of Government. The terrible death
of Alexander II has thrown a lugubrious
shadow on your accession to the throne.
You were told that this death was the
result of the ideas in favor of freedom
which had been developed in consequence
of the reforms introduced during the previ-
ous reign, and you were inspired to take
measures by which it was desired to
make Russia go back to the sombre epoch
of Nicholas I. They frighten you by agita-
ting the spectre of revolution, of a revolu-
tion which would suppress monarchy, and
this at the present time, and in such a
country as yours is a pure illusion. After
the catastrophe of the 1st March the regi-
cides themselves did not hope to see the
convocation of a Constituent Assembly.
The enemies of the Czar have been exe-
cuted, every one obeys blindly the will of
the monarch. Then by what fatal mis-
understanding does the Government sup-
press all traces of those reforms projected
during the best years of Alexander II's
reign. It was not the reforms enacted
during the previous reign that brought
our terrorists into existence, it was their
insufficiency.

* * * * *

Do you imagine that because you are
anointed sovereign, you are a divini-
ty possessing knowledge of all things?
If you could, Sir, like the sovereign in the
fable, pass over the towns and villages so
as to know what life the Russian people
live, you would see its misery, you would
see how the Governors bring up your
soldiers to shoot down the peasants and
the workmen. You would see that this
order, maintained by thousands of soldiers,
by legions of functionaries, by an army

of spices—this order in the name of which every word of protestation is suppressed—that this order is not order at all, but a state of administrative anarchy”.

উ—এই গ্রন্থকর্ত্রীর নাম আমি শুনি-
যাছি। কথা বা লেখার স্বাধীনতা আমাদের
দেশে নাই। যেখানে সেখানে যা খুশি
বলিলে অনেক গোয়েন্দা আছে, তাহারা
পুলিশকে খবর দিয়া বক্তাকে গ্রেপ্তার
করাইবে। লেখা সম্বন্ধে একজন বিশেষ
রাজ কর্মচারী আছেন, তাহার অনুমোদন
ব্যতীত কোন প্রকার মুদ্রিত বিষয় প্রকাশ
হইতে পারে না।

রাজ কর্মচারীগণের অত্যাচার সম্বন্ধে
আমি পূর্বেই বলিয়াছি। সম্রাটকে বাধ্য
হইয়া সর্বদা পরের মুখে ঝাল খাইতে হয়।
আমাদের শাসন প্রণালীতে নানা কারণে
দোষ প্রবেশ করিয়াছে। কৃষিয়ার সিভিল
বিভাগের * কর্মচারিগণ এক বিশেষ
শ্রেণীর লোক হইতে ববাবর নিযুক্ত হইয়া
আসিতেছে। ইহারা উচ্চ নীচ কোন
শ্রেণীর মধ্যে গণ্য নহ, মাঝামাঝি এক শ্রেণীর
লোক, সংখ্যায় অতি অল্প। আমাদের দেশে
এক বড় লোক এক ছোট লোক, মধ্যম
লোক বলিয়া কোন শ্রেণী নাই; ইহারা
এই দুইয়ের সংশ্লেষে উদ্ভূত, কাজেই অল্প
সংখ্যক। ইহাদের নিয়োগ, বিয়োগ, পদো-
ন্নতি, সমস্তই প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, মন্ত্রীবর্গ
বা অন্তঃস্থ বিভাগীয় কর্মীদের মঞ্জুর উপর
নির্ভর করে। চাকরির স্থিরতার অভাব,
কখন.. আছে কখন নাই; তার উপর
বেতন বড়ই কম; উপরওয়ালাদের মন
সমস্ত সকল উপায়ে সর্বদা যোগাইয়া চলা
নেহাত সরকার; ইত্যাদি কারণে তাহারা

* Civil Service

৬৩

যারপরনাই অত্যাচারী ও অর্থলোলুপ :—
কাজেই দেশ বা প্রজার হিতাহিতের দিকে
কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া, তাহারা যেন
তেন প্রকাষণ কেবল নিজের পেট পূরা-
ইতেই চক্ৰিণ ঘণ্টা ঘোণ আনা বাস্তব।
রাজ-কার্য * যে ভাবে চলুক না কেন, সে
বিষয়ে বেখাতির।

“১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আলেকজান্ডার
অনেক গুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন,
নানা কারণে সেগুলি শীঘ্রই বন্ধ করা হয়।
এ বৎসরও (১৮৯১) সহস্র সহস্র স্কুল বন্ধ করা
হইতেছে। আমার বোধ হয় না যে, অল্প
কোন হেতু প্রজাব শিক্ষা বিস্তার অবরোধ
করা ইহাব কারণ। বিশেষ কারণ আমি
দেখিতেছি এই যে, আমাদের ছাত্রগণ লেখা
পড়া শিখিয়া কেবল সরকারী চাকরি দাবী
কবে, বিদ্যালয় দ্বারা যেন তাহারা ইহাই
বুঝে যে, অল্পাংশ কাজ না করিয়া কেবল রাজ
সরকারে চাকরি করিবাব জন্তই তাহারা
উপযুক্ত হইয়াছে। আমাদের মত দরিদ্র
রাজ্যে অত বিদ্যাব ছড়াছড়ি বোধ হয় অসম-
লের কারণ বলিয়া হ্রীকৃত হইয়াছে।

“প্রজার প্রতি অত্যাচার অনেক সময়
ঘটিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। গুপ্ত চরগণ
অত্যাচার রূপেও অনেককে গ্রেপ্তার করাইয়া
দেয়। এক্ষণে গ্রেপ্তার মধ্য রাত্রিতেই হইয়া
থাকে, কারণ সে সময় সকলকেই বাড়ীতে
পাওয়া যায়। অনেক নির্দোষী ব্যক্তি হয়ত
কেবল মাত্র সন্দেহের দণ্ড বা ছুট কর্ম-

* তৃতীয় আলেকজান্ডার কয়েক বৎসর হইল
ইহা নিরাকরণের জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়া নিয়োগ
বিয়োগাদির ভার অনেকটা নিজের হাতে লন; এবং
পরিদর্শনের জন্য একটা বিশেষ বিভাগ স্থাপন করেন।

তাহার নাম Special Inspection department.

চারিদের অত্যাচার কোপগ্রস্ত হইয়া বিনা বিচারে যাবজ্জীবনের জন্ত সাইবিরিয়াতে নির্বাসিত হইয়াছে। রাজ্যশাসনের গুঢ় রহস্য নিচয় ভেদ করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। অনেক সময়ে দারুণ কঠোর শাসন নিত্য প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং সেই শাসন-বস্ত্র সকল সর্বাবস্থায় ঠিক নিক্রিয় তৌলে ব্যবহার ও প্রয়োগ অতিশয় দুর্কর কার্য, সন্দেহ নাই। জাতি, ধর্ম, শিক্ষা, অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে একরূপ বিভিন্ন প্রকারের নানাবর্ণের প্রজা আমাদের এই বিপুল সাম্রাজ্যে বাস করে, ইহাদের সকলকে লইয়া চলিতে গেলে কোথাও না কোথাও ক্রটি লক্ষিত হইবেই হইবে।

“রুশিয়ার নিন্দা তোমরা অনেক শুনিয়াছ, কিন্তু আমার গুটিকতক কথা শুনিলে অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, আমরা সংসারের হিতসাধনে ব্রতবান কি না। দেখ মধ্য-আসিয়া আমাদের অধীনে আসিবার পূর্বে কি ছিল, আর এখনই বা কি হইয়াছে :—কোথায় দিবারাত্রি তুর্কমানদের লুটতরাজ, নানা প্রকার উপদ্রব অত্যাচার, গোলাম ব্যবসায়, আর কোথায় জীবন ও বিত্ত নিরাপদ জানিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে আহার বিহার সুলে নিদ্রা এবং কৃষি বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন। একজন মাত্র রুশী কর্ণেল ৮ জন দেশীয় সহকারীর সাহায্যে নির্বিঘ্নে ত্রিশ হাজার প্রজাকে স্বশাসনে রাখিতে সমর্থ, ইহা কি আমাদের গৌরবের বিষয় নয়। কর্ণেল আলিখানফ, বাহার আসল নাম আলি খাঁ, একজন তাতার মুসলমান রুশিয়ার অধীনতা স্বীকার করিয়া বুদ্ধ-বিভাগে চাকরি পাইয়া শত শত গোলামকে মুক্ত করিয়াছেন এবং গোলামী উন্মূলিত

করিবার জন্ত বন্ধপরিষ্কার হইয়াছেন। মোটামুটি ফরাসিরা ৬০ বৎসর ধরিয়া আল-জিরিয়াতে * যতদূর করিতে না পারিয়াছে, আমরা ২০ বৎসর মধ্যে তাহা মূল্যে তদপেক্ষা অধিক করিতে সমর্থ হইয়াছি। এককাল পবেও আল-জিরিয়ার এমন অবস্থা যে, আজ অবকাশ পাইলে তাহারা ফরাসি শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিতে প্রস্তুত; কিন্তু মধ্য-আসিয়া আমাদের আপনাদের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃতিবর্গ অতি সুখে বাস করিতেছে।

তারপর, ভরসা করি, তোমরা ইউরোপেব ইতিহাস সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞাত আছ, আমার কথা কতদূর প্রামাণ্য বেশ বুঝিতে পারিবে যে, সভ্যজগতের হিতে রুশিয়ার হস্ত কতদূর বিস্তৃত। তোমরা “রুশিয়ার ছরকাজ্জা ও রাজা গুরুতার কথা অনেক শুনিয়াছ, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, অনেক স্থলে আমরা বিপদাত ভাব প্রকাশ করিয়া উদারতার পরিচয় দিয়াছি। নেপোলিয়ন যখন প্রথম বার এল্‌বাতে † তাড়িত হন, তখন রুশিয়া ব্যতীত আর সবাই লম্বা লম্বা হাত বাড়াইয়া ফ্রান্স প্রতিবাসীর রাজ্যভাগ আপনাপন কোলে টানিতে বসিয়াছিলেন। সে সময়ে ফরাসিদেশে তাহাদের পুরাতন রাজ-বংশকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার মত সঙ্কল্পেরই হইয়াছিল, কেবল আমাদের সম্রাট তাহার বিরুদ্ধে দাড়াইয়া ফরাসিদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহারা সাধারণ-তন্ত্র প্রচারের পক্ষপাতী কি না। হৃদ্যন্ত নেপোলিয়ন রাছ বিনাশের প্রধান সহায় রুশিয়া :—মস্কোদাহ † ও লাইপজিক ‡ যুদ্ধ তাহার

* Algeria † Elba
Burning of Moscow

জীবন্ত সাক্ষী। তারপর নেপোলিয়ন ধ্বংসের পর অবশিষ্ট ইউরোপের অরাজকতা ও বিপ্লবের প্রধান শক্তি কশিয়ার গ্রীস, রুম্যানিয়া * ; সার্বিয়া † মনিটিনিগ্রো ‡ ও ইটালির স্বাধীনতা ও জার্মানি একীকরণের প্রধান সহায়ক শক্তি সম্রাট। গ্রীস ও রুম্যানিয়ার বন্দোবস্তের সময় ইংলও পর্যাঙ্ক কতক কতক বিপ্লবতাবরণ করেন, কিন্তু কশিয়ার ষোল আনা সহায়। ইংবেজ প্রতিদ্বন্দ্বক না হইলে গ্রীস আশ্রয় বেনা পাইতেন, রুম্যানিয়ার বেলায় তাহার কথা পাটে নাই। অন্যদের মত আছে যে, দিনের রূপ, কেবল মাত্র ২০২২ বৎসর গত হইয়াছে, যুদ্ধাবসানে সন্ধি সংস্থাপনের পূর্বে জার্মান সম্রাট উইলিয়ম § আমাদেব জার আলেক্সান্ডারকে ৭ পদ লেখেন, “প্রশিয়া ॥ কখন ভুলিতে পারিবে না যে, কেবল মাত্র আপনার জন্ত এই যুদ্ধ ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে নাই। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আপনার চিবুকতরঙ্গ বন্ধু।”

প্র—দ্বিতীয় আলেক্সান্ডার যেকোন সর্ব প্রকারে সদাশয় লোক ছিলেন, তাহাকে বধ করাটা কি ভয়ানক নৃশংস ব্যাপার।

উ—তিনি যেমন বাহিরের ব্যাপারে উচ্চ উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, প্রজাবর্গের হিত সাধনেও তেমনি কার্যমনোবাক্যে যত্ন করিতেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে তিনি এক ঘোড়ায় এক খানি গাড়ীতে যাইতেছিলেন, হটাৎ তাহার গাড়ীর নিচে একটি বোম ছুটিল। তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আহত-দিগের জন্ত ব্যবস্থার আদেশ দিতেছেন,

এমন সময়ে তাহার পায়ে নীচে নিক্ষিপ্ত একটি বোমের দ্বারা তাহার পা দুখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সেই দিনই বৈকালে তাহার মৃত্যু হয়। ইহা পূর্বে প্রথম আলেক্সান্ডারের পিতা পাল ও * ছুট প্রজা কর্তৃক হত হন। এ সকল অর্থহীন ব্যাপার এক জন ক্ষিপ্ত লোকের কাজ। পিটব দি গ্রেট। ইহাতে আমাদেব সর্ব সম্রাটই দেশের উন্নতিব জন্ত বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়া ও প্রজা-বর্গে একরূপ নৃশংস ব্যবহার প্রাপ্ত হন। কেবল মাত্র অমৃত্য কশিয়াকে সুসভ্য কর-লোকেশে পিটব মহারা হত হইয়াছে। দ্বন্দ্ব দ্বারা নানা বিষয়ে জ্ঞানোপাধুন করিয়া আসিয়াছিলেন। বিদেশে অতি সামান্য লোকের মত দিনযাপন করিয়া ছুতার কামের কাজ, জাহাজ ও বাড়ি নির্মাণ প্রভৃতি বহুবিধ প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষা করতঃ এবং কনকাবথানা, চিকিৎসা বিদ্যালয়, হাসপাতালাদি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনান্তর ঐ সকল বিষয়ে প্রজাবর্গকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কশিয়ার গেলে তাহার অনেক কীর্ত্তি দেখিয়া প্রীতি হইবে।”

কশিয়ার প্রসিদ্ধ ‘নাইহিলিষ্ট’ সম্রাট-য়ের বিশেষ কোন সম্বাদ ইহার নিকট পাওয়া গেল না।

জাহাজের কাপ্তেন ও যাত্রীগণের বিশেষ রূপে উক্ত রশ মহিলার, নিকট বিদায় গ্রহণান্তর হোটেলান্তিমুখে যাত্রা করিলাম। পূর্বে অনেকবার বলিয়াছিলেন, আবার নামিবাব সময় কাপ্তেন বলিলেন, “বাথ § অর্থাৎ স্নানাগার দেখিতে যেন ভুলিও না”।

শ্রীচন্দ্র শেখর সেন।

* Roumania † Servia
‡ Montenegro § Emperor William
¶ Czar Alexander II Prussia

* Paul † From the Great
§ Bath ; Nihilist

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ । (১৩)

পাঠকগণ! আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে যে, স্বর্ঘ্যনারায়ণ কশ্যপ ঋষির পুত্র; এবং হনুমান এক সময়ে তাঁহাকে কক্ষ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ও উদরস্থ করিয়া ছিলেন। কুন্তী দেবীর আস্থানে তিনি তাহার সহিত সহবাস করিয়াছিলেন। আপনারা বিচার করি:। দেখুন যে, অনাদিকাল হইতে ত্রিজগতের একমাত্র প্রকাশক যাহার আংশিক তেজে সমগ্র জগৎ সম্ভূত হয়, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারণ সেই জ্যোতিঃস্বরূপ স্বর্ঘ্যনারায়ণ যাহাদেব পুত্র; সেই পিতা না তা কীদৃশী তেজসম্পন্ন হইবেন, তাহা সহজে অনুমান করা দুঃসাধ্য। আর তাহাদের বাড়ী যব লোখা আছে, তাহারা এক্ষণে জীবিত কি মৃত, কেহ বলিতে পারেন কি? আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, বানর একটা হাত পা বিশিষ্ট জন্তু, স্বর্ঘ্যনারায়ণ হইলেন অগ্নি ও জ্যোতিঃস্বরূপ, যাহার এক কণা তেজে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহাকে যে একটা সামান্য জন্তু হনুমান গিলিয়া ফেলিল ও বগলে পুরিয়া রাখিল ইহা অতি অসম্ভব কথা! যে হনুমান লক্ষা দগ্ধ করিতে যাইয়া স্বর্ঘ্যনারায়ণের অংশ অগ্নি দ্বারা নিজের মুখ পোড়াইয়াছিল ও যাহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সমুদ্রে কাঁপ দিয়াছিল, সেই হনুমান পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ স্বর্ঘ্যনারায়ণকে এতাদৃশী দুর্বস্থা করিয়াছিল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা আর কিছু হইতে পারেনা। রামায়ণে লেখা আছে যে, যখন শ্রী রাম চন্দ্র রাবণবধে হতাশ হইলেন, তখন মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য আসিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন যে, আপনি কেন হতাশ হইতেছেন? আপনি জগদ্বি-

খ্যাত স্বর্ঘ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, জগৎ প্রকাশক স্বর্ঘ্যনারায়ণ আপনার আদি পুরুষ, আপনি সেই আদি পুরুষকে ভক্তি পূর্বক অর্থ প্রদান করুন, তাঁহার পূজা করুন, তাঁহার ববে নিশ্চয় আপনি রাবণবধ করিতে পারিবেন। রামচন্দ্র ভগবান অগস্ত্যের উপদেশানুসারে সেই আদি পুরুষের পূজা করিলেন ও ভক্তি পূর্বক অর্থ প্রদান করিয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন তাহাকে বাণ মারিলেন অমনি সেই বাণেই রাবণ বধ হইল। রাবণ নিধন হইলে লক্ষাবিজয় ও মীতা উদ্ধার হইল। এক্ষণে দেখুন যে, সেই রামচন্দ্রের ভক্ত দাস হনুমান তাহার আদি পুরুষ জগৎ প্রসবিতা স্বর্ঘ্যনারায়ণকে বগলে পুরিয়া রাখিয়াছিল ও গিলিয়া ফেলিয়াছিল, ইহা কিরূপ মঙ্গল কথা?

পাঠকগণ! আমাদের শাস্ত্র রূপকে পরিপূর্ণ। সেই রূপকজাল ভেদ করিয়া সারভাব গ্রহণ করা অতীব কঠিন। বাহ্য হউক, আনি সংক্ষেপে সারভাব বুঝাইয়া দিতেছি, আপনারা সজ্ঞভাবে গ্রহণ করিবেন। কশ্যপ শব্দে পূর্ণ পরব্রহ্ম আকাশ স্বরূপ বিরাট-ব্রহ্ম। অদিতি শব্দে বিদ্যা—জ্ঞান; যাহার মধ্যে দ্বিতীয়ভাব নাই। সেই অদিতি অর্থাৎ জ্ঞান চইতে জ্ঞানী অর্থাৎ দেবতাগণ, যাহারা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপকে জানেন, তাহারা জন্মেন। দিতি শব্দে মায়ী, অজ্ঞান, অবিদ্যা। দিতির গর্ভে রাক্ষস, অসুর অর্থাৎ পরমাত্মাবিমুখ অজ্ঞানীগণ জন্ম গ্রহণ করেন। নিরাকার নিগুণ পরব্রহ্ম আকাশ স্বরূপ কশ্যপ পিতা হইতে স্বর্ঘ্যনারায়ণ জগৎ প্রসবিতা স্বতঃই প্রকাশ করেন ও তিন লোককে প্র

কাশ করেন। হুম্মান শব্দে হরিভক্ত জন।
যিনি ইন্দ্রিয়গণকে হনন করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ
স্বর্ঘ্যনারায়ণকে গিলিয়া ফেলেন, অর্থাৎ ভক্তি
পূর্বক ধারণ করেন। ইহাই হুম্মান স্বর্ঘ্য-
নারায়ণকে গিলিয়া ফেলার অর্থ; আর বগলে
পূরিয়া রাখার তাৎপর্য্য এই যে ভিতর বাহির
স্বর্ঘ্যনারায়ণ ভিন্ন আর কাহাকেও দেখেন
না। লক্ষা শব্দে মায়া—অজ্ঞানতা; সীতা
পরমাশক্তি জগজ্জননী ব্রহ্মময়ী; রাবণ অহ-
ঙ্কার, রাম জীবাত্মা; জ্ঞান বাণ। যখন জীবাত্মা
রাম-ব্রহ্ম পরমাশক্তিরূপী স্বর্ঘ্যনারায়ণকে ভক্তি-
পূর্বক হৃদয়ে ধারণ করিলেন, তখন অহঙ্কার
মহামোহরূপী রাবণ সহজেই বধ হইল।
সোণার লক্ষা অর্থাৎ সংসার-বন্ধনকারী মনো-
হারিণী মায়া জ্ঞান অগ্নি দ্বারা ভস্ম হইয়া
গেল। তখন পরমাশ্রুতি পূর্বরূপিণী
জগজ্জননী কুলকুণ্ডলিনী সীতা উদ্ধার হইল।
অর্থাৎ—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন
হইল। অর্থাৎ মহামোহ মায়া প্রভৃতি সাধনা-
রূপ যুদ্ধে হত হইলে জ্ঞানের উদয় হয়।
জ্ঞানের উদয় হইলে সাধকের আর ভেদজ্ঞান
থাকে না, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম পৃথক বোধ

হয় না। তখন সকলই ব্রহ্মময় বোধ হয়
নিজের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না।

কুন্তীদেবীর সহিত সহবাস সম্বন্ধে এস্থলে
যাহা বিবৃত হইবে, তাহার সূক্ষ্ণভাব আপনারা
বিচার করিয়া গ্রহণ করিবেন। আপনারা
দেখুন যে, জ্যোতিঃস্বরূপ স্বর্ঘ্যনারায়ণের হাত
পা ইন্দ্রিয়াদি কিছুই নাই, কেবল মাত্র তেজো-
ময়। তিনি একজন স্ত্রীলোকের সহিত সহ-
বাস করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে
পারে? যে স্ত্রীর সহিত তিনি সহবাস
করিলেন, সে স্ত্রীলোক ত স্থূলবস্ত্র। সে ত
স্বর্ঘ্যনারায়ণের স্পর্শ মাঝেই ভস্ম হইয়া
যাইবে। জ্ঞানীমাত্রেই জানেন যে, জগৎ প্রস-
বিতা সবিতা নিরাকার ও সাকার অথগা-
কার ভিতর বাহির বিরাটরূপে বিরাজমান
আছেন। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু ব্রহ্মাণ্ডে
মধ্যে নাই: সমস্ত জগৎই তিনি, অতএব
দ্বিতীয় স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিল যে,
তিনি তাহার সহিত সহবাস করিলেন?
পাঠকগণ! তোমরা ভক্তি সহকারে উপা-
সনা ও যোগ কর, তাহা হইলে স্বর্ঘ্যনারায়ণকে
চিনিতে পারিবে ও তাহার স্বরূপ অবগত
হইতে পারিবে।

ব্রহ্ম ও জগৎ । (৫)

আমরা এই প্রবন্ধের বিগত চতুর্থ সংখ্যায়,
বেদান্তদর্শন কি যুক্তি সামর্থ্যে গ্রাহ্যদর্শনের
পরমাণুবাদ খণ্ডিত করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন
করিয়াছি। পাঠক দেখিয়াছেন, বেদান্তের
যুক্তি সমূহ কেমন মনোহর। সাধ করিয়া
লোকে বেদান্তকে দর্শন শাস্ত্রের “শিরোমণি”
বলে নাই। যাহা হউক, মত-গত গুণ
ঘোর বিচারের জন্য আমরা এ প্রবন্ধের
অবতারণা করি নাই। যদি বিধাতার ইচ্ছা

থাকে, তবে সে সম্বন্ধে সময়ে দুই চারি
কথা বলিব। আমরা পূর্ব সংখ্যার শেষাংশে
স্বীকার করিয়াছিলাম যে, সাংখ্যের সেই
উৎকৃষ্ট প্রকৃতি পুরুষবাদের বিরুদ্ধেও
বেদান্ত স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করিতে ক্রটি
করে নাই। সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি সম্বন্ধীয়
মত ও যুক্তিগুলিকেও বেদান্ত খণ্ডন করিয়া
দিয়াছে। এ সংখ্যায় আমরা কিরূপে ও
কি যুক্তিবলে বেদান্ত-দর্শন, সাংখ্যের সেই

অতি সুন্দর প্রকৃতি পুরুষবাদের মূলোচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী হইয়া, একমাত্র ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান কাবণ বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পাঠিব ।

সহ রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ ব্যতি-
বিলম্ব জগতে অতরূপ গুণের অস্তিত্ব নাই ।
এই ত্রিবিধ গুণের মিশ্রণ বা অদ্বৈতিক
বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক সৃষ্টপদার্থেই পরিলক্ষিত
হয় । এই গুণত্রয়, সূত্রদ্বয় ও মোহাদ্বয়ক ।
এই গুণত্রয় বন্ধন সামান্যস্থায় থাকে, তখন
তাহাকেই “প্রকৃতি” বলা যায় । নিশ্চুর্ণ
চৈতন্যময় পুরুষ, ভোগাপবর্ণ সাধনের
জন্ত, কাম্য বা অদৃষ্ট বশতঃ সেই অচেতন
প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হয় । তাহা হইতেই
প্রকৃতির কাষ্যাকাষে পরিণাম হয় । সেই
সংযোগ ফলে, প্রকৃতির মধ্যে বৈবৰ্য্য
উপস্থিত হয় । অর্থাৎ সামান্যবস্তুর বিচ্যুতি
হইয়া একটা গুণ অপব অপেক্ষা কিছু বেশী
প্রবল হয় ;—সেই বৈবৰ্য্য ক্রিয়া বলেই
মহত্ত্বাদি ক্রমে সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হয় । প্রকৃতি
অচেতন ও জড় ;— পুরুষ, নিশ্চুর্ণ, নিষ্ক্রিয়
ও চেতন । সূত্রবাৎ সমস্ত জগতের কাবণ
সেই অচেতন প্রকৃতি । প্রকৃতির স্বাভাবিক
পরিণাম হইতেই এজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ।
সংক্ষেপতঃ ইহাই সাংখ্যমত । একথা আমরা
এই প্রবন্ধের প্রথম সংখ্যায় বলিয়া আসি-
য়াছি ।

বেদান্ত, সাংখ্য-প্রবর্তিত এই প্রকৃতি-
পুরুষবাদের যথাযথ খণ্ডন করিয়া স্বমত
প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন । বেদান্তের যুক্তি
সমূহ প্রধানত নিম্নে বিবৃত হইল ।

১। সাংখ্য বলেন, অচেতন সূত্রদ্বয়
মোহাদ্বয় প্রকৃতিই সৃষ্ট বিষয় বা পদার্থ সমূ-

হের কারণ । যেমন ঘটশরাবাদি জড় পদার্থ
সমূহ মৃত্তিকা প্রভৃতি সমন্বিত বলিয়া, মৃত্তিকা
প্রভৃতিই ঐ ঘটাদির কারণ ;—সেইরূপ
বাহ্যিক ও আন্তরিক সমুদয় পদার্থ সূত্রদ্বয়
মোহাদ্বয় বলিয়া, উহাদের কারণ ও সূত্রদ্বয়
মোহাদ্বয়ক । সেই সূত্রদ্বয় মোহাদ্বয় অচে-
তন ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি চেতন পুরুষের ভোগা-
পবর্ণ সাধনের জন্তই স্বভাবতঃ গুণবিক্ষোভ-
বশতঃ বিচিত্র জগদাকাষে স্বয়ংই পরিণত
হইয়া থাকে । কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই
যে, এজগতে কোথায় দেখিয়াছি যে, অচেতন
পদার্থ, কাহারও কোন প্রয়োজন সিদ্ধির
জন্ত, চেতন দ্বারা চালিত না হইয়া স্বয়ংই
কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ? চেতন দ্বারা
প্রেরিত বা অধিষ্ঠিত হইলে, তবে অচেতন
কার্য্য করিতে সমর্থ হয় । অচেতন প্রকৃতি
কি করিয়া কেবল স্বভাবতঃই পরিণত হইয়া
এজগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে ? অতএব
সাংখ্যের সেই “পুরুষার্থ এবং হেতুঃ, ন কেন
চিং কার্য্যতে করণং”—এ উক্তি নিতান্তই
অসার । সৃষ্টিকার্য্যে কেবলমাত্র পুরুষার্থই
(ভোগাপবর্ণ) কারণ হইতে পারে না,
উহা চেতন দ্বারা চালিত হওয়া নিতান্তই
আবশ্যক । অচেতন জড় মৃত্তিকাদি যদি
চেতন কুন্তকারাদি কর্তৃক প্রেরিত বা
চালিত না হয়, তবে যুগসংশ্রেণে সেই
মৃত্তিকাদি হইতে একটা ঘট উৎপন্ন হইতে
পারে না । সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে,
চেতন দ্বারা অচালিত বা অনধিষ্ঠিত হইয়া,
অচেতন প্রকৃতি স্বয়ং এ জগতের কারণ
হইতে পারে না ।

তারপর, সাংখ্য সমস্ত পদার্থ সূত্রদ্বয়
মোহাদ্বয় বলিয়া, তাহাদের কারণেও সূত্র
দ্বয় মোহাদ্বয় প্রকৃতিকেই দেখিয়াছিলেন ।

কিন্তু শব্দাদি সমুদয় বিষয় মাত্রই বাহ্যিক।
আব সূত্র দুঃখাদি বাহ্যিক নহে,—ইহাবা
আন্তরিক বা মানসিক বস্তুমান। অতএব
পদার্থ সমূহ যে সূত্র দুঃখ মোহান্বক, একথা
ভ্রান্তিপূর্ণ। কেননা, বাহ্যিক পদার্থ কিরূপে
আন্তরিক সূত্র দুঃখ মোহান্বক হইতে পারে?
আবাব দেখ, একই বিষয়, লোক, বাসনাব
বৈচিত্র্যবশতঃ কাহাবও পক্ষে দুঃখজনক,
কাহাবও পক্ষে সুখান্বক, আবাব কাহাবও
নিকটে সেই বস্তুই যে হজনক হইয়া থাকে।
একই বস্তুতা-বদন স্বামাব নিকটে পবমা-
নন্দজনক, আবাব উহাই, মপল্লীৰ মহা
বিদেষ ও পবন দুঃখ উপাদান কবিয়া থাকে।
অতএব বিষয় বা পদার্থ সমূহ স্বয়ং সূত্র দুঃখ
মোহান্বক—একথা হইতেই পাবে না।

তাবপৰিসংখ্যাব আব এক যুক্তি এই
যে, সৃষ্ট পদার্থ যখন পৰিমিত (I imited),
তখন উহাব কাবণ অবগুই প্রকৃতি। কথাটা
একটু অনুবাদন কবিয়া বুঝিতে হইবে।
দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহাবই পৰিমাণ
আছে (Measured) অর্থাৎ যে বস্তুবই
ইয়দা বা সীমা পৰিচ্ছিন্ন কবা যায়, দেখা
যায় যে, সেই তিন বা ততোধিক কাবণেব
সংসর্গে বা মিশ্রণে তাহাব উৎপত্তি। যেমন
দেখ, বৃক্ষেব মল, অঙ্কবাদি পদার্থ “পৰিমিত”
(I imited)। উহাবা নিশ্চয় বীজ, ভূমি, ও
জলাদিব একত্র সংসর্গে বা মিলনে উৎপন্ন
হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই
যখন পৰিমিত, তখন ইহা ঠিক অনুমান
করা যাইতে পাবে যে, সৃষ্ট পদার্থও জুই তিন-
টির সংসর্গে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব এক
অধিতীৰ ব্রহ্ম ইহাদের কারণ হইতে পাবে
না। কেননা, অধিতীৰ ব্রহ্মের ত আর
পরস্পর সংসর্গ সম্ভব হয় না। অতএব

পদার্থ মাত্রেই সত্ত্ব, বজ ও তম—এই ত্রিবিধ
গুণের সংসর্গে বা মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।
কিন্তু সাংখ্যেব একপ উক্তি শ্রুতি মবুব মান।
কেননা, বস্তু পৰিমিত হইলেই যদি তাহা
অণু বা অণুটীৰ “সংসর্গ” হইতে উৎপন্ন
হওয়া নিয়ম হয় তবে সত্ত্ব বজ ও তম—
ইহাবাও যখন পরস্পর পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ
বিভিন্ন,—তখন ইহাবাও ত পৰিমিত।
সুতরাং সত্ত্ব বজ তমেরও আবাব “সংসর্গ
জন্ম” বোন কাবণ স্বীকার কবা অনিবাধ্য
হইয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃতিব ত আব
কাবণান্তব নাই। অতএব অচেতন প্রকৃতি
পৰিণত হইয়া জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে—এ যুক্তি
অসাব ও অলীক।

২। সৃষ্টিব প্রাক্কালে নিগুণেব সাম্যা
বস্থাৰ বিচ্যুতি ঘটে। সৃষ্টিকালে, প্রকৃতিব
বৈষম্য হয় অর্থাৎ কোন গুণ পবান, কোন
গুণ অপেক্ষাকৃত অপ্রবান হইয়া পড়ে,
তৎপবে এইকপ বৈষম্য হইলে পব মহাদি
ক্রমে সৃষ্টি হয়। ইহাই সাংখ্য মত। কিন্তু
জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রকৃতিব এইকপ কার্যে
প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব কি না? যুগ্মিকাদি
বা বখাদি, কখনও কুন্তকাবাদি বা অখাদি
কতক চালিত না হইলে, কাণ্যে প্রবৃত্ত
হইতে পাবে না। সুতরাং অচেতন প্রকৃ-
তিব স্বভাবত কি কবিয়া কার্যে প্রবৃত্তি
হইতে পাবে? প্রবৃত্তি বা কাণ্যেব আশ্রব
স্বরূপ দেহাদি সম্বলিত চেতনেবই কার্যাকা-
বিতা দেখা যায়। কেবল চেতন বা কেবল
অচেতন পদার্থেব কার্যে প্রবৃত্তি হইতেই
পাবে না। অচেতনে, চেতনেব ক্রিয়া বা
অধিষ্ঠান না হইলে, কার্যে প্রবৃত্তি জন্মিতেই
পাবে না। যদিও চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের
কোনরূপ প্রবৃত্তি নাই, তথাপি, প্রবৃত্তি-

রহিত-রূপাদি যেরূপ চক্ষুরাদির প্রবর্তক, সেইরূপ সর্বশক্তিমান ব্রহ্মও সর্ববিধ কার্যের প্রবর্তক । অতএব অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব ;—সুতরাং সাংখ্য মতে সৃষ্টিও অসম্ভব হইয়া পড়িল ।

৩। যেমন গোত্রধা অচেতন হইলেও, গোবৎসের পুষ্টির জন্ত, স্বভাবতই ক্ষবিত হয় ; যেমন জন অচেতন হইলেও, লোকোপকারার্থ স্বভাবতই সান্দিত হয় ;—তদ্রূপ প্রকৃতি অচেতন হইলেও, পুরুষার্থ সাধনের জন্ত স্বতঃই প্রবৃত্ত হইবে—ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? কিন্তু সাংখ্যের একরূপ যুক্তি তত সাধু নহে । উপরোক্ত দৃষ্টান্তে, দুগ্ধ ও জল উভয়েতেই চেতনাধিষ্ঠান রহিয়াছে । ধেমু চেতন ;—চেতন ধেমুর ইচ্ছা বা স্বীয় বৎসের প্রতি স্নেহের জন্তই ত দুগ্ধ ক্ষরিত হয় । চেতন বৎসও ত আকর্ষণ করিয়াই দুগ্ধ ক্ষরিত করায় । অতএব নিরপেক্ষ ও নিরবচ্ছিন্ন অচেতনই স্বভাবত প্রবৃত্ত হয়, ইহা ত কোথাও দেখা যায় না । তারপর, সামান্যস্থাপন্ন প্রকৃতিতে কে তবে কার্য্য উৎপন্ন করায় ? পুরুষ ত সাংখ্যমতে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন । সুতরাং নিষ্ক্রিয় পুরুষ কদাপি প্রকৃতির প্রবর্তক হইতে পারেন না । কে তবে প্রবৃত্তিতে প্রথম বৈষম্য-রূপ বিক্রিয়া উপস্থিত করিল ? অদৃষ্ট বা কৰ্ম্ম ও প্রবর্তক হইতে পারে না । কেননা, সাংখ্যমতে, প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত কৰ্ম্মের সন্ধান কোথায় ? কৰ্ম্মও ত প্রকৃত্যাত্মক এবং অচেতন । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতির নিজের যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সামর্থ্য নাই, এবং উহার যখন অস্ত কোন প্রবর্তক নাই, তখন সৃষ্টি ক্রিয়াও আরম্ভ হইতে পারে না ।

৪। আমরা উপরে দেখিয়া আসিয়াছি যে, প্রকৃতির বিনা কারণে প্রবৃত্তি হইতে পারে না । প্রকৃতির বিক্রিয়া বা কার্য্য হইতে হইলেই তাহার একটা প্রবর্তক বা কারণ আবশ্যক । আর যদি তর্কের অজু-রোধে স্বীকারই করা যায় যে, প্রকৃতি পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্ত স্বতঃই প্রবৃত্ত হয় ;—এরূপ স্বীকার করিলেও বিষম দোষ আসিয়া পড়ে । স্বীকারই করিয়া লইলাম যে, প্রকৃতি স্বভাবতই কার্য্যাকারে পরিণত হয় এবং বাস্তব কোন সাধনের অপেক্ষা করে না ;—তাহা হইলেই জিজ্ঞাস্য, যদি সহকারী কোন রূপ কারণের অপেক্ষা না থাকে, তবে বল যে, কোন “প্রয়োজনেরও” অপেক্ষা নাই । তবে আর তুমি কেমন করিয়া বলিতে পার, যে “প্রকৃতি প্রাণীর ভোগাপবর্গ সাধনরূপ প্রয়োজনের জন্তই কার্য্যাকারে পরিণত হয় ।” এরূপ “প্রয়োজন” স্বীকারেরই বা প্রয়োজন কি ? তারপর আর এক আপত্তি এই যে, এ কিরূপ প্রয়োজন ? ‘ভোগ’ই যদি প্রয়োজন হয়, তবে যিনি কুটস্থ, যিনি সুখ দুঃখাদি হইতে বহুদূরে অবস্থিত, সেই অসঙ্গ উদাসীন পুরুষের আবার ‘ভোগ’ কিরূপ ? নিঃসঙ্গ পুরুষের আবার সুখদুঃখ ভোগ কি ? আর যদি “অপবর্গের” জন্তই প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় বল, তবে প্রবৃত্তির পূর্বেও ত অপবর্গ বা মুক্তি বর্তমান ছিল । সুতরাং প্রবৃত্তি অনর্থক হইয়া পড়ে । আর যদি “প্রকৃতির ঔৎসুক্য-নিবৃত্তি”র জন্তই প্রবৃত্তি জন্মে বল, তবে একটা দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে । অচেতন প্রকৃতির ‘ঔৎসুক্য’ সম্ভবে না ;—এবং শুদ্ধ নির্মল পুরুষেরই বা ঔৎসুক্য আসিবে কোথা হইতে ?

৫। সাংখ্যের আর একটা যুক্তি এই

যে, যেক্ষণ একটা পক্ষ (যাহাব দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু চলৎশক্তি বা প্রযুক্তি শক্তি নাই), অপব একটা অন্ধকে (যাহাব দৃষ্টি-শক্তি নাই, কিন্তু প্রযুক্তি আছে) চালাইয়া লইয়া যাইতে পাবে; যেক্ষণ চক্ষু কলৌহকে আকর্ষিত কবে, তদ্রূপ পুরুষ ও প্রকৃতিকে কাথো শ্রবৃত্ত কবায়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে সাংখ্যের এ যুক্তিও অসঙ্গত বলিবা বোব হইবে। সাংখ্যমতে পুরুষ উদাশীন। উদাশীন পুরুষ কি কবিবা প্রকৃতিকে চানাইবে? পক্ষুও ত অন্ধকে বাক্য ইত্যাদি দ্বাৰা প্রবর্তিত কবায়। কিন্তু পুরুষ ত নিষ্ক্রিয় ও নিগুণ। আব যদি বল যে, চক্ষু যেনন লৌহের স্নিকর্ষে থাকিযাই, তাহাতে ক্রিয়া

উৎপাদন কবায়, তদ্রূপ পুরুষ ও প্রকৃতির স্নিকর্ষ বা সান্নিধ্য হইলেই শ্রবৃত্তি হইবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, পুরুষ ও প্রকৃতির ত সঙ্গমের সন্নিধ্য বহিষাছে। তবে নিতাই সৃষ্টি হউক না কেন? স্রুতবাং পুরুষ উদাশীন বলিবা, প্রকৃতি হঠাৎ বনিয়া, এবং এতভয়েবব পবম্পব মিনন বা সম্বলব ত্তান কোনকণ কাবণেব অসম্ভাব বশতঃ প্রকৃতিব কদাচ কাব্যাকাবে পবিণাম হইবেই পাবে না। অতএব সাংখ্যমতে সৃষ্টিই হইতে পাবে না। অতএব সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষবাদ তত সমাচান নহে।

ত্রিকোকিলেধব ভট্টাচার্য্য।

খোকার বিলাতের পত্র। (১)

প্রীতীচরণকমলেশু,—

পুনঃ পুনঃ আমাব ভ্রমণেব বৃত্তান্ত জানিতে চাহিতেছ। পথে যেইখানেই স্রমোণ পাউয়াছি, সেখান হইতেই পত্র লিখিয়াছি, যতদূব সম্ভব পথেব সংবাদ দিযাছি। কিন্তু তবুও তাহাতে তোমাদেব মনস্তৃষ্টি হয় নাই। যাহা হউক, আমাব খাতা হইতে যতদূব সম্ভব পথেব সমস্ত ‘সবিশেষ’ কথা লিখিতে বসিলাম। এবিবরণ বড়ই সংক্ষিপ্ত হইল।

ইংবাজি নবেধব মাসেব এবা, শনিবাব-রাত্রি তোমবা আমাকে জাহাজে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গেলে। যখন তোমাদের নৌকাগুলি ফিরিতেছিল, আমি তখন ডেকের উপরে। যতক্ষণ সম্ভব, কেবল তোমাদের পানে তাকাইয়া রহিলাম। ছুট অন্ধকার শীঘ্রই তোমাদিগকে তাহার কোলে লুকা-

হল। আব তোমাদের দেখিতে পাইতেছি না, তবুও তাকাইতেছি পাঁজিতেছি। বোধ হয়, ভুলিয়া তোমরা এবটা জিনিষ আমাব সঙ্গে দাও নাই। আমাব বেশ মনে আছে, আমবা বাড়ী ছাড়িযাব সময় অতিকষ্টে সেটাকে জাহাজ পশাস্ত আনিযাছিলাম; কিন্তু ভুলিয়া জাহাজে তোলা হয় নাই। আমি ভুলিবে পাবি নাই—তোমবাও দাও নাই। তোমবা ফিবিযা গেলে, আমাব প্রাণটাকেও লইযা গেলে? কি বিষম ভুল! প্রাণ লইলে কি প্রাণী বাচে? আমি ছটফট কবিতে লাগিলাম। ডেকের উপর তখনও দাঁড়াইয়া আছি। ঐ বৃষ্টি তাহাবা ফিবিযা আসে। কই?—কিছুই নয়, আকাশ-কুহুম। ১১টা, ১২টা, ১টা বাজিয়া গেল, তবু তোমরা আসিলে না। তখন নিরাশায় আমার ক্ষুদ্র ঘরে ফিরিলাম।

কেমন সুন্দর ঘর । সাদা ছুধের মত পরিষ্কার বিছানা । আয়না, চিকনি, ক্রস, তোয়ালে, পিপাসা-নিবারণের জন্ত শীতল জল, গ্লাস, সুন্দর, পরিষ্কার, পরিপাটী, কিছুই অভাব নাই । কেমন সুন্দর বৈজ্ঞানিক আলো ! সবই সুন্দর, কিন্তু আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না । যত গ্রীষ্ম কি আমার ঘরে?—জানালা (Port-hole) খুলিয়া দিলাম বাতাস নাই । বায়ু খুলিলাম, তোমরা যে পাখা দিয়াছিলে, তাহা বাহির করিলাম । বাতাস করিতে করিতে হাত ব্যথা হইল, প্রাণ ঠাণ্ডা হইল না । প্রাণই নাই,—ঠাণ্ডা হইবে কি ছাই ! বিদায় দিবাব সময় তুমি বলিছিলে—‘বৃষ্টি হইলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে । প্রার্থনাই আমাদের এক মন্ত্র মঙ্গল ।’ সে কথা আমি ভুলি নাই । একবার, দুইবার, কতবার বেতাহাব নিকটে সাস্তনা ভিক্ষা চাহিলাম, দিক নাই । বানি প্রায় শেষ হইতে চলিল । ঘাড় টুন্টুন্ করিয়া তিনটা বাজিল । এখন একটু ভাল লাগিতেছে;—রাত্রি শেষে প্রায়ই শীতল বাতাস বহিয়া থাকে । এই সুযোগে কি জানি কখন নিদ্রাদেবী আমার চক্ষের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিলেন । ক্ষণেকের জন্ত বেশ ঘুমাইলাম । কত কি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম । যদিও সেই সব স্বপ্ন ঘুমের ব্যাঘাৎ জন্মাইতেছিল, তবুও ক্লান্তির পর ঘুমাইলাম বেশ । এখন ভাব পাঁচটা । আর ঘুম হইল না । ষটিয়ারের শিকল সন্ধ্যের কড়মড় শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল । উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইলাম । ডেকের উপরে যাইতেছি, দেখিলাম, (Mr. Rowe) রো সাহেব আমার বোর্জ করিতেছেন; (Steward) কে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন । আমি তাঁহার

নিকটে গেলেম; সহজেই বেশ আলাপ হইয়া গেল । এমন ভাল লোক আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি । তাঁহার সহিত উপরে গেলাম । তিনি আমাকে মিসেস্ রো (Mrs. Rowe) এর সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন । তাঁহার দেব সহিত কথাবার্তা করিয়া অনেকটা শান্তি পাইলাম । আজ রবিবার, মেটেবুক-জের কাছে আমরা গিঞ্জার ঘণ্টাঘনি শুনিতে পাইলাম । মিঃ রো বলিলেন ‘প্রায় একমাস আর উপাসনালয় (church) দেখিতে পাইব না, দেখিলেও যোগ দেওয়া হইবে না ।’

আমরা এ জাহাজে (Enden) অনেক লোক নই । জোর ৫০ জন ভদ্রলোক যাত্রী । জাহাজে লোকের সহিত আলাপ হওয়া বড়ই সহজ । সকলেই ডানে, মাঝে একাকা থাকিতে ভালবাসে না । জাহাজে তাতে আবার কোন কাজ কর্ম নাই । চুপটা করিয়া কোন কাজ না করিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব । কাজেই সহজেই পবম্পরে আলাপ হয় । কলিকাতা হইতে লণ্ডনের যাত্রী মোটে পাঁচ জন ছিলাম । Mr. Rowe, Mrs. Rowe, Mr. Nutter, Dr. Alcock এবং আমি । প্রথম দুইজনকে তোমরা চেন । তৃতীয় ব্যক্তি বোম্বাইতে British Marine Service এ কাজ করেন । বয়স বড় বেশী নয়, ২০১১ । বাড়ী স্কটলণ্ডে । এক বৎসরের ছুটি লইয়া দেশে যাইতেছেন । ইনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন । ক্রমে ক্রমে ইহার অনেক কথা লিখিতে হইবে । তারপর, Dr. Alcock, ইহাকেও বোধ হয় তোমরা জান । আমাদের কলিকাতার বাহুঘরের ইনি গৃহাবধায়ক (Supdt.) পনর মাসের কলোঁ পাইয়া এক বার বাড়ী গানে যাই-

তেছেন। ইনি অত্যন্ত বিনীত, অহঙ্কার-শূন্য। আমি ইহাকে চিনিতাম না, কিন্তু ইনি স্বয়ং আসিয়া আলাপ করেন। ইনি যে এত বড় লোক বুদ্ধিতে পারি নাই, কেন না, তিনি স্বভাবত স্তম্ভিত আচার ব্যবহারে বুদ্ধিতে দেন নাই। আমাদের দেশী কোন লোক যদি এত উচ্চপদ পান, গর্বে কুলিয়া উঠেন, আর কাহাবও সহিত কথা বলেন না। সভ্যতার তারতম্য কি এইখানে নাই?

আগেই বলিয়াছি, বায়ে ঘুম হয় নাই।

সেই জন্য শরীর কেমন কেমন করিতে লাগিল। রো সাহেবের আদেশ মত বেশ করিয়া মাথা ধুইয়া ফেলিলাম। আমাদের ব্রেকফাস্টের সময় পূন্যাত্র ১০টা। স্নানাদি করিতে প্রায় দশটা বাজিল। এই আমার প্রথম দিন;—টেবিলে গেলাম। আচাব ব্যবহারে যদিও আমি অভ্যস্ত নই, তবুও পূর্ণিগত বিদ্যা আমার বেশ ছিল, ওয়েব (Webb) সাহেবের বই খানি পড়িয়া প্রায় মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তাই আমাকে কোন বিশেষ লজ্জার পড়িতে হইল না। অন্ততঃ ডান হাতে চামচ, বামহাতে কাটা ধরিতে জানি। কিন্তু কাটা ধরা জানিলে হইবে কি?—পেট ভরে কই? আমার ইচ্ছা করিতেছিল, একবার ধাঁ করিয়া খানিকটা হাত দিয়া খাইয়া ফেলি, কিন্তু পারিলাম কই? পেট তরিলনা, ক্ষুধা মনে ঘরে আসিলাম। সঙ্গে যে সমস্ত দেশী খাবার ছিল, তাহা খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলাম।

এখন বেলা ১১টা। জাহাজ এখনও যাত্রাতে। একখানা দুইখানা জাহাজ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও জোয়ার আছে। তবুও জাহাজ আস্তে ২ চলিতেছে, কিন্তু জানি পাছে

ডাঙ্গায় লাগিয়া যায়। ক্লান্তি হেতুও বটে, আর পূর্ক রাত্রির অনিদ্রা হেতুও বটে, গঙ্গার সুন্দর শীতল বায়ুতে, ডেকের উপরে চেয়ারে বেশ ঘুমাইলাম। বড় সুন্দর খুম হইল। কতক্ষণ ঘুমাইলাম, জানি না, কিন্তু যখন বেলা প্রায় সাড় তিন, সেই সময়ে নঙ্গর সিকনের ভয়ানক শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এখনও আমরা নদীতে, নদী নয়, বাহাকে সকলে গঙ্গাসাগর বলে। চারি ধাণেই গুল, সম্মুখে একটু চড়া দেখা যাইতেছে। হঠাৎ মধ্য নদীতে নঙ্গর করিতে দেখিয়া একটু ভয় হইল। ভাবিলাম, বুদ্ধি চড়ায় ঠেকিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে সকলের মুখ প্রসন্ন দেখাইত না। আমি রো সাহেবকে এইকপ স্থানে থামিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, “কোন ভয়ের কারণ নাই। এখন ভাঁটা পড়িয়াছে, এবং এই সমস্ত স্থান তত গভীর নয়, সেই জন্য আবার জোয়ার হওয়া পর্যন্ত জাহাজ এইখানে থাকিবে।” ক্রমে আরও দুই এক খানি জাহাজ আসিয়া আমাদের আশে পাশে নঙ্গর করিল। আমাদের জাহাজ নঙ্গর করে প্রায় সাড়ে তিনটার সময়। সূর্য্যের এখন তত তেজ নাই, প্রায় ডুবু ডুবু হইতেছে। আমরা এই সময়ে চা খাইতে আমাদের খাবার ঘরে গেলাম। চা খাইতে আমার বড় কষ্ট হইল না, কেননা ইহাতে বেশী কোন চাল-চলন (etiquette) নাই। ওয়েব সাহেবের বইখানি একবার দেখিয়া লইলাম। চামচ দিয়া চা পান করা নিষেধ। চামচটী কেবল শোভার জন্য ও নাড়িবার জন্য। পেয়লা ধরিয়া পান করা নিয়ম। এই রীতি দেখিয়া আমার কোন বেশী কষ্ট হইল না, কেননা পেয়লা ধরিয়া চুমুক দেওয়া

বেশ সহজ ; ঐ একটু ২ ক'রে চামচ দিয়ে খাওয়াই কঠিন। হায়, অনভ্যাস হেতু চামচে আবার কিছুই উঠে না, সব পড়িয়া যায়। কোন বকমে কয়েক খণ্ড রুট, এক প্যালা চা খাইয়া আবার ডেকে গেলাম।

বিদায় গ্রহণের সময় প্রায় সকলই অতি নম্র, বিনীত হইয়া থাকে। প্রায় পাঁচটা বাজে। আমাদের গাচ অন্ধকারে ফেলিয়া সূর্য্যদেব বিদায় লইবার সন্মোগ দেখিতে-ছেন। এখন আর তাহাব সেই উগ মুষ্টি নাই। কত নম্র ! দিবসের উগ্রতাব জন্তই হউক বা অল্প কোন কারণেই হউক, এখন তিনি লজ্জায় বক্তৃতা-বর্ণ হইয়াছেন। না আন সহ হইল না, ধীরে ২ সমুদ্রের এক কোণে ধীরে ২ মুখ লুকাইতে লাগিলেন। সমুদ্র আনন্দে আট খানি ; কেমন প্রফুল্ল মনে তাহাকে স্নেহ কোল দিতেছে, দানি ২ নৃত্য করিয়া সূর্য্যকে ডাকিয়া লইতেছে। এখন পাখীগুলিও বিদায় দিবাব জন্ত বাচিব হইল। ঝাঁকে ২ তাহাবা ; দুবিলা ২ উড়িতে লাগিল। কেমন সুন্দর দৃশ্য ! তুমি ত এই দৃশ্য দেখিয়াছ, বেশ ব্যস্তেছ। আমরা ডেকের উপরে পাণ্টোপি কণিতে লাগিলাম ও স্বভাবের এই আশ্চর্য্য লাল বেলা দেখিয়া মোহিত হইলাম। বেশীক্ষণ দেখিতে পারিলাম না। ডিনারের ঘণ্টা বাজিল। সকলকে নীচে বাইতে হইল। ডিনার ছয়টার সময়। এইবার একটু ভাল করিয়া খাইতে পারিলাম। যাহা তাহা করিয়া খাইয়া অল্প সকলে কি প্রকাবে আহ্বার করে, তাই দেখিতে লাগিলাম। এইরূপ দেখিতে ২ শীত্ৰই বেশ ভাল করিয়া খাইতে শিখিলাম। ডিনারে খাইতে দেয় একটা বোল (soup), বিক্টেক, মাটন, কফি, আলু, কলা, লেবু,

আপেল, আনারস, কখন ২ আতা, নেশ-পাত্তী, বাদাম, কিস্মিস্, মনক্কা, তারপর কুলপি বরফ, (Ice-cream) শেষে চা কি কফি। এই জাহাজে মদটা জলেব মত ব্যবহৃত হয়। ক্লাবেট কিম্বা বিরাব যে যত চাষ, সে তত পার, কেবল ডিনাব সময়ে। অল্প সময়ে কিনিয়া খাইতে হয়। যাহাবা মদ না খায়, তাহাদের জল ভিন্ন উপায় নাই, কারণ গিননেড্ ১টা ছব পেন্স, মোড়া ৩ পেন্স।

গত রাত্রে ঘুম হয় নাই, গরমেব জন্ত। আব জানিয়া শুনিয়া কি ঐ পাষবার খুবীতে ঘুমাউতে পারি ? রো সাহেবের কথা মত ধূয়াটকে বলিয়া ডেকের উপরে বিছানা কবাইলাম। আমরা সকলেই ডেকের উপরে ঘুমাইলাম। ঘুম বেশ হইল। নদীব শীতল বায়ুতে কান না ঘুম হয় ?

সোমবার, ৫ই অক্টোবর, ৯৬। পাঁচটার সময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এখন জোয়ার আসিয়াছে। জাহাজ ছাঁচবার উদ্যোগ করিতেছে। উঠিয়া বাহাকেই সম্মুখে দেখিলাম, তাহাকেই গুডমর্নিং (good morning) করিলাম, কেননা, এইরূপ বেলা কবে, সে নিতান্ত অসভ্য। প্রক্কাপ্পদ ডাক্তার বাবু ইহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন। আব ঘণ্টা পরে জাহাজ ছাড়িল। প্রাণকালের দৃশ্য আরও সুন্দর ! কেমন সুন্দর মহাস্য বদনে সূর্য্যদেব শীতল সমুদ্র-জলে স্নান করিয়া পবিত্র ও নির্মল হইয়া উদ্ভিত হইতেছেন। মাধে কি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ইহাকে দেবতা রূপে বর্ণনা করেন। আমার ইচ্ছা হইল, একবার সূর্য্যদেবকে প্রণাম করি। কিন্তু তাহাকে না করিয়া সূর্য্যের সৃষ্টিকর্তা, পিতার পিতা, মাতার মাতা, অসহায় সমুদ্রবক্ষে একমাত্র সহায় সম্বল, ভূবার্ণবের কাণ্ডারী, দয়াময় স্নান-

বন্ধুকে অন্তরের ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাইব।
 জ্ঞান আমার নিজস্ববে গেলাম। অনেকক্ষণ
 ধবিষা তাঁহার পূজা কবিয়া, শাস্ত হইলাম।
 অবশেষে স্নান কবিবাব জ্ঞান প্রস্তুত হইলাম।
 এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে ফবানী জাহাজেব
 কঠে পড়িতে হয় নাই। এতক্ষণ তাহাবা
 যাহা দিয়াছে, তাহাই খাইযাছি। আমার
 কিছুই চাহিতে হয় নাই। এখন হোয়ালে
 চাই, বোঝেনা, সাবান চাই, দেব না। তাহা-
 দেব দোষ কি, তাহাবা ইংলিজ কিম্বা হিন্দী,
 কিছুই বুঝিতে পারে না। আমি মহা মুচ্ছিলে
 পড়িলাম। সেই ফরাসী এই খানি দেখিয়া
 ছুই একটা কথা শিখিলাম। কোন বকম
 তাহাদেব জানিতে দিলাম, আমি দবাশ ভাবা
 জানি না। স্নান কবিতে চাই, সাবান তো
 য়ালে দাও। তোয়ালে দিল বটে, কিন্তু সা-
 বান কই, কি বলে ছাই ওষু কিছুই বুঝি।
 তার পর তাহাদেব ভাব ভঙ্গিতে বুঝিলাম
 যে, সাবান দেওয়া তাহাদেব নিয়ম নয়।
 বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। স্নান কবিয়া নিজের
 ঘবে গেলাম। এখন এইরূপ অসময়ে আবাব
 নিদ্রাদেবী কৃপা কবিলেন। বিছানার বেশ
 ঘুমাইয়া পড়িলাম। ১০টা বাজিয়া গেল, ভস্-
 নাই। আমার লোক (waiter) আনাকে
 ডাকিয়া, ব্রেকফাস্টেব সময় হইয়াছে, জানা-
 ইল। শরীব ভাল লাগিতেছে না। মন ভাল
 না থাকিলে কি শরীব ভাল লাগে? কোন
 রকমে একটু খাইলাম। সেই সিদ্ধ পোড়া
 মাংস দেখিয়াই বমি আসিতে লাগিল। এখ-
 নও আমার রুচি স্তম্ভিত হয় নাই। খাইয়া
 বমি বমি লাগিতে লাগিল। ছুই একখানা
 বেলেব মোরক্বা খাইলাম। আবাব ঘুমাইব,
 ভাবিলাম। কিন্তু তাহার পূর্বে একবার
 জেকে বেড়াইতে গেলাম। একি! অকুল—

অকুল নীল জল, কেবল নাল। ধু ধু করি-
 তেছে নীল জল। দূবে আকাশ সমুদ্রে
 চূষন কবিতেছে। যে দিকে চাই, কেবল জল
 আব আকাশ। অবত ড জাহাজখানি এখন
 যেন অতন অণিম জল বাশিব মবো তৃণ ক-
 গাব জায় বোব হইতে বাগিল। দূবে দেখি-
 লাম, তোনাদেব Sea Gull আসিতেছে।
 অনেক ক্ষণ দেবিলাম। দেখিতে দেখিতে
 ক্রান্ত হইলাম, আব ভাল লাগিল না। Sea-
 Gull আমাদের সমুখ দিয়া চলিয়া গেল।
 আমিও সমল বুঝিবা চেষাবেব উপবে ঘুমা-
 ইয়া পাড়লাম। ঘুমাছবা ঘুমাইবা তোমাদেব
 কপাস্থ প্রদেবিত বাগনান। ঘুমাছবা ঘুমা-
 ইবাও নিস্তাব নং, কত বাদিলান, জাগ্রত
 অবস্থায় কখনও এত কাঁদি নাই।

চাবিটা বাজিয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিবা গেল।
 জাগিয়া দেখি, Mr Rowe, Mrs Rowe
 এবং আর অপব ব্যক্তি পাণে গল্প কবিতো-
 ছেন। আমি সকলেব নিকট ক্ষমা চাহিলাম
 (Excuse me) বো বলিলেন,—বেশ ঘুমাই-
 যাছ। আমি—হা। বো বলিলেন, ‘জানিবে,
 সমুদ্রে ছুই চাবি দিন ঘুমাতে পাবিলেই
 ভাল, পবে মহিয়া যায। আব কোন অসুখ হয়
 না।’ তাবপর Mr Nutter এর সঙ্গে পাটাত-
 নের উপব পাটচাবি কবিতে লাগিলাম। জা-
 হাজে অনেক লোক, সকলেই আমাকে হাদব
 কবে, তবে আমার নামটা বড়ই বড়। যাহাবা
 অধিক ঘনিষ্ঠ, তাহাবা Mr. Ray বলিতে
 নারাজ, আমিও ভালবাদি না। অবশ্য অন্তান্ত
 সকলেই ঐ নামে ডাকে, তবে আমার বন্ধু
 গুলি কেন ঐ নামে ডাকিবে? আমার নাম
 জিজ্ঞাসা কবিল। আমি বলিলাম, বড়ই কঠি-
 না,—প্র-ভা-ত। তাঁহাবা সকলে মিলিয়া
 আমার Patrick নাম দিলেন। আমি ক্রমে

ক্রমে জাহাজে ঐ নামেই চলিলাম। মিঃ রো এখনও চিঠিপত্রে 'My dear Patrick' লিখিয়া থাকেন। বেড়াইতে বেড়াইতে ছয়টা বাজিল। ঘুবিয়া ঘুবিয়া প্রায় মাইল দুই তিন বেড়াইয়াছি। বেশ লাগিতেছিল। কিন্তু ক্ষুধা পাইরাছে, আর ডাকও পড়িয়াছে। সকলের সঙ্গেই আলাপ হইয়াছে, এখন আব টেবিলে বেশি লক্ষ্য কবে না। সমস্তই বন্ধু 'নাটাবের নিকট জিজ্ঞাসা কবিয়া লইতে পারি। খাইয়া নিজের ঘবে গিয়া ঘণ্টা দুই আইন পুস্তক পড়িলাম। আব ভাল লাগিল না; গরম বোব হইতে বাগিল। উপরে গেলাম। অগারপর বন্ধুগণের সহিত আলাপ কবিলাম। অনেক ক্ষণ গল্প করিলাম। তাব পব সকলে ডেকের উপব ঘুমাইলাম। বেশ ঘুম হইল, বেশ সুন্দর ঠাণ্ডা বাতাস। আরামে ঘুমাইলাম।

মঙ্গলবার, ৬ই অক্টোবর। যদিও প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমুদ্র বেশ শান্ত ছিল, যদিও নির্মল জলরশ্মি মধ্য দিয়া আমাদের তরীখানি ভাসিতে ভাসিতে, ছলিতে ছলিতে কত কি রঙ্গ করিতেছিল, যদিও সূর্য্যদেব নির্মল মেঘশূন্য আকাশ হইতে প্রথর কিরণ বিস্তার কবিয়া রাত্রের শীতলতাকে বিনাশ ও দিবসের শোভা বর্ধন করিতেছিলেন, যদিও আজ প্রকৃতি রীতিমত নূতন সাজে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া জগতকে মুগ্ধ বিমুগ্ধ করিতে কুষ্ঠিত নন; তবুও কি জানি কেন, কোন অজানিত কারণে আমার এ সব ভাল লাগিতেছে না। প্রথম প্রথম সমুদ্র দেখিব বলিয়া কত উৎসাহের সহিত আমি জাহাজে আসিয়াছিলাম। তুমি যখন 'উৎকল-ভ্রমণ' করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সমুদ্রের গল্প করিতে, কত ইচ্ছা হইত, একবার

দেখিয়া আসি। ঐ নামে পুস্তকখানি বাহির হইলে কত উৎসাহের সহিত সমুদ্র-বর্ণনা পাঠ করিতাম। পুরাতন সাধ পূর্ণ হইবে বলিয়া কত আনন্দ হইরাছিল। বিবাতা সমুদ্র দেখিবাব সুযোগ দিলেন বটে, কিন্তু এই তিন দিনেই আনাব সাব বেশ মিটিয়াছে। আজ আর ভাল লাগে না। শরীর ভাল লাগে না, মন কি চায়, পায় না, প্রাণ উদাস উদাস। সমস্তই অবমানগ্রস্ত। সুযোগ বুঝিয়া শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। কি করি, কোথায় বাহ, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। পূর্ণ দুই দিন ডেকের উপরে শয়ন কবিয়া একটু একটু সদিও বাগিয়াছে, বড় বিশ্রী লাগিতে লাগিল। একবার কেবিনে, একবার সেলুনে (saloon) একবার ডেকের উপর, এইরূপ ছটুই কবিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। একবার ভাবিলাম, বাই, সকলের সঙ্গে কথাবাড়া করি, মন প্রফুল্ল হইবে। কই কিছুই হইল না; বন্ধু বাঙ্গালী জাতির বিধন সমালোচনায় আমার বিবক্তি হইল। তাহার প্রেক্ষণ ভাবে আরম্ভ করিল, কি করি, পদে পদে আমাদের নীচতা স্বীকার করিতে হইল। একটু তক কবি, আর পারি না। ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছি, আমাদের দেশ পাশ্চাত্য জগতের কত পশ্চাতে! শেষে আমি বলিলাম, বেশ, আমি বাঙ্গালী বলিয়া আমাকে ঘৃণা করেন নাকি? তাহারা আমাকে বড় ভালবাসেন, এই প্রশ্ন শুনিয়া বুঝিলেন, আমি মর্ম্মাহত হইরাছি। আর ঐ বিষয়ে কোন কথা (অন্ততঃ সেই দিন) বলিলেন না। আমি তিক্ত বিরক্ত হইয়া নির্জ্ঞানতার অবস্থানে, একেবারে জাহাজের পশ্চাৎ-ভাগে চলিয়া গেলাম। সুবিধা পাইয়া চারিদিক হইতেই আমাকে চাপিয়া ধরিয়া।

তোমাদের কথা মনে পড়িল। স্মৃতি আসিয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। জাহাজ সমুখে চলিয়াছে; সমুদ্র খুব শান্ত, ঠাণ্ডা; আমি বসিয়াছি, ঠিক হালের উপরে, পশ্চাতে বতাই চলিতেছে, ততই আমি তোমাদের থেকে দূরে, —আরো দূরে পড়িতেছি। পশ্চাতে অনন্ত—কত অনন্ত যেন ফেলিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিলাম, যেখান দিয়া জাহাজ বাই-তেছে, পিছনে ঠিক একটি পথ ফেলিয়া বাই-তেছে। যতদূর চক্ষু গেল, পথটা দেখিলাম। এই পথ দিয়া স্মৃতি আসিয়া বাফসির মত চাপিয়া ধরিল। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

কাঁদিলাম তোমাদের কথা মনে করিয়া, কাঁদিলাম, আমার দেশের দুর্বলতার জন্য, কাঁদিলাম, আমার অপদার্থতা চিন্তা করিয়া, কাঁদিলাম, আরও কত কিছুর জন্য, তাহা লেখা দুঃসাধ্য এবং অযোগ্য। আমি পাঁচটার সময় আমার বন্ধুদের ছাড়িয়া আসিয়া নির্জনে বসিয়াছি। কখন কি জানি, খাবার ডাক পড়িয়া গিয়াছে, শুনিতে পাইনাই। আমার লোক (waiter) আসিয়া আমাকে ডাকিল। একদিন এইরূপ ঘূমাইয়া পড়িয়া আহারের সময় উপস্থিত হইতে পারি নাই। আজ আবাব সেইরূপ; বড় লজ্জায় পড়িলাম। আমি বলিলাম, আমার ভাল লাগিতেছে না, আমি টেবিলে বাইব না। আমাকে এক প্যালা দুধ আনিয়া দাও। সামান্য চাকর, তাহার শিষ্টাচার দেখিলে অবাক হইতে হয়। সে বুঝিল, আমার অসুখ হইয়াছে। দেখিলাম, সে চিন্তাযুক্ত হইয়াছে। কিছু পরে সে ডাক্তার সাহেবকে ডাকিয়া আনিল। আমি আশ্চর্য হইলাম। বাস্তবিক আমার তেমন কোন পীড়া হয় নাই। আমি ডাক্তারকে বলিলাম—‘না মহাশয়,

আমার বেশী কিছুই হয় নাই, তবে পূর্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত।’ আমার লোক আমাকে বিস্কুট, দুধ, চা, লিমনেড প্রভৃতি আনিয়া দিল। আমি তৃপ্তির সহিত আহার কবিলাম, কেননা, যদিও দুই তিন দিন পোড়া মাংস খাইতেছি, তবু তাহা ভাল লাগে না। আমার যদিও সন্দেহ হইয়াছে, তবু ডেকের উপবে শুইবার সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করিলাম না। সকলে মিলিয়া পুনরায় নিশ্চল পবিত্র উন্মুক্ত বাগতে সুখে নিদ্রা গেলাম। গাঢ় নিদ্রার মত আর ঔষধ আছে কি না, জানি না। অন্ততঃ দুঃখের হাত হইতে বিশ্রাম লইবার উহা এক অব্যর্থ ঔষধ।

বুধবার, সাতই অক্টোবর। পূর্ব দিনের মত আজও আমরা বঙ্গোপসাগরের অনন্ত (৭) জল-রাশির মধ্য দিয়া বাইতেছি। বুঝিতেই পারি-তেছি, আমাদের কেমন লাগিতেছে। তবে কিনা, আমার সন্দেহ কম, মাথাবরা মোটেই নাই, আর আমরা মাদ্রাজের কাছে আসিতেছি, সেই আশা। মান করিয়া, Breakfast এর সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না, এত ক্ষুধা পাইয়াছে। ক্ষুধার চোটে আজ ঐ মাংস বেশ লাগিল। কোন রকমে দিনটা কাটিয়া গেল। আমরা রাত্রি ১২-টার সময় মাদ্রাজে পৌছি। কিন্তু গভীর রাত্রে বন্দরে প্রবেশ নিষেধ বলিয়া আমাদের বাহিরেই নঙ্গর করিতে হয়। পর দিন প্রত্যুষে উঠিয়া দেখি, আমরা বন্দরে প্রবেশ করিতেছি।

মাদ্রাজ-বন্দর।

জাহাজ হইতে মাদ্রাজ সহর অতিশয় সুন্দর দেখাইতেছে। বন্দরটা অত্যন্ত সুন্দর। কেমন চারি দিকে প্রস্তর-নির্মিত দূর্গে

ঘেরা। একটি অতিশয় প্রকাণ্ড মুখ-ওয়াল
চোবাচ্চা। কত ২ জাহাজ রহিয়াছে। কেহ
জিনিষ তুলিতেছে, কেহ নামাইতেছে, কেহ
বা নিতেজ নিষ্কর্মা হইয়া কেবল বন্দরের
শোভা বন্ধন কার্য্য সমাধা করিতেছে। প্রায়
পাড়ে ছয়টার সময় আমাদের জাহাজ বন্দ-
রের মধ্যে নঙ্গব কবিল। দেখিতে দেখিতে
অনেক গুলি নৌকা আমাদের দিকে অগ্র-
সব হইল! আমাদের জাহাজের মাল সমস্ত
নামাইতে আরম্ভ করা হইল। মাল নামিলে
আবার মাল লওয়া হইবে। Notice Board এ
বিজ্ঞাপিত হইল, জাহাজ রাত্রি ১০ ঘটিকার
পূর্বে ছাড়বে না। এই সুযোগ বুঝিয়া,
আমরা মাল্লাজে নামিব স্থির করিলাম, কত-
কটা দেখিবার জন্ত, আব বিশেষতঃ (আগেই
বলিয়াছি ইহাণা সাবান দেয় না) সাবান
কিনিবার জন্য। আমরা কেহই সাবান
আনি নাই। সকলেই জানিতাম, জাহাজে
পাওয়া যাইবে। আবার সাবান ব্যতীত
সমুদ্র জলে স্নান করা বিষম দায়। আমরা
চা খাইয়া ডেকে আসিলাম। দেখি, ডেকের
উপরে এক প্রকাণ্ড বাজার বন্দিয়াছে।
রেশম, পশম, তুলাব জিনিষ, জুতা, ফিতা,
কালী, বস, মুচি, নাপিত, দজ্জি, ধোপা, যত
কিছু সমস্তই উপস্থিত। মাল্লাজ বাহুখেলার
জন্ত নাকি বিখ্যাত। আমাদের জাহাজে
নানা প্রকার খেলা আসিয়াছিল। সাহেব-
গণ খেলার আমোদ ভোগ করিবার জন্ত
তাহাদিগকে নিহুক্ত করিলেন। নানা প্রকার
মজার খেলা দেখিলাম। কত প্রকার ধাঁধা
সকলে কিনিলেন। তিন দিন পরে আবার
জমি আসিয়াছে, সকলেই উৎফুল্ল।

জাহাজ হইতে মাল্লাজের হাইকোর্টের
উপস্থিত নূতন আলোক-মঞ্চ দেখা যাই-

তেছে। দূরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড
বাড়ী। সারি সারি জাহাজ আফিস
বহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ট্রাম গাড়ী সকল
আসিতেছে, যাইতেছে। দূর হইতে আমার
মাল্লাজ বেশ লাগিতে লাগিল। বড় সাধ
হইল। একবার পাড়ে গিয়া দেখিয়া আসি।
রো সাহেব ও বন্ধু নাটার পাড়ে যাইবেন,
আমাকে লইয়া যাইবেন, বলিলেন। প্রাতঃ
ভোজনোপপরে আমরা চাবিজন মাল্লাজে
গেলাম। ভাড়া পাইবাব জন্ত অনেক নৌকা
আমাদের জাহাজের নিকটে আসিয়াছিল।
এক খানা ভাড়া কবা গেল। পাড়ে লাগিবা-
মাত্র কতকগুলি পাণ্ডার মত লোক আসিল।
সমস্ত স্থানে লইয়া যাইবে, সমস্ত কথা
বলিয়া দিবে। আমাদের ঐ প্রকার লোকে
বড় বেশী প্রয়োজন ছিল না। অনেক
সময় আছে, প্রায় ১২ ঘণ্টা, ইহার মধ্যে
সমস্ত স্থান সুন্দর রূপে দেখিতে পারিব।
আমরা পাণ্ডা লইলাম না। সর্ব প্রথমে
ডাক ঘবে গেলাম। অতি সুন্দর বাড়ী।
তবে আমাদের কলিকাতার ডাকঘরের মত
শুষ্ক নাই। পোষ্টকার্ড কিনিয়া চিঠি পত্র
লিখিয়া আমরা হাইকোর্টে গেলাম। হাই-
কোর্ট প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ঘুরিয়া ২ অনেক
গুলি এঞ্জলাস দেখিলাম। দেশী ব্যারিষ্টার
এবং উকিল মোক্তার সকলেই শূন্যপদে বিচ-
রণ করিয়া থাকে! তাহারা কেহই পাহুকা
ব্যবহার করে না! মন্দ নয়, জুতার অনব-
রত মন্দ মন্দ শব্দ হয় না; তবু যেন কেমন
আপুহী দেখায়। চোগা, চাপকান, পেন-
টুলেন (বা মাল্লাজী রেশমী ধুতি) পরা,
কিন্তু পা খালি! আমার বড়ই আশ্চর্য্য
বোধ হইল। কত স্থানে কত প্রকার রীতি,
দেখিলে অবাক হইতে হয়। তার পর দেখি-

লাম, আলোক-স্তুভ ; সময়েব অন্নতা হেতু এবং অত্যাচ্ছ কাৰণে আমরা আব উঠিলাম না। সেই খান হইতে আমবা ষ্টেসনে গেনাম। ষ্টেসনটি দেখিবাব জিনিষ। প্রকাণ্ড, বেশ সুবন্দোবস্ত। কিছুক্ষণ ষ্টেসনে বেড়াইয়া আমবা সাবান কিনিতে গেনাম। এমন ময়লা ও ধূলিময় স্থান আমি নিশ্চয়ই আব কখনও দেখি নাই। সে আব বলিবাব নয়। দাতায় বোধ হয় কোন কালে জল দেওয়া হয় নাই। চাহিলে, বুকি বা, সমুদ্রও বুজান যায়। এদিক ওদিক দেখিবা, সাবান কিনিয়া ফিণিলাম। কিবিবাব সময় অনেক আঙ্গুব কেনা গেল। যদিও মাস্ত্রাজ বড় সুন্দর স্থান নয়, অন্ততঃ জাহাজ হইতে যত ভাবিয়াছিলাম, তত নয়, তবুও তিনদিন পবে জমিতে বেড়াইয়া বেশ আনন্দ হইল, সমস্ত বাধাবিপত্তি স্বেও তৃপ্ত হইলাম। কিবিয়া গেলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। আব ঘণ্টা বিশ্রামেব পরই আহাৰ কবিতে গেলাম। ক্ষুধা হইয়াছিল, বেশ আহাৰ কবিতে পাবিলাম। রাত্রি দশটাব সময় আমাদের জাহাজ ছাড়ে। আমাদের অনেক বন্ধু এই খানে অবতরণ করেন, আবাব অনেকে আরোহণ কবেন। যাহারা আসেন, তাহাদের মধ্যে একজন উল্লেখ-যোগ্য—Mr. Macpherson, এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ, স্কটলণ্ড বাসী। এমন লোক আমি আজও দ্বিতীয় দেখি নাই। এমন ভয়ানক সমালোচক যে কাহারও সহিত তাহার বনিবনাও হইত না। তিনি যত স্থান দেখিয়াছেন, সমস্তই খারাপ। এমন কি, তাহার নিজের দেশও তাহার ভাল লাগিত না। তিনি তাহারও নিজের কামিডেন্স যে বোক স্বদেশকে ভাল-বাসিতে না, জানেন, যে, কি নিচ পণ্ডনের

মধ্যেও স্বদেশ-হিতৈষণা আছে। সহজেই বুঝিতে পাবিবে, তিনি আনাদের দেশকে কিরূপ সমালোচনা কবিতে লাগিলেন। আমি একেবাবে চুপ, কি কবিব, নীববে ক্রন্দন কবা ব্যতীত আব উপায় ছিল না। ক্রমে ক্রমে অসন্ম হইবা উঠিল। জাহাজে এমন লোক ছিল না, যে তাহাব উপর বীতবাগ না হইয়াছিল। তিনি অত্ৰ বিষয়ে কথা কহিতে, বোধ হয়, জানিতেন না। শেষে ভয়ে তাহাব সহিত কেহ মিশিত না ; কাছে গেলেই দেশেব নিন্দা, দেশেব লোকেব নিন্দা। এমন লোক কেহ দেখিয়াছি কি ? ক্রমে ২ ইহাব চাই এক কথা লিখিতে হইবে, যথা স্থানে লিখিব। কান আমবা ফবাসী নগর পণ্ডিচাবী পৌছিব।

আজ অক্টোবর মাসেব নয়দিন। ইহাব মধ্যে এত সাহেব হইয়াছি যে, আজ আশ্বিন কি ভাদ, জানিনা, জানিবাব উপায় নাই। তবে বাঙ্গালাব জানাব মধ্যে জানি আজ শুক্রবাৰ। প্রভূবে উঠিয়া দেবি, আমবা ভাবতেব ভাব দিয়া সাহেছি। মাস্ত্রাজের অত্যাশ্চর্য পল্লভ-মালা গামাদিগকে মোহিত করিল। সমস্ত দিন কেবল দেখিতে লাগিলাম। আহা, সমুদ্রেব চেউগুলি গড়াইয়া গড়াইয়া অবশেষে সেই পৰ্ব্বত শ্রেণীতে মাঘাং পাইতেছে। অন্ধ তবঙ্গ উৎকল অন্তরে বাইতেছিল, ছুট পৰ্ব্বত তাহাকে বেন বাবা দিল। বীব তরঙ্গ গর্জিয়া উঠিল। শত হস্ত উল্টে উঠিয়া ভীম পবাক্রমে পৰ্ব্বতের উপর পৰ্ব্বত হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অহঙ্কার পরক্ষণেই চূর্ণ হইল। ভীষণ গর্জনে পৰ্ব্বতের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। লজ্জার মুখ ধবল হইয়া গেল, সমুদ্রের অর্ধেক লজ্জাব্যঞ্জক ফেন রাশিতে ঢাকিয়া ফেলিল। বন্ধুর

এইরূপ পরাজয় দেখিয়া আরও কত শত
বীচিমালা পর্ততকে শাস্তি দিতে চলিল।
কেমন ভালবাসা! কেমন সুন্দর একতা!!
সমুদ্র দুই দিনের পরে বড়ই কঠোর বোধ
হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সমুদ্রের সহিত
ভূমির দ্বন্দ্ব বড়ই সুন্দর ও ভয়ানক। যদিও
সমুদ্র সর্বদাই জয়ী, তবুও ভূমি স্থানে স্থানে
ভূগাঁদি দ্বারা বেঠন করিয়া কোন মতে সমুদ্র
হইতে রক্ষা পাইতেছে। যদি কেহ জল
রাশির পরাক্রম দেখিতে চান, তাহাকে বেশী
দূর যাইতে হয় না। সামান্য পদ্মাই তাহাব
উজ্জল দৃষ্টান্ত! ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ষাকালে রাক্ষসী
মূর্তি পদ্মাকে গোয়ালন্দ্রের নিকট যিনি
দেখিয়াছেন, তিনি বিশেষরূপে জলরাশির
পরাক্রম অবগত আছেন। সমুদ্র ত কত
প্রবাণ্ড!

একটু বেলা হইতে না হইতেই আমরা
মনোহর বন্দর পণ্ডিচারীতে পৌছিলাম।
এখন বেলা প্রায় সাতটা। আমাদের আগ-
মন দেখিয়া ভূগাঁ হইতে তোপ ধ্বনি হইতে
লাগিল। আমাদের জাহাজও তোপ
ছুঁড়িল। পরস্পরে এইরূপ অভ্যর্থনা করার
পর কোন এক সৈনিক পুরুষ আমাদের
জাহাজ দেখিয়া গেলেন। আমাদের জাহা-
জের অনেক খানসামাই পণ্ডিচারীর লোক,
বাড়ীর নিকটে আসিয়া কাহারও অস্থ,
কাহারও মাতার পীড়া, কাহারও বিবাহ উপ-
স্থিত হইল। অধ্যক্ষের নিকট ছুটি লইয়া
তাহারা বাড়ী গেল। প্রায় পাঁচ জন নামিয়া
গেল! মাল নামাইয়া দিয়া ও গ্রহণ করিয়া
আমাদের এরিডেন আবার চলিল। জাহাজ
ছাড়িল বেলা ১০ টায়। আমরাও আহা-
রাবির পর ডেক-চেয়ারে ঘুমাইলাম।

আজকাল সুরুপক্ষ ১০ রাতে চাঁদ দেখিয়া

বুঝিলাম, তৃতীয়া কি চতুর্থী। চাঁদের আলোকে
সমুদ্রের খেলা কত সুন্দর, লিখিয়া বর্ণনা
করিতে আমার ত সাধ্য নাই। প্রতাহই
রাতে আমরা চাঁদের আলোতে বসিয়া গল্প
করিতাম। কি সুন্দর, অমন দিন আর
হইবে না। গল্পে গল্পে ঘুমাইয়া পড়িতাম,
চাদও ইত্যবসবে বিদায় লইত। পরদিন
শনিবারও আমরা ঐ রূপ ভাবে আনন্দে
উপকূল দিয়া চলিলাম। আজ আর ভারতের
নয় (?) লঙ্কা-দ্বীপের।

রবিবার প্রাতঃকালে আমরা কলিকাতা
ছাড়ি, আজ আর এক রবিবার। দেখিতে
দেখিতে আট দিন হইয়া গিয়াছে। এই
আট দিনে তোমাদের হইতে নিকট প্রায়
১২০০ নট মাইল দূরে! এখনও আমাদের
প্রায় ৬০০০ হাজার মাইল যাইতে হইবে!!
সমস্ত ভাবিতেছি, দূরে ধূ ধূ অসংখ্য অট্টা-
লিকা দেখিতে পাইলাম। বাড়ীগুলির ছাদ
প্রায়ই খোলা টালির। চাল বলিলেই হয়।
কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর। আমাদের মত
গোল গোল খোলা নয়। আলিপুরের
চিড়িয়া-খানায় অথবা হিন্দু হোটেলে যে
প্রকার টালির ছাদ, ঠিক সেই রকম। নানা
রংদ্বারা চিত্রিত। যথার্থই বড় মনোহর।
এখন কেবল ঐ সমস্ত চালই দেখিতেছি।
প্রায় নয়টা বাজে। আমরা কলকাতা বন্দরের
মুখে। সেই খানেই আমাদের জাহাজ থামিল,
আমরা (বিলাত-বাত্রাগণ) সিডনী জাহাজ
আসিতেছে কিনা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হই-
লাম। দূরেই সিডনীকে দেখিতে পাইলাম।
শীঘ্রই সে বন্দরে প্রবেশ করিল। আমরা
পূর্বে আসিয়াও বন্দরের ডাক্তার সাহেবের
অপেক্ষায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই
একখানি ছোট্ট জাহাজের ডাক্তার সাহেব উপ-

স্থিত হইলেন। খালাসী, খানসামা, ইত্যাদি সকলেই তাহাদের নিজ নিজ সাজে সাজিয়া এক সারে ডেকের উপর দাঁড়াইল। কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। ডাক্তার সাহেব রেজেষ্টারি লইয়া এক এক করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ষ্টুয়ার্ড আসিয়া আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ কি বোম্বাই হইতে আসিয়াছেন? বোম্বাই মহামারির ভয় কলম্বো পৌছিয়াছে! প্রায় এক ঘণ্টা কা-ন পবে আমরা পাশ পাইলাম। বন্দবের মধ্যে আমাদের জাহাজ প্রবেশ করিল।

১০ টা বসন্ত আমরা আহাির করলাম। ইতিপূর্বেই আমাদের জিনিষ পত্র যথা স্থানে গুছাইয়া রাখিয়াছিল। প্রায় ১১ টা বসন্তে আমরা জিনিষ পত্র একখানি ছোট জাহাজে (Steam-Launch) এ তোলা হইল। আমরা এরিডেন ছাড়িলাম। এরিডেনের খানসামাগণ বড় ভাল লোক। আমরা তাহাদের কিছু কিছু বসন্ত দিলাম।

সিডনীতে গিয়া দেখি, ইহা জাহাজ নয়, যেন সহর। কত প্রকাণ্ড, তাহা ভাষায় জানান কঠিন। আমরা এরিডেনে গিয়াছি, সিডনী তাহাকে ছোট নৌকা বসন্ত বহন করিয়া লইতে পারে। এরিডেনে বিত্তীয় শ্রেণীতে মোটে ৩০০ জনের থাকার বন্দোবস্ত ছিল, এখানে প্রায় দুই শত লোকের বন্দোবস্ত। উপরে গিয়া দেখি ডেক নয়, যেন গড়ের মাঠ! মহা ঝাঁকার বসিয়া গিয়াছে। কলম্বোর ফেরি-ওয়ালা-গণ সব উপস্থিত। এমন জিনিষ নাই, বাহা পাওয়া যায় না। গরু, বাছুর, ভেড়া, মুরগি, টার্কি, পায়রা, ইত্যাদি নানা প্রকার জীবন্ত পশু দেখিলাম। শি এণ্ড ও কোম্পানীতে সজ্জিত মাংস ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এ জাহাজে সজ্জিত (জীবন্ত) নয়।

অনেকগুলি আমাদের দেশী বাদর, হুমান ফ্রান্সে চলিয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনটি ঘোড়া আমাদের সহযাত্রী। গানের ঘর (Music-Room) ধূমপানের ঘর (Smoking Saloon) নাপিতের ঘর (Hair cutter's saloon) আরো কতকি। কি বে নাই, জানি না। তাই বসিতেছিলাম, ইহা জাহাজ নয়, ছোট সহর। প্রথম শ্রেণীর খাইবার ঘর (Saloon) দেখিবাব জিনিষ। বৃক্ষ লতা দ্বারা কেমন সুসজ্জিত! তাড়াতাড়ি করিয়া আমরা জাহাজ খানি দেখিয়া নইলাম। আমাদের ঘরে জিনিষ পত্র বাবা হইল, কলম্বো দেখিতে গেলাম। পূর্বেই ওনিয়াছিল।

কলম্বো সহর

বড় মনোহর। না দেখিলে কোন জিনিষ উপলব্ধি করা যায় না। হাজার শোন সন্দেশ অতিশয় উপাদেয়, সকলেই বলুক না কেন উহার মত উত্তম জিনিষ আর নাই, কিন্তু বতফণ না উহার স্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে, ততক্ষণ কিছুই বোঝা হয় নাই। আমরা অতিশয় ব্যাগ হইয়া সহরে উপনীত হইলাম। একটু দূরে গিয়াই দেখিলাম, কলম্বোর গ্রাণ্ড হোটেল—প্রকাণ্ড বাড়ী। Mr. ও Mrs. Rowe সেখানে গেলেন। আমরাও দেখিতে গেলাম। এত বড় হোটেল আমি আর দেখিয়াছি নাই, জানি না; অবশ্য আমাদের দেশে।

অষ্ট্রেলিয়ার একজন ভদ্রলোক আমাদের সহিত বরাবর আসিতেছিলেন। বৃদ্ধ হইয়াছেন, বয়স অশীতি বৎসর হইবে! বৃদ্ধ বয়সে ভারত দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। এখন পুনরায় অষ্ট্রেলিয়া বাইতেছেন। অষ্ট্রেলিয়া ইহার উপনিবেশ। ইহার বাড়ী ইয়ারলণ্ডে। অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজ না আসা পর্যন্ত

কলঙ্ঘোতে থাকিবেন। আমাদের ছাড়িবার সময় আমাদের (Mr. Nutter কে এবং আমাকে) তাহার হোটেলে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। আমরা তাহার হোটেলের নাম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তিনি যাইতেছেন দেখিতে পাইলাম। আমরা তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। তিনি আমাদের জুই যাইতেছিলেন। কেবল ভাষাজের আলাপ! মানুষ কি এত ভালবাসিতে পারে!! হোটেলের নাম Galle Face Hotel, সুন্দর Billiard খেলবার ডেবিল ছিল। বন্ধু নাটবে আর তিনি একবার, দুইবার, তিন বার খেললেন। আমি খেলা জানিতাম না। বুঝিতাম বটে। চা, লিমনেড, কেক, বরফ ইত্যাদি আমাদের জন্য যোগের ভাণ্ডার প্রস্তুত ছিল। ডিনার খাইতে আমরা অস্বস্তিক হইলাম, কিন্তু সাহস হইলনা, পাছে জাহাজ ছাড়িয়া দেয়। তিনটা পর্যন্ত হোটেলে থাকিয়া আমরা বেড়াইতে বাহির হইলাম। তিনখানি মানুষ টানা গাড়ী ভাড়া করা গেল। চড়িতে বড় সুন্দর। অনেক মানুষ টানা গাড়ী। সে জুলাকে ইংরাজিতে Rickshaw বলে। Breakwater কলঙ্ঘোর দেখিবার জিনিস। আমরা বরাবর সমুদ্রের পাড় দিয়া চলিতে লাগিলাম। এমন সুন্দর দৃশ্য আমি দেখি নাই। এই জাহাজ Empress of the East ইহার নাম হইয়াছে। তারপর সমস্ত স্বাভাবিক ভ্রম দেখিলাম। Chinamon Garden এর নাম শুনিয়াছিলাম। একবার খুব ভাড়াতাড়ি দেখিয়া লইলাম। আজ পর্যন্ত অনেক জায়গা দেখিয়াছি, কিন্তু কলঙ্ঘোর মত ছোট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাভাবিক শোভায় পরিপূর্ণ স্থান আর দেখি নাই। স্বভাবের কবিমাত্রেরই

কলঙ্ঘো দেখা আবশ্যিক। যদিই বা লক্ষ্য সুবর্ণ মণ্ডিত হইত, তবুও বোধ হয় এখনকার অবস্থা হইতে সুন্দর দেখাইত না। প্রকৃতই কলঙ্ঘো স্বভাবের রাজধানী।

সন্ধ্যা হইয়াছে। পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। আমাদের বৃদ্ধ আর্দ্রে গিয়ান বন্ধু বাট পর্যন্ত আসিলেন। তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা নৌকার উঠিলাম। জাহাজে গিয়া প্রথমত আমাদের ক্যাবিনে গেলাম। আমাদের ক্যাবিনে পাঁচটি বিছানা, কিন্তু যোক আমরা দুজন এবং আর এক জনের জিনিস দেখিতে পাইলাম। কি চক্ষুণ পবেই জিনিসের মালিক আসিলেন। তিনি পুরোঁক Mr. Macpherson. যদিও তিনি তত ভাগ নোক নন, তবুও অপরিচিত ব্যক্তি অপেক্ষা ভাগ বিবেচনা করিলেন। কিন্তু পরের বিবরণে জানিতে পারিবে, তাহা নয়। যাহা-ইউক, আমরা মুখ হাত ধুইয়া ডেকের উল্লুজ বাতাসে গেলাম। সমুদ্র কল্লোল-স্নাত পবিত্র সুবিস্ময় বায়ুতে আমাদের ক্লান্তি কথঞ্চিৎ দূর হইল বটে, কিন্তু নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতে লাগিল। ভাবিলাম, এই রবিবার সন্ধ্যাকালে তোমরা কি করিতেছ? না জানি কত লোক আসিতেছে, যাইতেছে। আবার ভাবিলাম, এখানে যদি আমার অস্বস্তি হয়, কে কাছে আসিয়া বসিবে? আবার দেখিলাম, এই যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আমার নবজীবন আরম্ভ হইতেছে, যখন ফিরিয়া যাইব, নূতন মানুষ। আরও মনে হইল, ভগবান আমাকে শিক্ষাদিবার জন্য যাক্কারসনের মত লোকের সহিত মিশাইতেছেন। আমি বেশ সন্তোষ লাভ, হাজার জুলাকে ভোলাকে, অবস্থা,

স্বপ্না, নিন্দা, অপবাদ, লাঞ্ছনা, গল্পনা করুক না, তুমি কেবল ক্ষমা কর। যদি না কবিতা পার, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে না। আবার মহাত্মা বীণুর কথা মনে হইল, যদি তুমি তোমার ভাই মানবের সামান্য ক্রটি মার্জনা করিতে না পারিলে, কি করিয়া তুমি ভগবানের নিকটে তোমার প্রতি মুহূর্তের শত শত গুরুতর অপরাধের ক্ষমা চাহিতে পার? তখন আবার হৃদয়ে জাগিল “মেবেছ মেরেছ কলঙ্গীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দেব না’। এই সব ভাবিয়া মন একটু আশ্বস্ত হইল। ভাবিলাম, যাহা হয় হইবে। ভগবান সহায়!

ক্রমে রাত্রি ১০টা বাজিল। আমাদের জাহাজ ছাড়িয়া দিল। আমরা এতক্ষণ ভারতের নিকটে ছিলাম। এইক্ষণ প্রায় তিন বৎসরের জন্ত প্রস্তুত হইলাম। আমি সর্বদাই দেশ ভালবাসি, কিন্তু আজকাল মত স্বদেশ-প্রেম আমাতে আর কখনও জাগে নাই। ভাবিলাম, একবার স্বদেশকে চুম্বন করিয়া যাই। তিন বৎসর আর দেখিতে পাইব না। শেষে মনে হইল—

“রেখ মা দাসেরে মনে

এ মিনতি করি পদে—

সাধিতে মনের সাধ

ঘটে যদি পরমাদ,

মধুহীন করোনাক তব মনঃ

কোকনদে।”

এইরূপ ভাবিতেছি, এদিকে জাহাজ চলিতেছে। প্রকাণ্ড জাহাজ পরাক্রান্ত অকুল সমুদ্রে ভিতরে সামান্য তৃণকণার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঙিতে ঘাইতে লাগিল। সমুদ্র ক্রমাগত উঠিতে আসিল, শত সহস্র, কোটি কোটি অণুপাণ্ডুর ইহার বিশাল শাউরি নিহিত।

করিতে পারে। কিন্তু তাহার এইক্ষণ ক্ষুধা নাই, নিস্তন্ধে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। কোন আন্দোলন নাই, কোন গোলমাল নাই। আমাদের তবণী নিঃশব্দে বেগে তাহার উপর দিবাধাবি হইল। বস্তু হইল চারিদিক নিস্তন্ধ। আমাদের জাহাজের যাত্রীগণ, কলম্বো দেখিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, সকলেই নিঃশব্দতাকে আবোনিঃশব্দতাব মনো দেখিয়া বিশ্বাসের জন্ত বিশ্রামাগাবে গিয়াছেন। ডেকে উপরে আমি আর দুই এক জন ভদ্র লোক। নূতন জাহাজ, কাহাবও সহিত এখনও খালি হইয়া নাই। কিছুক্ষণ নিঃশব্দতাব সুখ ভোগ করিলাম, কিন্তু অল্পক্ষণেই ক্ষুধা নিবারণ হইল। নিঃশব্দতাব সুখ ভোগ কবিতা দেখিলেই ‘স্মৃতি’ উদবেব পীড়া আসে, জানিতাম না। সুখ ভোগ কবিতা কবিতাই এই স্মরণে পীড়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। দুঃখে, কষ্টে, বাতনায় আমি ‘নিঃশব্দতাব’ সম্মুখে হাউ হাউ কবিতা কাদিতে লাগিলাম! কেহই বোধ হয় আমাকে দেখিতে পায় নাই। যাহা হউক, সুখের উপরে বীতরাগ হইয়া আমি আমার ভগ্ন হৃদয়ে শব্দায় গেলাম। ভাবিয়াছিলাম, নূতন ঘরে, সাহেবদেব সঙ্গে (এই আমার প্রথম সাহেবের সঙ্গে বাস) ঘুম হইবে না। কিন্তু দিবসের ক্লান্তির পব কখন কি করিয়া ঘুম আসিল, জানিতে পারিলাম না। ঘুম ভাঙিলে দেখি, সকাল হইয়াছে। বন্ধু নাটার তাহার হাত মুখ ধুইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অপর ব্যক্তি ম্যাকফারসন এখনও উঠেন নাই। চক্ষু মেলিয়া গুডমর্নিং বলিলাম, উঠিলাম, হাত মুখ ধুইলাম, কাপড় পরিয়া আহার করিতে গেলাম।

রো সাহেবদের ঘর আমাদের ঘরের নিকটেই। জাহাজে লোক অনেক হওয়ায় তাঁহারা, (তিনি ও তাঁহার স্ত্রী) একটা ঘর পান নাহ। তবে অব্যর্থ বলিয়াছে, প্রথম বন্দরে লাগিলেই কিছু লোক কমিবে, তখন একটা ঘর দেওয়া হইবে। মিসেস্ রো এক ঘরে কোন এক সন্ন্যাসিনী (Nun) এর সঙ্গে থাকেন। মিঃ রো, ডাঃ এলকক ও অপর একটা ফরাসী ভদ্রলোক আপাততঃ এক ঘরে। প্রথমতঃ যে বন্দোবস্তে আমরা পড়িলাম, তাহাতে সকলেরই কষ্ট হইতে লাগিল। আমার ম্যাকফারসনকে ভাল লাগে না, কেননা বড় খিটখিটে রকমের লোক। কেবলই নিন্দা, কেবল অপর দেশের অপবাদ ইত্যাদি। আনাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সবে নূতন আমি সাহেব-সংস্পর্শে পড়িয়াছি,—কোথায় না ভাল করিয়া বলিয়া দিলে, এই কব, ঐ কর; তা না, সে কেবল দেশের নিন্দা, রো সাহেবের নিন্দা, সুধু তাই কি, একদিন মুখ ধুইব, সে জল খবচ করিতে দিবে না! যাক্ পরের নিন্দায় কাজ নাই। মোটের উপর আমি ও আমার বন্ধু নাটার জাগাতন হইতে লাগিলাম। মিসেস্ রোয়ের ঘরে সন্ন্যাসিনী, তিনি কখন স্নান কিম্বা গা পরিষ্কার করেন না। নিকটে গেলে পেটের ভাত চাল হ'য়ে যায়, বাঘ পালায়। তারপর বিষম গরমে তিনি জানালা খুলিতে দিবেন না!! আমরা মিসেস রোয়ের বিছানা ডেকের উপরে ছই থানা বেঞ্চের উপরে করিয়া দিতাম। তিনি সেইখানে ঘুমাইতেন। এরিডেনে আমাদের বিছানা ডেকের উপরে করিয়া দিত বটে, কিন্তু সিডনীতে সে নিয়ম নাই। মিঃ রো অনেক লোকের সঙ্গে ঘুমাইতে পারেন না।

তাহারও কোন রকমে ডেকে শু'তে হইত। এই সমস্ত কারণে আমাদের কাহারই ঘর মনের মত হয় নাই।

পূর্বে বলিয়াছি, জাহাজ থানি প্রকাণ্ড। জাহাজে লোকও অনেক। সর্বসমেত তিন শ্রেণী জড়াইয়া প্রায় ছই শত হইবে। প্রথম শ্রেণীতে জন দশ পনর। আমাদের শ্রেণীতেই বেশী, প্রায় শত জন, বাকী সব তৃতীয় শ্রেণীর। আমাদের জাহাজ থানি চীন হইতে জাভা দ্বীপ হইয়া আসিতেছে, জাহাজে এত প্রকার লোক যে, সচবাচর দেখা অসম্ভব। জাপানী, চীনদেশবাসী, জাভাদ্বীপবাসী, বাঙ্গালী, মাল্লামজী, নিংহলবাসী, ইটালিয়ান, জার্মান, ডাচ্. নরওয়েবাসী, ফরাসী, আমেরিকার নিউইয়র্কবাসী, সুইজারলণ্ডবাসী, ইংরাজ, স্বটলণ্ডবাসী, গোয়ানিজ্ ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় এককুড়ি জাতি! কখনও এত প্রকার লোক দেখিরাচ কি? সমস্ত লোকের সঙ্গেই অস্বাভাবিক আলাপ হইয়াছিল। নানা জাতির ব্যবহার জানিবার ইচ্ছা কি কম সুবিধা!! কাহার সহিত কি প্রকার কথা হইত, আমার লিখিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে, কেননা, আমি নানা প্রকার কথায় বড়ই উপকৃত হইতাম। কিন্তু তোমরা শুনিবে কি না, জানি না। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে একটু একটু সকলের বৃত্তান্ত দিব ইচ্ছা আছে। বেনীক্ষণ কষ্ট দিব না। খুব সংক্ষেপেই শেষ করিব।

জাপানকে কে না ভালবাসে? স্বাধীনতা-প্রিয় জন সমাজ মাত্রই জাপানের পক্ষপাতী। নয় কি? আমাদের জাহাজে জাপান-লিগেশনের (দূত) প্রধান সম্পাদক (Primer Secretary to the Legation of Japan) * ছিলেন! তিনি স্বপরিচয়

ইউরোপের নানা স্থান পরিভ্রমণে যাইতে-
ছেন। তাঁহার পত্নী অতিশয় ভদ্র। আমার
সহিত বেশ আলাপ হইয়াছিল। সামান্য
ইংরাজি জানেন। তাঁহার একটি একবৎ-
সরের বালক সঙ্গে ছিল। তোমরা জান,
আমি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের
বড়ই প্রিয়! আমার মনে হয়, তাহারাই
ভগবানের স্বর্গরাজ্য। মহাত্মা যীশুর কথা
আমি সর্বথা বিশ্বাস করি (অন্ততঃ এই স্থানে)
তিনি বলিতেছেন,—“Suffer the little
children to come unto me, and for-
bid them not; for of such is the
kingdom of God” Mark. X. 13-14.
তাহারা কেমন সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র,
সরল। আমি সেই শিশুর সহিত বেশ
আমোদ করিতাম। সে আমাকে বড় ভাল-
বাসিত, কেবল আমার কাছে থাকিত।
যাক্ কি বলিতেছিলাম;—সেই ভদ্রলোক
একদিন আমাদের দেশের কথা পাড়ি-
লেন,—“আচ্ছা, ভারতে কি বীর নাই,—
কেবল পরাধীনতার পরবশ হইয়া রহিয়াছে?”

আমি—“হাঁ, হুই এক জাতি ভয়ানক বল-
বান, সাহসী। কিন্তু তা হইলে কি হইবে,
এক জাতির সহিত অপর জাতির মিল কই?”

ভদ্রলোক (সহাস্যে)—বান্দালীরা বড়
ভীক, নয়?

আমি—“হাঁ, যদিও তাহারা যুদ্ধকার্য্যে,
কিছা দ্বন্দ্ব বিবাদে বিশেষ পটু নয়, তবুও
তাহারা লেখা পড়া, বুদ্ধিচালনা, মস্তিষ্কের
কাজ করিতে অধিতীয়া। তাহাদের উন্নতি
অসম্ভব সমস্ত জাতি অপেক্ষা উচ্চ। বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করিতে তাহাদের
সমর্থক কেহই হইতে পারে না। এবংসর
একজন বান্দালী Civil service পরীক্ষায়
অগ্রসর হইয়াছেন।”

তিনি—“বেশ, আমি জানি, অধ্যাপক বহু
অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় আবিষ্কার করি-
য়াছেন। সে ত বেশ; নাই বা হগো
সাহসী, নাই বা হগো যুদ্ধপ্রিয়। বাঙ্গালী
বুদ্ধি জোগাইতে ত খুব পটু। এখন
কেবল চাই একতা, মৈত্রী! এক জন
অন্ধ এবং এক খঞ্জ, দুই বন্ধু। অন্ধ খঞ্জকে
কাঁধে করিয়া লয়, খঞ্জ পথ দেখাইয়া দেয়।
এই ত চাই। আমি আশা করি, শীঘ্রই
ভারতের সমস্ত জাতি একত্র হইয়া, এক
প্রাণে, এক মনে, এক কার্য্যে লাগিবে।”

আমি—“আজকালকার ভদ্রসমাজ সেই
চেষ্ঠাতেই আছেন, কেবল হিন্দুদেব মধ্যেই যে
কত প্রকার বিভিন্ন সম্প্রদায়, তাহার গণনা
করা দুর্কর। তার পর মুসলমান। তাহা-
দের মধ্যেও হুই তিন শ্রেণী। হিন্দু মুসল-
মানে চির বিবেষ !!! কবে যে এই বিবেষ
যাইবে, বলা যায় না। তবে ইংরাজ শাসন
আমাদের দেশের অনেক উপকার করিতেছে।
আমার পিতার মতে অন্যান্য পঞ্চাশ বৎসর
ইংরাজ আবশ্যক। দেখিয়া দেখিয়া রাজ-
নীতি সমুচিত শিক্ষা করিলে পরে ভারত
হয় স্বাধীন, অথবা ইংরাজরাজ্য (British
Colony) হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে! আজ
কাল ইয়ারলণ্ডে যেমন বন্দোবস্ত, কেনেডায়
যেমন শাসন প্রণালী, ভারতেও তাহাই হইবে।
ভারতে পার্লামেন্ট, হইবে এবং ভারত শাসন
ভারতবাসীর হাতে ন্যস্ত হইবে !!! অথবা
সমুচিত উন্নত হইলে ইংরাজ সৈন্ত-বিভাগ
পরাস্ত করিয়া ভারত স্বাধীন রাজ্য হইবে!
হায়, সে দিন অনেক দূর। আমাদের মত তিন
চারি জীবন পশ্চাতে লুকাইয়া আছে !!!”

তিনি স্বাধীন মানুষ, লাক্ষাইয়া উঠিলেন।
“হাঁ, যথার্থই তখন জাপান ভারতকে সাহায্য

কবিত্তে পারে”। আমি দেখিলাম, স্বাধীন জাতিব ও আমাদের জাত্য চর্দশাগ্রস্ত পরা ধান জাতিতে কত তকাত। যদিও আমি অত্যন্ত উদোজত ভাষায় অন্তরের অন্তরতম স্থানের প্রকৃত বিখ্যাসেব কথা বলিয়াছিলাম, তবু নিশ্চয় বাঙ্গালী ইহাতে কিছু মাত্র উত্তেজিত হইত না। হয়ত “বটে বটে” করিয়া মারিত। এক্ষুণ্ণ এত দৃষ্ট কি ভাবনক! বৈনিক পুনর দাড়াইয়া তববারি হস্তে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—“হা সেদিন জাপান ভারতকে সাহায্য কবিত্তে পারে !!!”

আমি বলিলাম—“আমার বিশ্বাস, ভারত সাদরে জাপানের সাহায্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা। আজ কাল আমাদের দেশে ইংরাজ-শাসন বড়ই সুন্দর। যদিও হৃদান্ত নীচজাতি ইংরাজবর্গ নানা প্রকারে অশ্রায় ব্যবহার করে, তবু সে সমস্ত ভারতের পক্ষে বিধম শিক্ষা। রাজনীতি কাহাকে বলে, ভারত জানত না। জানিলেও বহু দিন পূর্বে। এখন পরিচালনা অভাবে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন আবার প্রথম হইতে শিক্ষা করিতেছে। আমার মতে ইংরাজ শাসন হইতে পুনরায় হাতে খড়ি হইয়াছে। ইংরাজ শাসন, রাজনীতির মহা বিদ্যালয়! এখানে দেখিয়া, ভুগিয়া অবশেষে দাঁড়াইতে হইবে। নয় কি?”

তিনি বলিলেন—“হা, শুনিয়াছি, ইংরাজ ভারতকে উত্তম শাসন করিতেছে। আমার হুজা আছে, আমি একবার ভারতে গিয়া দেখিয়া আসি। আচ্ছা, এখন যদি কোন বাঙ্গালী রাজা হয়, তবে কি হইবে?”

আমি—“রাজনীতি বিশেষ না জানা দক্ষণ, রাজ্য হয়ত ছারে খারে বাইবে। হয়ত, রাজার মন্ত্রী একজন ইংরাজ হইবেন।

রাজা তাহাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা করিয়া, অন্তর মহলে শত শত স্ত্রী মহিলাবর্গ বেষ্টিত থাকিয়া নিজেকে সুখী মনে করিবেন। একবারও রাজ্যের বিষয় কিম্বা প্রজার কথা স্মরণ কবিবেন না। সুধু তাই কি? তাঁহার উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্মচারী পদে পদে তাঁহার বিকটচরণ করিবে। বিশ্বাসঘাতকতা তাহাদের ধর্ম! সং কি অসং, যে কোন উপায়ই, যৌর কামনা ও বাসনা চরিতার্থতার জন্য অর্থ পাইলেই হইল।”

তিনি—“কি আশ্চর্য্য, আমাদের দেশে সামান্য গুণ্ পর্য্যাপ্ত নয় না। সামান্য কর্মচারী কখনই ঘুষ লইবেনা !!!”

এই প্রকার অনেক কথা হইল। আমি বাহা বলিতেছিলাম, তাহা ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমি যত দূর দেখিয়াছি, তত দূর বলি নাই। তোমরা কি মনে কর? আমি কি বড় ভুল করিয়াছি? কেন তোমরা ত আগর-তলার কথা জান! রাজার না কয় শত কচ্ছরাণী!! যথার্থই দেশের কথা ভাবিলে কান্না পায়। হুই একটা সুরেক্তনাথ, সামান্য একটা জাতীয় সভা, হয়, তাহা কি দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে। বোধ হয় না! চরিত্র কই, জীবন কই? এবারের জাতীয় মহাসভার বিবরণ এখনও পাই নাই; জানি না, কি হইয়াছে। এইবারই ভাঙ্গিবার উদ্যোগ হইতেছিল। হিতবাদীর হিত বচনে, সুরেক্তনাথের বক্তৃতায় আমাদের কাহার কাহার হিংসা-প্রিয়তায় (?) কিম্বা কোমর-বাধা অভ্যাসে আমাদের অতিশয় প্রিয় প্রাণের সভা অসময়ে, অকালে, শৈশবাবস্থায়ই কালগ্রাসে পতিত হইতে চলিতেছিল!! তাহাতে আবার দিন দিন, দরিদ্র ভারতের সহায় সুখল, উজ্জল নক্ষত্র সকল ধীরে ধীরে অকালে ধীরে পড়িতেছে! আশা কোথায়!

উদ্যম কাহাকে বলে, আমরা বড় বেশী জানি, বিশ্বাস হয় না। আমাদের সহিত নর-ওয়ে বাসী পাঁচজন লোক ছিলেন। তাঁহার বাণিজ্যের জন্ত সাইবিরিয়াতে গিয়াছিলেন। জাহাজ ডুবি হওয়ায় পুনরায় দেশে যাইতে-ছেন। তাঁহার সকলেই পুনরায় বাণিজ্যে আসিবেন, বলিতেছেন। তাঁহাদের নিকট সেই সমস্ত গল্প শুনিতে খুব ভালবাসিতাম। যখন জানিলাম, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছয়বার জাহাজ ডুবিতে পড়িয়াছিল, তখন আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমাদের দেশের একে ত কাহারও জাহাজ নাই। থাকিত যদি, তবু একবার জাহাজ ডুবিলেই ঢের! বাপ্ আবার!! সভ্যতার তারতম্য নয় কি?

আমি এখন আরও দুই একটি ঘটনা বলিব।

পাশ্চাত্য পরসেবা যেমন বিখ্যাত, আমাদের পরের ক্ষতি করা সেইরূপ। নূতন জাহাজে আসিবার পূর্বে, আমরা যখন এন্ড্রিডেনে ছিলাম, তখন আমাদের সঙ্গে কলিকাতা হইতে এক ইংরাজ-মহিলা আসেন। তিনি বোধ করি, কোন প্রচারিকা হইবেন। যাহা হউক, তিনি বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, বেশ সুন্দর লিখিতে পারেন। তাঁহার পণ্ডিত্যে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু মন্ডাজে আমাদের জাহাজ আসিলে, এক রুগ্ন মহিলা আমাদের জাহাজে আরোহণ করেন। তাঁহার সহিত অপর কেহই ছিল না। পূর্বে লিখিত মহিলা এই নবাপতার সমস্ত ভার লইলেন। তিনি যখন বসন করিতেন, তিনি অগ্নান চিত্তে পরিষ্কার করিতেন। সারাদিন তাঁহার বিছানার পাশে বসিয়া থাকিতেন! রাত্রে খাবার দিলে নিকটে থাকিয়া বাতাস দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রকারে তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি পণ্ডিত্যে নাইলেন না।

পর্যন্ত তাহার সঙ্গে গেলেন!!! কলকাতাতে রুগ্না বায়ুপরিবর্তনে যাইতেছিলেন। তোমরা এই ঘটনাকে কি মনে কর, জানি না, আমি কিন্তু একেবারে স্বর্গের ছবি দেখিলাম! দেশে কটা এই প্রকার ঘটনা দেখিয়াছ?—অপরিচিতের কথা দূরে থাক, পরিচিতের কথাই জিজ্ঞাসা করি।

টেবিলে আমি, প্রথমে, রো সাহেব এবং সেই ম্যাক্‌ফারসনের মধ্যে বসিতাম, আমার সম্মুখে এক ইটালিয়ান-মহিলা বসিতেন। তাহার পার্শ্বে মিসেস রো। মিঃ রো সাহেবের ডানদিকে ডাঃ এলকক বসিতেন। ম্যাক্‌ফারসন, খাইবার সময় কেবল আলাতন করিত। এটা নয়, ওটা নয়। এই কাঁটা ধরা হ'ল না। ঐ রকম প্রণালী নয়, ইত্যাদি নানা প্রকার খুঁত ধরিয়া বেড়াইত। পূর্বে বলিয়াছি, দেশের নিন্দা তাহার ব্যবসা। সে টেবিলে বসিয়াও সে কার্য্য হইতে বিরত থাকিত না! মিঃ রো এ সমস্ত ভালবাসিতেন না। আমি যাহা করি, আমার আচার ব্যবহার ইতিমধ্যে এমন হইয়া পড়িয়াছে, যেন ঠিক সাহেব!! সে সমস্তই মিঃ এবং মিসেস রোয়ের অনুমোদিত। তবে যে ম্যাক্‌ফারসন বলে, সে কেবল আমাদের বিরক্ত ও নিজের বিজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্ত! সে যে সুধু আমাদেরই বলে, তাহা নয়। সকলেই তাহার উপর বীতরাগ। জাহাজে এত লোক, তাহার মধ্যে তাহার পক্ষপাতী, একজন নাই, পক্ষপাতী হওয়া দূরে থাক, সকলেই বিরোধী!!! “যেমন ব্যবহার করা যায়, তেমন ব্যবহার পাওয়া যায়।” বাক্ কি বলিতে-ছিলাম। কি বলিলাম,—একদিন সে আমাদের বলিতেছে, একটু মদ্যপান কর। আমাদের

আপ্যায়িত কব্লেদ আব কি ! আমি বলি-
লাম—“না মহাশয়, আমি কখনও মদ খাই নাই,
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কখনও খাইব না। ও
সুধারস পান আপনাদের জন্ত। আমি পাশ্চা-
ত্য জগতে মদ্যপান শিক্ষা করিতে যাইতেছি
না।” তবুও সে ছাড়ে না !!! মিঃ বো পার্শ্ব
থেকে বলিলেন,—“No Sir, his father
does not want him to take wine.”
তিনি এমন গভীর স্বরে বলিলেন যে, সব
চুপ্। ইহা কি ঠিক পিতার কার্য্য নয় ?
পর দিন মিসেস্ রো তাঁহান পাশে আমাকে
লইয়া বসাইলেন। আমি সেই হৃদ্যন্তেব
হাত হইতে রক্ষা পাইলাম। মাতা আব কি
বেশী করিয়া থাকে !! বথার্থই মিঃ এণ্ড্ মিসেস
রো আমাকে না বাবাব মত ভালবাসেন।
একদিন মিঃ বো খাইবাব সময় বলিতেছেন,
“Mary, the boy in your left looks
like your another child.” কি সুন্দর !

১১ই, ১২ই, ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই, ১৬ই,
১৭ই, আজ সাত দিন আমবা কলম্বো
ছাড়িয়াছি, কিন্তু এক কয় দিন কেবল জল,
একটুও স্থল দেখি নাই। ছই একখানি
জাহাজ, ছই একটা পার্বী। উড্ডয়নশীল মৎস্য
নাম শুনিলাম, কিন্তু কখনও দেখি নাই।
এখন কত যে দোথতেছি, জানি না। এক
দিন ভোরে একটা আমার ঘরে উড়িয়া
আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি ধরলাম।
ষ্টুয়ার্ডকে বলিয়া বালুতে জল আনাই-
লাম। কিন্তু বেচারি জল আনিবার পুঙ্কেই
পঞ্চম প্রাপ্ত হইল। মাছটা বড় বেশী বড়
নয়। কই মাছের মত বড় হয়। তাহা
অপেক্ষা কখন বড় হয় না। দেখিতে কই
মাছের মত। অথবা পাশে-মাছের মত।
ভান্না ছইটা তাহার শরীর হইতে অনেক

বড়। আর দেখিতে পাই, অনেক শুক্ক।
এক এক স্থানে প্রায় পাঁচ ছয় শত দেখি-
তাম। মনে হইত, সমুদ্র ছাইয়া পড়িয়াছে।
এই সাত দিন পরে আজ আমরা জমির
কাছে আসিয়াছি। আমাদের জাহাজ এডেনে
থামিবে না। আফ্রিকা উপকূলে ফরাসী-
বন্দর জিবুটীতে (Djibouti) থামিবে।
বেলা ১০টার সময় সেইখানে পৌঁছলাম।
কেবল মরুভূমি—বালী ধু ধু কবিতেকে। আর
গরম বিষম। তিষ্ঠান দার। আমি ভুলিয়া
গবম কালের পোষাক আনি নাই। আমার
অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। এখানে আমা-
দের জাহাজ কয়লা লইবে। কয়লা লইতে
প্রায় তিন ঘণ্টা লাগিবে। জাহাজ ছাড়িবে
বোব হয় ৬টার সময়। আমি একবার ভাবি-
লাম, নামিয়া স্থানটা দেখিবা আসি। কিন্তু
বিষম গবম, তাই গেলাম না। আমাদের
সহিত একজন জাবা-দ্বীপবাসী উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ
পরিণত ছিলেন। তিনি জীবুটা দেখিতে
যান। তিনি ফিবিয়া আসিলে দেখিলাম,
তিনি সাত মাইল ঘুরিয়া পাঁচ প্রকার গাছ
আনিয়াছেন। একটাও বড় গাছ নাই।
সমস্তই ছোট চারা। ১০টা হইতে ছয়টা
পর্য্যন্ত ঘুরিয়া হাত দশেক জাগা দেখিতে পান
সবুজ। সেইস্থানে ও তাহার কাছে কাছে এই
কয় প্রকার উদ্ভিদ !!! ইহাকেই বলে আফ্রিকার
মরুভূমি ! তিনি পিপাসায় জলের চেটায় গিয়া-
ছিলেন। মাহল কতক ঘুরিয়া সামান্য জল
পাইলেন। হোটেল গিয়া লেমনেড্ চাহিলে,
তাহারা হা করিয়া থাকে, লেমনেড্ কি ?

বৈকাল ছয় টার সময় জাহাজ ছাড়িল।
আমরা শাব্রই লোহিত সাগরে আসিয়া পড়ি-
লাম। বিষম গরম। সাহারার উষ্ণ, বালু
আমাদের বেন্ গোণ কাড়িয়া লইতে লাগিল।

১৯শে, ২০শে, এবং ২২শে আমরা এই-
রূপ Redsear ভরানক উত্তপ্ত বায়ু সেবন
করিয়া চলিলাম। ২৭শে অক্টোবর আমরা
স্নেহে পৌছিলাম। স্নেহে খালের বিশেষ

বিবরণ পরসংখ্যায় লিখিব, এইবার এই
পর্য্যন্ত।

স্নেহের সেবক প্রভাত।

২৭ শে নবেম্বর, ১৮৯৬, শুক্রবার,

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৩।

বিদেশী বাঙ্গালী । (৪)

গোলোকনাথ ।

যে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাশয়
নাম এই প্রস্তাবেব শীর্ষদেশে উল্লেখ করা
গিয়াছে, ইনি বাঙ্গালী খ্রীষ্টান-কুলের অত্যন্ত
ভূষণ ছিলেন। সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে ইষ্টাব
নাম ও গুণাবলী মহাভক্তি ও প্রেমের সহিত
সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া থাকে ; বিদেশী
বাঙ্গালী সমাজের পক্ষে গোলোকনাথ কেবল
অত্যন্ত নেতা ছিলেন না, দয়া দাক্ষিণ্য, যমতা,
স্বদেশবৎসলতা—সাধুতা প্রভৃতি অসাধারণ
গুণাবলীও তিনি আকর ছিলেন। গোলোক
নাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী চাৰি অংশে
বিভক্ত করা হইতে পারে। ১ম বালাজীবন,
২য় খিষ্ট-জীবন, ৩য় ধর্ম প্রচাবক এবং চতুর্থ
শিক্ষক ও পর্বোপকারক।

গোলোকনাথের পিতা কলিকাতায়
নীলকুঠার কর্ম করিতেন ; * এই সময়ে
অপ্রসিদ্ধ আলেকজান্ডার ডক্ সাহেব কলি-
কাতা নগরীতে দেশীয় বালকদিগের ইংবাজী
শিক্ষার জন্ত একটি স্কুল স্থাপনা করেন,
গোলোকনাথ এই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার জন্ত
প্রেরিত হন। এখন এই স্কুলটি ফ্রিচর্চ-
মিশন কলেজ নামে খ্যাত। গোলোকনাথের
ধর্ম প্রবৃত্তি ক্রমে যিশুখ্রীষ্টের দিকে প্রণত

হইতেছে দেখিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে
স্কুল হইতে গৃহে লইয়া যান এবং বাইবেল
পড়িতে নিষেধ করেন। অল্পকাল পরে গোলো-
কনাথ চট্টোপাধ্যায় গৃহ হইতে পলাইয়া যান,
পলাইবার সময় তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি মাত্র-
বোপ্য মুদ্রা, দু একটা স্বর্ণালঙ্কার, একটা
তাম্র পাত্র এবং দুই একখানা পুস্তক বস্ত্র
ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে
সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক কালে গোলোকনাথ
গৃহত্যাগী হইলেন। সে সময়ে রেল বা টেলি-
গ্রাফ ছিলনা। পথের সর্বত্র দম্ভাভয় এবং
সমগ্র দেশ অশান্তিতে পরিপূর্ণ ; পুলিশের
বন্দোবস্ত নাম মাত্র ছিল বলিলেই হয়।
সন্ন্যাসীর বেশে তিনি বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ
করেন, লেখা পড়া তাঁহার জানা ছিলনা,
সঙ্গে সহায় কেহই নাই এবং বঙ্গদেশের
বাহিবে যে সকল ভাষা প্রচলিত, তাঁহারও
তিনি কিছুই জানিতেন না। একখানি
উর্দু গ্রন্থে, বুদ্ধ বয়সে পণ্ডিত-প্রবান গোলো-
কনাথ লিখিয়াছিলেন, “আমি সোণার সংসার
পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে আসিয়াছিলাম ;
দেবতুল্য পিতা, দেবীকৃপা মাতা, যুবতী স্ত্রী,
স্নেহময়ী ভগিনী প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া
আমি দেশত্যাগী হইয়াছিলাম। হিন্দুধর্মের
অনাস্থা স্বদেশ পরিত্যাগের প্রধান কারণ।”
যাহা হউক, নানা স্থানে নানা প্রকার কষ্টে
দিনশাত করিয়া বালক গোলোক বাঙ্গালী

* This paper forms the substance of
a lecture on the life of the Revd. Golak
Nath Chatterjee delivered by the writers
at a special meeting of the Chintadripetah
Christian Association in, Madras on the
6th day of November, 1896. *

ধামে পৌঁছিলেন ; তথা হইতে আলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি পঞ্জাবের লুধিয়ানা নগরীতে বিশ্রাম লাভ করিলেন । এখানে কোনও কার্যালয়ে অতি সামান্য বেতনে তাঁহার একটি চাকুরী মূল্য, শেষে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী নিউটন সাহেব কর্তৃক গোলোকনাথের খ্রীষ্ট-ধর্ম-গ্রহণের চিহ্ন স্বরূপ বাপ্তিস্ম ক্রিয়া সমাপ্ত হইল । হিন্দু গোলোকনাথ খ্রীষ্টান হইলেন ।

খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়া গোলোকনাথের সমস্ত জীবন যেন পরিবর্তিত হইল । শারীরিক ও মানসিক তেজ এবং সৌন্দর্য্যে দিনে দিনে গোলোকনাথ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ; আধ্যাত্মিক বলেও তিনি শেষে প্রকৃষ্ট রূপে বলীয়ান হইয়া উঠেন । দেখিতে দেখিতে নানা ভাষায় গোলোকনাথ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন ; সুন্দর স্বভাব, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, শারীরিক বল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, ধন, মান, যশ, আধিপত্য প্রভূত প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে কেহই সমকক্ষ ছিল না । গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় নিজের মানসিক গুণ ও সুন্দর স্বভাবের বলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নীত হইয়া একজন মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন । ভগবানে আত্ম-সমর্পণ এবং পরত্ব-মোচনের জন্ত স্বকীয় স্বার্থত্যাগ গোলোকনাথের জীবনের মহা সৌন্দর্য্য ।

লুধিয়ানার অবস্থান করিতে করিতেই গোলোকনাথ সংবাদ পাইলেন, তাঁহার বালাবিবাহের সহধর্ম্মী পরলোকগতা হইয়াছেন । ইহাতে কিছুকাল তিনি দুঃখিত অন্তঃকরণে যাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভগবানে ভরসা থাকায় তাঁহার চিত্তের

শান্তি লোপ পায় নাই । অনন্তর গোলোকনাথ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন । গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় যে সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সে সময়ে ভারতবর্ষে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ব্যতীত খ্রীষ্টান মিশনারীদিগের প্রভুত্ব হয় নাই ; পঞ্জাব তখন শিখদিগের শাসনাধীন, সুতরাং পঞ্জাবে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করা আর স্বহস্তে স্বপদে কুঠারাঘাত করা প্রায় সমতুল্য ছিল । কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন—

“Golak Nath became a convert to Christianity when the dawn of Christian religion was yet far below the horizon in the Panjab: He became a Christian at a time when a handful of European missionaries in Ludhiana stood as watchmen upon the walls of Zion looking expectantly and prayerfully for the first rays of the light of the sun of righteousness amid the surrounding gloom of error and superstition”.

যাহা হইক, গোলোকনাথ লুধিয়ানা এবং তাহার পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য প্রচার এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের কার্য্য করিতে লাগিলেন । ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি পত্রের স্বর্ত্তাহুসারে শিখ সর্দারগণের অতুলনীয় প্রভুত্ব তখন পঞ্জাবের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল । ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চনদের চারিদিকে শিখেরা এতদূর যথেষ্টাচারী হইয়া উঠিল যে, যে দিকেই দেখ “নরহত্যা, ব্যভিচার, সতীত্বনাশ, ডাকাইতি, লুণ্ঠন, সুরাপান, ধর্ম্মহীনতা, কুসংস্কার, মূর্থতা এবং পাশব প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই বিদ্যমান ছিল না ।” সদাচার, শান্তি, ভদ্রতা, ধর্ম্ম, বিনয়, এসকল যেন দেশ হইতে দূরে পলাইয়া গেল । দুষ্টের দমন করিবার কেহ ছিলনা, বিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক হইয়া উঠিলেন । শিখ-সর্দারগণের হস্তে, রাজা কাঠের পুতলিকাধঃ অকর্ণণ্য হইয়া বলিয়া রহিলেন ।

এই সময়ে গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায় পঞ্জাবের সমাজ-সংস্কার এবং পঞ্জাবে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন; খ্রীষ্টের দেবোপম চরিত্রের কথা পঞ্জাবের প্রজাকুলকে শুনাইবার জন্য তিনি প্রথমে উৎসুক হইলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে শতক্রপার হইয়া অপর তটে যাওয়া বড়ই দুষ্কর ব্যাপার ছিল; সরকারী পরোয়াণা ব্যতীত পঞ্জাবী ভিন্ন আর কেহ এই নদ পার হইবার অধিকারী ছিলনা; বিশেষতঃ দেশীয় বা ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদিগকে শতক্রপ অপর পারে যাইতে দেখিলেই শিখেরা তাহার মস্তক চ্ছেদন করিত। নির্ভয়ে গোলোকনাথ শতক্রপার হইলেন; অপর পারে গিয়া “বিদ্যা-শিক্ষার আবশ্যকতা” এবং “নির্ম্মল চরিত্রের গুণ” সম্বন্ধে দুই দিন ওজঃস্বিনী বক্তৃতা করিলেন, প্রজারা শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিল, কিন্তু তৃতীয় দিবসে যখন তিনি “খ্রীষ্টের উদার চরিত্র ও খ্রীষ্ট দৈশ্বাবতার” এই বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন সমগ্র শিখ, হিন্দু ও মুসলমান তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। অবশেষে গুরুতর রূপে আঘাত করিয়া সায়াহ্নে ফিলোর দুর্গের অভ্যন্তরে অশিক্ষিত ছুটেরা গোলোকনাথকে বন্দী করিয়া রাখিল, এই দুর্গ শতক্রপ তটে এখনও রক্তমাখা, সম্প্রতি এখানে একটি রেলওয়ে স্টেশনও নির্মিত হইয়াছে। গোলোকনাথের এই অবস্থা সম্বন্ধে জনৈক লেখক লিখিয়াছেন—

“There, while like a brave watchman, he was lifting the lamp of the Gospel amid the surrounding darkness of heathenism, and on a soil where no Gospel messenger's foot had ever trodden, Golak Nath

suddenly seized by the neck from behind, and the infuriated anti-Christian mob dragged him mercilessly towards the part which was built by Kanajit Sing after the treaty of 1809. In this deadly part amidst a forest, Golak Nath was made secure under the crushing weight of two huge stone-mills and deprived (for hours together) of food and waters.”

সমস্ত রাত্রি উপাসনা ও সঙ্কীর্ণনে গোলোকনাথ মহানন্দে যাপন করিলেন, তাঁহার অতুলনীয় ধর্ম্মভাব দেখিয়া ছুটেরা ভয় পাইল, দুর্গরক্ষকদিগের পায়ণ হৃদয় বিগলিত হইল; অবশেষে প্রভাতে তাহারা গোলোকনাথকে মুক্তি দান করিল।

১৮৭৭ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে গোলোকনাথ “পাদ্রী” বা “রেভারেণ্ড” উপাধি প্রাপ্ত হইয়া জলন্ধরে প্রেরিত হইলেন। জলন্ধর তখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ; জঙ্গল কাটাইয়া, পাত্রী গোলোকনাথ অতি রমণীয় মিশনাশ্রম স্থাপন করিলেন। এই মিশনাশ্রমে গির্জা, দাতাখানা, পাঠাগার, পুস্তকালয়, অনাথালয়, প্রভৃতি সংযুক্ত হইল। অথচ গোলোকনাথ মিশন হইতে একটি পায়সাও লয়েন নাই। চাঁদা উঠাইয়া এই সকল বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদন করিলেন। সকল শ্রেণীর লোকের নিকট তিনি এতদূর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, রূপণেরাও তাঁহাকে সাহায্য দান করিত। গোলোকনাথের সমস্ত জীবন পরোপকারে ব্যয়িত হইয়াছিল। অনাথের সেবা, দরিদ্রের পালন, মুর্থকে শিক্ষাদান, পীড়িতের চিকিৎসা, অধ্যার্থিকের সংস্কার প্রভৃতি কার্যেই তাঁহার আনন্দ লাভ হইত। গোলোক নানা ভাষায় দ্বিগিজরী পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার নানা ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাবলী পঞ্জাব ট্রাক্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ১৮৭৭ অব্দে জলন্ধরে এবং

জলন্দর পার্শ্বে বিদ্রোহী সিপাহীরা শত সহস্র লোকের প্রাণ বধ করে, অনেক দেশীয় ব্রিটান এবং অনেক ইংরাজ তাহাদের হস্তে শমন সদনে প্রেরিত হয়, কিন্তু গোলোক নাথের মস্তকেব একটি কেশও কেহ স্পর্শ কবে নাই, গোলোকনাথ সর্বত্রই “মহাপুরুষ” এবং “দেবানুগৃহীত মহাত্মা” বলিয়া পবিত্রিত ছিলেন। এই সময়ে কর্পূবতলার মহাবাজা বিদ্রোহী সিপাহিদিগের সহিত মিলিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিপক্ষতা কবিত্তে ইচ্ছুক হয়েন, গোলোকনাথ মহাবাজাকে অনেক বুঝাইয়া নিবস্ত করেন এবং অবশেষে তাঁহারই পবামর্শ মতে কর্পূবতলাব মহাবাজা গবর্ণমেন্টের “মদৎগাব” অর্থাৎ সহায় হয়েন। বিদ্রোহের শাস্তি হইলে, মহারাজাকে পুরস্কার দিবাব ভ্রাতা গোলোকনাথ গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ কবেন গবর্ণমেন্ট বাহাদুর কর্পূবতলাব মহাবাজাকে অযোধ্যার অন্তর্গত ববাইচ তালুকদারী জায়গীর স্বরূপে উপঢৌকন দেন। সেই হইতে কর্পূবতলাব বাজবংশের সহিত গোলোক নাথের মহামিত্রতা জন্মিল, ঐ জায়গীরে এখনও কর্পূবতলা-ষ্টেটভুক্ত। বেভবেও গোলোক নাথ বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে ব্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত কবেন, পাদ্রী আবছলা এবং তাঁহার সহধর্মিণী এখনও জীবিত, ইহাবা গোলোক নাথের শিষ্য। বিখ্যাত রেভবেও মিষ্টব আবছলার এক কন্যা পঞ্জাব গবর্ণমেন্ট বালিকা বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শিকা, অপব কন্যা একজন সুপ্রসিদ্ধা চিকিৎসিকা। গোলোকনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্যের কথা আমরা এখনও বলি নাই; কর্পূবতলার মহারাজাধিরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স যুবরাজ হরনাথ সিংহ বাহাদুর গোলোকনাথ কর্তৃক

ব্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া পিতৃসিংহাসন-ও পিতৃালয় পরিত্যাগ করেন; পিতা আপন পুত্রকে ববাইচ তালুকদারী দান করিয়াছেন, প্রিন্স হরনাথ সিংহ বাহাদুর ববাইচে এখনও জীবিত। শ্রীমান হরনাথ সিংহ কেবল গোলোকনাথের শিষ্য নহেন, গোলোকনাথের জামাতাও বটে। ইনি পাদ্রী গোলোকনাথের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রিন্স হরনাথ সিংহ এক্ষণে জি, সি, এস, আই, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বিলাতে গিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং জ্যায় মহা সমাদর প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজা হরনাথ সিংহের রানী জীবিত; তাঁহার কয়েকটি পুত্র (অর্থাৎ গোলোকনাথের দৌহিত্র) ইংলণ্ডে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। গোলোক নাথের দ্বিতীয়া, জ্যী: কাম্মীর দেশীয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিলেন; পাদ্রী গোলোকনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র পঞ্জাবে বাবিষ্টার, দ্বিতীয় পুত্র অম্বালার পাদ্রী, তৃতীয় পুত্র লাহোর গবর্ণমেন্ট কলেজে অধ্যাপক এবং চতুর্থ পুত্র দিল্লি সার্ভিসে প্রবিষ্ট। গোলোকনাথ নিঃসম্বলবস্থায়, বাল্য বয়সে সহায়হীনতার, মূর্খের জায় বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, চরিত্র ও সাহস এবং অব্যবসায় ও স্বয়ম্ভু সমুখানশক্তিবলে পঞ্জাবে অধিতীয় পুরুষ হইয়া উঠেন। ধনে, মানে, প্রভুত্বে, বিদ্যায়, তাঁহার সময়ে পঞ্জাবে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। তিনি লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর হইতে কুলী মজুর পর্যন্ত সকলেরই প্রিয় ও সম্মানার্থ ছিলেন; তাঁহার নামে পঞ্জাবে “বায়ে ছাগে” এক ঘাটে জল থাইত। গোলোকনাথ অতুল ধনের অধিকারী হইয়া মৃত হয়েন, তিনি নগদ তিন লক্ষ টাকা রাখিয়া মরেন এবং তদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ভূসম্পত্তি মানস্বামীরে ধরিদ করিয়া দিয়াছেন।

গোলোকনাথের চেষ্ঠায় পঞ্জাবে সর্ব-প্রথম শিক্ষার হ্রদপাত হয়। তাঁহার পূর্বে কেহ এ বিষয়ে চেষ্ঠা করেন নাই। তিনি নানা স্থানে ইংরাজী স্কুল ও দেশীয় ভাষার পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, বহু স্থানে চিকিৎসালয়, লেক্চর-হল, রিডিংরুম, লাইব্রেরী, অনাথাশ্রম এবং ধর্ম্মালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, পঞ্জাবের তদানীন্তন লেঃ গবর্নর সার রবার্ট মন্টগমরীর সাহায্যে তিনি পঞ্জাবে জ্ঞানশিক্ষার হ্রদপাত করেন এবং কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে জলন্দের ৭৬ বর্ষ বয়স্ক কালে গোলোকনাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধি সময়ে তিন সহস্র লোক উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পরে পঞ্জাবের খ্রীষ্টান ও অ-খ্রীষ্টান ভদ্র লোকেরা চাঁদা তুলিয়া গোলোকনাথের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। জলন্দের দ্বিতীয় গির্জা Golak Nath memorial Church গোলোকনাথের স্মৃতিচিহ্ন।

মহাত্মা রেভারেণ্ড গোলোকনাথ মরিয়াছেন কিন্তু মৃত হইয়াও তিনি জীবিত। “He died with a nation’s weeping” সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের প্রজাকুলের হৃদয়ে তিনি এখনও জীবিত; পঞ্জাবের আজি কালিকার শিক্ষিত যুবকেরা তাঁহার চেষ্ঠার ফল স্বরূপ। পঞ্জাবের জ্ঞানশিক্ষা, পুরুষ-শিক্ষা, ধর্ম্মচর্চা, সমাজ-সংস্কার, এ সকলের গোলোকনাথই প্রধান ও মূল। পঞ্জাবের দাতব্যালয় সমূহের

তিনিই প্রথম উৎসাহদাতা। পঞ্জাবে গোলোকনাথের নাম কখনই লুপ্ত হইবে না; “Golak Nath was the Pioneer of education in the Land of the five waters”. Mrs. Mackenzie’s Journal. পঞ্জাব প্রদেশে, কোনও বিদেশী পুরুষ গোলোকনাথের স্থানাবিকার করিতে পারে নাই; পঞ্চদশ বাঙ্গালী মহাত্ম্যেব গোলোকনাথই মূল। খ্রীষ্টধর্ম্ম ও খ্রীষ্টসমাজ সম্বন্ধে পঞ্জাবে গোলোকনাথ যাহা করিয়া গিয়াছেন, ইউরোপীয় মিশনারার শত বৎসরের চেষ্ঠায় তাহার অর্দ্ধাংশ হওয়াও অসম্ভব।

বিদেশী বাঙ্গালী সমাজের গোলোকনাথ অস্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ নেতা; বঙ্গদেশের বাহিরে দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজের গোলোকনাথ ভিন্ন আর কোনও বাঙ্গালী-খ্রীষ্টান বিদেশে এত বড় মহাপুরুষ হইতে পারেন নাই। এই দৃষ্টান্তে বেশ বুঝা যায়, খ্রীষ্টান হউক আর হিন্দু হউক, ধামান বাঙ্গালী যদি উপযুক্ত কন্মক্ষেত্র পান, যদি মানসিক বলের পূর্ণ ক্ষুণ্ণিত স্থান পায়, তাহা হইলে শান্তপ্রধান, গ্রীষ্মপ্রধান প্রভৃতি যে স্থলেই হউক না, তিনি স্বজাতির ও স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইতে পারেন। বাঙ্গালার বিদেশ গমনের বাহারা বিরোধী, তাহার দেশের মহা বৈরী; ঈশ্বর করুন সমুদ্র পারেও—সুদূর ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা ভূমিতেও—বাঙ্গালার নামে ফুল চন্দন পড়ুক।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ।

বিচ্ছেদ ।

বেহাগ

জাগিতে ঘুমাতে রে পড়ে মনে
সেই কাল বরণ
ঘুমায়ে স্বপন দেখি, কানাই কানাই বলে ডাকি
মা বলে, কোথায় তোর কানাই এখন,
অমনি মনে পড়ে সেই কালবরণ ।
মার ডাকে চেয়েদেখি, লাজে পুন মুদি অঁখি
হৃদয় মাঝাবে পুন' কবি দরশন
জাগিতে ঘুমাতে রে সেই কালবরণ ।
কেমন মোহন কঁাতি, অলকা পুরিত ভাঁতি,
পাশে বসি নন্ত অঁখি মধু পরশন,
জাগিতে ঘুমাতে রে পড়ে মনে সেই কালবরণ ।
কুঁহুম তুলি ভরি ডালা, গাঁথনি চিকণমালা,
গলে তোর দিতে যাই ও কাল বরণ
সরমে মুদলি অঁখি, অঁখি পরে চেয়ে থাকি,
অঁন্ততে অঁখার করে মুদরে নয়ন,
অমনি হৃদয় মাঝে সে কাল বরণ ॥
জাগিতে ঘুমাতে রে পড়ে মনে
সেই কাল বরণ

খেলা ঘর বেঁধে আর, আবার খেলি দুজনার
আনাদরে পড়ে আছে ছেলেমেয়ে সব এখন ।
চিরদিন খেলার সাথী তুই রে আমার
কাল বরণ
লুকোচুরি কত খেলা, কানাই রে সাজের বেলা,
বেঁধেছি যে প্রেমের পাশে লুকাবে কি
কাল বরণ ।

জাগিতে ঘুমাতে রে পড়ে মনে
সেই কাল বরণ ।
ধূলোদিব ধূলোনিব ধূলোর ধূলোর সাজাইব,
চড়দিব চুমোদিব, হাসাইব কঁাদাইব
খেলার সাথী খেলি আর কালবরণ
সাজের বেলায় গেলি কোথায়

ফেলে আমার কালবরণ,

জাগিতে ঘুমাতে রে পড়ে মনে

কাল বরণ ।

প্রেমদাস বৈরাগী

দেবপুষ্পরথ ।

১

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ !

নবগ্রহ তার চাকা,

কনক রজত মাথা,

উজলিয়া উঠিয়াছে উদয় পর্বত !

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ !

২

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,

হেমন্তে আগুন মাসে,

মেঘে শীত জমে' আসে,

মরকতে মোড়া যেন নভ নীল পথ !

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ !

৩

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,

কমল-কলস চুড়ে,

পলাশ পতাকা উড়ে,

মরাল বাহনে তারে বহে মনমথ !

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ !

৪

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,

চন্দ্রহর্ষ গেছে নিরা,

সেরূপে মলিন দিরা,

চাঁকার চাঁকার আঁধারে শস্তু শরৎ !

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ !

৫

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,

যে দেশে সে 'রাবুমেলা',

বটতলে করে খেলা,

উল্লাসে 'ধবলেখরী' ঢালিছে রজত !
সে দেশে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ !

৬

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
প্রেমদা দেখেছে তারে,
নেমেছে কুটার দ্বারে,
আলোকে হাসিল যব সুধা স্বপ্নবৎ !
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ !

৭

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
প্রেমদা দেখিল হেসে,
কোলেতে জমিল এসে,
সে পুণ্য আনন্দ আলো মৌচাগ্য সম্পৎ !
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ !

৮

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ !
হৃদয়ে কুলনানী ;
আনন্দে ভাসিল বাড়ী,
অনন্দে ভাসিল যেন এ সুদ্র জগৎ !
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ !

৯

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
সে এক স্বর্গের শিশু,
নহে বৃদ্ধ নহে যীশু,
সে আরো পুণ্যের পুণ্য পবিত্র মহৎ !
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ !

১০

ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ,
পিতৃগণ মহোন্মাদে,
চপলা চমকে হাসে,
অশনি—জ্বলন্তি বাজে অর নহবৎ !
ভূতলে নেমেছে নাকি দেবপুষ্পরথ !

শ্রীমদোবিদ্য চন্দ্র দাস।

অনন্ত বিরহ।

১

প্রথম বিরহ ; রূপগুণ শুনি
শালসা হইল মনে,
কোথা থাকে নেই, কোন্ পথে যায়,
নিরখি তারে কেমনে ?
তুষিত এগুটী, নয়ন চকোর
সে চাক টাঁদ বয়ান
জুড়াইবে হায়, সে লাবণ্যমৃত
বারেক করিলে পান।

২

নিরখি নয়নে, বাড়িল যাতনা
দূরেতে নিরখি তারে,
নিকট না হলে, জুড়ায় না প্রাণ
বিরহে দ্বিগুণ বাড়ে।
কাছে বসি বসি, হেরি মুখ-শশী
দাঁড়ায়ে রূপের ছায়।
নয়ন ভরিয়া, সে রূপ হেরিয়া
এ প্রাণ জুড়াতে চায়।

৩

নিকটেতে পেয়ে, বাড়িল বিরহ
পরশেব অভিলাষী,
জুড়াইতে চায়, বৃকেতে ধরিয়া
সে রূপ-নির্মলা রাশি,
শিরীশ-কোমল, সে তনু পরশি
হারাইয়া আন জ্ঞান;
আবেশে অলস, ঘুমন্ত নয়ন
লাবণ্য করিবে পান।

৪

হইল পরশ, শোণিত জোয়ার
তপত বহিল জোরে,
অঁধার দেখিছ চারিদিক সখি,
অবীরা করিল মোয়ে।

অবশ শরীর, শিথিল বন্ধনী
 ছরুছরু হিয়া কাঁপে,
 “যামে তিতি গেল, সব কলেবর
 না জানি কেমন তাপে ।”

৫

সঙ্গরি সজনি, বাড়িল বিরহ
 যাতনা বুকেতে রাখি,
 দেহের বিচ্ছেদ, মিটাই কেমনে
 হৃদয়ে হৃদয় মাখি ।

মিলনের বুকে, বিরহেব বাসা
 এ ছুখ ডানাব কাবে,
 যুকের উপবে, মাগাটী রাখিয়া
 ডুবিছে বিরহ ধাবে ।

৬

তখন, একটি চুষনে, প্রিয়তম মন
 হৃদয় করিলা পান,
 তটিনী তুবিল, সাগর সঙ্গমে
 ঘুচিল দৈতের ভাণ ।
 নাহি পাপপুণ্য, নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম
 নাহি সুখ দুঃখ লেশ,
 নাহি আমি তুমি, স্বর্গ মর্ত্ত্যভূমি
 মিলন, বিরহ ক্লেশ ।

৭

কিন্তু, এভাবস্বত্বনী, ঘুচিল চকিতে
 ভাঙ্গিল ঘূমের ঘোর,
 একঅঙ্গে আধা, আধাশ্রাম রাধা
 দৈতাত্মিত ভাবে ভোর ।
 হারাইয়া প্রাণ, প্রাণভরে কাঁদি
 সাধায়ে সাধিয়ে মরি,
 মরণের ঘরে, জন্মিল জন্ম
 সবে বলে হরি হরি ।

৮

প্রণয়ী বাচেনা, অভেদ মিলনে
 শ্রাম-সোহাগিনী রাধা,

ক্ষণেক হাসিবে, ক্ষণেক কাঁদিবে
 বিরহ মিলনে বাধা ।

বিরহ ছাড়িয়া, প্রণয় লালসা
 প্রেমিক মানয় ভুল,
 অনন্ত লীলায়, বিরহ মিলন
 এক বুহে ঢুটাইল ।

শ্রীমদনোবজ্ঞান শ্রুত ।

অশ্রুজল ।

১

কেনই বা অশ্রুজল করি পবিত্র,
 শোক ভাপে দিবানিশি কবি হাহাকার ।
 কেনই বা প্রাণ কাঁদে,
 না হেরিলে স্নাত চাঁদে,

মরণ অরণে কেন হৃদয় বিদার !

কেনবা ভাবনা অঙ্গে,
 কেনবা কাঁপি তবানে,
 কেন শূন্য হেরি অশ্রু-সংসার ।

কেহ কার ভবে নয়
 তবু মনে হেন লয়
 মায়ায় দেখায় কেন জগত আমার ।

ভালবাসিঘাছি যায়ে
 বিনা গণে অকাতরে

হৃদয় সর্ব্বদা যেই হৃদয় মাঝে,

নাহি পাব ভবে আর
 প্রাণবনে পুনর্কাব,

মদি পাই, তবু নয় শব্দে তাহার ।
 তথাপি সাঙ্কনা পাই ফেলি অশ্রুধার ।

মন যার দার মনে
 নিদারুণ, প্রতিফণে,

জীবনে মরণ আলা সহি অনিবার,
 তথাপি সাঙ্কনা পাই ফেলি অশ্রুধার ।

নে গেল, সে গেল, আঁহা ফিরিবেনা আর,
 রহিল আহা নিদ্রা এ শরীর-ভার ।

রহিল লোচন, কিন্তু গেল যে চন্দ্রমা,
রহিল জগত, গেল প্রকৃতি সুসমা,
রহিল শ্রবণ, গেল রব নধুরিমা,
রহিল সকলি, গেল পরশ গরিমা,
পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিহীন

দিনে দিনে দেহ ক্ষীণ
রহিল কেবল ছায়া অতি কদাকার,
তথাপি সাস্থ্য পাই কেলি অশ্রদ্ধাব।

২

কেন ঝরে অশ্রুজল অতি নিঃশব্দ,
কোথায় প্রেমসী আঁহা হৃদয় কোমল !
হৃদয়ের আবখানি ! প্রণয়ের খনি !
জীবন-পরশ-মণি ! আশা-সৌদামিনী !
জীবন মরণ সম তোমার বিহনে,
এস প্রিয়ে একবার এস গো স্বপনে।
জীবনে বুদ্ধদ তুমি জীবনে মিলেছ,
প্রতিধ্বনি সমতুমি পবনে মিলেছ,

আমি শশী তুমি ত আকাশ,
আমি ভাল, তুমি পরকাশ,
আমি তরু, তুমি পল্লবিনী
আমি মেঘ, তুমি সৌদামিনী,
আমি পিক তুমি কুহরব,
আমি ফুল, তুমি ত সৌরভ।
আমি গিরি তুমি নির্ঝরিনী,
আমি দেহ জীবন রূপিনী।

কলকণ্ঠ রাজহংসি মনসে আমার,
শ্রেম তামরস মাঝে দিতে গো সঁতায়।
অরিলে সে সব কথা

হৃদয়ে দারুণ ব্যথা

পাশরি কেমনে,
এস গো প্রেরসি ! এস এস গো স্বপনে।
তপন-তাপিত ধরা কেলে গো নীহার,
আত্মের গিরির শিরে জমাট তুষার,
নয়নে কেন না-রবে মন অশ্রুধার।

কেজানে হইবে কিনা দৌহার মিলন
কোন কালে,
হইবে আবার ফিরে প্রণয় তেমন
মম ভালে ?

দেহ ভট্ট ; এক সৃষ্টি, স্থূলতম আর,
কেমনে সে হেন প্রেম ঘটবে আবার,
তথাপি সাস্থ্য পাই কেলি অশ্রদ্ধার।
শ্রীশরচ্ছন্দ্র শুভ্র, এম এ।

দেখা ।

“প্রেমের তড়িৎ বেড়ায় ছুটিয়া
অলখিতে যদি ছুঁয়ে ;
যেচে যেচে প্রাণ ছুঁয়ে।”
স্মৃতির মলয়ানিলে কি ছবি জাগিল,
সৌহার্দে জড়ায়ে বাহ বাহ-লতা-পাশ।
প্রেমালস, স্বপ্নাবেশ, ঘুমাইতেছিল
অস্তান্তলে ; বিদ্যায় চুষিত প্রয়াস।
সমাবি সুরভি যথা, কুসুম মরিয়া,
বায়ু বৃকে ছবি থানি ; যেন ভোলা গান,
ভাষাহীন সুর বাজে রহিয়া রহিয়া,
বিদিত তাহার ষা’র স্মৃতি অবসান।
বিথারি বৈজ্যতি টানে বাহুর মন,
সরল মোহিনী মঞ্জ, পরশনে টুটে,
লক্ষ যোজনেতে গ্রহ-বিশ্ব আকর্ষণ,
তাড়িত-প্রবাহ যদি কুণ্ডে কুণ্ডে ছুটে।
প্রেমময় চায়াময় ঘুমঘোর মাথা,
যেন স্থির সৌদামিনী সচকিত দেখা।
শ্রীমতী সুরবালা বহু (কাহালগাঁ)।

প্রাণের দেবতা ।

তাহারে ছোঁবনা আমি সেযে গো দেবতা
এসেছি পূজিব বলে, পূজিব হৃদয় খুলে,
নাইবা কহিল কথা—না কহিছ কথা।
কথাত কথার কথা কাজ প্রাণে প্রাণে,
দরশ স্বর্গের ধন, পরশে কলুষ মন,
দরশনি চাহে লোক দেবতার স্থানে।

দবশ দেবের ভোগ্য, পবন পিশাচ যোগ্য
দরশে অসিয়া ওঠে ধবমের ভাতি,
পরশন হতে ভাল দবশন হাত ।
অধিতে বাধিবা অধি, দূব হতে চেয়ে দেখি
দাওগো এ বকে বল অর্গাতব গতি ।
অহুদিন অধুক্ষ, পাই নেন দবশন,
শুধু দবশন দিও প্রিয় পাণপতি ।
নাইবা ছুঁইলো অঙ্গ না কহিল কথা,
বকে বাধি সদা শুচি, ভকতি প্রদান পুজি,
দূরে দূরে ভালবাসি পাইব যেন ।

ভাতপুজা সুনন্দী দাস ।

সম্মানে ।

প্রতিদিন কি মোহন হু বদাড়া-এ জগতর তীব্র,
মোহনয় অবাক্ত ভাষায়, শব্দ । আশা ক মঙ্গীত গায় ।
সে মঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তগত নীরব হয়ে যায় ।

স্নেহময়ী জননী'র মত স্নেহ হস্ত বুলাইয়া শিরে,
অধিবাস্ত চব দিয়া ঘেরি জগতের দেহপানি ধীরে ।
নীরব হৃদীর পদক্ষেপে ধীরে ধীরে স্বপন মতন,
যে মন মোহন মগ্ন গাহি নক্ষা ঘ'র কবে আগমন,
কি গভীর কবিত্ব মাধুরী খুঁট উঠে এনিখ মন্দিরে,
কি এক মনস্ক পদে তারক শাখায় ধীরে ধীরে ।
প্রাণ মিস্র ধব'র পাশে চে'ল উঠে অগ্নি গাহ'ব,
দিগনে । শেষে ন মনস্ত হয় ধীরে গোলাব পকাশ ।
ক গভীর গাভীয়া গোরাব ভরে উঠে বিবেক আনন,
নিশবতে যেন শুক প্রাণ শনে কার আশীষ বচন ।
মব্যাব গোরাব গীত গাহি উদালয়া বাহুগো তটিনী,
সুগভীর অবগাহ হাত উঠে মহা বন্দনাব মানি ।
দিবসেব কনক চন্দন টুটে উঠে সন্ধ্যাব চল টে,
চুমিতে ও বজ্রের বরণ মেঘলি আস ধীরে ছুটে ।
শেষবাস্ত বসিয়া নীরবে আধুট শ্রমোতন তানে,
যেন কোন রহস্ত কাছিনী বান্দ সদা ধরীর কাপে ।
নিশবত মন পদকনি জাগ'র্য নিদ্রিত অধার,
বাল যার হৃদীর গমনে বাধে শুভ মন হা তার ।
ভীমতী লজ্জাবতী বহু ।

ভারতের দুর্ভিক্ষ সমস্যার জাতীয় মহা-সমিতি । *

অনুবাগী দলেব আনন্দ হিলোল এবং
বিরাগীদলের নিন্দা প্লাবন মস্তকে বহন
করিয়া, এবাব বনিকাতা নব'বে, জাতীয় মহা
সমিতির দ্বাদশ অধিবেশনের শস্য সূচক
রূপে নির্বাহ হইয়া গিয়াছে । আমরা পূর্বে
হইতে শুনিয়া আনিতেন ভিলাম যে, এসাব
কাব দাক্ষণ চুক্তিগেব তগত ভাতায় মহা স-
মিতির অধিবেশনের একান্ত প্রয়োজন । আশা
করিয়াছিলাম, নিবর ফ্রা-কাতব অদংয়া
নরনারীর বক্ষা ব্রত গ্রহণ করিয়া মহাসমিতি
সর্ব সাধারণেব আশীর্বাদ-ভাজন হইবেন ।
মনে করিয়াছিলাম, এই মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হইয়া জাতীয় মহাসমিতি স্বীয় অস্তিত্ব-গতি-
ষ্ঠায় সুন্দর, অক্ষয়, অটল কাবণ-বাহ বচনা
করিবেন । কিন্তু বুঝিয়াছি, সকল আশা বৃথা ।
এখন বুঝিতেছি, দ্বিবিদ্রগণের প্রোথিত অহি-
স্তপের উপর, বাহাড়বর, কথা, উপদেশ ও

বলুতা কণ একর ভিত্তিতে মহা সভা এদেশে
দাঁড়াইয়া থাকিবে । অহো দুঃভাগ্য ।

আমরা জাতীয় মহা সমিতির অকৃত্রিম
বন্ধু । বন্ধু নিকট ও মাছুষ মত বিবক উপদেশ
শুনিতো চাহে না । কোন কথাব প্রতিবাদ
ব বিলেই মাছুষ শক বসিয়া মনে করে ।
পূর্বে জাতীয় মহা সমিতি সম্বন্ধে কয়েকবার
আমরা কিছু লিখিয়াছিলাম বলিয়া, নিম্নিত
এবং তিবস্ত হইয়াছিলাম । অনেকে আমা-
দিগকে জাতীয় মহা সমিতির শত্রু বলিয়া
মনে করিয়াছিলেন । তা করুন এই ভাব-
তেব উন্নতির জন্ত যিনি যে কোন সংকাজে
ব্রতী, তিনিই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র ।
সকল সংকাজের সহিতই আমাদের প্রাণের
যোগ । দূরে থাকি, আদ কাছে থাকি—
সকল কাজের সাফল্যের জন্তই বিধাতার
নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকি ।

* জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধে ঠাকুরদাস বাবুর একটা বড় প্রবন্ধ আশ্বমী বাবুর বাহির হইবে ।

কিন্তু কি জানি কেন, কাজের পরিবর্তে বৃথা জল্পনা, হিতৈষণাব নামে প্রভাবণা, ধর্মের নামে ভণ্ডামী দেখিলেই আমাদের প্রাণ অস্থির হয়! এই মহা সভাব মহা আনন্দেব ব্যাপাব দেখিয়া কত লোকের নাকি উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু এই হতভাগ্য আমাদের কেবল অশ্রুপতন হয়! এবাব পৌড়ার নিদারুণ কষাঘাতে প্রথম তিন দিন সভায় যাইতে শক্তি ছিল না।—একদিন সময় বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাই চতুর্থদিন যাইতে পারিয়াছিলাম। যখন এক একজন প্রবাব বক্তার মঞ্চ-আরোহণের সময় “হিপ্ হিপ্ হুররো” রবে চতুর্দিক আন্দোলিত হইতেছিল, তখন কি জানি কেন, আমাদের কেবলই দীর্ঘ নিঃশ্বাস নির্গত এবং অশ্রু পতন হইতে ছিল। অনেকক্ষণ, স্থানান্তাবে, দাঁড়াইয়া দেখিলাম, ভারতের প্রবাব ব্যক্তিগণ মিলিয়া যাহাকে মহাসভা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে-ছেন, তাহা যেন অস্থায়ী বক্তৃতার উচ্ছ্বাস ভরঙ্গ মাত্র! বুকিলাম, মহা ব্যাপাব নয়, যেন মহা ছেলেমী। বাঙ্গালীদিগকে বঙ্গের পার্শ্বী সম্প্রদায় কথা-সর্বস্ব জাতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীব অহু করণে ভারতের কর্মদক্ষ অগ্রাভ জাতি সমূহও কি বাক্যবাগশ হইয়া উঠিবে?

একটা গল্প শুনিয়াছি। এক বন্ধুর একটা ছোট ছেলে একদিন প্রাঙ্গণে কতকগুলি বালি ভূপাকার করিয়া তত্ক্ষণে একটা কাটার কাটা পুতিয়া বাড়ীর সকল লোককে ডাকিয়া বলিয়াছিল—“দ্যাখ এসে আমি কি কনেছি” এই অন্তত ব্যাপার মানুষকে না দেখাইলেই নয়! বাড়ীর লোকেরা বালকের এই ক্রীড়া দেখিয়া হাসিয়া আকুল! জাতীয় মহা সমিতির এই কথা সর্বস্ব ব্যাপার-ভিত্তিক আমাদের মনে সেইরূপই মনে হয়। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা

কোন কাজ করিবে না, কেবল উপদেশ দিবে। জলে ডুবিয়া লোক মরিতেছে দেখিলে বিদেশে লোক আনিতে সংবাদ পাঠাইবে। আগুণে বাড়ী পুড়িয়া যাইতেছে, যখন তখন কমিটী ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসিবে। এবাব ভূভিত্তিক সমস্যা মহাসমিতির ব-টা ব্যাপী বক্তৃতা এবং উপদেশ পড়িয়া আমাদের এই সকল কথাই মনে হইতেছে। মহা অপদার্থতার মহা মেলা—জদগহান হজুয়া প্রিয় লোকেব মহা হজুগ—সম্মান-প্রত্যাশা লোকেব স্বার্থ-জালবিস্তার। হা ভগবান, এ দেশের উদ্ধার তুমি এমন সকল লোকের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছ!!

মহা সমিতিতে এবাব প্রতিনিধি বড় অল্প উপস্থিত ছিলেন—বড় জোব ৮০০। এজন্ত কেহ কেহ টিকানী দিতেছেন। ইহাতে শক্তি-লঘুতাব পবিচয় নাই। ৮০০ লোকের মধ্যে শতটী লোকও যদি প্রকৃত স্বদেশবান, চবিত্রবান, স্বার্থ-হীন দেশ-হিতৈষী থাকেন, তাঁহাদের শক্তি অপরিমেয়। একা ম্যাটিনি যদি একটা দেশ স্বাবান করিতে পারে, শত অবোধ্যানাথ কি তাহা পাবে না? অবশুই পাবে। কিন্তু অবোধ্যানাথের জায় প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষী এ দেশে বড়ই বিবল। এই বা ছুঃখ। সুবেঙ্গ নাথ হিতবাদীর সাহায্যে নৃত্য করেন, কি আনন্দ নোহন সঞ্জাবানর সাহচর্যে উল্লাস করেন, তাহা শোভা পায়, কেননা, তাহারা যাহাই হউন, দেশের বড় লোকত বটেন! একসময়ে লর্ড ক্রসের ভাবত-কাউন্সিল বিলের তার প্রতিবাদ করিয়া থাকিলেও, তাহারা আজ কাউন্সিলে বসিয়া “মাননীয়” উপাধি পাইয়াছেন ত, তাহাদের সকলই শোভা পাব। কিন্তু তুমি, আমি, সে, যাহারা কখনও দেশের জন্ত ভাবে না, যাহারা এক মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াকে পাপ মনে করে, যাহারা আত্মীয় পোষণকে অলসতার প্রশয় দেওয়া রূপ মহাপাপ মনে করিয়া, একানবর্ভী পরিবার প্রথা সর্বনাশের মূল ভাবিয়া, বিচ্ছিন্নতার রাজ্যে কুটীর নিরুৎসাহ করিয়া মহাপ্রলয়ে আছে, তাহারা যদি এহেন মহারথীগণের সহিত নৃত্য বা উল্লাস করে,

তবে তাহা সাজে কি ? যাত্রার সং বলিয়া কি মনে হয় না ? হিতৈষণার ভেদান-সাজ পরিলে হিতৈষণা গজাইতে পারে, কেহ কেহ বলেন। তাহা অসম্ভব। ময়ূবপুচ্ছ পরিয়া কখনও কাক ময়ূব হইতে পারে না। না—কখনও ভেক বরিয়া, তন্ম মাখিষা ভণ্ড ভক্ত-সন্ন্যাসী হইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজেব মাঘোৎসবে অনেকের ক্রন্দন শুনিয়াছি—কি পরক্ষণেই দেখিয়াছি, যে চরিত্রহীন, সেই চরিত্রহীন। কনগ্রেস মণ্ডপ পরিত্যাগের পর অনেক প্রতিনিধি দেখিয়াছি, পূর্বে যে রূপ উপহাস প্রিয় ছিলেন, সেইরূপ উপহাস-প্রিয়ই আছেন। এমন লোক সকল দ্বাৰা দেশ উদ্ধার হয় কি ? তুমি ভাই আশা কর, তোমাব পদ ধূলি দাও, মস্তকে লই। আমাদের একজন জমীদার বন্ধুকে প্রতিবৎসর প্রতিনিধি হইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছি। তিনি সজ্জন, পবোপ-কামী, প্রজারঞ্জক, ধর্ম পিপাসু ব্যক্তি, তিনি প্রতিবারেই বলেন—“আমি কি প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য ? দেশের কথা কি ভাবি, দেশের জন্ত কি করি যে, প্রতিনিধি হইব ?” একার ও তাঁহাকে প্রতিনিধিরূপে সভায় উপস্থিত করিতে পারি নাই। তাঁহাব এই কথাটা যখনই ভাবিয়াছি, তখনই প্রাণ ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। ভাবিয়াছি, প্রকৃত হিতৈষণা এইখানে। কিন্তু অনেক প্রতিনিধি। ক-রূপ দরের লোক ? কনগ্রেসের বন্ধ, বৃকে হাত দিয়া বলত ?

সকল কথা বলিতেছি কেন ? যে ব্যক্তি যেমন, তাহার কাজ ও তেওঁনি। বাক্য-বাগীশ কাজ দেখিলেই ভয় পায়। বক্তৃতা করা যার ব্যবসায়, বক্তৃতা শুনে তার হিতৈষণা আর থাকিবে কেন ? যে ব্যক্তি তামাসা দেখিতে, বক্তৃতা শুনিতে খিয়াটারে বা সভায় যায়, তামাসা বা বক্তৃতা শুনে তাহাকে আর কে পাইবে ? এবার-কল্পিত জাতীয় সভার অধিবেশনের পূর্বে দুই জন বন্ধুকে বলিয়াছিলাম যে, এবার হৃদ-কের জন্ত প্রলিকাতা, বধে, মন্ত্রাজ প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান সহরে হৃদকের কমিটি গঠন করিয়া সমিতির দরিত্রসেবায়

গ্রহণ করা উচিত। আমাদের দেশের এক-জন সজ্জন ব্যক্তি কনগ্রেসের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট এসংবাদ লোক দ্বারা পাঠান হইয়াছিল, তিনি ক্ষদ্র-বান ব্যক্তি, কিছু চেষ্টাও করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি, কিন্তু হইলে কি হইবে—প্রধান পাণ্ডাদের আসরে তাঁহার চেষ্টা পরাস্ত হইয়াছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ত জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত, দরিত্রের জন্ত চেষ্টা করিবে ? উহা যে রাজনীতির বাহিরের কাজ !! বিলাতে টেলিগ্রাম পাঠাও, হৃদকের জন্ত গবর্ণমেণ্টে লেখ, তারপর মহা-সুখে নিদ্রা ঘাও ! কে এখন স্বথসেব্য আহার পবিত্রাগ করিয়া, জীবন-সার বক্তৃতা বিসর্জন দিয়া দরিত্রের পাছে পাছে বেড়াইবে মূর্খের চিংকার শুনিও না, মহানাস্তিতে নিদ্রা ঘাও এবং মধ্যে মধ্যে জাগিয়া জাগিয়া, উঠিয়া উঠিয়া গবর্ণমেণ্টের কাজের সমালোচনা করিও এবং উলুবেড়েতে প্রজাসভা ডাকিয়া হই-হই রই-রই করিও ! কৃবিব্যাগ স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রজা রক্ষা করুক, অন্নভাবে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে, গবর্ণমেণ্টের রক্ষা করা কর্তব্য, গবর্ণমেণ্ট কখন, আমরা বক্তৃতা করি আর সুখে নিদ্রা ঘাই !! আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিও না। আমরা কংগ্রেসে যাইব না, অভিমান করিয়াছিলাম, দেখ কত কষ্টে সে অভিমান ত্যাগ করিয়াছি। আমাদের ত্রায়স্বার্থত্যাগী কি আব আছে ! আমাদের দিগকে এখন বিপুল পরিশ্রমশূন্য একটু বিশ্রাম করিতে দাও। অনেকের মুখে এইরূপ কথা শুনিতেছি। এরূপ করিয়াই নাকি ভারত জাগিবে !! অহো হৃদগ্য ! জাতীয় মহা-সমিতির মহা ধুমধামের অধিবেশনের পর ক্রমাগত ভাবিতেছি হায়, এ কি হইল ? শুনিতেছি, ইতিমধ্যে নাকি দেড়লক্ষ লোক অনাহারে ভারতে মরিয়াছে। মহাসমিতি চেষ্টা করিলে দশ-সহস্র লোকের প্রাণ কি রক্ষা করিতে পারিতেন না !! অথবা কাজ করে, এমন লোক কোথায় মিলে ? হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বক্তাগণ নীরব হইয়াছেন, কাজ করে কে ? এখন ভাবিতেছি, যেমন স্বার্থে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছে, তাহার

উপযুক্ত কাজই হইয়াছে! দয়াশূন্য বীর, দয়াশূন্য বক্তা, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য পণ্ডিত মণ্ডলীর মহাসম্মিলনের মহাফল—“বিলাতে লর্ড মেয়রকে চাঁদাসংগ্রহের জন্য টেলিগ্রাম কর!!” একপক্ষদ্বয়ই প্রস্তাব এখন কেবল এই ভাবতবর্ষেই শোভা পায়! ইহা ঠিক কাজই হইয়াছে। যা কিছু বুঝিবার ভুল আমাদের, এবং যা কিছু কপালের দোষ এই দৃষ্ট দৃষ্ট দৃষ্টদিগের। জন সংখ্যা বৃদ্ধি

দারিদ্র্যের প্রধান হেতু, এবার ভারতের ত্রিশকোটি লোকের দশকোটি লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করুক, আগামী বৎসর “অমাবস্যা”তে তাহাদের অস্তিত্বশির, উপর দাড়াইয়া মহাদত্তা প্রায়শ্চিত্ত এবং স্বস্তায়ন করিবেন। সুবেশ্রনাথের জয়, হউক, রণদেব জয় হউক, তরুণ মহায়া দিয়ানীব জয় জয় কাবে দেশ পূর্ণ হউক, মহাসভাব মহাকাঙ্ক্ষা রিসম গু হইয়াছে। সবলে হবি হবি বল।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩১। সচিত্র শিশুসংক্রমণ।—দ্বিতীয়-ভাগ, কৃষ্ণবীর নন্দাল বিদ্যালয়ের ভূত-পূর্ব দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র সেন প্রণীত, মূল্য ০/৫। শিশুদিগের ক্রীড়া শিক্ষা উপযোগী এবং উপকারী, তাহা যেমন পণ্ডিতগণ বুঝিতে পাবেন, এমন আর কেহ নহেন। প্রসন্ন বাবু এই পুস্তক শিশুদিগের বিশেষ উপযোগী করিয়া রচনা করিয়াছেন। সুন্দর সুন্দর ছবি দ্বারা পুস্তকখানিকে আবেশ মনোরম্য করিয়াছেন। আমবা পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এখন শিক্ষা বিভাগের কর্তাদিগের ইহাব প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি পড়িলে হয়।

৩২। পাঠশালা পাঠ্যগণিত, মূল্য ০/১। এখানিও উক্ত গ্রন্থকারের প্রণীত। এ পুস্তক খানি আইমারি বিদ্যালয়ের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। নিয়মগুলি বিশদরূপে ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং উদাহরণগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। সর্বসাধারণের নিকট আদৃত হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। পুস্তক খানিতে আর ৩৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য অতি সুলভ।

৩৩। শারদীয় সাহিত্য।—চাঁদাসংগ্রহ রূপোপাখ্যান প্রণীত, মূল্য ১/১। চাঁদাসংগ্রহ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। চাঁদাসংগ্রহ একজন সাহিত্য-জগতের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। নব্যভারতের পাঠ্য-গ্রন্থ এই বিশেষ পুস্তক-সমগ্র গ্রন্থকারকে

বিশেষ রূপ জানেন। সাহিত্য মঙ্গল নামক গ্রন্থে ইনি যে অসাধারণ ক্ষমতা,—কৃতিত্ব, লিপিকৌশল, নিবপেক্ষতা এবং পতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমাদের অন্তরে চিহ্নিত বহিয়াছে। এই শাবদীয় সাহিত্য এক অভিনব গ্রন্থঃ—ইহাতে পূর্ব গ্রন্থের ক্ষমতার সহিত লেখকের হস্ত বস উদ্বাপনের বিশেষ ক্ষমতা সংযুক্ত হইয়াছে। কাঠিন্বে কোমলতা, গাভারো তবলতা, ধর্ম-ভাবে বসিকতা বিমিশ্রিত হইয়া এই গ্রন্থ এক উপাদেয় সামগ্রী হইয়াছে। গদ্য এবং পদ্য, দুয়েই গ্রন্থকার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। একপ প্রবীণ সাহিত্য সেবকের গ্রন্থ, এই বঙ্গ, এই নতন যুগে এক নতন সামগ্রী। আমরা পড়িয়া কখনও হাসিয়াছি, কখনও কাঁদিয়াছি, কখনও মাতিয়াছি। শ্রাবণের অনর্গল বর্ষার পর নব ভাস্কর্য্যের কিরণ যেমন মধুর, কণ্টক খেণ্ডিত গোলাপের দোরভ যেমন মিষ্ট, এ পুস্তক তেমনি। এ বঙ্গ এ গ্রন্থের আদর না হইলে ছুঁখের সীমা থাকিবে না।

৩৪। প্রবন্ধলহরী।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল বায়, এম এ, বি-এল প্রণীত, মূল্য ৬০। চাঁদাসংগ্রহ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। বাবু জ্ঞানেন্দ্র লাল, “বঙ্গবাসী”র প্রথম যুগের সম্পাদক। যখন বঙ্গবাসীর আদর দেশমর ব্যাপিয়াছিল, তখন জ্ঞানেন্দ্র বাবু অসাধারণ প্রতিভা বিকীরণে বঙ্গবাসীর মেঘার তৎপর

ছিলেন। ঘটনা-চক্রে, বঙ্গবাসী যখন অভ্য-
ন্নতির পরিবর্তে অবনতির সুর ধরিলেন,
তখন জ্ঞানেন্দ্র লালের সহিত আর বঙ্গবাসীর
সম্বন্ধ রহিল না। তাবপর জ্ঞানেন্দ্র লালের
প্রতিভা “পতাকা” প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল।
এ দেশে যে ভাল জিনিসের আদর হয় না,
পতাকার জীবনে তাহাও উদাহরণ লিখিত
হইল। উপহারের কুণ্ডকে মাতিয়া সস্তার
বাজারে যখন এ দেশের শিক্ষিত এবং অর্ধ-
শিক্ষিতগণ মাতোয়ারা, তখন পতাকা আদব
পাইবে কেমনে? পতাকা গেল, নবজীবন
গেল, প্রচারও গেল। ষাঁহার বঙ্গদেশের
উন্নতিতে আনন্দিত, এবং অবনতিতে দুঃখিত,
ঐহার এ সময়ের ইতিহাস স্মরণে অশ্রু সঞ্-
চরণ করিতে পাবেন না। আজকাল বঙ্গভূমির
সাপ্তাহিক পত্রিকা সকল অদিকাংশই স্বার্থ-
কুহকে, পরনিন্দায়, পরকুৎসার, পরশ্রীকাতর-
তায় পূর্ণ। একজন ক্ষুদ্রবান ব্যক্তি এক
সময়ে বলিয়াছিলেন, এখন আব সাপ্তাহিক
হাস্তে করিতে ইচ্ছা হয় না, কেবল গালা-
গালি, কেবল পরনিন্দা। উল্লীষণের সুন্দর
যুগ উপস্থিত। এখন ভাল জিনিসের অনাদর,
কুৎসিৎ, কদাকার, অশ্রীল জিনিসের আদব।
থিয়েটারের আদর বৃদ্ধির সহিত উপহারের
আদর বাড়িতেছে—প্রকৃত সাহিত্য এখন
অঙ্গে অঙ্গে লোপ পাইয়াছে। এই দারুণ
দুর্দিনে জ্ঞানেন্দ্র বাবু বহুদিনের অনাদৃত ও
উপেক্ষিত জিনিস লইয়া উপস্থিত। হাঁ কপাল,
ইহার আদর কে করিবে?

নব্যভারতের পাঠকগণ জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে
—বোধ করি, উত্তম রূপই জানেন। তাঁহার
লেখনী ফাটরা যেন রক্তশ্রোত—হৃৎশ্রোত
বহিতেছে—তাঁহার হৃদয় যেন কেবল দেশের
জুয়া কাঁদিতেছে। খাটী হৃদয়ের খাটী জিনিস
কেহ দেখিতে চাও—জ্ঞানেন্দ্র বাবু লেখা
পাঠ কর। প্রতিভা-যমুনা যেখানে দয়া-গঙ্গায়
সম্মিলিত হইয়া অতি সুন্দর, অতি মধুর,

অতি স্নিগ্ধ, অতি সুশীতল সুস্বিমল সাহিত্য-
পানীয় রচনা করিয়াছে, সে স্থানে অবগাহন
করিয়া জীবনকে ধুস্ত করিতে কেহ লালায়িত
থাক যদি, তবে প্রবন্ধ-লহরীর পানে তাকাও।
ইহার প্রতি কথার স্বদেশাত্মরাগ, প্রতি তরঙ্গে
প্রতিভা স্ফূরণ। এই লহরীতে শৈত্য এবং
স্নিক্ততা, মাধুর্য এবং দয়া, দেশাত্মরাগ এবং
প্রাণনা, জ্ঞান এবং প্রেম, শক্তি এবং কর্ম্মাত্ম-
রাগ তরলাকারে পরিশোভিত। লেখায় হৃদয়
পাঠ করিবার কাহারও ইচ্ছা থাকিলে, প্রবন্ধ-
লহরীতে অবগাহন করিলে বিমুগ্ধ হইবেন।
আমরা জ্ঞানেন্দ্রবাবুর লেখায় অমুপ্রাণিত,
তন্মগ্ন; আমরা তাঁহার অমুরাগী ভক্ত। কিন্তু
একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, যিনি এই
প্রবন্ধ লহরী পাঠ করিবেন, তিনিই তাঁহার
ভক্ত হইবেন, তিনিই মোহিত হইবেন।

৩৫। সাহিত্য-চিন্তা।—শ্রীপূর্ণেন্দ্র
বসু প্রণীত, মূল্য ১। গুরুদাস বাবুর পুস্তকা-
লয়ে প্রাপ্তব্য। আমরা জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পুস্তক
সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি, পূর্ণবাবুর
এই পুস্তক সম্বন্ধে তাহার অনেক কথাই
থাকে। সাহিত্য-নিষ্ঠু মন্বন করিয়া (১) সাহি-
ত্যের আদর্শ, (২) সাহিত্যে খুন, (৩) সাহিত্যে
প্রেম, (৪) সাহিত্যে বীরত্ব (৫) সাহিত্যে দেবত্ব, এই
পঞ্চরত্ন পূর্ণ বাবু উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার
গভীর গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে
আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। পূর্ণবাবুর লেখা সজীব,
প্রাঞ্জল, মধুর এবং গাম্ভীর্য পূর্ণ। যিনি এই
পুস্তক পাড়িবেন, তিনিই মোহিত হইবেন।
একজন বন্ধু লিখিয়াছেন যে, পূর্ণ বাবুর জ্ঞান
কুতী লেখক একখানি চিন্তাপূর্ণ বড় পুস্তক
লিখিতে আরম্ভ করিলে ভাল হয় আমরা
বন্ধুর সহিত একবাক্যে বলি, পূর্ণবাবুর নিকট
বাক্যাদ্য ভাষা অনেক উচ্চ জিনিষ পাইতে
আশা আছে। কালে নিশ্চয় যে আশা পূর্ণ
হইবে।

কঙ্গ্রেস্, উহার শক্তি ও সাহিত্য এবং শরীর-গঠন।

(সমালোচনা)

কঙ্গ্রেস্ দ্বাদশ অতিক্রম কবিয়া ত্রয়োদশ বৎসরে পড়িয়াছে। উহার “কনিষ্টিটিউশন্” নিশ্চিত, লিখিত বা নিয়ম বদ্ধ না হইলেও, বয়সে বিকাশ লাভ কবিয়াছে। উহার শারীরিক ক্রিয়া আছে, অতএব শরীরও আছে। শক্তিও কিঞ্চিৎ জন্মিয়াছে। সর্বোপরি উহার সাহিত্য সবিশেষ পৃষ্ট হইয়াছে। কঙ্গ্রেসের বিগত দ্বাদশ অধিবেশন-উৎসব উপলক্ষে, উহার সাহিত্য, শক্তি ও শরীর গঠন এ স্থলে কিঞ্চিৎ আলোচ্য।

কঙ্গ্রেস্-জাত সাহিত্যেব কলেবর ক্রশ নয়, উহা, ক্রমে স্থূল স্থূলতব, বৃহৎ বৃহত্তব হইয়া চলিয়াছে। দ্বাদশ বৎসরের বক্তৃতা-রাশি একত্র সংযুক্ত হইলে, বোধ হয়, অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত স্থান অধিকৃত ও আবৃত করিতে পারে। তত্ত্ব, পত্র, প্রবন্ধ, অনুবন্ধ, মন্তব্য, মিনিট, বিচার-বিশ্লেষণ ও সমালোচনা প্রভৃতি, কঙ্গ্রেসের অগ্রাগ্র অবয়বে ও অঙ্গে, ঐ সাহিত্যের শরীর, দীর্ঘে প্রস্তু, এখন বড় কম প্রকাণ্ড হয় নাই। কঙ্গ্রেসেব কার্য্যক্ষেত্রের বিপুলতা ও কর্ম্মবর্গের বহুলতার জ্ঞান, উহার সাহিত্য-শরীরও যে অতি বিস্তীর্ণ হইবে, ইহা অবশ্যস্বাবী। ফলত কঙ্গ্রেস্ কল্পে, এ দেশীয়দিগের কর্তৃক যে রাজনৈতিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা কেবল সাহিত্যের হিসাবে ধরিলেও স্মৃষ্ণং বটে। তবে আক্ষেপ এই যে, কঙ্গ্রেস্ কৃত এই রাজনৈতিক সাহিত্য-সৌধের আপাদ মস্তক ইংরেজী। উহার গঠনে ভারতীয় ভাষা-নিচয়ের একটা বর্ণেরও ব্যবহার নাই;—

“ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতিব” সাহিত্য, ইংবেজী অনভিজ্ঞ ভারতীয় মহাজাতিব অবোধ্য। স্ততবাং “ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতিব” রাজনৈতিক আলোচনা আন্দোলনে ভাবী ভাবতবর্ষেব ধন ধাত্তেব ও স্বা-শাস্তির সম্প্রদায় যতই সম্ভাবনা থাকুক, ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতিব স্মৃষ্ণং সাহিত্য দ্বারা ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির কোন ভাষা পৃষ্ট, পোষিত ও উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা, আপাতত বড় দেখা যাইতেছে না।

ভারতীয় জাতীয় সমিতিব সাহিত্য ভাব-তীয় জাতিব অবোধ্য, ইহা অস্বাভাবিক বটে। একপ সমিতি এবং এবধিব সাহিত্যের কথা শুনিবা মাসই তাহাকে অসম্ভবের সাধনা—অস্বাভাবিকের উপাসনা বলিয়াই বোধ হয় বটে। কিন্তু, মানব জীবনে ও মনুষ্য জাতিব ইতিহাসে, অভিনব ও অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা কখনও যে না ঘটে, এমন নহে। “ইতিহাস অপনাকে আপনি পুনরুৎপন্ন করে” এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, ইতিহাস অপর দিকে, অভূতপূর্ব অভিনবত্বও অঙ্গীকার করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্থান-পতন ও উক্ত পুনরুৎপত্তের জ্ঞান অপূর্ব এবং অভিনবত্বও মানব-জাতিব জাতীয় ইতিহাসেব অঙ্গ ও উপাদান।

অভিনব কার্য্য-কাবণ-পবম্পরার সমবায়ে অসম্ভব হইতে সম্ভব ও অস্বাভাবিক হইতে এক প্রকৃতিব স্বাভাবিকতা উৎপন্ন হইতে পারে। আমাব বোধ হয়, এ স্থলে তাহাই হইতেছে। দৈনিক জীবনের অতি সাধারণ ঘটনা-প্রোতে অভিনব কার্য্য কারণ-পরম্পরা

এমন বীৰে ধীৰে, আশ্রিয়া সমবেত, সম্মিলিত
ও সমষ্টি-নিবন্ধন শক্তি সমন্বিত হয় যে,
লোকে তাহা সবিশেষ লক্ষ্য কবে না;
অজ্ঞাতে তাহাব মাধাকর্ষণে কেজ্জাকুঠ হয়,
কার্য্য কবে, চিন্তা কবে না, চিন্তার কারণ
উৎপন্ন করে ।

মানুষ, কলের পুতুলের মত বাজ কাব,
সম্ভবের বা অসম্ভবের বেজ্জাকুঠ হইয়া দেবে,
পূর্কপব বড় বেশী চিন্তা কবে না । ইহান
এক মাত্র ব্যাখ্যা,—‘প্রকৃতির বহুত্ব ।’ অস-
ম্ভব হইতে সম্ভব উৎপন্ন হওয়াবও এক
কথায়, ‘কৈফিয়ৎ’ তাই ।

‘জাতীয় মহা-সম্মিতব’ ভাষা, বিজাতীয়—
মহা বিজাতীয় ! সে ভাষা, নবাবিস্তৃত ভাষা
বিজ্ঞানানুসারে ‘ইণ্ডো-ইউরোপীয়’ পবিবাবস্ত
হইলেও, নিশ্চয়ই ভাবতবর্ষের কোন ভাষা
নয় । তাহা বরং ‘সেমিটিক্’ সংসারের
কোন ভাষা হইলে উদ্ধূ পাবসার পাশাপাশী
পড়িয়া ভাবতবাসী বহু সংখ্যক হিন্দু মুসল-
মানেব বোধগম্য হইতে পারিত । কিন্তু,
তাহা বাউক ।

ভাবতবাসীর ভাবতবর্ষীয় সমিতির ভাষা-
ও সাহিত্য ভাবতবর্ষীয় নয়,—ইংলণ্ডের
ইংবেজী । জাতীয় সংযোগ ও সংমিলনেব মূল
গ্রন্থিই এ স্থলে, বিজাতীয় । ইহা বিসদৃশ বটে ।
ইহা বিপর্য্যয়কবও হইতে পারে । কিন্তু,
এ স্থলে, বিসদৃশ হইতে সাদৃশ্য ও বিপর্য্যয়-
বীজের মধ্য হইতে পদ্য উৎপন্ন হইয়াছে ।
কথাটাব তাৎপর্য্য প্রহেলিকার মত অপরিষ্কার,
আশ্চ-বিরোধী ও কঠিন হইলেও, অবস্থাও
ঘটনা-পর্য্যপন্ন ক্রমে এত সর্ববাদিসম্মত
ও এত অবিসদ্বাদিত স্বীকার্য্য হইয়া দাঁড়া-
ইয়াছে যে, ব্যাখ্যা করিয়া না বলিলেও
চলে । সোজা কথা ছিড়িয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া

বুঝিতে গেলেই বরং তাহা বিলক্ষণ বাঁকা
হইয়া দাঁড়ায় ।

ইংরেজী ভাবতবর্ষের কোন পুরুষের
প্রচলিত ভাষা নয় । উহা বিদেশীয়—বিজা-
তীয় । কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, উহা হইতে—
ঐ বিদেশীয় ও বিজাতীয় হইতেই, আমাদের
এই স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় প্রজ্ঞা-হুম মহা
সমিতি । ইংবেজের ইংবেজী, ইংবেজের
ক্ষণ, ইংবেজের বেলপথ প্রভৃতিই এই ‘ইণ্ডো-
য়ান গ্রামেটোল কন্স্ট্রাক্শন্স’ আদি কারণ এবং
সর্বপ্রধান সাধাবণ সম্মিলন ও বন্ধন-গ্রন্থি ।
পবস্ত, ইংবেজের রাজনীতি-বিজ্ঞান—মিণ্টন
বেকান, মিল বেহ্মাই—কংগ্রেস কৃত প্রজ্ঞা-
নীতির উপাদান ও প্রাণ স্বরূপ । এক কথায়,
ইংলণ্ডের ইংবেজী ব্যতীত ভাবতবর্ষের এব-
দ্বিধ কন্স্ট্রাক্শন্স কখনও সম্ভবপর হইত না ।
সম্ভবপর হইত না বলিয়া যে অসাধ্যই
হইত এমন বলি না । একরূপ সহজসাধ্য
হইত না, ইহাই বলা যায় । যাহা সহজ-
সাধ্য, তাহাব শক্তিও সহজ—যাহা দুঃসাধ্য বা
বহু আয়াস সাধ্য, তাহাব শক্তি দুঃবস্ত ।
ইংবেজী-বিচ্ছিন্ন ও ইংবেজ-বিবহিত, ভাবত
বর্ষীয় বাঙলৈতিক সম্মিলন যদি বহু আয়াস
ও আয়োজনেও সাধ্য হইত, তাহা হইলে,
সে কন্স্ট্রাক্শন্স প্রকৃতি ও শক্তি অল্প প্রকারের
হইত, ইহা বলা বাহুল্য । কিন্তু, সে কথা
বলিতেছি না ।

একমাত্র ইংরেজী হইতেই এই কন্স্ট্রাক্শন্স
উদ্ভূত । ইংরেজী ইহাব শক্তি, সম্বল, যথা-
সর্বস্ব,—ইহার অবলম্বন-যষ্টি, ইহার সম্মিলন
আলোক । ইংরেজী হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন
হইতে পারে না, ইংরেজী ব্যতীত এক মুহূর্ত্ত
কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না । ইংরেজী
হইতে কন্স্ট্রাক্শন্সের সৃষ্টি, ইংরেজীতেই

অতএব ইংরেজীর বিরহে উহার বিলয়। ইণ্ডিয়ান গ্রামাণাল কঙ্গ্রেসে ইংরেজী অসিবার্থ্য।

অতএব, এস্থলে দেখিতেছি, বিজাতীয় হইতেই স্বজাতীয়তার জন্ম। বিসদৃশ হইতে সাদৃশ্যের, অসম্ভব হইতে সম্ভবের, ও অস্বাভাবিক হইতে স্বাভাবিকতার সৃষ্টি। অল্প ব্যাখ্যার অপেক্ষা না করিয়া, ইহাকে হিন্দু মান্নাবাদের “অঘটন পটিয়নী লীলা” এবং মহম্মদীয় “কিস্মতের” “ক্যাথুবি কুদ্দত” কহা যাইতে পারে।

ইংরেজ রাজার বৈচিত্র্য-বিহীন শাসন-প্রণালী, ইংরেজী শিক্ষা প্রণালী এবং তাড়িত বার্তা ও বাস্পীয়পস্থা-প্রণালী, ভারতবর্ষের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টির বিরাট সমষ্টি সঙ্কলন করিয়াছে। অতি দূরত্বকে অতি নিকটস্থ করিয়াছে; পৃথক্ পৃথক্ পরমাণু-কণা এক কেন্দ্রে আকৃষ্ট করিয়াছে;—এক কথায় আমাদের কঙ্গ্রেসটিকে খাড়া করিয়াছে; আমাদের ‘রাজনৈতিক জাতীয়তা গোড়া দিয়া জুড়িয়া দিয়াছে;—কিন্তু, জোড়া দেও-রাইবা বলি কেন? এ জাতীয়তার জন্ম, বিজাতীয় ইংরেজীতেই দিয়াছে।

বৃহৎ ব্যাপার! বিপুল বিপ্লব! কঠিন সাধনা! একটু ভুব দিয়া দেখিলে, প্রকৃতিই “অঘটন পটিয়ন্” কার্য্য,—ইহা ইংরেজের বা অদৃষ্টের! আবার, অপর দিকে, ভারতবর্ষ-বাসীর দৈনিক জীবন-স্রোতে ইহা এমন শটন শটন, অতি সাধারণ ঘটনার আয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,—এমন সহজ-সেবা শর-বৎ পানের আয়, এই অপরিমেয় পরিবর্তন প্রকৃতি হইয়াছে যে, উহার ঐকান্তিক লক্ষণসমূহ দেখে উহা আর অভিনয় নয়, উহার নিমিত্ত বিশ্বকামিতা—সংঘেও, উহা

আর বিন্দু মাত্র বিশ্বকর নয়! উহা, এখন একান্ত অভ্যস্ত, ইতরীকৃত;—নিখাস প্রখাল-প্রবাহের মত অতীব সহজ, স্বাগত, সচারা-চর সংঘটিত; অতএব শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়স্থ লোকেরই প্রায় একই রূপ অলক্ষণীয়! আসল কথা, এই যে উহার তল দেশে আর আমরা তাকাই না, তাকা-ইবার প্রয়োজনই মনে করি না। অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রায়ই আমাদের চিস্তার বিষয় হয় না। আমরা বর্তমান লইয়াই ব্যস্ত আছি। পরন্তু, উহার আরও একটা কারণ এই যে, উপরোক্ত সিদ্ধির যে কঠোর সাধনা, সে সাধনা আমাদের নয়,—সে সাধনার শক্তি আমাদের নয়, কিছুই আমাদের নয়,—সে সাধনার সংঘমও আমাদের নাই। সুতরাং স্বভাবতই আমরা সে সাধনার প্রতি তত লক্ষ করি না; তৎপ্রদত্ত সিদ্ধিকে স্বাগত ও সহজ মনে করি; আর সেই সিদ্ধির কথ-ক্ষিৎ সুবিধা উপভোগ করিয়া কক্ষিৎ লাফাই ঝাঁপাই। সাধক সে দৃশ্য দেখিয়া কি বিবেচনা করেন, বলা যায় না।

কোথায় ইংলণ্ড, ইংরেজ ও ইংরেজী ছিল? আর কোথায় ছিল ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী, পুরাতন হিন্দুজাতি ও পরবর্ত্তী মুসলমানগণ! ঘটনা-স্রোতের কি বিচিত্র, কি বিশ্বকর তরঙ্গাবাতে আজ উভয়ে এই উপশাসনং চিন্তোন্মাদক সংযোজন-সংঘর্ষ-ইতিহাস! এবং সেই ইতিহাসের এক অধ্যায়ের একটী অক্ষর আমাদের অদ্যকার এই কঙ্গ্রেসের এই দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনোৎসব। ইহা প্রধানত ইংলণ্ডের ও ইংরেজী-রই নিজের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর ইতিহাসের সহিত ইহার যে কিছু সংঘ, তাহা কঙ্গ্রেসের অভিনয়-স্থল, অতএব গোপকর।

“কঙ্গ্রেস কিছু নয়” ধারা বলেন, যদি কেহ বলেন, তাঁরা হয় আহাম্মক, নয় উন্মত্ত নয় জীর্ণপরতন্ত্র, তাঁদের সমালোচনা বা শ্লেষ উভয়ই নিরর্থক । “কঙ্গ্রেস কিছু নয়” নহে — বিলক্ষণ কিছু । কঙ্গ্রেসের কৃতিত্ব আছে । কিন্তু, সে কৃতিত্ব ইংলণ্ডের নিজের, ভাবত বর্ষের নিজের নহে ।

ভারতবর্ষীয় ভাবে কঙ্গ্রেস “জাতীয়” জিনীস নহে—হইতেই পারে না । তথাচ যদি সেই ভাবে “জাতীয় সমিতি” বলা হয়, সে কেবল জোর করিয়া বলা । কারণ, কঙ্গ্রেস যে প্রকৃতির জাতীয় সমিতি, সে প্রকাবেব প্রকাশ ও ‘পাঁচ মিশিলি’ জাতি ও জাতীয়তা হিন্দুস্থানে পূর্বে কখনও ছিল না ; হিন্দুর বেদ ও মুসলমানের কোবাণে তাহা নাই এবং বেদ ও কোবাণ উভয়েব কাহারও আদেশানুসারে এখন তাহা উৎপত্তি হইতে পারে না ; তথাচ এই কঙ্গ্রেস “জাতীয় সমিতি”ই বটে । কিন্তু সে ‘জাতি’ বা ‘জাতীয়তা’ ইংরেজের শাসন প্রণালী ও ইংরেজী ভাষা কর্তৃক সৃষ্ট অভিনব ও আধুনিক জাতি বা জাতীয়তা । তাহা, সম্যক রূপে শাসননৈতিক জাতীয়তা, আপাতত সামাজিক ও ধর্ম-নৈতিক জাতীয়তা নহে । পুনশ্চ, আপাতত উহা ইংরেজী শিক্ষিতেরই জাতীয়তা, অশিক্ষিতের জাতীয়তা নহে । কারণ অশিক্ষিত ইংরেজ শাসনাধীন হইয়াও ঐ সভার সদস্য ভাবে নাই বা অতি-অল্পই আছে ।

কিন্তু, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে (যাহাই বল) এই আপাত-শাসন-নৈতিক জাতীয়তা ও ইংরেজী শিক্ষিতের জাতীয়তা যদি অচিরে বা কালক্রমে, সামাজিক ও ধর্ম-নৈতিক জাতীয়তায় সংযুক্ত ও সম্মিলিত হয়, এবং

ইংরেজী-শিক্ষিতের এই কাল্পনিক জাতীয়তা ইংরেজী অশিক্ষিত অগণিত জন সাধারণের জাতীয়তায়ও পরিণত হয়, তাহা হইলেই, যুরোপীয় হিসাবে, ভারতবাসীর পূরাপূরী একজাতিত্ব—ঐতিহাসিক অথবা একজাতিত্ব সাব্যস্ত হইতে পারে । এবং সেই অসম্প্রদায়িক, আকাশভেদী ইংরেজী বা বাবনিক একজাতিত্বে জীবন্ত ও বলীয়ান হইয়া যদি হিন্দুস্থান এক দিন দণ্ডায়মান হইতে পারে তাহা হইলে, যে যৎসামান্য রাজনৈতিক অধিকারের জন্য কঙ্গ্রেস আজ কোলাহল ও কাঁদাকাটা করিতেছেন, তাহা পাইতে ক্ষণ মাত্র বিলম্ব ত হয়ই না, তাহা অপেক্ষা আরও অনেক উচ্চাধিকার আসিয়া আপনা হইতে উপস্থিত হইতে পারে ।

কিন্তু, সে রূপ অথবা ও পূর্ণ একজাতিত্ব অন্তত, আপাততঃ কঙ্গ্রেসের অভিপ্রেত নয় । কারণ সে অভিপ্রায় হইলে, কঙ্গ্রেস এখন, মৃত্যু কালও টিকিতে পারে না । পরন্তু, ইংরাজী শিক্ষা এখনও তাদৃশ বিস্তার ও বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে করিয়া তদ্রূপ অসাম্প্রদায়িক ও সামাজিক ব্যবধান-বিরহিত একজাতিত্ব, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংস্থাপিত হইতে পারে । ইংরাজী শিক্ষা যে পরিমাণে বিস্তৃত ও ইংরেজী শিক্ষার শক্তি যে পরিমাণে বিকশিত হইয়াছে, তাহারই ফল এই শাসননৈতিক একজাতীয়তা-মূলক এই “জাতীয় মহা সমিতি” বা কঙ্গ্রেস । অগ্রেই বলিয়াছি এ জাতীয়তা অভিনব ও ইংরেজী-মূলক । যে প্রকৃতির জাতীয়তা এদেশে কখনও প্রচলিত ছিল না, ইংরাজী শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা তাহা অন্তত, আশাদের কতক সৌক্যে দিয়াছে । একটা জাতিকে বা জাতি ভিন্ন কতকগুলি জাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন

প্রকৃতির একটা জাতিই প্রদান করা বড় সোজা কথা নয়। অতএব এস্থলে ইংরেজী-রই শক্তি শরণীয়।

কিন্তু, ইংরেজ ইতিহাস লেখক ও সংবাদ পত্র-সম্পাদক যে বলেন, হিন্দু জাতি কখন এক জাতি ছিল না; ইহাও মহা ভ্রম। হিন্দু হিন্দু-জাতিই ছিল এবং এখনও আছে এবং ধর্ম-বিপ্লবে বিপর্যস্ত ও বিজাতীয় বর্ণ সঙ্কর প্রাপ্ত না হইলে, বোধ হয়; ভবিষ্যতেও থাকিবে। তবে, হিন্দু মুসলমানে ও খ্রীষ্টা-নাদিতে মিলিয়া এক জাতি ছিল না বটে। নহিলে হিন্দু, হিন্দুই ছিল ও মুসলমান মুসল-মানই ছিল। তাহা, যুরোপীয় হিসাবে, এক-জাতিই না হইতে পারে; কিন্তু, এদেশীয় হিসাবে, এক জাতিই ভিন্ন বিজাতীয় নহে। তবে, হিন্দু জাতিব মধ্যে বহু শাখা বহু সম্প্র-দায় আছে, আচার ব্যবহাব আহাবাদি গত পার্থক্য আছে। ইহা সত্য। কিন্তু কেবল এক আহার ব্যতীত আব সকল বিষয়ে সে রূপ পার্থক্য মুসলমান ও খ্রীষ্টান জাতিব মধ্যেও বিলক্ষণ বিদ্যমান।

শিক্ষিত হিন্দুদিগের মধ্যে অল্প সং-খ্যক ও মুসলমানদিগের মধ্যে বোধ হয় তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক এমন অনেক আছেন, যাহারা বলেন “যে কঙ্গ্রেসের রাজনৈ-তিক আন্দোলন অমুঠানে এদেশীয়দের জাতি ধর্ম নষ্ট হইবে, যাহা আছে “শাসন নৈতিক জাতীয়তা, তাহা ক্রমে সামাজিক ও ধর্ম-নৈতিক এক জাতিতে মিশিয়া গিয়া সব “একাকার” হইয়া যাইবে, অতএব কঙ্গ্রেস যত শীঘ্র ক্রম প্রাপ্ত হয়, ততই এ দেশীয়দের কল্যাণ, কেহ কঙ্গ্রেসের কাছে দেখিও না, কঙ্গ্রেস জাতি খাবার কল, জাহাজ জাহাজ, কল, কল, লোকের কুহক

বই আর কিছুই নয়, ইংরেজীও জাতি মারা বিদ্যা, অতএব, ইংরেজী না পড়াই উচিত।” কঙ্গ্রেস-বিরোধী মুসলমান বলেন, ইংবেজী স্পর্শেও পাপ আছে। হিন্দু বলেন, ইংবেজীই এদেশীয়দের অবঃপাতেব কারণ। জাতি নাশ কবিয়া সব একশা করার শক্তি ইংরাজীতে অত্যন্ত অধিক পবিমাণে আছে। ইংরাজ রাজনৈতিক গোণ ও গুণ উদ্দেশ্য সব একাকার করা,—স্নেহ খ্রীষ্টান করা। কাবণ, তাহা হইলেই রাজ্য শাসনের সুবিধা হয়, ও কোনও কালে রাজ্য নাশের শঙ্কা থাকে না। সমগ্র হিন্দুস্থান, এখন স্নেহ হউক, দেখিবে, রাজনৈতিক স্বেচ্ছিকতারের কোন অভাব থাকিবে না। রাজা তখন প্রত্যয় কবিবেন, রাজ-প্রসাদ দিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। ইংরাজী ‘বিস্তারের’ ‘পলিসি’ জাতি নষ্ট কবা, কঙ্গ্রেসের পলিসিও জাতি ধর্মের বিলয় করা। অতএব সাবধান, এ উভয় হইতেই দূরে থাক। অপার্যমাণে ইংরাজী যদিও পড়, খবরদার কঙ্গ্রেসের কাছে কেহ বেঁধিও না। হিন্দুর হিন্দুত্ব ও মুসলমানের মুসলমানত্ব বজায় থাকিলে, অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে, এক দিন না এক দিন তাহাদের সময় আসিলেও আসিতে পারে, পরাধীনতার দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন হইলেও হইতে পারে, জাতি ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকিলে, তাহা হওয়াই খুব সম্ভব, তবুও যদি তাহা না হয়, তাহাতেও অনিষ্ট নাই। জাতি ধর্ম অব্যাহত থাকিলে, আপাতত ঐহিক মঙ্গল না হউক, ভবিষ্যতে পারত্রিক কল্যাণ, —আধ্যাত্মিক উন্নতি,—স্বর্গ, অপবর্গ, বৈকুণ্ঠ-বাস বা ‘তেহস্ত’ নিশ্চয়ই হইবে। অতএব, প্রলোভে পড়িয়া পতঙ্গবৎ পড়িয়া মরিও না। ঐহিক পারত্রিক উভয়ই হারাইও না। ঐহিক

উন্নতির জন্য জাতি ধর্ম নষ্ট করিলে পরকালে ন্যক পুড়িয়া মরিবে। ইংরেজীর উন্নতি-আকর্ষণ ও কঙ্গ্রেসের কুহক কুমন্ত্রনায় কেহ অনন্ত নরকের পথে উঠিও না।' ইত্যাদি।

কখন কিছু স্পষ্ট, প্রায়শঃ অস্পষ্ট স্বরে উপরি-উক্ত মর্মান্বক উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা, 'অর্থোডক্স' হিন্দু বা মুসলমানের উক্তি। হিন্দু, হিন্দুভাবে, ও মুসলমান তাঁহার নিজের মুসলমানীয়ভাবে, কঙ্গ্রেস ও ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে ঐ রূপ বলিয়া থাকেন ও ঐ প্রকারের অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন। মুসলমান অভিমতেব আর এক মাত্রা অতিশয় আছে, তাহা বাউক। কঙ্গ্রেস-ক্যাম্পে এ মত, অশিক্ষিতের অভিমত বলিয়া উক্ত। আমরাও আপাতত এ মত রীতিমত পরীক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি না। সংক্ষেপত ইহা বলিলেই এখন প্রচুর হইবে যে, উপরোক্ত অভিমত শিক্ষিতের বা অশিক্ষিতেরই হউক, 'অর্থোডক্স' বা অতিবজ্রিত হউক, ইহা এ দেশীয় অসীম রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মত এবং এক মাত্র। কূটনীতি প্রবণ ও তাহাতে সন্দেহ নাই। পরন্তু, ইহাও অহুদারতা ও উগ্র এক-দেশ দর্শিতা সম্বন্ধে ইহাতে আশ্রয়-মূলক এক মাত্রা উচ্চ "পলিটিক্সের" আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। অপিচ, এবিধ অত্যাগ্র অভিমত যতই অহুদার ও একদেশদর্শী হউক, ইহা সঞ্চালিত হইতে দেখিলে রাজ-শক্তি কিঞ্চিৎ শক্তিত হন, সুতরাং শাসন-দণ্ড সম্প্রসারণ করিয়াও ইহাকে সম্ব্রম করিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই যে, এই রূপ ঐকান্তিক আশ্র-কেদ্র-পরতন্ত্র সংঘত সংকীর্ণ নীতি হইতে সহসা সংকোচ উপস্থিতির সম্ভাবনা। সঙ্কীর্ণতাতে স্বভাবত সুভীক্ষতা

অধিক; অহুদারতার উগ্রতা উদারতার অপেক্ষা অনেক অধিক। রাজনৈতিক ইতিহাসে, ধর্মোন্মত্ততার পরাজয় ও প্রমার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রমাণিত। সুতরাং আশ্চর্য্য নহে যে, রাজ-শক্তি রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা ধর্মোন্মত্ততা ও ধর্মোন্মত্ততার প্রতি অধিকতর সতর্কতা, সম্ব্রম ও শঙ্কার সহিত লক্ষ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিশাল কঙ্গ্রেস অপেক্ষা সামান্য গোরক্ষী সভা গবর্ণমেন্টের অধিকতর মনোযোগ, সতর্কতা ও সম্ব্রম আকর্ষণ করে। ফলত রাজনীতির নিকট সর্বজন-বিদিত, সম্ভ্রান্ত ইণ্ডিয়ান্ স্যাসানান্ কঙ্গ্রেস অপেক্ষা একটা অপরিচিত নগণ্য গোরক্ষী সভার শক্তি অধিক। অতএব সর্বজ্ঞাতিব জাতীয় কঙ্গ্রেস-সভা গবর্ণমেন্টের বরং উপেক্ষণীয় হইতে পারে; কিন্তু, অজ্ঞাতনামা কোন হিন্দু গোবক্ষী সভা বা তৎসদৃশ কোন মুসলমান সমিতিতে উপেক্ষা পরিবার অবসর নাই। কঙ্গ্রেস বাহা কিছু করিয়াছেন ও করেন, তাহা সমস্তই ইংরেজীর সহায়তা দ্বারা হইয়াছে ও হয়, কিন্তু, গণিব গোবক্ষী সভাবল্য কোন সভা বাহা করিতে পারে, তাহাতে ইংরেজ ও ইংরেজীর এক বিন্দুও আবশ্যক হয় না। তাহা আপনার আভ্যন্তরীণ শক্তিতেই সমুহ শক্তিমান, স্বকাব্য-সাধনে পরকীর শক্তির উপর নির্ভর করে না। কিন্তু, কঙ্গ্রেস ভারতীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সমিতি হইয়াও, সর্বাপেক্ষে, ইংরেজের ও ইংরেজীর শক্তি সাপেক্ষ। তোমার আমায় তুচ্ছ, ইংরেজী-শিক্ষিতের উপেক্ষিত ক্ষুদ্র গোরক্ষী সভা আপনার অশিক্ষিত ও অসমাজিত শক্তি সঞ্চালনে, কুর-সময়ে ও অত্যন্ত ব্যয়ে বা বিনা ব্যয়ে সমস্ত হিন্দুধর্মের হিন্দু একত্র করিতে পারে, ইংরেজীর

রণোন্নত করিতে পাবে। কিন্তু, কঙ্গ্রেস বার বৎসর কাল বহু ব্যয় ও বহুতর বক্তৃতা করিয়াও স্বল্প সংখ্যক ইংবেজী অভিজ্ঞ লোক মাত্র এক স্থানে একত্র কবিত্তে সমর্থ হইয়াছেন। অথচ কঙ্গ্রেস কত বড় প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং গোবন্ধিনী সভা কতই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান।

অতএব রাজনৈতিক দৃষ্টিতে, ‘অর্থোডক্স’ অভিমত, আন্দোলন ও অনুষ্ঠান আদৌ উপেক্ষণীয় ও অগ্রাহ্য নয়। প্রত্যুত তাহাই অধিকতর অনুধাবন ও আলোচনার বিষয়। কারণ, তাহাব শক্তি চিরন্তন ও সনাতন সংস্কার মূলক, সুদৃঢ় স্বাভাবিক শক্তি। পক্ষান্তরে, কঙ্গ্রেসের শক্তি ইংরেজী সাহিত্য ও যুবোপীয় রাজনীতি হইতে অমুকৃত artificial বা অস্বাভাবিক পৰিমাণে কৃত্রিম শক্তি। কঙ্গ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনে গবর্ণমেন্ট অনায়াসে নিশ্চিন্ত থাকিতে পাবেন, নিশ্চিন্তই আছেন। কারণ, তাহা constitutional, বাজি বধি ও আইন কাহুনা-বস্তী, অতএব, নিব্বিয়। কঙ্গ্রেস বাহা চাহে, আপাতত যে শাসন সংস্কার ও প্রজাই সম্বাদিকার প্রার্থনা করে, তাহা এমন কিছু নৃহৎ বিষয় নয়, বাহা একেবারেই দেওয়া বাইতে না পারে, —অনুগ্রহ ও দয়া করিয়া তাহার কিছু কিছু ক্রমে ক্রমে দিলেই চলিবে। আর তাহার কিছু মাত্রও না দিলেও কোন অনিশ্চয়তা বা সাধারণ সংকোভের সম্ভাবনা নাই। ফেবল, কান্দাকাটা, constitutional agitation মজ্জ করিবে; তাহার অধিক কঙ্গ্রেসে সম্বল নাই; সমর্থ্যও হইবেনা। কঙ্গ্রেস-সমর্থন মজ্জা পাইবে; নিয়ন্ত্রণ সমগ্র জাতির নিকট থাকিবে। পরিত্রের emasculation এককণ-হইয়াই পরিণত হইবে, উপর

ইংবেজী শিক্ষা, অবাধ চিন্তা, ও যুবোপীয় আদর্শ ও অভ্যাসের প্রভাবে, স্বদেশীয় সংস্কার সম্বন্ধেও তাহাব চিন্তা মনের emasculation সংঘটিত; অতএব অত্যাগ্ন স্বার্থ-বিশ্বাস জন্মিত যে প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা, ঐকান্তিকতা-জনিত স্পষ্ট শক্তিব উত্তেজনা, তাহাবও সম্ভাবনা নাই। অশিচ, কঙ্গ্রেসের অত্যাগ্ন আকাঙ্ক্ষা, —সে রূপ-আকাঙ্ক্ষা যদি কস্মিন্ কালে কখনও আদৌ অভিব্যক্ত হয় —আর্মালিওর আকাঙ্ক্ষিত “হোম রুল” ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন-তান্ত্রবস্ত্র ভারতীয় পার্লামেন্ট, বড জোব “ইংলিস্ সিটিজেন সিপেব” অমুকূপ সম্বাদিকারের অধিক নয়। কল্পনা যত দূর যাইতে পাবে, কঙ্গ্রেসের চরম আকাঙ্ক্ষা-এই, —ইহাব বৈশি নয়। কিন্তু, এ আকাঙ্ক্ষা বিকাশ লাভ কবা বহুকালের কথা, আগামী নূতন শতাব্দী সমাপ্ত হওয়ার পবে ভিন্ন পূর্বে নহে, কঙ্গ্রেস যদি ততকাল থাকে ও আত্ম-ক্ষেত্রে তদমুকূপ উন্নতি দেখাইতে পারে, তবেই, নহিলে নহে। ফলত কঙ্গ্রেসের চরম উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা-কল্পনা করিয়া লইলেও তাহা constitutional ও ইংরেজী পন্থা পবতন্ত্র, অতএব কঙ্গ্রেস সময়ে সময়ে, ইংরেজ কর্মচাবীদিগেব বিরক্তিব কাষণ হইলেও, ইংবেজ গবর্ণমেন্টের কোন চিন্তার কারণ হইতে পাবে না। কাষণ কঙ্গ্রেস ইংরেজের স্বকীয় শক্তি হইতেই উদ্ভূত এবং সর্ব্বাংশে সেই শক্তি-সাপেক্ষ। ইংরেজী শক্তি ব্যতীত কঙ্গ্রেসের আত্ম-শক্তি অন্নই আছে, অথবা কিছুই নাই।

উপরে উল্লেখ করিয়াছি, “কঙ্গ্রেস আপাতত শাসননৈতিক জাতীয়তা-মূলক জাতীয়-মহা-সমিতি। সমগ্র বৃটিশ ইণ্ডিয়া ও তাহার অধিবাসী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী

ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়স্থ প্রজা জাতি একই রাজ-শক্তিতে, একই রূপ শাসন-প্রণালী দ্বারা শাসিত, প্রায়ই এক প্রকার বিধি ব্যবস্থায় বদ্ধ ; অতএব সমগ্র বৃটিশ ভারতের প্রজা মাত্রের সকলেরই স্বধ দুঃখ, সমান ও মোটের উপর এক, সকলেবই অভাব, আকাজক্ষা ও অভিযোগ, রাজনৈতিক হিসাবে, প্রায় একই রূপ । কাজেই সম-শাসন-সূত্রে ইহা বা সকলেই পবম্পরে সম-বেদনা যুক্ত । এখন, সম-শাসনের একতা ও তজ্জনিত সমবেদনার একতা নিবন্ধন যে জিনীস তাহাই আপাতত ইহাদের জাতি-ত্বের একতা, অর্থাৎ প্রজানৈতিক বাজনৈ-তিক বা শাসন নৈতিক জাতীয়তা,—কি না Political Nationality. এ দেশায়েবা যখন রাজ্যব জাতি নহে, এবং এখন বাজ-শক্তি-বিহীন, তখন এ জাতীয়তাকে রাজনৈ-তিক বা শাসননৈতিক জাতীয়তা না বলিয়া বরং প্রজানৈতিক জাতীয়তা বলা বোধ হয়, বরং প্রকৃত অর্থপ্রদ । যাহা ইউক্, এই জাতীয়তা-সূত্রে আমাদের এই কঙ্গ্রেস্ এবং কঙ্গ্রেসে শুভ সন্মিলন ও সৌভ্রাতালিঙ্গন । একই দায়ে ঠেকিলে, একই দণ্ডে দণ্ডিত হইলে, ও একই পাকে পড়িলে, যেমন হস্তী ও পিপীলিকা, সিংহ ও শশক, ব্যাঘ্র ও মৃগ, সর্প ও ভেক, মার্জার ও মূষিক মিলিত হইয়া এক জাতি হইতে পারে, এ স্থলে, অবশ্য ঠিক সে রূপ নয় ; তবে ইবমাত্রায় সেই রূপ বটে ; নহিলে জমিদারে রায়তে, খাদকে ও খাদ্যে, ধন-কুবেরে ও কাকালে, সম্পদে ও শ্রমে, ছজুরে ও তাঁবেদারে, গৌমায়ে ও গোলামে, ব্রাহ্মণে ও যবনে কি রূপে এক জাতির জাতীয় কঙ্গ্রেস্ হইতে পারিত ?

একদায়ে দায়গ্রস্ত হইয়াই এই জাতো-যতা । অতএব সেই দায় যতটা যায়, ততটা পর্য্যন্ত এই জাতীয়তার গীমা, তাহার অধিক নয় । এখন সেই গীমাই আমরা গ্রহণ করি ও তাহাবই অভ্যন্তরে থাকিয়া আলোচ্য বিষয়ের পরীক্ষা করি । সে গীমার বাহিবে বেশী যাইব না ; গেলে, পরম্পর-বিবোধ-স্বার্থের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া সঙ্কটাপন্ন হইতে হইবে ।

প্রজানৈতিক, অথবা অপর কথায়, বৈষ-য়িক সমবেদনা হইতে এই জাতীয়তা বা একতা উৎপন্ন হইয়াছে । সামাজিক সম-বেদনাব সহিত আপাতত ইহার সংস্রব নাই ; পূর্বে বলিয়াছি, পবে আরও কিছু বলিব । আপাতত বৈষয়িক সমবেদনাই ধরা যাউক ;—সমতা নহে, তাহা নাই ; তাহা প্রায় স্বভা-বতই অসম্ভব ।

এখন, এই বৈষয়িক স্বার্থের সমবেদনা যতটা ধবিয়া কঙ্গ্রেসেব জাতীয়তা সংস্থাপিত ও কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণীত করা হইয়াছে, তাহা, ভাবিয়া দেখিলে, অতি অল্পকালই টিকিতে পারে । জমিদারে ও রায়তে মূল-ধনে ও শ্রমে বৈষয়িক স্বার্থের সমবেদনা, কতটুকু ও কি রূপ বলুন দেখি ? দৃষ্টান্ত স্বরূপ জমিদার ও কৃষকই এ স্থলে গ্রহণ করুন । ইহাদের বৈষয়িক স্বার্থের সমবেদনা ইণ্ডিয়ান পেনাল্ কোড, অস্ত্র আইন, লব-ণাদির কর, পুলিশের অত্যাচার,—সাময়িক ব্যয়, শাসন ও বিচারের বা দেওয়ানী ও ফৌজদারির একতান্ত্রিকতা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে, অবশ্যই অল্পাধিক পরিমাণে আছে । কিন্তু, সেই স্বার্থগত সমবেদনা বেঙ্গল টেনেন্ট্স অ্যান্ড মধ্যমী স্বার্থগত বৈষম্য বিরোধের তুলনায় প্রায় কিছুই নয় । 'স্বায়ত্ত স্বাকার

উদ্দেশ্যে যখন ঐ প্রজাসভা আইনের অনুষ্ঠান হয়,—(বেলী নয় ১৩১৪ বৎসরের কথা) তখন জমিদার পক্ষ হইতে কিকপ আকাশ-পাতালভেদী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, আমাদের অনেক পাঠকেবই মনে থাকিতে পারে। রায়ত পক্ষ সমর্থনেব কেহই প্রায় ছিল না; ছিলেন কেবল গবর্ণমেন্ট। তথাচ, লর্ড রীপন, এক্সলোইণ্ডিয়ানী ইলবার্ট বিল আন্দোলনে যেকপ, জমিদারদেব কর্তৃক, বেণ্ট বিল আন্দোলনেও, সেইরূপ হাড়ে হাড়ে কাঁপিয়াছিলেন। ইলবার্ট বিলের স্থায়, বেণ্ট বিলেরও অনেক অভাবশুকীয় বাবা আন্দোলনেব বিবাট ঝটিকাষ ঝটিক বিয়-লোকে গমন কবিয়াছিল। বেণ্টবিশ, বিকলাঙ্গ হইয়া পাশ হইয়াছিল। তাববা বাঘতি-স্বহ যতটুকু রক্ষিত হইয়াছিল, সেই পাপে, লর্ড বিপন প্রস্তর-মূর্তি পাইলেন না, অথচ কত সিধু নিধু তাহা পাটরাছে। সেইপায়ে লর্ড বিপন ভূস্বামী ধনকুবেরদেব নিকট হইতে এক বিন্দু বিদায়-অভিনন্দন পান নাই, বিষাক্ত নিন্দাব বিদায়-নৈবিদ্য পাইয়াছিলেন। রিপন ভক্ত ও বিপন-কলেজ-কর্ত্তা সুব্রহ্ম নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গের “প্রিমিয়ার জমিদার” প্রিন্স, দাবভাজার মহাবাজা ত এখন কোলাকুলি কবিয়া কঙ্গ্রেসেব প্রজা-নৈতিক বৈষয়িক একজাতীয়তা সংস্থাপন করিতেছেন,—(অতি সুন্দর পেট্রিয়ারটিক দৃশ্য লক্ষ্য নাই) কিন্তু উপরোক্ত কথা কি এখন তাঁদের কিছু কিছু মনে পড়ে? অবশ্য পূর্বে ও বিগত বৈষম্য-বিবোধে বিস্তৃত হওয়াই মহদেবের স্বকণ্য। কিন্তু, এখনি যদি বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট কর্তৃক রায়তের রক্তি পরিসিত উৎকর্ষিত পক্ষ-বেঙ্গল টেনার্সী-আর্জেন্টের এক সিধু পরিবর্তন করিতে উদ্যত হন, তাহা

হইলে অবস্থাটী কি কপ দাঁড়ায়, কঙ্গ্রেস কোন্ পক্ষ অবলম্বন করেন? অগংথা দুর্বল ও নিরস্ত্র কৃষক বায়তেব পক্ষ কঙ্গ্রেস অবলম্বন কবিলে, কঙ্গ্রেসেব কোটি বন্ধ ও স্বন্ধ স্তম্ভ বাবা। মহাবাজাদি ভূমি কুবের—কঙ্গ্রেসের ক্যাস বয়া শুলি কোণাষ থাকেন? কঙ্গ্রেসেব “কম্বকাণ্ডেব” বিবাট বায় কিকপে নির্বাহিত হয়? “জ্ঞান :কাণ্ড” প্রকৃত ও পবমার্থ-প্রদ পদার্থ হইলেও, কঙ্গ্রেস-ক্ষেত্রেও ত কম্ব কাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ডেব উচ্ছে এবং অগে। অতএব অবস্থা যেকপ দাঁড়ায় বেশ জানা যাউতেছে, সে দিন গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বিহাণ কেডাধাল সার্ভেব প্রবর্তনেব সময়ে বিলক্ষণই জানা গিয়াছিল। কঙ্গ্রেসেব প্রথব ঔজ্জ্বল্যনৈতিকগণ প্রজা-মেধ-যজ্ঞে জমিদাবেব যজমানত্ব গ্রহণ করিয়া স্বহিকেব আসন গ্রহণ কবিয়াছিলেন। পবিত্র ঔজ্জ্বল্য-সত্তেব নামে, প্রজাব শোণি-তাক্ত স্বার্থ জমিদার যজ্ঞেব জলিত হোমানলে আত্মিত অতি হইতেছিল। সে হোমেব প্রবান হোতা যিনি হইয়াছিলেন এবং সেই কৃষক মেব যজ্ঞেব সর্ব প্রধান যজমান যিনি ছিলেন, কে না জানে? কে না জানে, সে মহাযজ্ঞে, বঙ্গ ও বিলাতে কত অব্যাপক বিদায় হইয়াছিল এবং পদ-বিদলিত বিহাবী কৃষকেব দাস বৃত্তি বন্ধমূল বাখিবাব জন্ত, বেণ্টবিল আন্দোলনের স্থায়, সেদিনকার সার্ভে সেটেলমেন্ট-আন্দোলনেও কৃষাণ শোণিত-শোষিত কি বিপুল অর্থ রাশি বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল।

স্বার্থ-বৈষম্যের ও স্বার্থ বিরোধের ইহা যদৃচ্ছা গৃহীত একটা দুর্ভাগ্য মাত্র। এমন অনেক আছে। এখন উল্লেখের আবশ্যক নাই। এই যে স্বার্থের কথা বলা হইল, সে

স্বার্থ কৃষক রাষ্ট্রত সমাজের প্রাণের স্বার্থ—
জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধীয় স্বার্থ, মনুষ্যত্ব ও
পশুত্ব সম্বন্ধীয় স্বার্থ, স্বাধীনতা ও দাসত্ব সম-
্বন্ধীয় স্বার্থ, স্থিতিক ও দ্রুতিক সম্বন্ধীয় স্বার্থ ;
কোনও সখের স্বার্থ নহে, নাম মাত্র রাজ-
নৈতিক অধিকার-সূচক স্বত্বও নহে । বরং
সামাজিক বৈষম্য সম্বন্ধেও, যবনে, ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে
ও চূড়ামণি মহাশয়ে এক জাতিত্ব সম্ভবে,
(বিষয় ব্যাপাবে সম্যক সম্ভাব ও স্বার্থ-সমতা)
জনিত তাহা বিস্তৃত আছেও) কিন্তু, এবম্বিধ
বৈষম্যিক স্বার্থ-বৈষম্য বিরোধে ও খাদ্য খাদক
সম্বন্ধে জাতিত্বের একতা কদাচিৎ সম্ভবপব ।
তথাচ, যে সকল স্থলে, এবম্বিধ বিরোধী
সম্প্রদায়ে স্বার্থের সাধারণত্ব, সমতা বা একতা
থাকে, সে সকল স্থলে, কঙ্গ্রেসক জাতীয়তা
স্বাধীনতা ও সংস্থাপিত হইতে পাবে, হউক,
উত্তম । কিন্তু, অতঃপর কঙ্গ্রেস হইতে,
কৃষক রাষ্ট্রত সমাজের কৃষি স্বার্থের কথা,
একেবারেই ছাটিয়া ফেলা শ্রেয় । গত দুই
বৎসরের বাৎসরিক অধিবেশনে, এ সম্বন্ধে
কঙ্গ্রেস, কিয়ৎপরিমাণে, আত্ম সীমা নির্ণয়
করিয়া বড় ভাল কবিয়াছেন । উহা অধিকতর
স্পষ্ট ও পবিত্র ভাবে কবিলে আরও ভাল
হইবে ; তাহা হইলে আর কাহারও কোন
কথা থাকিবে না । “কঙ্গ্রেস শিক্ষিত ভাবত-
বাসীর জাতীয় সমিতি” কঙ্গ্রেস এত দূর
এখন স্বীকার কবিয়াছেন । অতঃপর, আর
কুটী দুই কথা স্পষ্ট স্বরে ব্যক্ত করিলেই
যেমন এক দিকে বিষয়টী বিশদ হয়, অপর
দিকে তেমনি কঙ্গ্রেস কর্তৃক কখনও কঙ্গ্রেস-
বহির্ভূত কোনও সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত
লাগিলে, কেহ কলঙ্ক আরোপ করিতে
পারিবে না ; অপিচ, আঘাত-প্রাপ্ত সম্প্র-
দায়েরও তাদৃশ অনিষ্টাশঙ্কা থাকিবে না ।

নহিলে, অপ্রকৃত প্রতিনিধিত্বে, পদে পদে,
লোকের বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে ।
কঙ্গ্রেসের বিধিবদ্ধ “কনস্টিটিউশন” নির্ধারিত
না হওয়াতে, সময়ে সময়ে, বাহিরের লোকে-
বও নেতাও গোল বাঁধিতেছে । কঙ্গ্রেসের
একাদশ অধিবেশনে উহা হয় নাই ;
দ্বাদশ অধিবেশনেও হইল না । যাহা হউক,
কোন কোন প্রেসিডেন্টের মুখে ব্যক্ত হই-
য়াছে “কঙ্গ্রেস ইংরাজী শিক্ষিতের সভা ।”
ইহা সত্য এবং প্রকৃত । অতঃপর যে সত্য
ও প্রকৃত কথা বাক্যে (কার্যে হইয়াছে ও
হইতেছে) ব্যক্ত ও ঘোষিত হওয়া উচিত,
তাহা এই—“কঙ্গ্রেস শিক্ষিত ও ধনীদিগের
বৈষম্যিক স্বার্থের প্রতিনিধি ।” “কঙ্গ্রেস কৃষি-
ভীষী বায়তেব জমি জমা সম্বন্ধীয় স্বার্থের প্রতিনি-
ধি নহে ।” এই একটা মাত্র কথা কঙ্গ্রেস
কর্তৃক স্বীকৃত এবং প্রকাশ্য ও বিস্তৃত ভাবে
ব্যক্ত হইলে, অনেক গোল মিটিয়া যায় ।

দেশের উপস্থিত অবস্থায় ও কঙ্গ্রেসের
নিজেব বর্তমান গঠনে কঙ্গ্রেস যেমন হিন্দু
বা মুসলমান সমাজের সামাজিক প্রতিনি-
ধিত্ব কবিতো অসমর্থ, তেমনি অসীম কৃষক
সম্প্রদায়েব জমি জমা সংক্রান্ত স্বার্থের প্রতিনি-
ধিত্ব হইতে অপারক । পরন্তু, উপস্থিত
ক্ষেত্রে কঙ্গ্রেস বরং Capital বা মূল ধনের
প্রতিনিধি-হইতে পারেন, কিন্তু, কার্য্য পক্ষে
Labor বা শ্রম ও নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবী
সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব হইতে পারেন
না । এ কথাও স্পষ্ট করিয়া বলা কঙ্গ্রেসের
কর্তব্য । তবে, এদেশে, এখনও যুরোপীয়
শ্রম ও যুরোপীয় স্বার্থে capital এর ও
Labor এর তাদৃশ বিস্তার এবং (নীল)
চাক্ষুঃের অভ্যাজিত ও কুলী-চালানী ইন্দু-
চিক ব্যভিচার ব্যাপ্ত হওয়াতে, কঙ্গ্রেসের

হয় নাই। কঙ্গ্রেসে কৃষ্টিমাল সম্প্রদায় যোগদান না করা পর্যন্ত (বোধ হয় করিবে না) কঙ্গ্রেস জুলী স্বার্থ সমর্থনে সমর্থ হইবেন। কিন্তু কৃষক-স্বার্থ, বিশেষতঃ চিবস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল নিচয়ের কৃষক স্বার্থ (যাহা এদেশে Labor এর অপার নাম) সমর্থন ও সংরক্ষণে কঙ্গ্রেস কখনও অন্ততঃ আপাততঃ সামর্থ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। অতএব সে কথা স্পষ্ট স্বীকার ও প্রচাৰ করা একান্ত উচিত। নহিলে সেই নিরন্ন, নির্দীক ও আজীবন অন্ন কষ্ট-পীড়িত অসংখ্য প্রাণীব মহা অনিষ্ট ঘটবে এবং কঙ্গ্রেসের নিজেবও ছরণনয় কলঙ্ক বটিবে। নির্দীকের নিজের কথা যাহা নহে, তাহা যদি তুমি তাহাবই নিজের প্রাণের কথা বলিয়া প্রতিপন্ন ও প্রচার কর, তাহা হইলে সে তাহাব প্রতিবাদ করিতে পারক হইবে না, কেহই তাহাব প্রতিবাদ করিবে না, কৃষকের কে আছে? তোমার প্রমাদপূর্ণ প্রতিনিধিত্বে তাহার সর্বনাশ ও তোমার কলঙ্ক হইবে। উপকাৰ তোমার ও তাহাব, কাহারই হইবে না। ছুঃখীর ছুঃখ ভার, দেশের দাবিদ্র্য-ভার অধিক বদ্ধিত হইয়া কেবল বিলাসীর বিলাস-স্রোত আয়ও বেগে বহিবে।

পক্ষান্তরে, তুমি স্পষ্টাক্ষেপে তোমার প্রতিনিধিত্বের প্রভাৱণা পরিচয় করিলে তোমার নিন্দা হইবে না; প্রত্যুত প্রশংসাই হইবে। এবং সেক্ষণ স্থলে, কঙ্গ্রেস যে স্বদেশীয় কৃষি-বলের একেবারেই কোন উপকার করিবেন না বা করিতে পারিবেন না, তাহাও নহে। সাধারণ কল্পে, পৃথক পথে, কঙ্গ্রেস কৃষিকার প্রভূত উপকার করিতে পারিবে। যে সকল স্থলে, কৃষক রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য, রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট বা

সমান, সে সকল স্থলে, সাধারণ কল্যাণের সহিত কৃষক শ্রেণীরও কল্যাণ হইবে। কেবল যে সকল স্থলে, জমিদারী স্বার্থের সহিত কৃষকের জমী জমা সংক্রান্ত স্বার্থের জীবন মরণ বৈষম্য ও বিশেষ বিরোধ, সেই সকল স্থলে কঙ্গ্রেস জমিদার শ্রেণীর প্রকৃত প্রতিনিধি হওয়াতে ও কৃষক সম্প্রদায়ের অপ্রকৃত ও অভিজ্ঞ প্রতিনিধি না হওয়াতে, কঙ্গ্রেসের কথায় শেষোক্তেব তত অল্পবিধা হইবে না এবং তাহাদের কথাকিৎ স্বার্থোন্নতি পথে বাধা পাইয়া গবর্ণমেন্ট ও তত গোলে পড়িবেন না।

“বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন” প্রাক্তন জমিদার-স্বার্থ সংরক্ষণী সভা হইয়াও কি কখনও রাষ্ট্র শ্রেণীব কোন উপকার করেন নাই? কেন করিবেন না? জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে অনেক উপকাৰ কবিয়াছেন। কেবল যে সকল স্থলে জমিদারী স্বার্থের সহিত রাষ্ট্র স্বার্থের সংঘর্ষণ উপস্থিত হয় ও হইয়াছে, সেই সকল স্থলেই, স্বীয় স্বভাব ও অঙ্গীকাৰানুসারে প্রথমোক্তের ইষ্ট ও শেষোক্তের অনিষ্ট চেষ্টা কবিয়াছেন ও কবিয়া থাকেন। ইহাতে উক্ত অ্যাসোসিয়েশন তত অপরাধী হইতে পারে না, কারণ জমিদারী স্বার্থ রক্ষাই তাহার অঙ্গীকৃত সংকল্প ও অস্তিত্বের কাৰণ। কিন্তু পক্ষান্তরে “ইণ্ডিয়ান-অ্যাসোসিয়েশন” প্রজা-স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিজ্ঞা কবিয়াও; ক্রমে ক্রমে এখন প্রায় দ্বিতীয় “বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান” বা বিহার-ল্যাণ্ড-হোল্ডারস-অ্যাসোসিয়েশনে পরিণত হইতেছে।

অতএব, বোধহয়, যুরোপের জ্ঞান, এদেশে, অদ্যাবধি আসল “ডেমোক্রেটিক অ্যাসেমব্লী” সংগঠিত হওয়ার সময় উপস্থিত হয়

নাই। “সামাজিক সাম্য” যেমন এদেশে আদৌ অসম্ভব (এবং সম্ভবতঃ অশুভকর) তেমনি বৈষয়িক ‘ডেমোক্রেসী’ শুভকরী হইলেও, হয় ত এখনও অসম্ভব। কঙ্গ্রেস নিজ যে গণনা গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুসারেই, অল্পদেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা শত কবা ৮০ জন। অতএব এই কৃষিবল লইয়া প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ এবং এই ক্লাষবলই ভাবতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গল। কিন্তু, ভারতের এই ভগ্নাবশিষ্ট শক্তি যেকোন সামাজিক শোচনীয় অবস্থা তাহার সবিস্তার বৃত্তান্ত বঙ্গ্রেস বিলক্ষণই জানেন। পবন্ত, তাহার পোতাক্ষ প্রজ্ঞাও, দ্রুত দেনীয়ায়মান প্রমাণ, —এই করালমুষ্টি বর্তমান—বর্তমানের বহিঃ এবং বিব—১৩০৩ সালের, সন্ধ্যা ৩০ রূপী মহা মনস্তর।

ভাবতবর্ষের কৃষিবল বৎসরের প্রায় বাব মাসই হ্রিষ্ক পাড়িত, অতৃক্ত, অশক্ত, পরন্ত, এ বৎসবেব সমগ্র ভাবত-ব্যাপী বিপুল হ্রিষ্ক বহিতে তাহা, কৃষাণ কৃষাণী, কদাল-সার মানুষ মানুষী, এমোংগর শস্ত্র মাত্র উপজীব্য অসংখ্য প্রাণী ক্রুরে পতঙ্গবৎ পুড়িতেছে, তাহার হৃদয়-বিদারক চিত্র আমি এস্থলে অঙ্কিত করিতে বসিব না। সহৃদয় পাঠক প্রতিদিনই তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া মর্মান্বিত হইতেছেন, হয় ত হাতের অন্নগ্রাস নিজের মুখে না দিয়া, অশ্রু-সিক্ত করিয়া, তাহা বহুদিন অভুক্ত ক্ষুধাতুরের মুখে তুলিয়া দিতেছেন। হয় ত অভাগা, সাগ্রহে প্রদত্ত আপনার অন্নগ্রাস গ্রহণ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে পাবিল না; কোটরস্থ নয়ন বহুদিনের পর অন্ন দেখিয়া উৎফুল্ল হইল, অভাগার আত্মা নিঃশেষে আপনাকে আশীর্বাদ করিল, কিন্তু, হায়!

শুষ্ক কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে, শীর্ণদেহ অবশ হইয়াছে; প্রাণ বায়ুর অন্নাবশিষ্ট নিশ্বাসটুকু তখনি নিবিয়া গেল! আপনি, হয়ত, পুনঃ অন্ন লইয়া অল্প এক অভাগার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। হ্রিষ্ক নিদারুণ দৃশ্য দৃশ্যদিকে আজ কাল দৃষ্ট, তাহার আলেখ্য উঠাইয়া দেখাইতে চাই না।

পবন্ত, কঙ্গ্রেস এই উপস্থিত বিপদে যে ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করিব না। লজ্জার কথা, হৃদয়হীন-তান কথা উল্লেখের অবোধ্য।

বঙ্গ্রেস কষক সমাজের চিবস্থায়ী অন্ন প্রশ্ন নিবারণ কল্পে যে কয়েকটি বাঁধা প্রস্তাব উক্ত ও পুনরুক্ত করেন, এবং এ বৎসর সে সম্বন্ধে যাহা কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রচুর নহে। কেবল, সাময়িক ব্যয় কমিলে, বা হোম চার্জ না থাকিলে, বা বাটা বৃত্তি না দিলে বা ধনী বধনের টেক্স কমিলে বা ঐ প্রকৃতির অন্যান্য “ইকনমিক” প্রশ্ন উত্থিত বা মীমাংসিত হইয়া অসম্ভব সম্ভব হইলে, আমাদের আর যতই উন্নতি হউক, গাফাং সম্বন্ধে, কষক শ্রেণীর ক্রেশ ও দেশের সংকামক হ্রিষ্ক প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পরন্ত, গবর্ণমেণ্টের খাসমহল ও অস্থায়ী বন্দোবস্ত মহলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া, জমিদার ও জমিদারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেও (যাহার জন্য কঙ্গ্রেস অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বাব বার রেজলিউশন পাস করিতেছেন) কষককুলের চাপ ঘটিবে না, শুদ্ধায় সে দ্রব্যটা বরং আরও অধিক ক্ষীণ হইয়া দাড়াইবে। অবস্থান্তর ব্যক্তি মাঝেই হইয়া জানেন। ইহার প্রমাণও প্রকৃত আদে। অতএব কষক-শ্রেণীর অর্থাৎ দেশের আরও তের আনা বক্রম, অথবা তাহার অধিক

সংখ্যাক লোকের সংক্রামক অন্ন কষ্ট নিবারণ বা প্রশমন করিতে হইলে প্রথমতঃ যে যে দিকে ব্যবস্থা করিতে হয়, কঙ্গ্রেস সে দিক স্পর্শ করিতেই সাহসী হইবে না। পক্ষান্তরে, অজগব গবর্ণমেন্ট, পুনর্বার সিপাই মিউটিনী মত, অথবা তাহার অপেক্ষা বহু বিস্তৃত সমগ্র দেশময় আর একটা মিউটিনীর মুখ না দেখা পর্য্যন্ত, বোধ হয়, সে দিকে তাকাইবেন না। অতএব সে কথা এখন উপব-পড়া হইয়া, উত্থাপন করা, অবগ্য মধ্যে রাখা বোদন করা মাত্র। অতএব সে কথা বাউক।

যে দেশে কৃষিজীবী লোকেব সংখ্যা শত করা ৮০ জন, সে দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে কাহা দের ? হায় ! যাহাদেব দেশ, যাহাদেব নিঃশেক নিরলস অবিশ্রান্ত স্বপ্নে দেশ বক্ষা হইতেছে, দেশের দশদিকে বিলাস-স্রোত বেগে বহিতেছে, তাহাবাই কেবল, তাহাবাই অহবহ অন্ন-কষ্টে কাতব, তাহাদেব আপ-নাব নিজেব বলিতে কিছুই নাই ! নিজের শ্রম-লব্ধ অন্নগুলিব অগ্রভাগ, অধিক ভাগ, অপরের মুখে তুলিয়া দিয়া, আপনাবা অর্দ্ধা-শনে অনশনে কাটাইতেছে ! অতীত, বিস্মৃত মুসলমান আমল হইতে, উপস্থিত বর্তমান ইংরেজের আমল পর্য্যন্ত, দেশের বিপুল কৃষিবল দেশের সর্বপ্রধান শক্তি পদদলিত, লুপ্তিত, প্রভাবিত হইয়া আসিতেছে ! যাহাদেব দেশ, যাহাদিগকে লইয়া দেশ, তাহাদেরই দশা সর্বাংগে শোচনীয়, তাহারাই সম্বল-হীন, সম্মানহীন। কঙ্গ্রেসের পেট্রিট বাবুও কৃষককে বলেন operative ! কৃষক, কুলী, কলের চাকর, হালের গরু, গোলাঘের গরু, তাহারাই গর্দভবৎ ব্যরহৃত, অপ-মানিত, নিঃশক্তি। কিন্তু, দেখুন ! বস্তু কানাই হউক, প্রকৃতির প্রতিশোধ আছেই।

বহু শতাব্দের সুপ্ত শক্তি এক সময়ে না এক সময়ে জাগিবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ কবিবেন না। নিদ্রিত ও নির্জীব যে দিন জাগিবে, সে দিন যে দ্রুত আগুন জলিবে, তাহা সহজে নির্দোষ হইবে না। তদ্বারা, হয়, কৃষি শক্তিব স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার সং-গঠিত ও সংস্থাপিত হইবে, নতুবা সমগ্র দেশ ভগ্নসং হওয়াব পব পুনঃ নূতন রাজ্যের পত্তন হইবে। সে দিনেব বড় বেশী বিলম্ব আছে, তাহাও মনে করা যায় না। ভাবত-বর্ষেব বিপুল কৃষি-বল যদি একান্তই আশ্রয় শক্তিতেও সচেতন না হয়, যুবোপীয় উদার “ডেমোক্রেনা” তাহাকে উত্তিত করিবে। ইহা নিশ্চয়।

ইংবেজ শাসন ও ইংবেজী শিক্ষাব বিস্তাবে অস্বদেশে যুবোপীয় ধবণে নতুনা বিষয়ক স্বত্ব ও স্বার্থেব সভা সমিতি উত্তিত হইলেও এবং সর্বোপবি, রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রজানৈতিক স্বার্থের মহা কেন্দ্র কঙ্গ্রেস সভা আজ দ্বাদশ বৎসব কাল সংস্থাপিত হইলেও, অদ্যাবধি কৃষি-স্বার্থের ও কৃষক স্বত্বের কোন সভা সমিতি দেখা যাইতেছে না ; অথচ দেশীয় লোকের শত-করা ৮০ জন কৃষক। ইহার কারণ, কৃষক যুবোপীয় রাজনীতি আজও চিনিতে পারে নাই। হিন্দু ও মুসলমান কৃষক তাহা^{পর} ধর্ম কর্ম চিনে ; কিন্তু, রাজনীতি চিনে না ; তাহাব কোন সংবাদ রাখে না। যাহা তাহারা চিনে, তাহার জন্য প্রাণ লইয়া হাজির হয়। এই কারণেই হিন্দুর গোরক্ষণী সভার এত জোর, মুসলমানের মহরমে মসজিদে এত মায়া, যে তজ্জন্ত তাহারা মৃত্যুকে অতি তুচ্ছ মনে করে। তাহাদের মুখের আর পরে কাড়িয়া ধার, ইহা যে তাহারা খুব

পছন্দ করে, তাহাও নয়; মুখের অঙ্গে যদি কাহারও মমতা থাকে, দরিদ্র কৃষকের তাহা বিলক্ষণই আছে; কারণ তাহাব প্রত্যেক শস্য কণা কৃষকেব স্বৈদ ও শোণিত হইতে উৎপন্ন। কিন্তু, অদৃষ্ট ও অদৃষ্টবৎ অপরিজ্ঞাত রাজনীতির ও ছরস্ত দেশাচারের কি রূপ বৈষম্যে, কোন বিভ্রাটে যে তাহাদের অনন্ত হুঃখ তাহা তাহাবা জানে না। আপন আপন ছন্দশাকে প্রারঞ্জে ও কিস-মতের কোড়ে শোয়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। বাজবিধি, শাসন নীতি ও বিসদৃশ বৈষয়িক লোক-ব্যবহারাদিকে তাহাবা অদৃষ্ট বলিয়াই বুঝে, তাহাদের প্রতাবক ও প্রপীড়ক-গণ, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াও দেয় তাই, আবহমান কাল হইয়া আসিতেছে তাই। কাজেই তাহাবা অলড়, অচল। কিন্তু, রাজনীতি অন্ততঃ ইংরেজ রাজনীতি যে একেবারে প্রারক্ষণ্য অপরিবর্তনীয় নহে, শাসন নীতি যে ন্যায় ও প্রজ্ঞা সাধারণের অভিমত মানিয়া চলে, বিসদৃশ ব্যবহার, ভূমির স্বত্বাধিকার ও তন্ত্রিবন্ধন অত্যাচার যে ভগবানের নিয়ম নহে, মহুষ্য-কৃত কৌশল, অতএব একান্ত অখণ্ডনীয় নয়; পরন্তু, রাজদ্বারে যে সমষ্টি ভাবে কৃষক কুলী-রও-মুদ্রম আছে, গুরত্ব আছে, সুবিচার প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, তাহা তাহারা জানে না; এক কথায় রাজনীতি তাহারা চিনে না। কাজেই স্রোতের শৈবালবৎ ভাসিয়া বেড়ায়। ছায়পরি রাজশক্তি, আইনের সহায়তা নিকটস্থ করিয়া দিয়াছেন, বিচার গৃহের দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু, হায়! কত সময়ে আইন নিজেই ভ্রান্ত, পদে পদে বিভ্রাট-ময়! বিচারালয় চাতুরীর বায়দারী গৃহ। উকিল ঠকান, মোক্তার ঠকান, আদালত

ঠকান, পিরাদা ঠকান, বর্ন্যাদিকরণ প্রভার-ণার পক্ষতীর্থ! তথায় সবল মিথ্যার জয়, দুর্বল সত্যের পরাজয়। তথায় উৎকোচ ও শঠতা ও কৌশল জাল দিনকে রাত্রি, রাত্রিকে দিন করে। শস্ত-ক্ষেত্রের সরল শ্রমজীবী তাহা একবার দেখিয়াই আজীবন অতর্ক শিহরে; মনে করে, উহাও তাহার কিসমত। শত অত্যাচার, পীড়ন, প্রবঞ্চনা নীরবে সহ করে, প্রতিকার প্রত্যাশায় পার্থামানে আইনের পানে তাকায় না। আইন, তাহার নিকট, অত্যাচারের অন্ততম বস্ত্র, অত্যাচারীই তাহাকে আইনেও আচ্ছন্ন করিয়া নিষ্পেষণ কবে।

ইহা বাজবিধির ব্যভিচার, বিচার গৃহের অবৈধ বিড়ম্বনা,—রাজশক্তির উদ্দেশ্য নহে, রাজনীতি আবও উচ্চে, তাহার নিকট এ ব্যভিচার বিড়ম্বনারও প্রতিকার আছে, শাসন সম্বন্ধ একেবারেই অচিকিৎস্য ব্যাধি নহে, অত্যাচার, অনাচার, অবৈধ অস্ত্রায় ও অস্বাভাবিক ব্যবহার মাত্রই প্রজাপুঞ্জের সমষ্টিত শক্তি দ্বারা প্রতিকার-সাধ্য; রাজশক্তি সমষ্টিত প্রজা-শক্তি উপেক্ষা ও অব-হেলা করেন না এবং কৃষি-বলই এদেশের সর্ব প্রধান প্রজা শক্তি, কৃষক সমাজ ইহা জানে না; তাহারা নিজের অপরিমিত শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, প্রজা-শক্তি বুঝে না, রাজনীতি চিনে না! কঙ্গ্রেসের উচিত ছিল চিনাইয়া দেওয়া, বুঝাইয়া দেওয়া। কিন্তু, কঙ্গ্রেস তাহা দেন নাই, দিতে পারেন না, দিতে সাহসী নন। দিতে হইলে, কঙ্গ্রেসের কতকগুলি বন্ধ-বন্ধ ধরিয়া পড়ে ক্যালকাত্ত বাহির হইয়া যার। পরন্তু, প্রত্যক্ষ ও সম্পদ-আকাক্ষী শক্তিরে, স্বাভাবিক আধার ব্যর্থ। স্বতরাং তাহা

সুতরাং কঙ্গ্রেসের সহিত সুরাহা ক্রমক সমাজের ষাট-স্বার্থের সংশ্রব ও সম্বন্ধ নাই। তাহা থাকিলে এই দ্বাদশ বৎসরের কঙ্গ্রেসের শক্তি ধেরূপ দাঁড়াইত, তাহা কেবল অনুমেয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৃষি-বল অর্থাৎ দেশের সর্ব প্রধান শক্তি কঙ্গ্রেসের সংশ্লিষ্ট নহে। অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট নহে। তবে কর্ত্তা করিয়া, জোর করিয়া যদি সে শক্তি সংশ্লিষ্ট আছে, বলা হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। শক্তি শক্তির পরিচায়ক, বাক্য বী কর্ত্তা নহে।

কঙ্গ্রেস হইতে কৃষিবল বাদ দিলে, দেশের লোকের শত করাঃ ৮০ জন লোক বাদ পড়ে। অবশিষ্ট থাকে ২০ জন। এই ২০ জনের মধ্যে যদি পাঁচ জনকে শিক্ষিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও বোধ হয় বিস্তর। এখন ইংরেজী শিক্ষিত মাত্রই যে কঙ্গ্রেসে যোগ দিয়াছেন বা উহার সহিত সমবেদনা যুক্ত, নানা কারণে এমন, বোধ হয়, বলা যায় না। ঐ পাঁচ জনের মধ্যে যদি এক জনকেও “কঙ্গ্রেস ম্যান” বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত সংখ্যা অপেক্ষা বোধ হয় কম হইবে না, কিছু বেশীই হইবে। অতএব কেবল সংখ্যার হিসাবে ধরিলে কঙ্গ্রেসের শক্তি এই। দেশের লোক-সাগরের অনুপাত ধরিলে, এ সংখ্যা খুবই কম, নেহাতই micro-minority, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি এই পিত করায় স্বল্প সংখ্যকেরও সমষ্টি করিলে সঙ্কলন-কলটা বড়কম দাঁড়ায় না। তাহার উপর যখন দেখা যায় যে, সেই সমষ্টি, ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের কীর এবং সর কার, শিক্ষিতের মধ্যেও অধিকতর শিক্ষিত ব্যক্তি বাহ্য দিবার লোক, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য

লোক, এবং ধনবান লোক, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, পবম শক্তিও স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, কঙ্গ্রেস শক্তিহীন সামগ্রী নহে। শক্তি যতই অল্প হউক, যতই ক্ষীণ হউক, যতই অস্পষ্ট ও অপ্রাপ্ত বিকাশ হউক, শক্তি অবশ্যই উহাতে কিছু আছে। রাজ শক্তির সাগবেব সমীপে উহা গোপন্দ-বৎ, সলিল বৃদ্ধ দবৎ বটে, তথাচ সলিল-বৃদ্ধ সলিল, হইতেই উদ্ভূত, গোপন্দস্থ বারি বারি-বই ক্ষুদ্রাযতন। অপিচ, বিশূল বারিষি ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দুবই সমষ্টি, শিশির বিন্দু সন্নিপাতে বহু শস্ত বর্দ্ধিত হয়। কঙ্গ্রেসের কিঞ্চিৎ শক্তি সর্বথা স্বীকার্য। তবে, সে শক্তি, কঙ্গ্রেসেব সাহিত্যেব স্থায় সম্পূর্ণ রূপে ইংরেজী। কঙ্গ্রেসেব প্রবর্ত্তক, পরিচালক, প্রতিনিধি কঙ্গ্রেসী মাত্রই ইংরেজী-উৎপন্ন জীব। Representative men এই আখ্যা যদি ইংরেজী শিক্ষাব ও শিক্ষিতের প্রতিনিধি অর্থে ইহাদেব প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে, তাহা কতকাংশে প্রকৃত বটে। কিন্তু, যে অর্থে দেশীয় দলপতি, সমাজপতি, পঞ্চায়ৎ চালক, বা প্রধান প্রভৃতি এ দেশে ব্যবহৃত হয়, অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ব্যবস্থাদাতা প্রভৃতি অধিনায়ক বাচক বাক্য স্ব স্ব জন-সাধারণ-মাগ্ন শক্তি সহ দেশের বাদ^১ সামাজিক বা শাস্ত্রীয় বা বৈবয়িক^২ স্বাধীন পরিচালক ও প্রভু ধারণ বা বহন করে, সে অর্থে ইহাদের অবিকাংশই Representative men নহেন। এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, এক জন অশিক্ষিত ইতর শ্রেণীব লোক পল্লীবাসী কাজী, হল চালক কৃষাণ ও হয় ত সে অর্থে সাধারণ মতের ও মন্ত্রণার Representative man হইতে পারেন; কিন্তু আবার এক জন অতি

সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, ধনী বা পদস্থ ব্যক্তি তাহা হইতে পাবেন না, ইহা বলা বাহুল্য। পবস্থ, ইংবেজী শিক্ষিত, অত্যাচ্ছ পদস্থ, ধনী, উকিল, বারিষ্টার, জমিদার, জজ, প্রভৃতি বড় লোকেরা ধনে মানে বিদ্যায় যথেষ্ট সম্ভ্রম আকর্ষণ করিলেও তাঁহারা অশিক্ষিত ইতব সাধারণের সহিত অতি অল্পই (in touch) সংস্পৃষ্ট; ইহাও উহার আব এক কারণ। এদেশীয় অশিক্ষিত ও ইতব সাধারণের আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রাণের বশুতা আকর্ষণ কবা অতীব কঠিন। বরং যিনি যত বেশী বিদ্বান, ধনী ও বড় লোক, তিনি তাহা হইতে তত অধিক দূরে। ফলতঃ আর কাল Representative man, Lord and man, Natural leader পদ্ধতি প্রতিনিধি ও পরিচালক বাচ্য ইংবেজী শব্দ এদেশীয় ও যুরোপীয় লেখকদিগের কর্তৃক প্রায়ই বড় অসংযত ও অর্থ শূন্য অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, তাহাতে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অনিষ্টও ঘটে।

কিন্তু, অভিনব ও যুরোপীয় অর্থে, কংগ্রেসীদিগকে অন্ততঃ উহা ব উচ্চতর স্তরের লোকদিগকে কুলীন বলিয়া অবশ্যই স্বীকার ও সমুচিত সম্মান কবিত্তে হয়। বল্লালী কুলীন, প্রায় অধঃপাতে গিয়াছেন। কিন্তু এই সময়ে, তাঁহা বাও শুধে কুলীন ছিলেন এবং গৌরবে কোলীনা পাইয়াছিলেন। কংগ্রেসীগণও শুধের কুলীন, তবে, তাহা ব সহিত ধনে ব কোলীজ ও মিশিরাছে। ফলতঃ কংগ্রেস কুলীন সভা বটে। বিদ্যা বুদ্ধি ব কোলীজ, বাকশক্তি ব কোলীজ, নিপি-কুশলতার কোলীজ, সম্ভ্রম-সম্পদ ও পদে ব কোলীজ, একত্রে কংগ্রেস-ক্রেত্রে মিলিত। অতএব ইংবেজী কথায় বলিলে, ইহাকে

অবশ্যই Aristocratic সমিতি বলা যাইতে পারে। উহা আমাদের প্রজানৈতিক পার্লামেন্টে House of Lords বা তদনুরূপ। House of Commons আজ ও জন্মে নাই। যদি কখনও এ দেশে শ্রম-স্বত্বাধিকার ও কৃষক স্বার্থের কংগ্রেস হয়, তাহাই হইবে “হাউস অব কমন্স” বা কোটি কোটি লোকে ব অকুলীন সভা। কিন্তু, এখনও তাহা কিছু বিলম্ব আছে। যদি যুরোপীয় শক্তিব সর্বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করিয়া ও তদ্বাচা সঞ্চালিত, সতেজ ও স্ফূর্ত হইয়া তাহা সংগঠিত হব, তাহা হইলে তাহা আংশিক ঘন্থুরিত হইত এখনও অন্ততঃ আবও অর্দ্ধ শতাব্দীকাল লাগিবে। এ দেশায় ইতব সাধারণের উদ্ধাব সাধন-করে, ইংবেজ শাসন ও যুরোপীয় “ডেমোক্রেসী” অবিকতব কায্যব বী ও ফলোপদায়ক হইবে ইহা বলা বাহুল্য। অতএব এ সম্বন্ধে তাঁহাদে ব উপব নির্ভর কবা নির্বিঘ্ন, এবং তাঁহাদে ব প্রদত্ত পথ ও সুবিধা সর্বতোভাবে অনুসরণ কবা কর্তব্য। দেশীয় অ্যারিসটোক্রেসী দ্বাচা ইতব সাধারণের ও কৃষি স্বার্থের অনেক উপকার হইতে পারে, এবং হই-বাছে, কিন্তু, তদ্বাচা তাহাদের চিরানুকাল বিমোচন ও দাসত্ব-গ্রহি ছেদন হইবে না। তাহা, যত দিনেই হউক, ইংবেজ শাসন ও ইংবেজ প্রবর্তিত শিক্ষা দ্বাচাই হওয়া সম্ভব। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে—অপার কৃষক সমাজ-সাধারণে সমধিক পরিমাণে শিক্ষা-বিস্তারের জন্ত গবর্ণমেন্ট (তাহার শত ক্রটি ও অসাধাধানতা সত্ত্বেও) যেরূপ সত্ব ও সতর্ক সচেতিত, এমন ত আব কেহই নছে—এমন ত ভাষা কথিত প্রজা-বক্ষণ নহেন! কংগ্রেসী এই দায় বহন হইয়াছেন; কেহ নহে

কয়টা কথা কহিয়াছেন ? কতটুকু যত্ন করিয়াছেন ? কয়টা রেজলিউশন পাস কবিয়াছেন ? একথা কি রাজনৈতিক কথার অন্তর্গত নহে ? ইহার সহিত সংক্রামক ছুভিক্ষের ও সর্বজন-বাহিনীর সুভিক্ষের কি কোন সম্বন্ধ নাই ? দেশের কয়টা সভা সমিতি, কয়খানি সংবাদ পত্র, নিম্ন শিক্ষা-বিস্তারের পোষকতা কবিয়া থাকেন ? সুলভ মূল্যের সংবাদ পত্র, বাঁহাদেব সাফাং সম্বন্ধে ইহাতে সবিশেষ স্বার্থ আছে, ভুলিয়াও কি ইহার উন্নতি করে কখনও একটা কথা লিখিয়া থাকেন ? শিক্ষিত কুলীন সম্প্রদায় উচ্চ শিক্ষার জন্তই তাহা কিছ্ বাস্তব, নিম্নতর শ্রেণীর সুলভ শিক্ষার জন্ত প্রাবই তা কখনও একটা বাক্যব্যয়ও করেন না। গবর্ণমেন্টের অভিযোগানুসারে (যদিও সে অভিযোগ গবর্ণমেন্টের পক্ষে শোভনীয় নয়) উচ্চ শিক্ষার অত্যধিক ব্যয়ই বৎ নিম্ন শিক্ষার অন্তরায় স্বরূপ। উচ্চ শিক্ষা সর্বথা অতীব প্রার্থনীয় ; কিন্তু, নিম্নশিক্ষা বা নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা ঠিক সেইরূপ অথবা উপস্থিত অবস্থায় ততোধিক বাঞ্ছনীয়। নয় কি ? বাল্যকালে গুণিতাম, উচ্চ শিক্ষা নিম্ন শিক্ষার ফিল্টার স্বরূপ কার্য্য করিবে। কিন্তু, কই এত কালে তা সে সাধের ফিল্টার হইতে নিম্নদিকে বড় বেশী কিছু চৌয়াইতে দেখা গেল না ! বিন্দু-পাতও, হায়, হইয়াছে কি ? অথবা কেবল গর্জন, বর্ষণ নাই।

কেশব বাবুর সমুদ্র সময়ে ইতর শ্রেণীর প্রাথমিক সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রশ্ন শিক্ষিত মনে, বিশেষ একটু প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাথমিক এই বিষয়ে বঙ্গপত্রিকার হইয়াছিল। এই শিক্ষার দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার উচ্চ মর্য্যাদার সুবিধে মনোযোগের

বিষয় হইয়াছিল। পূর্ণ বয়স্ক কৃষক, কারিকর, মুটে মজুর প্রভৃতির জন্ত এই সহরের ও, বোধ হয়, মফঃস্বলের স্থানে স্থানে রাজনী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল এবং সর্বোপরি, এ বিষয়ে আন্তরিক আন্দোলন ও উদ্যোগ আয়োজন চলিয়াছিল। বঙ্গের সর্ব প্রথম সুলভ সংবাদ পত্র, “সুলভ সমাচার” এই উপলক্ষেই, বোধ হয়, প্রবর্তিত হইয়া, সুলভ পত্রের পথ দেখাইয়া দেয়। “সুলভ সমাচার” স্মরণ ও পবিত্র পন্থার কার্য্য কবিয়া, অতি অল্প দিনে, জ্ঞানান্ধ গরিব লোকে যে উপকাব কবিয়াছিল, সে পন্থার ও সে মহত্বের সহিত, একাল পর্য্যন্ত কিছু কায্য হইলেও নিম্নশিক্ষা অনেক উচ্চ হইত, শ্রমজীবীদের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইত বলিয়া বোধ হয়। কেশবচন্দ্রের “ইণ্ডিয়ান বিফরম অ্যানোসিয়েসন” হইতেই, মনে হইতেছে, এই সব সদনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাহার পূর্ব, শিক্ষিতদের মধ্যে, সংস্কারক সম্প্রদায়ে, ব্রাহ্মসমাজে, সর্বত্রই যেন এ প্রশ্ন নিবিয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে কেবল গবর্ণমেন্ট, ও স্থানে স্থানে খ্রীষ্টীয় মিশনারী ব্যতীত আর কোথায়ও কেহ আছেন বলিয়া জানি না।

পুনশ্চ, বঙ্গ ও বিহারের লক্ষ লক্ষ রায়তের বাঁহারা অধীশ্বর, সেই রাজা, মহারাজা, ছজুর জমিদার মহাশয়েরা, তাঁদের নিরক্ষর রায়তের শিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ মনোযোগী ? অবশ্য ইহাদেব কেহ কেহ হয় তা স্বগ্রামে বা এলাকা মধ্যে এক আধটা “এডেড্ স্কুল থলিয়া নাম কিনিয়া থাকিবেন ; কিন্তু, তাহাই কি প্রচুর ? তাহাই কি প্রকৃত কর্তব্য পালন ? তাহার পর আমাদের ভূমায়ী মহোদয়গণ মোটের উপর নিম্ন শিক্ষার সপক্ষ,—না বিবম বিপক্ষ ? আমরা কোনও

মহাবাজা বাহাদুরের বিধৃত রাজ্যে এ বিষ-
য়ের যেক্ষণ ব্যবস্থা, কিঞ্চিৎ অবগত আছি ।
উক্ত রাজ্যে যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডের শাস-
নাধীনে ছিল, তখন এষ্টেটের কোন কোন
স্থানে স্কুল ও পাঠশালা স্থাপিত হইয়া কতক
কতক রায়ত বালকের কথঞ্চিৎ শিক্ষার
ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । কোর্ট
অব ওয়ার্ড, এষ্টেটের বাসে, ভরৈনক ডেপুটি
ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিয়া স্কুল পাঠশালা
গুলি পরিদর্শনের ও পরিচালনের বন্দোবস্ত
করিয়া দিয়াছিলেন । কিন্তু, রাজ্যের মালিক
মহাবাজাব বয়সাপ্তি ও রাজ্যে পাশ্চিমা কিছু
কাল পবেই, একে একে স্কুল পাঠশালা বন্ধ-
করা প্রায় সবই শাফ করিয়া দেওয়া হই-
য়াছে ॥ স্কেন ? বেন তাহা আবার ডিক্রাসা
করিতেছেন ? রাজ্যের ব্যয়ে রাজ্য মধ্যে
শিক্ষা-শালা রূপ সাম্প্রতিক অল্প- অল্প
অহিতকর আবর্তনা কি বাধিতে আছে ।
বাঘের চক্ষু ফুটিলে, বাঘত ভালোক
দেখিলে যে, রাজ্যের অকলাপ । অন্ধকার ।
অন্ধকার ! এস অন্ধকার, থাক অন্ধকার—
আমার প্রিয় পদার্থ ! আমার ঐশ্বর্য্য, আমার
আমার একাধিপত্য, আমার অত্যাচারের
অনন্ত সঙ্গী ।

মহাশয় । মার্জ্জনা করিবেন । নিজের
দেশ, নিজের দেশীয় প্রভু—নিজের গৃহের
পানে বারেক চাহিয়া গবর্ণমেন্টের উপর গালি
পাড়িলে ভাল হয় ।

নিম্ন—নিম্নতর স্তরে শিক্ষালোক প্রবিষ্ট
হইয়া কথঞ্চিৎ কার্য্য করিতে এখনও সময়
লাগিবে, ৫০—৬০—৭০ বৎসর ; প্রায় শতাব্দী
কাল । এ কংগ্রেস যদি ততকাল জীবিত
থাকার পথ, ক্রমোন্নতির দ্বারা, পরিষ্কার
করিয়া লইতে পারেন, তখন উহাতে

প্রকৃত প্রজা শক্তি পূর্ণতার দিকে অগ্রসর
হইবে । তখন আমাদের “হোস অব-
কমন্স” সৃষ্টি হইবে । কংগ্রেস এখন কুলীন-
সভা । প্রথমত উহাতে “কমন্স-সভা” হইবার
উপক্রম হইতেছিল । কিন্তু, তাহা নানা কার-
ণেই হইতে পারে নাই । অনিবার্য্য নিয়তি
বশে, উহা অভিনব তত্ত্বের কুলীন সমিতিতে
পরিণত হইয়াছে ।

অগ্রেই একাধিক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি,
কংগ্রেস, শাসন এতদর, জাতীয়তা-মূলক
জাতীয় সমিতি । সামাজিক জাতীয়তা, অজা-
তীয়তার সহিত এ পর্য্যন্ত উহার সংশ্লিষ্ট নাই ।
“সোশ্যাল কনফারেন্স” বা সামাজিক মঞ্জলিস,
উহা হইতে আপাততঃ একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া
গিয়াছে । তবে উহার পশ্চাতে আছে বটে ।
তা, থাকিলেও উহার সহিত একত্র হইতে;
অঙ্গে অঙ্গ মিলাইতে পারিতেছে না । গত
বৎসর পুনায় উহা কংগ্রেসের পাণ্ডাল
পর্গান্ত স্পর্শ করিতে পারেন নাই । মারহাট্টী
বাক্য-সম্প্রদায় সজোবে লাঠি ধরিয়াছিলেন ।
বলিকাতায় এবাব “কনফারেন্স” গুলি, আমায়
পাণ্ডালে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু কংগ্রেসী
চিন্দুপদিকাদিতে তাহাব নাম গন্ধও প্রকা-
শিত হয় নাই ।

যে কারণে কংগ্রেস সমাজ সম্পর্কীয় প্রস্নে,
সামাজিক সমস্যায়, সামাজিক একজাতীয়তা
অগ্রসবে সংলিপ্ত হইতে পারেন না ; কত-
কটা তদ্রূপ কারণেই প্রকৃত কৃষি-স্বাধীনতা
সহিত উহা আপনার একত্র স্থাপনে অপারক ।
কিন্তু প্রথমোক্ত কারণ দ্বিতীয় অপেক্ষায়
অনেক প্রবল ও প্রচণ্ড । একত্র সামাজিকতা
হইতে একরূপ সম্পূর্ণরূপে ও প্রকৃতরূপে
বিস্তৃত থাকিতে ও স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে
বাধ্য হইয়াছেন । এবং দ্বিতীয় কারণ

সহিত কার্য্যান্তঃ পৃথক থাকিয়া, কার্য্যাতঃ কৃষি-
স্বার্থে ও কৃষক-সঙ্ঘের বিপক্ষে থাকিয়া ও
বিক্রমচারণ করিয়া, বাক্যাতঃ তাহার সপক্ষতা
ও তাহার সহিত একত্ব দেখাইতেছেন, নহিলে
বড় বিসদৃশ দেখাইবে, বোধ হয়, এই কাব
ণেই ঐ সপক্ষতা। অগ্রেই বলিয়াছি, এই
আবৃত্ত আচরণে উক্ত স্বার্থে ও সম্বন্ধিকা-
বের অনিষ্ট ঘটিতেছে।

কিন্তু উপবোক্ত দুই বিষয়ে সমাজ ও
ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধে কঙ্গ্রেস্ এখন যে স্থান গ্রহণ
ও যেরূপ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট নীতি সংগঠন কবি
য়াছেন বা কবিতো বাধ্য হইয়াছেন, তাহা
বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না। সে স্থান ও
সে নীতি হইতে কঙ্গ্রেস্ এক অগ্রসর বা পশ্চাৎ
পদ বোধ হয় হইতেই হইবে। অমন মদট
স্থানে বহুদিন টিকিয়া থাকা সম্ভব নহে।
পরন্তু, সাধারণ রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থা
সম্বন্ধে কঙ্গ্রেস্ এখন যে নীতিচক্র পবিক্রমণ
করিতেছেন এবং যে প্রকৃতির নম্র ও কহু
ক্লিমহু প্রলিঙ্গ প্রচাৰ কবিয়া রাজদ্বাৰে আয়-
পবিচয় দিতেছেন, কেবল তাহাই উপজীব্য
করিয়া বহুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন
না। এখনকার নির্দিষ্ট নৈতিক কেন্দ্র হইতে
ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে, কার্য্যের ও পলি
সির প্রসার বৃদ্ধি ও প্রকৃতি পবিবর্তন ও
শক্তিবহ ও শক্তিপ্রদ করিতে হইবে, নতুবা
ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক পক্ষ অবশ্যভাবী।
ইহা স্মরণ রাখি বা না রাখি, ইংরেজ রাজ
শক্তি বিশেষকণ ন্যূন। কথা হইতে পারে
কি, কঙ্গ্রেস্ ইংরেজ রাজনীতির ও শাসন
ব্যবস্থার পক্ষ, পক্ষাভাবী এবং উহা
কে অগ্রসর করিয়া আবার ধারণ করে বা
নিরাসন করে, তাহার বিচার, বিশ্লেষণ,
কিঞ্চিৎ বা সমালোচনা করিতে হবে। কিন্তু,

এই কার্য্য—কেবল এই কার্য্য কঙ্গ্রেসের
মত সমিতির অস্তিত্ব বহন পক্ষে প্রচুর নহে।
এইরূপ কার্য্যেব জল্প স্থানীয় সভা সমিতি
ও সংবাদ পত্রই প্রচুর। কঙ্গ্রেস্ ঐরূপ কার্য্য
উপজীব্য কবিয়া কেবল সমালোচক স্বরূপ
জীবিত থাকিতে পারে না। এজাশক্তি
সংগঠন, সম্বলন ও সৃজন করা, তাহা নৈতিক
পবিস্থিতির ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে সম্বলিত ও সংস্থ-
পিত করা উহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য ও
উহাব অস্তিত্বের মৌলিক আবশ্যকতা।
রাজশক্তি সম্বৃত্ত প্রজাশক্তি পবিস্থাপিত ও
নিয়মিত করা যেমন উচ্চ এক কার্য্য,
তেমনি প্রজাব আয়ত্ত ও অদাগত শক্তি ও
বিস্থাপিত ও জীবিত কবিয়া, প্রয়োজন মত
প্রস্তুত কবিয়া রাজশক্তির সাহচর্য্যে, সহায়তার
ও সংস্বে পেদণ করা আবশ্যক—কেবল
আবশ্যক নহে, উহাব অস্তিত্ব বাবণের মূল
কাবণ।

কংগ্রেসের সামাজিক নিরপেক্ষতা, অস্তিত্ব
আপাততঃ অনিবাৰ্য্য স্বরূপ এবং উহাব অত্যা-
কৃষ্ট নীতি। এ নীতি যত সূদৃঢ় ও অটল
থাকে ও হয়, ততই উহার মঙ্গল। কিন্তু,
এ নীতি ধবিয়া, উহা থাকিতে পারিবে কি,
এবং পাবিলেও দম্যককণে উহার স্বকার্য্য
উদ্ধার সম্ভব হইবে কি? ইহা এক সমস্তা।
এ সমস্তা পূরণ করিতে বসে এখন বুণা।
অবস্থায়, কালে ও তহুপযোগী কর্তব্যে
উহাকে যে দিকে লইয়া যাইবে, সেই দিকেই
উহাকে যাইতে হইবে। সে বিষয়ের কোন
শুভ বা অশুভ কল্পনা আনয়ন করাতে ফল
নাই। তাহা তোমার আমার ইচ্ছা ও অভি-
প্রায়ের উপর নির্ভর করে না। তাহার গতি
সে নিজেই স্থির করিবে। হইতে পারে, সে
গতি ও তাহার পরিধায় শুভ বা অশুভ।

কিন্তু, সে শুভাশুভ কাহারও হস্তায়ত্ত্ব নহে । তাহা, কাল-শ্রোতে কার্য্য-কারণ পরস্পরার ফল । প্রকৃতির সে শ্রোত বোধ করা মানুষ-যের অসাধ্য ; বিশেষতঃ উপস্থিত অবস্থাপন্ন হিন্দুস্থানেব একান্ত অসাধ্য । অনিবার্য্য যুরোপীয় প্রভাবে যদি এমনি ঘটে যে, সমগ্র হিন্দুস্থান কালক্রমে একই জাতি, একই ধর্ম্ম ও বর্ণে পবিত্র হইয়া সমস্ত “একাকার” হইয়া যায়, হিন্দু মুসলমানাদির চিহ্ন মাত্র না থাকিয়া, তাহাব নাম মাত্র কেবল পুণ্যবৃত্তেব বিষয় হয় এবং সেই একীকৃত সংমিশ্রিত জাতি যুরোপীয় শক্তিতে সতেজ হইয়া ইংল-এবর অজ্ঞাতম “কলোনি” স্বাধীন অথবা ইংলও হইতে স্বতন্ত্র বাজ্ঞনৈতিক শক্তিতে পবিত্র হয়,—তাহা সে সুদূর পবিষাম, তোমাব আমার ইচ্ছাধীন নহে ; তোমার আমাব ক্ষুদ্র প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধকে বহিত হইবে না । অতএব যদি অদৃষ্টবাদী হিন্দু হও বা কিসমৎবাদী মুসলমান হও, সে পবিত্র-তিকে “নিয়তি কেন বাধাতে” বলিয়া কাজেই স্বীকার করিতে হইবে । সুতরাং এখন কংগ্রেসেব সমাজ-নিবপেক্ষতা বা তাহার সংস্কার-সপক্ষতার আসক্তি চিন্তা-পোষণী বিষয় হইলেও practical politics এর বিচার্য্য হয় না । কংগ্রেস্ এখন কার্য্যত, বাক্যত ও দৃশ্যত সমাজ ও ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ ; ইহাই যথেষ্ট । তবে তাহার পার্শ্বেও পশ্চাতে এমন সকল শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, যাহা ঐ দুই পুৰাতন পদার্থেব সংস্কার-প্রার্থী ও নূতন সংগঠন-প্রবণ, ইহাও প্রত্যক্ষ । যেমন গবর্ণমেণ্ট জাতি ও ধর্ম্ম নিরপেক্ষ হইলেও তাহার পার্শ্বে, পশ্চাতে, চতুর্দিকে, এমন সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে, যাহা লোকের জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে পুরা-

তনের পরিবর্তে নূতন সংগঠন করিতে সচে-
ষ্টিত । ফলতঃ গবর্ণমেণ্টের রাজশক্তি ও
কংগ্রেসের প্রজাশক্তির সহগামী যে ঐ সকল
অবাস্তব শক্তি ও তাহাদের কার্য্য,—উহা
অনিবার্য্য । পক্ষান্তরে, উহাদিগকে পরাভূত,
প্রশমিত ও খর্ব্বীকৃত করিবার জন্ত যে সকল
সংরক্ষণশীল শক্তি ও তাহাদের প্রতিবাদ,
তাহাও সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর,
তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই । প্রকৃত
উন্নতি ও তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য পূর্ন
সংরক্ষণ ব্যতীত কখনও সম্ভবে না । এখন-
কার উন্নত জাতির অতীত ইতিহাস ও
বর্তমান অবস্থাও ইহার সাক্ষী । ইংলও ত
অত্যন্ত ও প্র-ম শ্রেণীর শক্তি, কিন্তু,
সামাজিক রক্ষণশীলতায় এমনি সূদৃঢ় যে,
হিন্দু ও তাহাব নিকট হাব মানেন । রক্ষণ শীল-
তার প্রতি সংকীর্ণতাপবাদ দেওয়া তাদৃশ
উদারতাব পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না ।

স্বয়ং উন্নতিও এক পদ অধিক অগ্রসর
হইলে উচ্ছ্রাণত । বাজ্ঞনৈতিক উন্নতির
যে প্রকাব পবিত্রতার, মূর্ত্তি উপরে কল্পনা
করা হইয়াছে—তাহা হিন্দু দৃষ্টিতে ঐ স্বরূপ-
সমপ্ত । উহা সম্ভব । পক্ষান্তরে ইহাও
অসম্ভব না হইতে পারে যে, হিন্দুস্থানের
জাতি নিচয়, বিশেষতঃ হিন্দু জাতি যদি
হিন্দুত্বের আভ্যন্তরিক আত্ম-সংরক্ষণ শক্তি
দ্বারা, পূর্ব্ববৎ দৃঢ় থাকিয়া বহিঃবিপ্লবে
বিচলিত না হইয়া, আপনাব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম
অবাহ্যত রাখিতে পারে, তাহা হইলে ইহার
অসম্ভব নহে যে, হিন্দু হিন্দু থাকিয়া বিভিন্ন
জাতি ও বর্ণ সঙ্করাদিতে বিলুপ্ত বা বিকৃত
না হইয়া, বর্তমান শাসন শক্তির দ্বারা, ভবি-
ষ্যতে ব্রিটিশ রাজ-নীতির সঙ্কোচে অথবা
প্রজানৈতিক প্রবর্ত্তন দ্বারা পুনঃপুনঃ

প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহা অপেক্ষা আরও উচ্চতর উন্নতিও লাভ করিতে পারে। যাহা হউক, বিদেশীয় ও বিজাতীয় শাসনের যদি একরূপ পরিণাম কোনও কালে—দূর ভবিষ্যতে, এদেশে সম্ভব হয়, তাহা হইলে, পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অগুরু ও সম্পূর্ণ অভিনব অধ্যায়ের আবির্ভাব হইবে।

কংগ্রেসের সমাজ-সংস্কার-নিরপেক্ষতা-নীতি সমীচীন। সমাজ নীতির এখানে, কংগ্রেস, কত দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেন, দুব ভবিষ্য কাল তাহার মীমাংসা করিবে। কিন্তু, কংগ্রেসের কৃষি-স্বার্থ সম্বন্ধীয় নীতিকে অতিরিক্ত-কাল মধ্যেই, হয় পশ্চাতাকুঞ্জন, নয় অগ্র-প্রসারণ করিয়া অসম্মিষ্ট ও অন্ধকাবহীন পরিষ্কার স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। ‘উভয় সঙ্কট’ মধ্য স্থলে দাঁড়াইয়া, কার্য্যত সমর্থন ও বাক্যত দুর্ব্বলের রক্ষণাভিনয় কবিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে হয়, অকপটে কুবক পক্ষে, নয় কুলাচাৰ্য্যবৎ কুলীন পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। কোনও না কোনও দিন রাজনীতি নিজেই তাহা করাইবে। ইংরেজ রাজনীতির যে স্তায়পরতা ও নিয়ন্ত্রলন-কারিণী শক্তি প্রভাবে আজ এই কংগ্রেস ও কংগ্রেসে, মধ্যবিন্ত ও বৃত্তিহীন ভদ্র সন্তান-দিগের সহিত অস্থায়ীশাস্তা, অগাধ সম্মা-হক্কর উচ্চত, অভিমান-ক্ষীত রাজা মহা-রাজ, স্বেচ্ছাব ভূমিদার মহাশয়দের মিলন, হজ্জ কাম্পন, মিষ্টহাসি—মিশামিশি; পরন্তু রাজনীতির যে শক্তি প্রভাবে কংগ্রেস আজ সামান্য অক্ষিমত্তের মুখপাত্র লাক্ষিয়া চক্র-স্থিত দেশীয় দুর্ব্বল দেশীয় দিকপালদিগের সহকারিতা “রেজিউলন” প্রচার করিতে পারেন, তাহা একজালিক শক্তিই ক্রমে কংগ্রেসের শিরশ্চিহ্ন সিঁদে, কিলে কি ক

আমরা অনবধানে অন্ধ, তাই সে শক্তির প্রচ্ছন্ন প্রক্রিয়া দেখিয়াও দেখি না। আশ্চর্য্য বিশ্বতির মনুজে আপনাদিগকে “মন্ত” মনে করি। তা, তত বেশী বিলম্বও করিতে হইবে না; ভূস্বামী ও রায়তের সম্বন্ধ নিয়ামক এক বিন্দু উদার ব্যবস্থার একটা বিল কখনও ব্যবস্থাপক বৈঠকে উত্থিলেই বুঝা যাইবে, কংগ্রেস কেমন গরিব কৃষকের বন্ধু এবং তখন কি করেন।

ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের আবিষ্কর্তা—আদি জ্যোতক ও ঘটক মিষ্টার হিউম—ইংরেজ হিউম—ডেমোক্রেটিক হিউম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-সমর্থন-নীতি ও দেশীয় রাজগণ সম্বন্ধীয় নীতি কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে দেন নাই। বোধ হয়, তাঁহা শঙ্কা ছিল যে, উহার দ্বারা কংগ্রেস পাছে কোলীনা সভায় পরিণত হয়। উপস্থিত প্রকৃতির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনিবার্য্য অনিষ্টের মূল বলিয়া হিউমের ধারণা ছিল। কিন্তু, হিউমের অমুপস্থিতিতে ঐ উভয় নীতিই কংগ্রেসের অঙ্গালিঙ্গন করিয়াছে। গত কয়েক বৎসর হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুকীৰ্ত্তি কীৰ্ত্তন ও বিস্তারাক্ষণ চলিয়া আসিতেছে, এবং বৎসর দেশীয় রাজস্ববর্গও, আমাদের অহুগ্রহ ও পেটুনেজ প্রাপ্ত হইয়া কংগ্রেস রেজলিউশনের বিষয়ীভূত হইয়াছেন !!

দেশীয় রাজা ও রাজ্য, হায় ! আমাদের অতীত, বিন্দুত জাতীয় জীবনের ভগ্নাবশিষ্ট উপলব্ধি ! নব্য হিন্দুস্থানের পুরাতন স্বপ্নের শেষ স্মৃতি ! অতএব তাহার শত অশাসন, অশান্তি ও পূৰ্ব্বদম্বলন সত্ত্বেও হিন্দু (এবং মুসলমানেরও বটে) মাজেরই উপাত্ত সামগ্রী, বড় আদরের ও এখনও একটু অহুকারের বস্তু। তা, তাঁদের প্রতি কংগ্রেসের মন্ত

প্রজা সভার এই স্পন্দিত পেটুনেজটুকু—
এই অবাচিত অমুগ্ধ টুকু কি কিছু স্থান,
কাল পাত্রাঙ্গুপযোগী, অতএব বিলক্ষণ কি
নিদ্রাপকব ও সম্ভবতঃ অনিষ্টকর নহে? ইহাতে
দেশীয় রাজাদের ইষ্টাপেক্ষা অধিক অনিষ্টেব
সম্ভাবনা নাই কি? ইহাতে কংগ্রেসেবও
নিজের কোন আশঙ্কা নাই কি? বৃটিশ
রাজনীতিব অপব একটী অঙ্গ আছে, যাহা
বাজশক্তিব আদিম ও অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ,—
কঙ্গ্রেস কি তাহাও ইদানীং বিস্মৃত? হইতে
পাবে, স্বদেশীয় রাজণ্য বল কঙ্গ্রেসে মিলিত
হইলে, কঙ্গ্রেস বিপুল বলশালী হইতে পাবে।
কিঙ্ক, তাহা কি সম্ভব? সম্ভব হইলে দেশীয়
রাজণ্যবগ আপনাবাট কি আপনাদেব একটী
কঙ্গ্রেসও কবিত্তে পারিতেন না? পাটনা
ও ঝালওয়াডেব সম্মেলন কি সিদ্ধিলা, হল-
কব, তরঙ্গবাদ, ববদা, বিবাক্লেব বা আপ
বেহ বা সকলে মিলিয়া কবিত্তে পারিতেন
না? বডই বঠিন কথা। বাজনীতি এংলে
সাহিত্য লীলা নহে। কঙ্গ্রেস আমাদেব
নমস্যা; কিন্তু, রাজনীতিও ক্রাউনক নহে।
অতএব এ কথা ঘাউক

ফলতঃ কঙ্গ্রেস কার্যগতিকে, ক্রমে
প্রায় কোলোনিয়বই প্রতিনিধি হইয়া দাঁড়াই
তেছেন। এদেশীয় গবর্ণমেণ্ট “ববোক্রেনী”
বলিয়া উক্ত। কঙ্গ্রেসকে, “অ্যারিষ্টক্রেনী,”
যদি এক মাত্রা অভ্যুজ হয়, বরং বাবু-ক্রেনী
বলা যাইতে পাবে। ববোক্রেনীতে বতটা
“ডেমোক্রেনী” আছে, বাবু-ক্রেনীতে তাহা-
রও কম। কিন্তু, অকৃত্রিম ও আসল ডেমো-
ক্রেনীর উত্থান ব্যতীত শাসন সংস্কারও রাজ-
নৈতিক সবিশেষ কোনও সম্বাদিকার উদ্দেশে
সাধনা-সিদ্ধ হইবে না।

কঙ্গ্রেসের সাহিত্য-স্পর্শ মাত্র করিয়া

উহার কথা উঠান গিয়াছিল, এখন সেই
সাহিত্যেই কথা শেষ হউক। দেখা গিয়াছে,
কঙ্গ্রেসের বিপুল সাহিত্য ও বিন্দুমাত্র শক্তি,
উভয়ই ইংরেজী। মানা কারণে ইংবেজী,
তাহা অনিবার্য, আবশ্যকীয়। অতএব
আপত্তি ববা অত্যাধ। সংস্কৃতে বা অল্প
কোনও স্বতন্ত্র প্রদেশীয় ভাষার কঙ্গ্রেসের
মধ্য কেন্দ্রেব কাব্য নির্বাহ হইতে পাবে না।
ইংরেজী ব্যতীত এতদধিক কঙ্গ্রেস সম্ভবই
হইত না, তাহা সকলেই জানে। তবে, যে
সকল স্থানে নহিলেও চেনে, ও ইংরেজীরই
অধিকতর উপযোগীতা ও ইষ্টকারিতা, সে
সকল স্থলেও যে ইংবেজী উপদ্রব, ইহাই
আক্ষেপ। আক্ষেপ, কেবল দেশীয় ভাষার
আব বৃদ্ধি না হওয়াব জ্ঞান নহে, কঙ্গ্রেসের
নিজেই উন্নতি ও আত্ম মত বিস্তারে বাধা
পড়াব জ্ঞানও বটে। কঙ্গ্রেস-সাহিত্য ও
কঙ্গ্রেস বস্তুতঃ ইংরেজীর এই আবশ্যকা-
ধিক অতিবিক্ত বায় ও ব্যবহারও ইতর-
সাধারণের মধ্যে কঙ্গ্রেস কথা ব্যাপ্তি লাভ
কবিবাব প্রবল অন্তরায়। কঙ্গ্রেস আপা-
ততঃ ইংবেজী হ্যাটকেটে জন সাধারণের
মধ্যে জাগা পাইবেন না, পাইতেছেনও
না। উহা বস্তু কি, তাহাবা বুঝেই না। জন-
সাধারণের সংস্পর্শ-বিরহে কঙ্গ্রেসের জাতী-
য় ইংবেজী শিক্ষিতদের মধ্যেই আবদ্ধ
বহিরাছে। ইংলেণ্ডের উদার রাজনৈতিক
সম্প্রদায়ের সহিত কঙ্গ্রেসের বৈমিল্য।
তাহারই অমুরূপ আপনায় অভিব্যক্তি ও
আকাঙ্ক্ষা অঙ্গীকার করেন, অথচ জাতি-
কল্পে কল্পিতঃ ইতর সাধারণের উপেক্ষা
করিয়া ক্রমে কুলীন সভ্য হইয়া দাঁড়াই
তেছেন। দেশীয় প্রজা শক্তির উপেক্ষা
করী ও হীন ব্যবহার অব্যবহৃত কুলীন কুলীন

উভয় শক্তিরই সংযোজন আবশ্যক। উভয়ের কাহাকেই তাগ করা যায় না, তাহা জানি। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, তাহা হইতেছে কি? উভয়ের সমবায় সম্ভব, সত্য ও সফল করিতে হইলে, দরিদ্রের, পদদলিতের ভায়াভুমোদিত স্বার্থের দিকে বাবেক তাকাইয়া ধন কুলীনদিগের সম্প্রদায়-গত স্বার্থ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত কবিত্তে হয়; এবং তাহাই প্রকৃত “পেট্রিয়ারিজম” পদবাচ্য হইতে পারে। নহিলে কেবল বহু কালের পরিপূষ্ট ও প্রবল স্বার্থের পরিপোষণার্থে ও পৌড়ন ক্ষমতা-বর্ধনার্থে পেট্রিয়ারিট সাজিয়া কঙ্গ্রেসে যোগ দেওয়া পাপের উপর আরও পাপ, তাহাতে কেবল কঙ্গ্রেসকে কলুষিত করা হয়। অতএব কঙ্গ্রেসকে জন সাধারণের ইতর ভদ্রের—কুলীন অকুলানের জাতীয় সভা কবিত্তে হইলে, আপাততঃ উপযুক্ত পক্ষে দৃষ্টি বাধিয়া ইংবেজীব জায় দেশীয় যাবতীয় প্রাদেশীয় প্রচলিত ভাষার সবিশেষ সহায়তা গ্রহণ কবিয়া, তাহার পথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার কবিত্তে হয়। পরন্তু, কঙ্গ্রেসের যেখানকার ও যখনকার যে অধিবেশনই হউক, বাপাবটা বিলাতী সার্কাস থিয়েটারের মত একান্ত পেশাদারী ও সংকীর্ণ টিকেটী কাণ্ড না কবিয়া, অন্ততঃ দেশীয় বারইয়ারীর মত উদার সার্কজনীন প্রথার জাতীয় উৎসব বা স্বদেশ পূজা সম্পন্ন করিয়া ফেল। কথাটা খুব তুচ্ছ, কিন্তু, অনেক সময় তুচ্ছ ঘটনাতেই বহু ব্যাপার বেশী ব্যয় পায়, উন্নতির অনেক সুবিধা ও সহায়-ত্ব হ্রাস পায়। যখন যে প্রদেশে কঙ্গ্রেসাদি-কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তখন একটা দিনও সেই প্রদেশীয় ভাষায় কঙ্গ্রেসের কার্যাদি লোক-সাধারণের সহযোগিতা প্রাপ্ত করিয়া দিলে

মন্দ হয় না। এবং তাহা বোধ হয় একান্ত অসম্ভবও হয় না। এই যে সে দিন বিডন-বাগানে দ্বাদশ কঙ্গ্রেস হইয়া গেল, কলিকাতার প্রায় পোনেবো আনাও অধিক ইতর লোক বসিল না যে, উহা বস্তুগী কি। কেহ বলিল “ঘোড়ার নাচ” কেহ বলিল, “আগজিবিসন”—আমবা স্বকর্ণে কঙ্গ্রেসের নিকটবর্তী স্থানে ঐ ছুটি কথা অনভিজ্ঞের মুখে শুনিয়াছিলাম। অথচ তাহারা বুদ্ধিমান বিষয়ী লোক; যে কথাই হউক, বাঙ্গালা কথায় বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে পারে।

কিন্তু “কঙ্গ্রেস ক্যাম্পে, অভ্যাসে ও অজ্ঞাতে ইংবেজাই এমন আমাদের আপনাদের নিজেব; আমরা কাহাও কাহারও কাছে ইংলণ্ড আমাদের “হোম।” এবং যেমন আমাদের কেহ কেহ সর্বশ্রেণী (Thoroughly English) দ্বাদশ কঙ্গ্রেসাদি বেশন সভার বর্ণনা উপলক্ষে প্রকৃত স্বদেশ-প্রাণ, কঙ্গ্রেসের সবিশেষ পৃষ্ঠপোষক আমাদের পবম প্রজ্ঞাম্পদ “পত্রিকা” লিখেন,—

“English is a foreign tongue to an Indian—is it not? But the orators delivered themselves as British orators, trained in the British Parliament would have done under similar circumstances *** And after making the gifted Indians so thoroughly English, the Anglo-Indians want to keep them slaves”

উহা প্রকৃত বর্ণনা। যিনি কঙ্গ্রেস সভা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাহাকে এ কথা স্মরণ দিতেই হইবে। অন্ততঃ আমাদের কতক লোক কঙ্গ্রেসের শক্তিশালী সদস্য ও বক্তাগণ, ইংরেজীকে অবিকল ইংরেজেরই মত, অনেক ইংরেজ অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে আরম্ভ করিয়াছেন। কঙ্গ্রেসের বক্তৃতা, বস্তুতই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বক্তৃতার মত ব্রিটিশ এবং বক্তাগণ বিচক্ষণ, বহুদর্শী, স্বাভাবিক বাস্তবিক সম্পন্ন এবং সর্বশ্রেণী সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশও

নহে, বৃটিশ । অভ্যাসে, আচরণে, হাবভাবে, ধীরতায়, গাভীরো, পরিচ্ছদে, পারিপাট্যে, প্রাজ্ঞতাदि সকল বিষয়েই সর্বতোভাবে তাঁহার। Thoroughly English, ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য । পরন্তু, পত্রিকার উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনাংশ বিদ্রূপাত্মকও নহে । উহা সুদীর্ঘ ভাবে সুখ্যাতিবাজক সত্য বিবৃতি । কঙ্গেস এবং কঙ্গেসী Thoroughly English কিন্তু, তথ্যচ হায় ! Slave গোলাম— পরাজিতপদ-দলিত, রুতদাস !! “পত্রিকা” দৃষ্টান্ত দিয়া, নাম ধরিয়া পুনঃজিজ্ঞাসা করিতে ছেন, ও তাহার উত্তর দিতেছেন ;—

“What is W. C. Bonerjee ? He is slave.”

তা, এমনই যখন, তখন আমাদের যে এই ইংরেজী ও এত ইংরেজী ও ইংরেজত্ব, ইহাকে কি বলিব ? ইসফ্ উদ্ধৃত করিয়া কাক ও ময়ূর-পুচ্ছের কথা কি বলিব ? না, তাহা ঠিক নয় । আমাদের এই ইংরেজী, ইংরেজত্ব, শিক্ষা, স্বার্থ ও আসক্তি-প্রণোদিত অভ্যাস । অভ্যাস “দ্বিতীয় প্রকৃতি” হইতে পারে । কিন্তু প্রকৃতি নহে । হাঁ ইহা অভ্যাস বটে । কিন্তু বিলম্বণ আত্ম-বিস্মৃতিও বটে । নহিলে আমরা slave কেন ? এত ইংরেজী শিখিয়া ও এমন ইংরেজ হইয়াও গোলাম নফর কেন ? নফর গোলাম থাকিয়াও ইংরাজ সন্ধি কেন ? ময়ূর না হইয়াও ময়ূর পুচ্ছ ধারণ করি কেন ? অতএব ইহা আত্ম-বিস্মৃতি বই কি ? পরন্তু, ইহা বৃথা আত্ম-বর্জনও বটে । নহিলে “বন্দোপাধায়” বর্জন করিয়া “বোনার্জী” গ্রহণ করি না ? আমার আত্মবংশ—আমরা বায়স-কুলার পরিত্যাগ করিয়া ময়ূরালয়ে বাইয়া অপমানিত হই কেন ? আপন বাদাম বসিয়া, না মরিয়া ময়ূর সাজিয়া মরিতে বাই কেন ?

মরণই যখন নিশ্চিত, ব্যক্তিগত স্বার্থের দৃষ্টা পুঁইশাকের পাতায় প্রেলোভে যখন আমি এমন অস্বাভাবিক মরণ মরি, আত্ম-বিসর্জন দিই, আত্মবংশ, পুরুষ পরম্পরাগত পবিত্র স্মৃতি, সম্মান, গোত্র, জাতিত্ব, জাতিত্ব, সংস্কার, হায়, সবই অনায়াসে অগ্নান বদনে বিশদৃশ বা বর্করোচিত ভাবিয়া বর্জন করি এবং যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া অভ্যাস ও আকাঙ্ক্ষার দাস হইয়া পরস্বের প্রাপ্তি কামনা করি, তখন মহাশয় আমি slave হই-বারই কি উপযুক্ত নই ? master হইবার মত মালমসলা আমাতে কই, তদনুরূপ মনই বা আমার কই ? এ মনুষ্য, মনের এই অনি-বার্য মর্যাদান্তিক ক্রন্দন কেবল সাধারণ ভাবেই প্রযোজ্য । নহিলে সম্মানভাজন “পত্রিকা” যে কয়টী নামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার সকলেই মনুষ্যত্বের মাহাত্ম্যে ও মনস্বীতার আদর্শ স্থানীয় । বিশেষতঃ যে মহাশয়-নামটী আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, ভগবান তাঁহাকে মনুষ্যত্বের অতুল উপাদানে নির্মাণ করিয়া-ছিলেন । বন্দোপাধায় মহাশয়ের অসাধারণ মানসিক শক্তি ও ধীরতা সর্বজন-বিদিত । কিন্তু তদীয় বদান্ততা, স্বজন-প্রিয়তা, স্বাভা-বিক মুক্তহস্ততা, সর্বোপরি তদীয় অপরিমিত মাতৃভক্তি ও পারিবারিক প্রীতি-স্নেহের কথা ও পরতঃখকাতরতার কথা সকলে হয়ত শুনে নাই । বস্তুতঃ তাহা শুনিয়া বিমোহিত হইতে হয় । পরন্তু স্বজাতির জাতিধর্মে তদীয় সংরক্ষণ-প্রবণতার বিষয় শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া থাকি । তদীয় সামাজিক অব-স্থায় অবস্থিত কোন ব্যক্তির যদি হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠা থাকে, তাহা কেবল তাঁহারই আছে । অন্ততঃ তাঁহার বাদশ প্রভূত পরিমাণে আছে, তাদৃশ আর আর লোকের নাই । কথিত যে

এই মহাত্মা স্বকীয় সম্রাট সমাজের, স্ববংশের ও স্বসাম্রাজ্যের বিপরীত ও বিসদৃশ, বিজাতীয় অবস্থার অবস্থিত, ইহা শিক্ষারই প্রভাব ও হিন্দুসমাজের ও ব্রাহ্মণকুলেবই হরাদৃষ্ট। ছত্রাঙ্ক নহিলে এমন ছলভ রত্ন নিকটস্থ থাকিয়া দূরস্থ হইবে কেন? শিক্ষার প্রভাব নহিলে স্বভাবের বিরোধী ঘটনা ঘটিল কেন?

যাহাই হউক, এখন আমাদের এই ইংরেজী ও ইংরেজাভিনয় ও ইংবেজীকে আপনাদের জ্ঞান আর কিছুই নয়—আত্মবিশ্বাস, আত্মবর্জন ও অব্যক্তাভাব অভ্যাস। উহার আত্মার অভ্যন্তরে “পেট্রিফিকেশন” থাকিতে পারে, স্বদেশ-প্ৰীতি থাকিতে পারে এবং আছেও; কিন্তু উহার আপাদমস্তকে, অঙ্গে, অঙ্গে, উহার আচরণে ও আহার ব্যবহারে স্বদেশ-প্রোহিতা, স্বজাতি-অশ্রদ্ধা বিদ্যমান।

আমরা কঙ্গ্রেস কবিরাছি। কিন্তু, কঙ্গ্রেস কাহার? ইংলণ্ড ও ইংলেন্ডী বাদে, এক কঙ্গ্রেসও তাঁদেরই। বাদে প্রসাদে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁদেরই পদাঘাতে ইহা চূর্ণ হইয়া এখনি পঞ্চাশ পাইতে পারে। ইংলণ্ড ও ইংরেজী যেমন আমাদের, কঙ্গ্রেসও তেমন আমাদের; তথাচ যে উহাকে আমাদের বলি, ইহা আত্ম-বিশ্বাস। অদ্বৈত মতের মায়া মোহের আত্ম বিশ্বাস, অপ্রত্যক্ষ দার্শনিক মিথ্যা। আমাদের এ আত্ম-বিশ্বাসের কূহক প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক মিথ্যা। এই মুহূর্ত্তে সমুদয় সংবাদ পুত্রে দেখিতেছি,—আমাদের সকলোই আত্মশাসন-কেন্দ্র রাজধানী কলিকাতার মহামুনিমণ্ডল স্বায়ত্তশাসন যেকোনো কোষাগারে কত লাক্ষিত হইয়াছে। কলিকাতার বাসিন্দারি-সংস্থাপিত নিত্য পুজিত প্রতীক ইহা এখন এই পরিশ্রম, তখন রাজ-বিরুদ্ধ, মুখ্য রাজ-বিরুদ্ধ কঙ্গ্রেসকে অপমানিত হইয়াছে। রাজ-বিরুদ্ধ কি? মুনিমণ্ডল

যেকোজি-বিত্তপ্রায় কমিসনরদিগকে লক্ষ্য কবিয়া পাণ্ডনিধর বলিয়াছিলেন “They are riding for a fall” কঙ্গ্রেস সম্বন্ধেও কোন্ একথা পুনরুক্তর না করা যায়? আত্ম-বিশ্বাস হইয়া অতিবেগে অশ্চলনায় পতনের সম্ভাবনা পদে পদে। এ তবুও বৎ ক্ষুদ্র পতন; আত্মবিশ্বাসি অনন্ত পতন সংঘটন কবে। ব্রিটিশ প্রজা-নীতি, ব্রিটিশ “কনিষ্টিটিউশন,” ব্রিটেন ভূমির উদাবতা মূলক আইন কানুন—সর্বোপরি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর আমবা নির্ভয়ে নির্ভব করি, তাহাদের অল্প-কণ ও অল্পসবণ কবিয়া সেই আদর্শে কার্য কবিত্তে যাই বটে, কিন্তু আসল ইংরেজ প্রজায়া যাহা সম্ভবে ও শোভনীয় হয়, তাহা কি এখন আমাদের পক্ষে সম্ভব ও সমীচীন? আত্ম-স্বাধীনতা ও সাবধানতাই আমাদের প্রধান ও প্রথম পলিটিকা হওয়া উচিত। “কনিষ্টিটিউশন” উত্তম বটে। তথাচ তদনু-মোদিত কার্য্যও অনেক সময়ে আমাদের পক্ষে নির্বিরল নহে। তাহা প্রায় নিত্যই ত দেখা গিয়া থাকে। ফল কথা এই যে, দৈহিক “কনিষ্টিটিউশন”টা সবল ও কঠোর না থাকিলে, আইনের বা আর কিছুই কনিষ্টিটিউশন বড় বেশী উপকাব কবিত্তে পারে না। কঙ্গ্রেসের কনিষ্টিটিউশন এখন যেক্রপ, পূর্বেই বিচার করা হইয়াছে।

তথাচ, যদি ইংরেজী আমাদের হয় ও ইংরেজ্য আমরা কতক লোকে প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে শাসন-সংস্কার বা দেশোদ্ধারের ত তাদৃশ প্রয়োজন দেখা যায় না। দেশ ইংরেজ শাসনাধীন। আমরাও thoroughly English, অতএব দেশ ও ভাষার উভয়ই আমাদের নিজেরই আছে। অতএব “কি তার উদ্ধার!”

ନତୁବା ଆମରା ଯଦି ମତା ମତାଏ ପତ୍ରିକା-
କଥିତ ସୁଭ ସକଳେଇ ହଇ, ତାହା ହଇଲେ
ଅନର୍ଥକ ଇଂରେଜ ହଇବ କେନ ? “ସୁଭ” ଗିରି
ସୁଚାହିତେ ଯଦି ଦେଶ ଶୁଦ୍ଧ ସକଳେଇ ମାହେବ
ମାଜିତେ ହୟ, ଏକାନ୍ତୁଇ thoroughly
English ହଇତେ ହୟ, ସମୟେ ସକଳେ ଏକ
ତ୍ରୈ ତାହା ହଇଲେ ହଇବେ; ଅଗ୍ରେ କାହାବ
କାହାବଓ ହଓସାତେ ତ କିଛି ଉପକାବ ହଇ-
ତେଛେ ନା ।

ଆମରା ଦେଖିଲାମ କଞ୍ଜେସେବ କନିଷ୍ଠ-
ଟିଉସନ ଅଦ୍ୟାବଧି ଲିଖିତ ନା ହଇଲେଓ କାର୍ଯ୍ୟାତ:
ତାହା ମୋଟେବ ଉପର କିକପ ଦାଡାହିତେଛେ,
କଞ୍ଜେସେବ ଶକ୍ତି କି ପରିମାଣେ ଓ କି ପ୍ରକୃ-
ତିର ଜ୍ଞାପିଆଛେ, ପରନ୍ତୁ ତାହାବ ମାହିତ୍ୟେବ
ସ୍ୱଭାବ ମାଧାରଣତ: କୌଦୃଶ । କଞ୍ଜେସେ ମାହି-
ତ୍ୟେବ ବିସ୍ତୃତି ଓ ବ୍ୟାପ୍ତି ଯେକପ ୧୫୨, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ
ଅବସ୍ଥା ତେମନ ଅଧିକ ନହେ, ହଟେତେଇ ପାବେ
ନା । ଏକଇ ପ୍ରଣାଳୀବ ଶିକ୍ଷା, ଏକଇ ପ୍ରକୃତିବ
ଦୀକ୍ଷା, ଏକଇ ଦିକ୍ ଦିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି, ଏକଇ କପ ଶାମନ
ଓ ନିର୍ମାଣ ପରିପୁଷ୍ଟ, ଅତଏବ ଭାବତବର୍ଣ୍ଣେ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରାନ୍ତେଶେର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନସିକ ମତ୍ତା ଏଥନ
ପ୍ରାୟ ଏକଇ କପ ଉପାଦାନେ ନିର୍ମିତ, ଏକଇ
ଗଠନେ ଗଠିତ; ସୁତବାଂ ତତ୍ତ୍ୱପ ଚିତ୍ର-ସ୍ୱରୂପେ
ମାଧାରଣତ:ଇ ବୋଧ ହୟ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ତତ ବେଶୀ
ଧାକା ମତ୍ତାବିତ ନୟ । ତବେ ଉତ୍କର୍ଷେବ ଅନୁ-
ଶୀଳନେବ ଅବସ୍ଥାଗତ ମାନସିକ କ୍ଷୁଦ୍ଧିବ ଏବଂ
ସ୍ୱାଭାବିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଭାଦିର ଇତର ବିଶେଷେ
ସାହା ଅଗ୍ରାଧିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ । ଏହିରୂପ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ-
ବିହୀନ ଏକଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା-ସଂଗଠିତ ମାନ-
ସିକ ମତ୍ତାର ବା ଶକ୍ତିର ବାଣ୍ଟିର ମମୃଷ୍ଟି ହଇତେ
କଞ୍ଜେସ । ତାହାର ଉପର କଞ୍ଜେସ ଉତ୍ତାବ ସ୍ୱଭା-
ବତ: ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ବଶତ: ଏକଇ ପ୍ରକୃତିର ଓ
ପ୍ରଣାଳୀର ଚିନ୍ତା-ପ୍ରସୂତ, ଏକଇରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦାତ୍ତ-
ମନୁଷ୍ଟ ଅଭିମତ ମତ୍ତାବୀନି ପ୍ରଚାରେର ମତ୍ତା ।

ସୁତବାଂ କଞ୍ଜେସ-ମତ୍ତାପେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତେଶେର
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିଗତ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଚାର
ବ୍ୟବହାର-ସମନ୍ୱିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱେର,
ସୃଷ୍ଟିର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନାଦିର ବହୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସଙ୍ଗେଓ
ବଞ୍ଚିତାଦିତେ ଅତି ଅଗ୍ରଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖା ବାୟ ।
ଅତଏବ କଞ୍ଜେସେବ ମାହିତ୍ୟା ମାଧାରଣତ:
ବୈଚିତ୍ର୍ୟାହୀନ । ମତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟାତ: ଅସ-
ମ୍ଭବ । ମତ୍ତାଗା ବୈଚିତ୍ର୍ୟୋରଓ ଅବସର ନାହି ।
ତବେ, ନିରୂପିତ ମତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ମତ୍ତାବୀନି ଅବତାବଣ, ସମର୍ଥନ ଓ ପରିପୋଷଣ
ପ୍ରଭୃତିତେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଓ ବାକ୍ୟ-
ବିଦ୍ୟାମାଦିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟା ବିକାଶେର ଅବସର
ଆଛେ । ଅତଏବ କଞ୍ଜେସ-ମାହିତ୍ୟେ ମତ୍ତାବଚର
ସେଇ ପକ୍ଷେଇ ଅଗ୍ରାଧିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖା ବାୟ ନା ।
କଞ୍ଜେସେବ ବାଜନୈତିକ ବେକର୍ଡକେ ମାହିତ୍ୟେର
ହିମାବେ ଲୟା ମାହିତ୍ୟା-ଦୃଷ୍ଟିତେଇ ଏ କଥା
ବଳା ବାୟ । ନହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟୋର ଓ ଅଭିମତେର
ଏକତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦାତ୍ତେର ମାମଞ୍ଜୁରୀ ମର୍ଦ୍ଦବା ଶୁଭ-
ଦାୟକ । ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଓ ବହୁଲୋକ ମମୃଷ୍ଟିତ
ଏକପ ବ୍ରହ୍ମ ମତ୍ତାର ଏମନ ମତୈକ୍ୟ ବାରମର ନାହି
ପ୍ରଶଂସାବ ବିଷୟ । ମତା ଦେଶେର ଶକ୍ତିଜାତ
ଅନେକାନେକ ଜାତୀୟ ମମୃଷ୍ଟି ବାକ୍ସବିତଂ,
କଳା, ଚଳଣା ପ୍ରଭୃତି ଅସଂଖ୍ୟ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା-
ଦିବ ଜନ୍ମଓ କମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନହେନ । ସୀରତା ଓ
ଗାନ୍ଧୀର୍ଷ୍ୟେ ଆମାଦେବ ଏ କଞ୍ଜେସ ଶୂନ୍ୟାଦେର
ଆଦର୍ଶ ହୁଅ । ଇହା ଏଦେଶୀୟେର ଅନୁଶୀଳନା ଓ
ସଂସତ ସ୍ୱଭାବେରଇ ଏକ ଅଂଶ । ତବେ କେବଳ
କରତାଲିର ମାତ୍ରା, ଉତ୍ତାର ମନ୍ଦନତା ଓ ମନ୍ଦ
କିଛି କମିଲେ ବୋଧ ହୟ ଭାବ ହୟ; ମତ୍ତା
ଆରଓ ଶିଷ୍ଟତାବ ଧାବଣ କରେ; ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା
ଉଭୟ ପକ୍ଷେରଇ ସୁବିଧା ହୟ ।

କଞ୍ଜେସ-ମାହିତ୍ୟା ସବିଶେଷ ବୈଚିତ୍ର୍ୟାଦିର
ହଉକ,—ତଥାଚ ଇହା ନବ୍ୟଭାରତେ, ମତା
ଶିକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟାଧାନେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବାଣ୍ଟିବ ।

প্রস্তুত ফল, একস্থানে একত্রে গ্রহিত। ইহা দেখিয়া চিত্ত পুলকিত হয়, ইহা ভাবিয়া চিত্ত বিস্মিত হয়—ইহা পাঠ করিতে কবিতা নব্যভারতের সজাগ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, মনে হয়, স্বজাতীয় ও সমবেদনামুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সকলেবই সহিত আলাপ করিতেছি—তাদের আন্তরিক স্বদেশ ভক্তির আবেগময় উচ্ছ্বাসে যেন ভাসিয়া চলিয়াছি, ক্ষণে ক্ষণে আপনাব ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থপবতা-ময় অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া তাহাতে যেন মিশিয়া যাইতেছি। উদীপনাংশে কঙ্গ্রেসেব কোন কোনও বক্তৃতা উচ্চ স্থানার।

কঙ্গ্রেস-সাহিত্য আধুনিক ইংবেজা আধ্যাত্মিক রাজনৈতিক চিন্তাব এক বৃহৎ অট্টালিকা—এক বিস্তৃত স্রোতস্বিনী। কঠিন সমালোচনা শিল্পে, সে চিন্তা পূর্ণ কবিলে, হয়ত, তাহার কতক কাটছাট পড়িতে পারে, অত্যন্ত আঘাতেই হয়ত তাহার কতকাংশ স্থলিত গলিত হইয়া যাইতে পারে, তাহার অপরিপক্বতা, তাহার অন্তঃসাবশ্রুতা, তাহার দূরদর্শন ও স্বল্প দশনের অভাব, বা তাহার পরিণাম দশনের অপ্ৰাচুর্য্য প্রভৃতি বাহির হইতে পারে; পরন্তু, সে চিন্তা-স্রোত পরিমাপ করিলে, হয়ত তাহার গভীরতা খুব অল্পই দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া এবং তরুস্থলে, ক্ষণেকের জল স্বীকার করিয়া লওয়া সত্ত্বেও এমন কখনও হইতে পারে না যে, স্বদেশের সমগ্র শিক্ষিত যুগ্ম-বীর ভিন্ন ভিন্ন ভাষাধর্ম চিন্তের চিন্তা কিছুই নহে, এবং তাই। একতা-প্রাপ্ত ও এক স্রোত-প্রবাহিত হওয়াতেই একেবারে অগুরু, অদার ও অকল্পনীয় হইয়া গিয়াছে! এরূপ মনে করিয়া, অস্বস্তি, ও আশঙ্কা বৃদ্ধি প্রশংসার পাত্রকর। তাই, কবিতা, এক মাত্র, আই-

শুকীও বটে। তা, দেশভুক্ত বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত লোক মাত্রই যদি নির্দোষ হইয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুদ্ধি মহাশয়েরও বসবাসেব স্থান কই?

কঙ্গ্রেসের দ্বাদশাবিবেশনের বহু বক্তৃতা-ই বিশিষ্ট। সম্মাননীয় সভাপতি সয়ানী মহাশয়ের বক্তৃতা কার্য্যতঃই বৃহৎ, উহা বাজনৈতিক বহু তথ্য পূর্ণ এবং সেই তথ্য নিচয় হইতে কঙ্গ্রেসের মূল সিদ্ধান্তাদি সমর্থনে সমর্থ। সভাপতি সবিশেষ দক্ষতার সহিত তৎসম্বলিত ঐতিহাসিক ও শাসন-নৈতিক তথ্য নিচয়ের সমালোচনা কবিয়া-ছেন। দ্বাদশ সভাপতিব বক্তৃতা, একাদশ সভাপতিব বক্তৃতা অপেক্ষা আব যে যে অংশেই ন্যূন (যদি কোনও অংশে নহে) হউক, গুরুত্ব ও কঙ্গ্রেসেব পক্ষ সমর্থনে ন্যূন নহে, বরং শ্রেষ্ঠ বলিয়াই বোধ হইবে। বিশেষতঃ মুসলমানদিগকে কঙ্গ্রেসের পক্ষ অবলম্বনার্থে আহ্বান—তাহার উপযোগিতা ও উপকারিতা প্রদর্শন এবং কঙ্গ্রেস সম্বন্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের আপত্তি খণ্ডন,—এই মুসলমান সভাপতি যেরূপ দক্ষতা ও দূর-দর্শিতার সহিত কবিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। তদ্বারা কঙ্গ্রেসের কিছু উপকার হইলেও পাবে। কিন্তু, তাহা সংবাদ পত্রের কলমে ও কঙ্গ্রেসের বাৎসরিক পঞ্জি-বায় ইংবেজা অক্ষরে আবদ্ধ থাকিলে উপকার হইবে না। উহা অন্ততঃ উদ্ভূ ও বাঙ্গালাতে অহুবাদিত হইয়া মুসলমান-প্রধান স্থান মাত্রই বিতরিত হওয়া আবশ্যক।

এ সংসরের সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, উপাদেয় ও সুন্দর বক্তৃতা স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের। এবম্বিধ বক্তৃতার সংখ্যা কঙ্গ্রেস-সাহিত্যে বিরল। ইহা যেমন কুতূহল,

তরুণ সুলিখিত । ইহা উচ্চভাষ্য, বক্তার স্থানের মত সম্ভাষণশীলতায় তরুণ বিনীত, ইহা চিন্তাশীলতায় শীতল ও গভীর, অথচ আন্তরিক উদ্ভাপে চিত্তাকর্ষক । পবিত্র ইহা স্থানে স্থানে প্রচ্ছন্ন পরিহাস-রসিকতায় মনস এবং সর্বত্র সূক্ষ্মচিৎ সম্পন্ন ও সবল । স্মারক বয়শচক্রেব বক্তৃতা সাহিত্যাংশে এই । অপিচ, স্মারক বয়শচক্রেব কঙ্গেশাস্তিমতেব এই অভিব্যক্তি বাঙ্গলাসেব উপকারে আসিবে ইহা বলা বাহুল্য । ইহা দাবা অন্ততঃ কতক লোক কঙ্গেশে কিয়ৎ পরিমাণে শিখাসবান হইবে এবং আকৃষ্ট হইয়াও পাবে । কিন্তু, বাঙ্গলাস অন্তর্গত ২২৫৫ প্রচার হওয়া আবশ্যক । স্মারক বয়শচক্রেব মিত্রেব এই বক্তৃতা ও কঙ্গেশেব আরও কোন কোনও বিষয় সময়াস্তরে আলোচনা করা হইয়াছিল । এখন উপসংহারে কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, এই প্রবন্ধে বহু কথা বিচারের আকাজক্ষায়, অনেক স্থলে হয় ত, অল্প বুদ্ধি প্রবন্ধলেখকের ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে, অনেক স্থলে হয় ত চিন্তাবেগে বশতঃ অশিষ্টাচার হইয়া থাকিবে । কিন্তু, বিষয়টী যেক্রপ

বহু ও বিশিষ্ট, উহার এই আলোচনাকাবী তরুণ ক্ষুদ্র ও অক্ষম এবং এই আলোচনা তরুণ অকিঞ্চিৎকর । পরন্তু, এই প্রবন্ধে বাহ্য কিছু লিখিত হইয়াছে, সম্পূর্ণ মূল বিশ্বাস ও কঙ্গেশের সহিত সমবেদনা ও তৎপত্তি ও তাহার জ্ঞান্য প্রাপ্য ন্যায্য সম্বন্ধ প্রণোদিত হইয়া লিখিত হইয়াছে । অপিচ বুদ্ধির ভুল, বিচারের ভুল, তথ্যানভিত্ততার ভুল বাহ্য ঘটিয়াছে, সবল ও শাস্তভাবে, অনুরোধ পূর্বক কেহ প্রদর্শন করিলে, তাহা স্বীকার করিতে ও তদ্বারা সংশোধিত হইতে বিনীতান্তঃকরণে প্রস্তুত আছি । অতএব, এই সকল কারণে, আমাদের যে কিছু ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা প্রাণ ও সমীচীন পাঠকবর্গের নিকট মাজ্জনীয় হইবে, এমন আশা করা যায় । বহু ক্ষুদ্র সকলেরই কতক কঙ্গেশ কথায় ভাল মন্দের আলোচনায় কঙ্গেশেব মত পদার্থের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট নাই, ইহা বিজ্ঞ কঙ্গেশীর্গ অবস্থা বুঝেন, নিম্নাধিকারীদের ও বুঝা আবশ্যক ।

ত্রিঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ।

বিদেশী বাঙ্গালী । (৫)

তুর্লভ গোস্বামী ।

ভক্তাধিক ভক্ত, গায়ককুলাগ্রগণ্য, পরম সাধু তুর্লভ গোস্বামী মহাশয় ভারতের এক মহাধর্ম্মপ্রবীরা । ইনি বর্ণে বৈদ্য, ধর্ম্মে হিন্দু, চর্ম্মে বাঙ্গালী, সম্প্রদায়ে বৈষ্ণব এবং সাংসারিক জীবনে সার্থতাগী মহাপুরুষ । হৃৎপথের বিষয় যে দেশে ইহাঁর জন্ম, যে জাতির ইনি অলঙ্কার, সেদেশে ও সে জাতি মধ্যে ইহাঁর নাম সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত বলিলেও বোধ

হয় অত্যাশ্চর্য্য হয় না । তুর্লভের নাম বাঙ্গাল দেশে কেহই জানেন না, দাক্ষিণ্যবর্ত্তে তুর্লু গোস্বামী নামে একজন বঙ্গবাসী প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে সুন্দর স্বভাব, নিশ্চল চরিত্র, ধর্ম্মপ্রচার, মানবজাতির হৃৎথাপনোদন জন্য ক্রিয়াকর্ম্ম বশবী হইয়া উঠিয়াছিলেন, দাক্ষিণ্যবর্ত্তে ক্রিয়াকর্ম্মে তিনি চরিত্র বশে একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন । গণ্য হইয়াছিলেন হিন্দু ও মুসলমান সমাবেশে ক্রিয়াকর্ম্মে

বাঙ্গালী-অবস্থার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালী জাতি মধ্যে একথা কখন কেহই সংবাদ রাখেন না। আমিও যে সংবাদ রাখিতাম, এমত নহে; আমিও হুলভ গোস্বামীর কীর্তিকলাপের কথা শ্রবণ করি নাই; ইংরাজী ১৮৮৮ অব্দেব জাহ্নবারী মাসে আমি মাল্জা প্রেসিডেন্সী ভ্রমণ করিতে করিতে এই বাঙ্গালী মহাত্মার নাম, গুণ ও মহাত্ম্যের কথা সর্ব প্রথমে শুনিতে পাইলাম। কয়েক স্থানে বহু অনুসন্ধান করিয়া এই প্রাচীন পুরুষের সন্ধান যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মাল্জা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ত্রিপতি নামী নগরী দক্ষিণাবর্তের হিন্দুর এক মহা-তীর্থ স্থান। ইহা বৈষ্ণবদিগের মহাপীঠ, ইহা অতি প্রাচীনা ভূমি। ত্রিপতি নগরী উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা, বেল-ভয়ে ষ্টেশন হইতে নগর প্রায় অর্ধ মাইল। ত্রিপতি নগরীতে একজন মহাধনশালী মোহান্ত বাস করেন এবং এখানে বহুসংখ্যক বৈষ্ণবাচার্য্যের “আথেড়া” আছে। সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে গোকর্ণ গিরি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারই উপরে প্রকৃত ত্রিপতি নগরী স্থাপিত। সিটি ত্রিপতি রেল-ভয়ে ষ্টেশনের নিকটে ইংরেজ গরগমেন্ট বসাইয়াছেন, সুতরাং ইহা প্রাচীনা ত্রিপতি নহে।

খ্রীষ্টীয় ১৮৮৮ অব্দে আমি ত্রিপতি সিটিতে পৌঁছিয়া তত্রত্য মুন্সেফ মহাশয়ের অতিথ্য গ্রহণ করিলাম; ইনি জাতিতে তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ এবং স্বামীর দ্বারা ব্রহ্মচার্য্য-বৈষ্ণব। একদিন বাঙ্গালী জাতি এবং চৈতন্য মহা-ভক্তের কথা বলিতেছিলাম, এমন সময়ে মুন্সেফ মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, “ব্রহ্মভব পূর্বে

একজন বাঙ্গালী বৈষ্ণব ত্রিপতিতে আসিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্বক পর্লোপরে বাস করিয়াছিলেন, তিনি একজন অসাধারণ দৈববলসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার সমস্ত জীবন ধর্ম্মালোচনায়, ঈশ্বরোপাসনায় এবং পরোপকারে ব্যয়িত হইয়াছিল, ঐ মহাত্মার সমাধি গোকর্ণ গিরির বৈষ্ণব-গোস্বামী আচার্য্যদিগেব রমণীয় সমাধি শ্রেণী মধ্যে এখনও বর্তমান রহিয়াছে; শত সহস্র নর নারী ফুল চন্দন দিয়া ঐ সমাধির এখনও পূজা কবে।” বন্ধুবর মুন্সেফেব এই কথা শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল; অবশেষে এতই কোতুহলাক্রান্ত হইয়া উঠিলাম যে, পর দিবস পদব্রজে আমরা সেই বাঙ্গালী সাধুব সমাধি দেখিবার জন্ত গোকর্ণ গিরিতে যাইয়া পৌঁছিলাম। এই গিরি অতি উচ্চ, ইহার সর্বত্র নিবিড় অরণ্যে পরিপূর্ণ, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলোৎস দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও স্থানে পর্লোপের গাত্রে অতি প্রাচীন গুহা বিদ্যমান, এই গুহায় অনেক যোগী বাস কবেন বলিয়া শুনা যায়; আমরা একটা গুহায় প্রবেশ করিয়াছিলাম, উহার অভ্যন্তরে দিব্য মন্দির, মনোহর কুপ, ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান, ছোট, ছোট কুটার ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। যাহা হউক, অনেক কষ্টে গোকর্ণ গিরির উপরে আরোহণ করিয়া, বিনা অনুসন্ধান—অতি সহজেই—হুলভ গোস্বামীর সমাধিকে ভক্তিতরে দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম। ইহাতে এই বুঝিলাম যে, হনু গোঁসাই বা হুলভ গোস্বামী নামে এক পূজ্যপাদ ব্যক্তি অতি পুরাতন কালে ত্রিপতিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু “তিনি বাঙ্গালী ছিলেন কি না?” এই তর্ক মনোমধ্যে উদয় হইল।

হলু গোঁসাই যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি, সে কথা এখন বলিতেছি ।

বন্ধু বলিলেন, প্রবাদ, জনশ্রুতি এবং বহুকাল হইতে প্রচলিত বৈষ্ণব সমাজেব ক্রিয়াকাণ্ড মতে ইহা প্রমাণীত হইয়াছে যে, হলু গোঁসাই বাঙ্গালী ছিলেন । মুন্সেফেব এই কথা শুনি বিচাব করিয়া দেখিবাব জন্ত আমি অহুসন্ধান আবন্ত কবিলাম । অহু সন্ধানাবন্তেব পূর্বেই কয়েকটি অকাটা প্রমাণ দ্বারা হলুকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারিলাম । বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিলেন, এই সমাবিশ্ব মহাপুরুষেব প্রকৃত নাম (Full Name) হুর্লভচন্দ্র সেন, ইনি গোঁসাইগিবিতে দাক্ষিত হইবার পরে বৈষ্ণবেবো ইহার হুর্লভ গোঁসামী নামকরণ কবেন । ‘হুর্লভ’ এই নাম বাঙ্গালী ভিন্ন আব কোনও দেশায়েব মধ্যে প্রচলিত নাই, ‘হুর্লভচন্দ্র’ এই নাম বাঙ্গালী ভিন্ন আব কাহারও যে হয় না, যাহাবা ভাবতবর্ষ পবিত্রজন কবিরাজেন, তাঁহাবা ইহা সহজেই বুঝিরা লইতে পাবেন । “হুর্লভচন্দ্র সেন”— এই নাম যে বাঙ্গালোব, তাহা দশম বংসবেব বালকও বলিয়া দিতে পারে । সেন উপাধি বাঙ্গালীেব একচেটিয়া, বঙ্গদেশেব বাহিবে এ উপাধি চলেনা, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সী মধ্যে হুর্লভচন্দ্র সেন কোনও দেশীয় ব্যক্তিেব নাম হয় না । তন্ত্ৰিম সমগ্র দেশ-ব্যাপী— সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজ ব্যাপী—বহুকালেব জনশ্রুতি দ্বারাও হলু গোঁসাইয়ের বাঙ্গালীত্ব প্রমাণীত হইতেছে । ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটি সুন্দর প্রমাণ আছে । পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় জানা আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালী জাতি ব্যতীত আর কোনও জাতিই মস্তককে অনাবৃত রাখেনা, এই জন্ত বঙ্গদেশেব বাহিবে বাঙ্গালীর “মাথা খোলা”

উপাধি হইয়াছে । মাস্তাজ অঞ্চলে রেল বা তার খোলা হইবার পূর্বে, মহাপ্রভু চৈতন্ত এবং তাঁহার সহচরগণ ব্যতীত আর কোন বাঙ্গালী এ দেশে প্রাচীন সময়ে আসিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় না । হুর্লভ গোঁসামী বাঙ্গালী ছিলেন, স্মৃতবাঃ তাঁহাব মাথা খোলা ছিল, তামিল ভাষার এখনও একটা শ্লোক আছে যাহাব অর্থ এই যে “হলু বাঙ্গালী গোঁসাই ভিন্ন মাথাটা আর কাহাবও খোলা দেখলাম না ।” এই শ্লোকটাব কিয়দংশ অনুবাদ কবিলে এষ্টরূপ হয়—

‘হেলঙ্গী, তামিলী আর মালোয়ালের লোক,
পাগড়ীর ভারে, গেল মরে, ক’ছে কত শোক ।
চেয়ে দেখ, হলু গোঁসাই, বাঙ্গালাব বড় বীর,
আব কোথাও কি দেখিরাছ, এমন খোলা কেশেরশির ।”

এই হলু গোঁসাই মহাত্মা কোণায় জন্ম গ্রহণ কবেন এবং কোন্ কুলেব মুখোজ্জল কবেন, তাহাব কিছুই জানা যায় না । যে সময়ে মহা প্রভু চৈতন্ত এবং তাঁহার সহচরগণ দক্ষিণাবর্তে ধর্ম প্রচার জন্ত আগমন কবেন, হুর্লভচন্দ্র সেন তখন তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, সেন মহাশয় তখন অর্দ্ধ-সংসারী অর্দ্ধ বৈবাগী । ইনি চৈতন্তেব অথবা তাঁহার সহচরগণের চিকিৎসক হইয়া অথবা সেবক রূপে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে ।

প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্য অহুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, কেবল এক জন হুর্লভ গোঁসাইয়ের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে ইনি আইসেন নাই । ইহার সহিত আমাদের প্রস্তাবের হলু গোঁসাইয়ের কোনও সঙ্গ নাই । দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগত হইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড বা ক্রিয়াকলাপ প্রচার করেন, তাহাব মধ্যে

সাহিত্যে বাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহাতে
 ছলু গোঁসাইয়ের নাম নাই ; নাম না থাকি
 বাবই কথা, কাবণ এই যে—ছলু'ভ গোঁসাই
 চৈতন্যদলকে পবিত্যাগ করিয়া যান এবং যে
 সময়ে পবিত্যাগ করেন, সে সময়ে তাঁহার
 নাম বা যশঃ বিস্মৃত হয় নাই, স্মৃতবাং তাঁহার
 নাম উল্লিখিত হয় নাই। এস্থলে একটা
 কথা বলিয়া বাধা উচিত যে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে
 বঙ্গদেশে বৈদ্য সমাজ যেরূপ ঘনতব রূপে
 মিলিয়া মিশিয়াছিল, আব কোনও সমাজ
 সেকপ মিশিয়া ছিল বলিয়া বোধ হয় ন'।
 বৈষ্ণব সাহিত্যের অর্দ্ধাংশ হইতেও অধিক
 গ্রন্থ বৈদ্য-লেখনীর প্রসূত। ঢলু'ভ গোস্বামী
 এই বৈদ্যকুলের মুখাঙ্কল করেন। ত্রিপতি
 হইতে শ্রীচৈতন্য দক্ষিণে চলিয়া গেলে, ঢলু'ভ
 তাঁহার সঙ্গে আব যান নাই, কেন যান
 নাই, আমরা তাহা জানিনা। তিনি ত্রিপ-
 তিতে থাকিয়া কিছুকাল বৈদ্যের ব্যবসা
 (চিকিৎসা) করেন, তখন “তিনি সেন
 বাবু” বা “ছলু'ভ সেন” বলিয়া বিখ্যাত
 হইয়াছিলেন, তদন্তর মস্তক মুণ্ডন করাইয়া
 বৈষ্ণবাচার্যাদিগের সামাজিক প্রথামতে
 গোস্বামী মতে দীক্ষিত হয়েন এবং ঢলু'ভ
 গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। আমরা
 এইবার ঢলু'ভের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কিছু
 বলিব।

মহাত্মা ঢলু'ভ গোস্বামী একজন প্রকৃত
 ধর্মবীর ছিলেন। সংসার পরিত্যাগ করিয়া
 শ্রীচৈতন্যের ব্রত গ্রহণ করিবার পরে
 লিঙ্গম ধর্ম ব্যতীত আর কিছু পালন করিয়া-
 ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সমস্ত
 জীবন সংসারের উপকারে ব্যয়িত হইয়া-
 ছিল। নিজের স্বপ্ন স্বচ্ছন্দতার দিকে তাঁহার
 দৃষ্টি ছিল না, অপরের সুখে তিনি সদা সুখী

থাকিতেন। দরিদ্রের দুঃখ মোচন, পীড়ি-
 তের সেবা, অনাথের পালন, দুঃখবিজয়ের
 সংশোধন, অজ্ঞানীর সংস্কার সত্য ধর্মের
 আলোচনা, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, ব্রহ্মোপাসনা,
 যোগাভ্যাস প্রভৃতি কাব্যেই তাঁহার আনন্দ
 ছিল। বুদ্ধ, যুবা, বানিকা, হিন্দু, মুসলমান,
 শাক্ত, শৈব—সকলেবই তিনি নমস্ত ও প্রিয়
 ছিলেন। তাঁহার বিকল্পে কেহ একটা
 কথাও বলিত না, যেহেতু তাঁহার বিকল্পে
 বলিবার কোনও হেতুই ছিল না। প্রভাতে
 উঠিয়া তিনি উপাসনাব পবে আপনাব আশ্র-
 মেব সম্মুখে গো, মেঘ, মহিষ, ছাগ, পক্ষী
 প্রভৃতির জন্ত চাউল পড়তি শস্ত ছড়াইয়া
 দিতেন, এবং ইষ্টক নির্মিত এক রুহং “হজ্জে”
 নির্মল জল স্বহস্তে ভবিয়া রাখিতেন, এই
 জলে বহুসংখ্যক তৃষিত জীবের পিপাসার
 শান্তি হইত। গ্রীষ্মকালে পর্কতের যে বাস্তা
 দিয়া পথিকেবা গোকর্ণে উঠিত, তাহার
 স্থানে স্থানে তৃষিত যাত্রীর জন্ত তিনি জলের
 কলস বসাইয়া রাখিতেন। পশু-পক্ষীদের
 আহাব হইলে, তিনি দবিদ্র ও পীড়িতদিগে
 ঘবে ঘবে গিয়া দৈর্ঘিয়া আসিতেন এবং
 বিনা মূল্যে ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া বিতরণ
 করিতেন। জাতিতে বৈদ্য ছিলেন বলিয়া
 অনেক ঔষধাদি তাঁহার জানা ছিল। তদন্তর
 ভিক্ষা দ্বাৰা বাহা কিছু প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই
 স্বহস্তে পাক করিয়া পবমানন্দে ভোজন
 করিতেন। অপরাহ্নে শাস্ত্র ব্যাখ্যা, সারাহ্নে
 সঙ্কীর্্তন এবং বাজি ৮টা হইতে ১০টা
 পর্যন্ত নগরের প্রধান প্রধান স্থানে বীণা
 বাজাইয়া ব্রহ্মগুণ গান করিতেন। মধ্যরাত্রে
 যোগ সমাপন করিয়া নিদ্রিত হইতেন এবং
 খুব প্রভাতে উঠিয়া কর্মে নিযুক্ত হইতেন।
 মধ্য মধ্য দেশ দেশান্তরে গিয়া ধর্ম প্রচার

করিতেন। প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্মের তিনি প্রচাবক ছিলেন; স্বার্থভাগ, স্বদেশের ও স্বজাতির উপকার, এক ব্রহ্মোপাসনা, জাতি-ভেদের অলৌকতা, পবোপকার পরম ধর্ম, এ সকল কথা তিনি শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া বুঝা-হতেন। তাঁহার শরীর যেমন সুস্থ, সবল ও সুন্দর ছিল, মানসিক বলেও তিনি তেমনি বলীয়ান ছিলেন; লোকে তাঁহাকে জ্ঞানের বারিধি বলিত। তাঁহার সুন্দর চবিজ

এবং নির্মল স্বভাব অতি সহজেই লোকের চিত্তাকর্ষণ করিত। আশ্রমে চৈতন্যেব একটী প্রতিমূর্তি ছিল, শুনিলাম, কথোকনম নগরের জ্ঞানৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে উহা এখনও বিদ্যমান আছে। দুর্লভ গোঁস্বামীর মিত্রা পাঠ্য চৈতন্ত-চবিতের কয়েক পৃষ্ঠা ত্রিপতি বৈষ্ণবাচার্য্য মন্দিরে এখনও সযত্নে রক্ষিত।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী ।

শোক-সঙ্গীত । *

মোগল-সম্রাট-কেশরী আকবরের রাজত্বকালে রাজস্থানের প্রায় সমস্ত হিন্দু রাজন্যবর্গ দিল্লীখরের বশ্যতা স্বীকার করেন। অথবাব রাজা মানসিংহ প্রভৃতি কেহ কেহ মোগল সম্রাট পরিষংগেব সহিত উচ্চাঙ্গ সন্ধন্ধ স্থাপন পূর্বক দিল্লীখরের অধীনে উচ্চরাজ কার্য্যে নিযুক্ত হন। কেবল চিত্তোবের হিন্দুগণ মহাবাজা প্রতাপসিংহ সুয্যবংশের গোবব অক্ষুণ্ণ রাখেন, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সম্রাটব বিক্ষোভে অগ্র ধারণ কথিয়া চিত্তোরের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। অবশেষে দিল্লীখব বহু সেন্য সামন্ত সহিত নিজপুত্র সেলিমকে প্রতাপসিংহের প্রতিকূলে প্রেরণ করেন। হলদীখাটের পবিত্র সমবক্ষেত্রে প্রতাপসিংহ অতুলনীয় শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিস্তি তাঁহাব কতিপয় সহস্র সৈন্য অবশেষে সম্রাটের অগণ্য সৈন্যের নিকট পরাভূত হয়। এত যুদ্ধে সহস্র সহস্র বাজপুত বীর রণক্ষেত্রে জীবন বিনোদন করেন, এবং মুসলমান সৈন্তের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য রজনীতে শত শত রাজপুত কুলোজনা জলস্তচিহ্না আরোহণ করেন। এই চিত্তাবোহণ উপলক্ষে এই সঙ্গীতটি রচিত হয়।

(১)

সাক্ষ্য আকাশে লোহিত দিনমণি
তিমির সাগরে ডুবিছে বে ॥
পর্বত-কন্দরে উচ্চ বিলাপে
শৈল-সমীরণ শ্রুনিছে রে ।

"সমুদ্র লহরীর" স্বর ।

মহুব গমনে ওট ফুজা তবঙ্গিনী
কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলেছে রে ॥
দিগন্তবেষ্টিত ভীম শাশানে
লোহিত কবজাল পরকাশিছে রে ।
আজি বিশাল প্রাঙ্গণে শোণিত বজ্রিত
বাজপুতগণ চিরনিদ্রিত রে ॥
জীবন বিসর্জিয়া জননীচরণে
রাশি বাশি দেহ রাজি শোভিছে বে ।
শিশিবেব ছলে যত স্বর্গসীমন্তিনী
তাহে নয়ন আপার ববষে রে ॥
হেনকালে দিল দেখা ভূধর উপরে
শত শত বাজপুত রমণী বে ।
রকত বসনে সকলে বসনা
বনকূলে শোভিত বেণী রে ॥
নৈশ আন্ধাবে ভুবিল ধরা
স্বর্গের পটখানি শোভিল রে ।
জপিল চিতা ভীম গুরজনে
শত রাজপুত রমণী গাইল রে ॥

২)

ঘোর আন্ধারে ভুবিল দেশ
নরনারী ক্রন্দন ছুটিল রে ॥
ওগো ও জন্মদে ! স্নেহময়ী জননি !
বিদায় মাগি ছে তব চরণে রে ॥

নিরখি তোমারে আকুল হিয়া
জদয়-আগার আকার রে ॥
আর্য্য শোণিতে লভেছি জনম
আর্য্যের মত প্রাণ সঁপিব বে ।
সাক্ষী থাকহে তুমি দেবী বিভাবি !
তারকামালিনী যামিনি ! বে ॥
বীর-রমণী মোবা বীর প্রসূতি
যাই চলি পতিপুত্র যেখানে বে ।
জয়দেব হতশন বিশ্ব-পবিত্রা
প্রণমিছে রাজপুত্র রমণী বে ॥
বলিতে বলিতে তবে অনল প্রবেশিল
শত শত নারীবেশী দেবী বে ।
পর্কত কন্দরে সিংহী গবজিল
স্ববগ ভূধব কাঁদিল বে ॥
দেখিতে দেখিতে কুম্ভাসারে
পর্কত প্রাঙ্গণ ছাটিল রে ।
দেখিতে দেখিতে বিদ্যুৎ রূপে
চিতানল আকাশে মিশিল বে ॥
কোথা সবে জননি গো কাঁদিছে পরাণ আজি
ছনঘনে জলধাবা বহিছে বে ॥
সোণার ভাবত এবে ভীম শাশান
ঘনঘটা আকাশে খেলিছে বে ।
বজ্র গরজনে ঝঞ্জা বহিছে
ভারত দুঃখিনী মুহুঁতা বে ॥

জাগাও জাগাও সবে ভীম নিনাদে
জাগাও এ নিরীষ ভারত রে ।
জীমূত মস্ত্রে বিদ্যুৎরূপে
ভারতাকাশে পরকাশিয়া রে ॥
জাগাও জাগাও সবে আর্য্য রমণী
দেখ সবে স্ত্রিয়মাণা রয়েছে রে ।
স্বর্গীয় তেজে পূবাও সবারে
ছন্দুভি নাদে ধরা কাঁপাও বে ॥
নৈশ ঝটিকাসনে এসগো ছুটিয়া
শত শত স্বর্গীয় দেবী রে ।
সবে শিয়বে বসিয়া দেখাও স্বপন
নিদ্রিত যুবকে জাগাও বে ॥
মিলিয়া সকলে নগবাজ শৃঙ্গে
সিংহী ব গরবে দাঁড়াও বে ।
কাঞ্চন-জঙ্ঘা স্বর্ণ কিবীটা
নববাগ রঞ্জিত শোভিবে রে ॥
স্বরগ মবত ভূধর সাগর
জয় জয় নাদে পুবিবে রে ।
গঙ্গা যমুনা সিদ্ধ কাবেরী
নাচিয়া নাচিয়া বহিবে বে ॥
স্বর্গের দূত হেমপঙ্ক প্রসারি
ভাবত আকাশে উড়িবে রে ।
হাসিবে কাঁদিবে নাচিবে গাইবে
ওই চিতাভস্ম মাখিবে বে ॥
ত্রিযোগেন্দ্রনাথ সেন ।

আহার-তত্ত্ব ।

ভেতো বাঙ্গালী বলিয়া আমাদের একটা
হুর্নাম আছে । ভাত কি হের পদার্থ ? তবে
এ হুর্নাম কেন ?

আবার কেবল বাঙ্গালীরাই ভেতো নহে ।
বঙ্গ-উপসাগরের ভিত্তি-পাশের লোকেরই
ভাতভাত প্রাণ । মাল্লিক, উড়িয়া, বাঙ্গালী
এ সকল দেশ, এই কয়েক প্রদেশেই ভাতের

প্রচুর আবাদ এবং এই কয়েক প্রদেশে
ভাতই প্রধান খাদ্য ।

অবশ্য হিন্দুজাতি ভেতো নহে । কিনা
ভারতবাসী ভেতো নহে । সমুদয় ভারত
সইতে গেলে, ভাত অল্প লোকের প্রধান খাদ্য ।
গম, বব, জোয়ার, বাজরা, দাইল ইত্যাদি ভারত-
বাসীর খাদ্য । তবে বঙ্গ উপসাগর বেড়িয়া কুঠের

কটা প্রদেশে ছাত্ত ও আটা যেক্রপ, ভারতের অপর প্রদেশে ভাত সেইক্রপ । কেবল ধনী লোকের রসনাব তৃপ্তি সাধন করে ।

ভাতের দোষগুণ বিচারের পূর্বে আহারের প্রয়োজনটা বুঝা কর্তব্য । কিন্তু আহারের প্রয়োজন বুঝেন না কে ? আহাব ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব, এ কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না । কিন্তু আহাব করাটা নিত্য বাপার বলিয়াই একটু বিচার করা আবশ্যক । প্রতাহ যাহা কলিতে হয়, তাহার ভাল মন্দ সবিশেষ বিবেচনা করিয়া করা কৰ্ত্তব্য ।

ছেলেবেলায় হুর্ভিক্ষের কথা শুনিলে মনে হইত, দেশে কত গাছপালা, কত মাটি-জল আছে, সেই সব খাইয়া লোকে পেট ভরায় না কেন ? মাটি জলের ত অভাব নাই । আর পেট খালি হয় বলিয়াই ত ক্ষুধা বোধ করি । তখন কেহ যদি বলিত, মাটি খাইতে মিঠে লাগিবে কেন ? অমনই উত্তর হইত, হুঁন তেল মাখাইয়া ভাজিয়া বা রাঁবিয়া খাইলে চলে না ? অনেক শাক কাঁচা খাইতে মাটি অপেক্ষা সুস্বাদু বোধ হয় না । আমাদের মধ্যে যে বুদ্ধিমান ছিল, সে বলিত “মাটি যে খাবার জিনিস নয় ।” তা’ত নয়, কিন্তু কেন নয় ? আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি ।

এক ব্যক্তি একটি নূতন পুষ্করিণী কাটাইয়াছিলেন । পুষ্করিণী করিলেই তাহাতে মাছ করিতে হইবে । বড় পুষ্করিণী, অনেক জল । অনেক মাছ ছাড়া হইল । কিন্তু ছুই বৎসর গেল, মাছ যেমন ছিল, তেমনই রহিল । বড় পুষ্করিণী মাছ অপেক্ষাকৃত কাতলা বড় হইল না । এমন সাধের পুকুরে মাছ হইল না, পুষ্করিণীর কর্তার ছুঁধের অবধি রহিল না । নির্মল জল, লতা পাতা নাই, পুকুরের চারি

পাড় পরিষ্কার, অথচ মাছ বাড়েনা । কেহ বলিয়াছিল, পুকুরের মাছ খাইতে পার না । কর্তা শুনিয়া অবাক হইয়াছিলেন । পুকুরে কি মাটি জল নাই ?

এক দিন খাইতে না পাইলেই শরীর অবসন্ন হয়, নড়িতে চড়িতে, কাজ কর্ম করিতে ইচ্ছা হয় না । শাস্ত্রে শরীরটা নববারনুকুল বলা হইয়াছে । কিন্তু দ্বার সংখ্যা নয় হউক বা দশ হউক, কয়েকটি দ্বার দিয়া আমরা অবি-রত ব্যয় করিতেছি । এই ব্যয়টা বন্ধ করিতে পারিলে আহার চিন্তা থাকিত না ।

কিন্তু ব্যয় হয় বলিয়াই শরীর যন্ত্রটা রক্ষিত হইতেছে । এ সম্বন্ধে একটা পুরাতন দৃষ্টান্ত আছে । আমাদের দেহটা একটা স্ত্রীম এঞ্জিন বা বাষ্পীয় যন্ত্র । একখানি এঞ্জিন থাকিলেই তদ্বারা কাজ পাওয়া যায় না । এঞ্জিন দ্বারা কাজ পাইতে হইলে খরচ করিতে হয় । সকলেই জানেন, এঞ্জিনের খরচ কাট বা কয়লা । তবেই কাট বা কয়লা পোড়াইলে যে শক্তি জন্মে, তাহাই এঞ্জিনের কাজ করিবার শক্তি । এঞ্জিন দ্বারা যত কাজ হয়, সমুদয় সেই কাঠ বা কয়লার শক্তি দ্বারা হয় ।

কাঠ বা কয়লা পোড়াইলে যত শক্তি প্রকাশিত হয়, তাহা পরিমাণ করিতে পারা যায় ; আবাব কত শক্তি দ্বারা কত কাজ হইতে পারে, তাহাও পরিমিত হইয়াছে । এই ভাবে দেখিলে, এঞ্জিনে যত কাঠ বা কয়লা পোড়ান হয়, তাহা অত্যন্তই আমাদের কাজে আসে । কাঠ বা কয়লার সমুদয় শক্তির প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ আমাদের কাজ করে । অবশিষ্ট ভাগের আকারে বায়ুর সহিত মিশিয়া যুখা নষ্ট হয় ।

তাহা হুঁফা এঞ্জিনের মধ্যে একখানি বন্ধ

চাকা ঘুরে এবং সেই প্রামাণ্য চাকার শক্তি দ্বারা ময়দার কল বা রেলেরগাড়ী চলে। কিন্তু সেখানি ছাড়া আরও কত ছোট বড় চাকা ঘুরিতে থাকে। সে গুলি চালাইতেও শক্তি চাই। এই শক্তি-বায়ুটা কি রূপা বায়ু নহে?

রূপা বায়ু নহে। কেন না, বড় চাকাটা চলিতে পারিবে বলিয়াই এই সকল ছোট চাকা চালাইতে হয়। এগুলি ঠিক না চলিলে বড় চাকা চলে না এবং ময়দা ভাঙ্গাও হয় না। তবেই দেখা গেল, এঞ্জিনে তাপের আকারে রূপা বায়ু ছাড়া আর এই রকমে শক্তি বায়িত হয়। (১) ছোট চাকা গুলি চালাইতে যে শক্তি বায়ু হয়, তাহাকে অভ্যন্তর বায়ু বলা যাইবে এবং (২) বাহিরের বড় চাকা ঘুরাইতে যে শক্তি বায়ু হয়, তাহাকে বাহ্য বায়ু বলা যাইবে।

আমাদের শরীর যন্ত্রে এঞ্জিনের রূপা বায়ুটা নাই। কিন্তু অপর দুই প্রকার বায়ু আছে। বকের ভিতরে যে হৃদযন্ত্র দিবারাত্রি ধক্ ধক্ করিতেছে, তাহার জন্ত অনেক খানি শক্তি আবশ্যক হয়। ফুস্ফুস আছে, আহার পরিপাক করিবার জন্ত পাকযন্ত্র আছে, আরও কত কল শরীরের মধ্যে চলিতেছে। সর্কীপেকা অধিক বায়ু, শরীরকে সর্বদা একই ভাবে উষ্ণ রাখিতে হইতেছে, গাত্রচর্ম দিয়া জল বাষ্পীভূত করিতে হইতেছে। এ সমস্ত কাজের জন্ত শক্তি চাই। ইহাদের উপর, বাহিরের কাজ কর্ম করিতে শক্তি আবশ্যক।

মূল দৃষ্টিতে আমাদের দেহের অভ্যন্তর বায়ুটা রূপা বোঝ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এঞ্জিন খানি গড়িতে কত শক্তি লাগিয়াছিল, তাহা জীর্ণসংস্কার করিতে শক্তি আবশ্যক হইল। আমাদের দেহে নিজের আপ-

নাকে নির্মাণ করিতেছে, নিজেরই আপনার জীর্ণসংস্কার করিতেছে। শরীরকে সর্বদা উষ্ণ রাখিতে হইতেছে। নতুবা প্রাণ রক্ষা হয় না।

তবেই দেহযন্ত্র কার্যকম অবস্থায় রাখিতে এক বায়ু এবং তদ্বারা বাহিরের কাজ করিতে আর এক বায়ু। প্রথম বায়ুটা বন্ধ করিলে দেহযন্ত্রটাই বায়। দ্বিতীয় বায়ুটা ইচ্ছামুতাবে কমাতে বাড়াইতে পারি। যদি কোন প্রকার কাজ না করিয়া কেবল দেহখানাই বাচাইয়া রাখিতে চাই, তাহা হইলে দ্বিতীয় বায়ুটা কবিত হইবে না। অবশ্য একরূপ স্থলে জড়ভরত হইয়া দিন কাটাইতে হইবে।

সময় ও অবস্থা বিশেষে আমরা প্রথম বায়ুটাও কিছু কমাতে পারি। শীতকালে দেহ অনাবৃত রাখিলে দেহের অনেক শক্তি তাপরূপে রূপা নষ্ট হয়। আগুন জালিয়া কিম্বা শীতবস্ত্রে বা ভস্মাদিতে দেহ আবৃত করিয়া এই অপব্যয় কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। সর্পাদি কতিপয় প্রাণী দেহের যন্ত্রগুলিকে এমন অবসন্ন অবস্থায় রাখিতে পারে যে, তাহারা কয়েক মাস আহার করিয়া অল্প হইতে শক্তি সঞ্চয় না করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অবশ্য এই সময়ে তাহাদের শরীর শীর্ণ হইতে থাকে।

দুই এক দিন কিছু না খাইলে যে শরীর শুকাইয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, তখন আমরা শরীরের অভ্যন্তর শক্তি ব্যয়টা শরীর দ্বারা সম্পাদন করি। বস্তুতঃ উপবাসী ব্যক্তি নিজের শরীর ভক্ষণ করে। এজন্ত শরীর শীর্ণ হয় এবং শক্তির অভাবে অবসন্ন হয়। কিন্তু যদি কষ্ট হইতে চাই, তাহা হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় বায়ুটা যথোচিত করিতে হইবে।

কিন্তু বিধাতা এমনই নিয়ম করিয়াছেন

যে, আর না থাকিলে ব্যয় করা চলে না। সুতরাং জীবন ধারণ করিতে হইলে আহার আবশ্যক এবং যিনি যত কাজ করিতে চান, তাঁহাকে তদনুরূপ আহার করিতেই হইবে। আহার দ্বারা দেহ রক্ষিত হয় এবং দেহে শক্তি সঞ্চিত হয়। কিন্তু এজন্য অল্প কেবল উদরস্থ করিলেই চলিবে না। অল্পকে দেহসাৎ করা চাই। অর্থাৎ অল্পকে আমাদের রক্ত মাংসাদিতে পরিণত করিতে না পারিলে আহারে কোন ফল হয় না। পুষ্করিণী জল-পূর্ণ করিতে হইলে যেমন জল নির্গম পথ খুলিয়া রাখিলে তাহা কখন পূর্ণ হইতে পারে না, তেমনই দেহে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে অল্পকে দেহস্থ করা চাই।

এই বিষয়ে দেহস্থ বাস্পীয় যন্ত্র হইতে প্রসূত। বাস্পীয় যন্ত্রে কাঠ বা কয়লা যেমন দেওয়া যায়, তাহা তেমনই পুড়িয়া শক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু দেহস্থে অল্প যেমন প্রবেশিত করা যায়, তেমনই আকারে উহার অত্যল্পই পুড়ে। অধিকাংশই শরীরের রক্ত মাংসে পরিণত হইয়া পুড়ে। এই কথাটা স্মরণ রাখিলে আমাদের কি প্রকার অল্প আবশ্যক, তাহা বুঝা যাইবে। অল্প এমন হওয়া চাই যে, তাহা সহজে দেহস্থ করিতে পারা যায়। অতএব যদ্বারা আমাদের রক্ত-মাংসাদি গঠিত হইতে পারে, তাহাই অল্প।

কি প্রকার অল্প আবশ্যক, তাহা শরীরের ব্যয় দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেহে তিনটি প্রধান ব্যয়স্থান আছে (১) ফুসফুস (২) মস্তিষ্ক (৩) গাত্র। এই তিন দ্বারা দিয়া যে সকল পদার্থ অবিরত দেহ হইতে চলিয়া বাইতেছে, তৎসমুদয় পূরণ করিতে পারিলে দেহ যেমন, তেমনই থাকে। শৈশবাবস্থায় শিশু যাহা দেহস্থ

করে, তাহার কিসদংশ আভ্যন্তর এবং বাহ্য-ব্যয়ে এবং অবশিষ্ট দেহবর্ধনে নিযুক্ত হয়। যৌবনাবস্থার পরে দেহ বৃদ্ধি আবশ্যক হয় না, এজন্য তখন ব্যয়ালুসারে আহার রূপ আর কবিলেই চলে। অতএব শরীরের পরিমাণের তুলনায় বালকদিগকে প্রোট অপেক্ষা অধিক আহার করিতে হয়।

দেখা গেল, অল্পের শক্তিই আমাদের দেহের শক্তি এবং দেহের উপাদানই অল্পের উপাদান। দেহের মূল উপাদান অনেক। তন্মধ্যে কার্বন বা কয়লা, হাইড্রজ, অক্সিজ, নাইট্রজ, গন্ধক, ফসফর, এবং কয়েকটা ধাতু প্রধান। এই মূল উপাদানগুলি উপ-যুক্ত পরিমাণে দেহস্থ করিতে পারিলেই আর ব্যয় সমান থাকে।

আবশ্যক মূল উপাদানগুলি ছাড়া অন্য নহে। কার্বন বা কয়লা কাঠে, হাইড্রজ জলে, অক্সিজ জলে ও বায়ুতে, নাইট্রজ বায়ুতে এবং গন্ধক ফসফর ও ধাতুগুলি মৃত্তিকায় আছে। কিন্তু থাকিলে কি হয়, যেমন ময়দার কলে ইট ভাঙ্গা চলে না, তেমনই মূল উপাদান দেহের বড় একটা কাজে আসে না। কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝা যাউক। ঐ সকল মূল উপাদান লইয়া দেহের রক্তমাংস গড়িতে অবশ্য শক্তি চাই। দেহ নিজেই অপর শক্তির অপেক্ষা করে, সুতরাং উহা মূল উপাদান যুড়িয়া রক্তমাংস গড়িবার শক্তি পাইবে কোথায় ?

এ বিষয়ে উদ্ভিদ প্রাণী হইতে ভিন্ন। তাহার মূল পদার্থ গ্রহণ করিয়া দেহ নির্মাণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সামান্য যৌগিক পাইলেই নিজ নিজ পুষ্ক-কাণ্ড গড়িতে পারে। তাহাদের দেহ আরও জটিল যৌগিক দ্বারা গঠিত। সুতরাং তাহা-

দিগকে অন্ন জটিল হইতে অধিক জটিল পদার্থ গড়িতে হয়। অবশ্য এতদ্ভিন্নও শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি তাহার সূর্য্য হইতে লইতেছে। কেননা, সূর্য্যের আলোক না পাইলে তাহার স্ব স্ব দেহ নিস্প্রাণোপযোগী যৌগিক প্রস্তুত করিতে পাবে না।

কিন্তু আমাদের ঠিক বিপরীত। আমরা অধিক জটিল পদার্থ ভাঙ্গিয়া অন্ন জটিল করিতেছি। আমাদের দেহের উপাদান যত জটিল, দেহেব ব্যয়িত পদার্থ তত জটিল নহে। জটিলকে ভাঙ্গিয়া বা পোড়াইয়া সহজ করিয়াই আমরা শক্তি পাই।

কিন্তু একেবারে কোন মূল পদার্থ আমরা আহার করি না, এমন নহে। বায়ুর অক্সিজেন আমরা অবিরত দেহস্থ করিতেছি। আমরা বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকি, এ কথা স্তনিলে অনেকে হয়ত বিস্মিত হইবেন। কিন্তু যাহা খাইয়া প্রাণ ধাবণ করি, তাহাই অন্ন। তবে অক্সিজেন মুখ দিয়া না খাইয়া নাক দিয়া খাই এবং উহা কঠিন কিম্বা দ্রব না হইয়া বায়ু। কিন্তু তা বলিয়া উহার অন্নত্ব বিলুপ্ত হইবে কেন? এই বায়ুরূপ অন্ন পবি-মাণেও অন্ন নহে। প্রত্যহ প্রায় ৮০ পোয়া অক্সিজেন আমরা দেহসাৎ করিতেছি।

অনেক লোক চাউল, দাইল, জল কত বাছাই করিয়া আহার করে, এবং আবশ্যক হইলে বেশী দাম দিয়াও ঐ সকল অন্ন ক্রয় করিতে পরাশ্রয় হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বায়ুটা সহজ লভ্য বলিয়া উহার ভাল মন্দ রুড় একটা বিচার করে না। এই শীতকালে লোকে ঘরের দর জানালা আট-খাট বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যায়, কিন্তু লক্ষ্য রাখিলে পাওয়া যায় না বলিয়া হুঃখ প্রকাশ করে। তাহার মতো অনেকে আহার

নাক মুখ লেপ চাপা দিয়া সুখে নিদ্রা যায়। মানব চরিত্র এমনই বিচিত্র বটে।

যাহা হউক, যেমন বায়ুর অক্সিজেন ব্যতীত কাঠ পুড়ে না, তেমনই আমাদের দেহও পুড়ে না। কাঠ পুড়িলে যেমন তাপ জন্মে, দেহের মাংসাদি পুড়িলেও তেমনই তাপ জন্মে। প্রভেদের মধ্যে কাঠ পুড়িবার সময় জলিয়া উঠে, দেহেব মাংসাদি এমন মন্দ মন্দ পুড়ে যে, জলিয়া উঠে না।

মূল পদার্থের মধ্যে কেবল অক্সিজেন বায়ু আমবা শরীরে গ্রহণ করিয়া থাকি। তন্নিম্ন, জলও কয়েকটা ধাতব পদার্থও আমাদের অন্ন। উহাদিগকে সামান্য যৌগিক বলা যায়। জলের ভাল মন্দ বিচার অনেকেই করিতেছেন; তৎসম্বন্ধে এখন কোন কথা বলা আবশ্যক নাই। আমাদের দেহের প্রায় ১০/০ আনা জল, শিশুদের ৮/০ আনা। কিন্তু আমরা কেবল জল পান করিয়াই দেহে জল প্রবেশিত করি না। শিশুদের প্রাণ মাত্রের মধ্যে প্রায় ৮০/০ আনা জল, গাভীহৃৎ ৮/০ আনা। শাক সবজি ফল মূলে বিস্তর জল। লাউ কুমড়া শাকে প্রায় ৮০/০ আনা জল। তরমুজে ৮/০ আনা, আলুতে ৮০, মৎস্য মাংসে গড়ে ১০/০। চাউল দাইল ময়দার মোটামুটি ৮/০ আনা জল।

ধাতব পদার্থের মধ্যে খাদ্য লবণ, ফস্ফর, গন্ধক, স্ফার, চূর্ণ ইত্যাদি প্রধান। হুন আমরা প্রত্যহ খাইয়া থাকি। অপরাপর পদার্থ এইরূপে পৃথক্ খাই না বটে, কিন্তু শাকাদির সঙ্গে উহাদিগকে উদরস্থ করিতেছি। কাঠ পোড়াইলে যে ভস্ম অবশেষ থাকে, তাহাই উত্তম দেহের ধাতব পদার্থ। এ স্তলিকে রাসায়নিকেরা সামান্যতঃ অবলম্বন করিয়াই নির্দেশ করেন। আমরা সকলেই

উদ্ভিদভোজী। একজ্ঞ এ সকল পদার্থের জ্ঞান ভাবনা নাই। অবশ্য সকল উদ্ভিদে সমান পরিমাণে ধাতব পদার্থ নাই। ১০০ সের পরিষ্কার চাউল পোড়াইলে ১০ সের মাত্র ভস্ম পাওয়া যায়। দাইলে অপেক্ষাকৃত অধিক ধাতব পদার্থ আছে। তন্মধ্যে ৩১০ সের চাউলে যত ফস্কর, ১ সের অড়র দাইলে তত আছে। স্থলতঃ বলিতে গেলে, দাইল ইত্যাদির খোসায় অপেক্ষাকৃত অধিক ধাতব পদার্থ আছে।

বায়ু, জল, মৃত্তিকা, (ধাতব পদার্থ) এই তিন প্রকার অগ্নির উল্লেখ করা গেল। কিন্তু এতদ্বারা আমরা কার্বণ এবং নাইট্রজ পাই না। মৃত্তিকায় সোরা আছে এবং সোবায় নাইট্রজ আছে। সেইরূপ বায়ুতে নাইট্রজের পরিমাণ প্রায় ৮/১০। কিন্তু এই এই আকারে নাইট্রজ আমাদের কাজে লগ্নে না। সুতরাং কার্বণ ও নাইট্রজ, এই দুইটির উপায় করিতে পারিলেই আহার সংস্থান হয়।

ইহাদের পরিমাণও অল্প নহে। আমরা প্রত্যাহ প্রায় ২৩ তোলা কার্বণ এবং ১.৬ তোলা নাইট্রজ বহু হইতে ব্যয় করিতেছি। উহাদের অনুপাত প্রায় ১৪ ভাগ কার্বণ ১ ভাগ নাইট্রজ।

এই কার্বণ ও নাইট্রজ ব্যয় নির্বাহ করিতে হয় বলিয়াই অল্প চিন্তা বিষম হইয়াছে। উহাদিগকে মূল আকারে কিম্বা সমাজ যৌগিক আকারে পাইলে হয় না। উহাদিগকে বিশেষ জটিল আকারে পাওয়া আবশ্যিক। ইহার কারণ পূর্বে বলা গিয়াছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে উহার আবশ্যিক জটিল আকারে বিদ্যমান। একজ্ঞ উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণীদেহ হইতে ঐ দুই পদার্থ গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের পত্যস্ত নাই। অর্থাৎ

এই কারণে উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণীদেহ কিম্বা উভয়ই আমাদের অগ্নের মধ্যে হইয়াছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী লইয়া জীব। তাহাদের দেহ জৈব পদার্থ। তবে আমাদের অল্প গুলি এই কয়েক প্রকার—(১) বায়ুর অক্সিজ (২) জল, (৩) ধাতব লবণ (৪) জৈব পদার্থ। জৈব পদার্থ আমরা তিন আকারে গ্রহণ করিয়া থাকি। (১) মাংস, আরাকট, চিনি প্রভৃতি যে সকল পদার্থে নাইট্রজ নাই, কিন্তু কার্বণ, হাইড্রজ, অক্সিজ আছে। এ গুলিকে রাসায়নিকেরা কার্বোহাইড্রেট নামে অভিহিত করেন। (২) ঘৃত তৈল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে ঐ তিনটি পদার্থ আছে, কেবল হাইড্রজের তুলনায় অক্সিজ কম আছে। (৩) মৎস্য মাংসাদি, যাহাতে ঐ তিন পদার্থ ছাড়া নাইট্রজ আছে। এই শ্রেণীতে পদার্থে নাইট্রজ আছে বলিয়া উহাকে নাইট্রজের পদার্থ বলা যায়।

কার্বোহাইড্রেট পদার্থে কার্বণ ৮/১০ আনা। চিনিতে একটু প্রভেদ আছে। উহাতে কার্বণ ৮/১৫। ঘৃত তৈলে কার্বণ ও হাইড্রজ বেশী এবং অক্সিজ কম। একজ্ঞ উহাদিগকে পোড়াইলে কার্বোহাইড্রেট অপেক্ষা বেশী তাপ পাওয়া যায়। যাহা হউক, ঘৃত তৈলে কার্বণ গড়ে ৮/১০ আনা। নাইট্রজের পদার্থের একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ ডিম্বের যেতাংশ। সেইরূপ দাইল ও ময়দার অংশ বিশেষ এবং মেদ ও অস্থি বিযুক্ত মৎস্য ও মাংস, দুধের ছানা প্রভৃতি নাইট্রজের পদার্থ। এই সকল পদার্থে গড়ে নাইট্রজ ৮/১০ আনা এবং কার্বণ ১৭/১০ আনা। উভয়ের অনুপাত ১: ৬.৩৮

এই সমুদয় জৈব অল্প ব্যতীত আমরা লেবু, তেঁতুল প্রভৃতি অল্প, লবঙ্গ, হলুদ, গোলা-মরিচ প্রভৃতি মজল পাইয়া থাকি। ইহাদের

পরিমাণ অল্প বলিয়া এখানে ধরা গেল না।
অবশ্য এগুলিবও প্রয়োজন আছে।

এই কয়েক রকম জিনিসই আমাদের
আবশ্যক। অবশ্য কেবল চিনি কিম্বা আরা-
কট কিম্বা তৈল বা ঘৃত খাইলে চলিবে না।
কেননা, তৎসমুদয়ে নাইট্রজ নাই। মাংসাদি
নাইট্রজের পদার্থে কার্বন ও নাইট্রজ, উভ-
য়ই আছে। কেবল ঐ প্রকার অল্প খাইলে
ক্ষতি কি?

কিন্তু দেখা যায়, নাইট্রজের পদার্থে নাই-
ট্রজ ও কার্বনের অনুপাত ১ : ৩.৩। কিন্তু
আমাদের চাই ১ : ১৪। সুতরাং আবশ্যক
নাইট্রজ পাঠিতে গেলে কার্বন কম পড়ে,
আবাব আবশ্যক কার্বন পাঠিতে গেলে নাই-
ট্রজ বেশী হয়। কিন্তু ভাগে নাইট্রজ বেশী
পড়িলে ক্ষতি কি? ক্ষতি এই যে, নাইট্রজের
পদার্থ হইতে আবশ্যক পরিমিত কার্বন
পাইতে হইলে ঐ পদার্থ অনেক খানি উদরস্থ
করিতে হয়। অতখানি পদার্থ জীর্ণ করিতে
পাক্ষয়কে তদনুকূপ শক্তি দিতে হয়। পূর্বে
বলা গিয়াছে, আমাদের অম্লের শক্তিই মূল-
ধন। সুতরাং যেমন টাকা আদায় করিবার
সময় ব্যয়ের দিকটা কম করাই উচিত, তেম-
নই অল্প হইতে শক্তি সঞ্চয় করিবার সময়েও
অধিক শক্তি ব্যয় বাঞ্ছনীয় নহে।

ইহার উপর আরও কথা আছে। পাক-
যন্ত্র একটা নহে, অনেকগুলি আছে। কোন
যন্ত্র দ্বারা কেবল কার্বনাইড্রেট, কোনটি দ্বারা
কেবল ঘৃতাদি তৈল পদার্থ, কোনটি দ্বারা
নাইট্রজের পদার্থ এবং কোনটি দ্বারা সকল
গুলিই অল্প পরিমাণে জীর্ণ হইতে পারে।
এখন ভ্রাতৃসমাজে যেমন লোকের কার্য-
ক্ষমতাসমূহের ব্যবহার তাপ দ্বারা কাজের
সুতরাং সমাজের সুবিধা, যত্নে তেমনি পাক-

যন্ত্র রূপ সমাজের লোকদিগের কার্য-
ক্ষমতাসমূহের সকলকেই স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত
রাখা উচিত। নতুবা কোন যন্ত্রটা নিষ্কর্ম
বসিয়া থাকিবে এবং কোনটা বা অতিরিক্ত
গুরু পরিশ্রমে শীঘ্র অকর্ম্ম্য হইয়া পড়িবে।
তবেই আমাদের জৈব অঙ্গ এমন হওয়া আব-
শ্যক যে, (১) পাকযন্ত্রের সমুদয় যন্ত্রগুলিই
স্ব স্ব কর্ম পাইবে এবং (২) কোন যন্ত্রকেই
অতিরিক্ত কাজ করিতে হইবে না। অর্থাৎ
ভোজ্য অম্লের কেবল উপাদান দেখিলেই
চলিবে না। তাহা স্থপাচ্য কি না, তাহা
দেখা আবশ্যক। নতুবা দুর্ভিক্ষের সময় বনের
লতা পাতা খাইলে চলিতে পারিত।

অনেক পবীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, আমা-
দের ভোজ্য নাইট্রজের, কার্বনাইড্রেট এবং
তৈল পদার্থত্রয়ের পরস্পর অনুপাত ১.৩;
৩.৫ : ১ হইলে দেহস্থ অচ্যুত চলিতে থাকে।
আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তৈল পদার্থের
পরিমাণ কিছু কম করিয়া তৎপরিবর্তে কার্ব-
নাইড্রেট গ্রহণ করিলে কোন ক্ষতি হয় না।
একজ্ঞ আমরা ১ : ৫ : ৪.৫ : ১ অনুপাতে ঐ
তিন পদার্থ গ্রহণ করিতে পারি। রাসায়নিক
বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যায় যে, এমন কোন
একটি খাদ্য নাই, যাহাতে ঐ তিন পদার্থের
অনুপাত ঐ প্রকার। একজ্ঞ আমাদেরকে
ঐ তিন রকম পদার্থ মিশাইয়া খাইতে হয়।

দৈনিক অম্লের ব্যবস্থা করিবার সময়
কোন পদার্থে কত কার্বন, কত নাইট্রজ
আছে, তাহার হিসাব করিয়া খাওয়া চলে
না। একজ্ঞ আর একটা সহজ উপায় করা
উচিত। ঘৃত তৈলের উপাদান এবং পোড়া-
ইলে কত তাপ জন্মে, তাহা বিচার করিয়া
দেখা গিয়াছে যে, ১ ভাগ ঘৃত তৈলাদি
পদার্থ ২.৩ ভাগ কার্বনাইড্রেটের জ্বল্য

ফল দেয়। এতদনুসারে আমাদের জৈব অন্ন দুই ভাগ বিভক্ত করা চলে। যথা, (১) নাইট্রজেন ও (২) কার্বোহাইড্রেট। উপরের লিখিত আমাদের তিন প্রকার জৈব অন্নের অনুপাত ভাঙ্গিলে দেখা যায় যে, নাইট্রজেন ও কার্বোহাইড্রেটের অনুপাত ১: ৪৪ কিম্বা ১:৫ রাখা উচিত। এই অনুপাতে নাইট্রজেন ও কার্বোহাইড্রেটের কার্বন ও নাইট্রজ হিসাব করিলেও আসে। ইহাদের অনুপাতকে পুষ্টিদ অনুপাত বলা যাইবে।

নিম্নে আমাদের প্রচলিত কয়েক প্রকার জৈব অন্নের স্থূল উপাদান দেখান গেল। প্রত্যেক পদার্থের শতভাগে কোন্ পদার্থ কত আছে এবং তৈল পদার্থকে কার্বোহাইড্রেটে পরিণত করিয়া নাইট্রজেন ও মোট কার্বোহাইড্রেটের পুষ্টিদ অনুপাত দেওয়া গেল।

নাইট্রজেন কার্বোহাইড্রেট তৈল পুষ্টিদানুপাত				
আরারুট	০.৮	৮৩.৩	—	১:১০.৪
মাগুরা চাউল	৭.৩	৭৩.২	১.৫	১:১৩
চাউল	৭.৩	৭৮.৩	০.৬	১:১০.৮
আলু (নূতন)	২	২১	০.২	১:১০.৭
জন্মার	৯.৫	৭০.৭	৩.৬	১:৮.৩
জোয়ার	৯.৩	৭২.৩	২.০	১:৮.৩
ষবের ছাতু	১১.৫	৭০.০	১.৩	১:৬.৩
ওট (oats)	১০.১	৫৬.০	২.৩	১:৬
চীনের বাদাম	২৪.৫	১১.৭	৫০.০	১:৫.২
গম	১৩.৫	৬৮.৪	১.২	১:৫.২
গুড়গুড়	১৮.৭	৫৮.৩	৫.২	১:৩.৮
কুশিাক	১.৮	৫.৮	০.৫	১:৩.৮
বুটের দাইল	২১.৭	৫২.০	৪.২	১:৩.১
অড়র দাইল	২২.৩	৬০.৯	২.১	১:৩
মাষ কলাই *	২২.২	৫৪.১	২.৭	১:২.৭

* কলাইর খোসা বাদ দিলে নাইট্রজেন ও কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কিছু অধিক হয়। কিন্তু একশ শতভাগে ১১.২ ভাগ মাত্র।

কুলথ কলাই	২২.৫	৫৬.০	১.৯	১:২.৭
মসুর দাইল	২৫.১	৫৮.৪	১.৩	১:২.৫
মুগ কলাই	২৩.৮	৫৪.৮	২.০	১:২.৫
শিম	২০.০	৫৫.০	১.৯	১:২.৫
বরবটা কলাই	২৩.১	৫৫.৩	১.১	১:২.৫
খেড়ী কলাই	২৩.৮	৫৬.৬	০.৬	১:২.৫
মটর	২৮.২	৫৫.০	১.৫	১:২.৪
খেসারী	৩১.৯	৫৩.৯	০.৯	১:১.৭৫
ঝিনুক	১১.৭	—	২.৪	১:০.৮
মৎস্ত	১৮.১	—	২.৯	১:০.৪
পক্ষীমাংস	২১.০	—	৩.৮	১:০.৪
ডিম্ব	১৩.৫	—	১১.৬	১:২
ঐ শ্বেতাংশ	২০.৪	—	—	১:০
ঐ পীতাংশ	১৬.	—	৩০.৭	১:৪.৪
ছাগ ও মেষ মাংস				
মেদহীন	১৮.৩	—	৪.৯	১:০.৬
মেদযুক্ত	১২.৪	—	৩১.১	১:৫.৮
গো দুগ্ধ	৪.১	৫.২	৩.৯	১:৩.৫
সর	২.৭	২.৮	২৬.৭	১:২৪
ছানা (ননীতোলা) ৪৪৮	—	—	৬.৩	১:০.৩
ঐ (ননীযুক্ত) ৩৩৫	—	—	২৪.৩	১:১.৭

এই তালিকা দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, এমন কোন একটি খাদ্য নাই, যাহা আমাদের আবশ্যিক কার্বন ও হাইড্রজেন দিতে পারে। এ জন্য দুই তিনটি খাদ্য মিশাইয়া খাইলে হয়। গমে আর একটু তৈল পদার্থ থাকিলে উহা উৎকৃষ্ট অন্ন হইতে পারিত। ঐ অভাব পূরণ নিমিত্ত রুটী বা লুচীর আকারে স্বতঃ সংযুক্ত করা হইয়া থাকে। ভাতে তৈল পদার্থ আরও কম। এজন্য উহাও স্বতঃ সংযুক্ত করিয়া খাইবার রীতি আছে। কিন্তু এক্ষণে পুষ্টিদানুপাত আরও কম হয়। তাহা ছাড়া, আমরা ভাত রাঁধিবার সময় উহার কেবল কেন্দ্রীয় দিকে

ফেনের সঙ্গে উহার ফক্ষর চঙ্গিরা যায় এবং নাইট্রজেন পদার্থও কিঞ্চিৎ নষ্ট হয়। একে চাউলে ধাতব পদার্থের অত্যন্ত অভাব, তাহাতে যাহা কিছু আছে, তাহাও ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে। * এজন্ত যেমন “পোড়ের ভাত” কিম্বা খিচড়ি বা পোলা-ওতে পরিমিত জল দিয়া ভাতে ফেন হইতে দেওয়া হয় না, তেমন কবির ভাত রাধি-বার রীতি হইলে ভাল হয়। যাহা হউক, দেখা গেল, কেবল ভাত খাইলে আমরা আবশ্যক উপাদান পাই না।

গম অপেক্ষা বিলাতী ওট উৎকৃষ্ট অন্ন। উহাতে আবশ্যক পদার্থ প্রায় আবশ্যক পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু এদেশে ওটের চাষ অল্পই হইয়া থাকে। জনার, আড়ুরা, জোয়ার প্রভৃতি অন্নগুলি চাউল, ময়দা, বঙ্গোপাত্তর মত সুপাচ্য নহে। দাইলের মধ্যেও তেমনই প্রভেদ আছে। একথা সকলেই জানেন। কিন্তু লোকে ভাতের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ দাইল পায় কি? শাক ভাত খাইরা আমাদের অনেকে জীবন ধারণ কবে। কিন্তু শাকে অল্পই সার পদার্থ আছে। কপির উপাদান দেখিলেই কথাটা বুঝা যাইবে।

এখন কয়েক প্রকার প্রচলিত অন্নের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করা যাউক। প্রথমে দাইল রুটী লওয়া যাউক। মনে করুন, এক সের আটা, ১০ ছটাক ঘৃত এবং ১০ পোয়া বুটের দাইল লইয়া কেহ অন্ন প্রস্তুত করিতে চান।

বিশেষ্য, নাইট্রজেন কার্বহাইড্রেট তৈল।
৮০ তোলা আটার + ১০৮ ৫৪.৭ ১ তোলা

* সিদ্ধ চাউল স্থপাচ্য বটে কিন্তু তাৎপ চাউল অপেক্ষা ভাঙিতে কক্ষর আরও কম পড়ে।

+ ঘৃত এবং বুটের আটা কিম্বা ময়দার মধ্যে উপাদানের একই প্রভেদ আছে। গম অপেক্ষা আটার

২০ " বুটের দাইলে ৪.৩ ১১.৮ ০.৮ ঐ
৭.৫ " ঘৃতে — — ৭.৫ "

অম্লপাত ১.৬ ৭ ১

আবশ্যক অম্লপাত ১.৫ ৪.৫ ১

সুতরাং ঘৃতাদির অম্লপাত প্রায় ঠিক দেখা যাইতেছে। ১ ভাগ ঘৃত ২.৩ ভাগ কার্বহাইড্রেটের তুল্য ধরিয়া দেখা যায়, নাইট্রজেন ও কার্বহাইড্রেটের অম্লপাত ১:৫.৮ হয়। সুতরাং এদিকেও এই প্রকার অন্ন উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে।

আটার রুটী অপেক্ষা কেবল লুচী ভাল নহে। ১ সের ময়দার লুচী করিতে ১০ পোয়া ঘৃত লাগিলে

নাইট্রজেন কার্বহাইড্রেট তৈল।

১ সের ময়দায় ১১ ৫৫ ১ তোলা

১০ পোয়া ঘৃতে — — ২০ ৯

অম্লপাত ১ ৫ ২

পুষ্টিদাম্পাত ১:৯।

সুতরাং কেবল লুচী কোন দিকেই ভাল নহে। উহার সঙ্গে দাইল বা অপর কোন নাইট্রজেন প্রধান খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য।

আর কয়েকটি প্রসিদ্ধ অন্ন বিচার করা যাউক। প্রথমে নিরামিষ ভোজীর খিচড়ী দেখা যাউক।

নাইট্রজেন কার্বহাইড্রেট তৈল।

চাউল ১ সেরে ৫৮ ৬২.৬ ০.৫ তোলা

ময়দার দাইল ১ সেরে ২০.১ ৪৩.৭ ১.০

ঘৃত ১০ পোয়া — — ২০.০ ৯

অম্লপাত ১.২ ৫ ১

পুষ্টিদাম্পাত ১:৬

এবং আটা অপেক্ষা ময়দার নাইট্রজেনের ভাগ একটু কম পড়ে।

নিবামিষভোজীৰ জন্ত

চাউল ১ সেব	৫৮	৬১	৬	০	৫	”
মুগেৰ দাটল ১০ পোয়া	৪৮	১১	০	০	০	৪
স্বত ১০ ছটাকে	—	—	—	—	৫	০
ছন্ধ ১০ সেরে	৪	১	৫	২	৩	৯
	১১	৭	৭৮	৮	৯	৪৪

অমুপাত ১৬ ৮৩ ১

পুষ্টিদানুপাত ১৬১

নিবামিষভোজীৰা ছন্ধ এৰু ছন্ধ হইতে জাত স্বত ছানা দৰি বাদ দেন না। এ গুণা আমিষাৰ না হইয়া নিবামিষা হইল কেন, বলিতে পারি না, যাহা হউক, মংসোৰ, মাংসেৰ এৰু নিবামিষ-ভোজীৰ জন্য ছানাৰ পোলাও উৎকৃষ্ট খাদ্য।

১১০ সেব চাউলে ৮৭ ৯৩৯ ০৭ ভোলা

১১০ সের মংস বা

১০ সের মাংস বা

১১০ সেব ছানাৰ ২২০ — ৩০ ”

১০ পোয়া স্বতে — — ২০০ ”

৩০৭ ৯৩৯ ২৩৭ ”

অমুপাত ১৩ ৪ ১

পুষ্টিদানুপাত ১৪৮

কিন্তু অনেক খিচড়ী পোলাওকে গুৰুপাক অন্ন বলিয়া থাকেন। অবস্থা বিশেষে উত্তৰা গুৰুপাক বটে। যে ব্যক্তিৰ প্ৰত্যাহ আবারুট খাওয়া অভ্যাস, তাহার পক্ষে নাইটুজৈত কিম্বা স্বতের পরিমাণ একটু অধিক হইলে দুপাচা হইবার কথা। তাহা ছাড়া আরও কথা আছে। অনেকে একপ উৎকৃষ্ট খাদ্য ভাতের মত আকর্ষণ খাইয়া বসেন। মাংস খাইতে হইবে, তাহাকে নানাবিধ মসলা দিয়া পাক করিয়া এক বাটা পূর্ণ মাংস খাইয়া বসেন। বস্তুতঃ উৎ-

কৃষ্ট অন্নের এই এক গুণ যে, শরীর রক্ষার্থ কিম্বা শারীরিক পশিশ্রম-জনিত ব্যায় নিৰ্ব্বাহ নিমিত্ত উদর পরিপূর্ণ করিয়া খাটবার প্রয়োজন হয় না। অনেকে দশটার সময় ভাতে জলে এমন এক পেট খাইয়া থাকেন যে, অফিসে যাইতে তাহাদের প্রাণান্ত ঘটে, অবশ্য আহাৰেৰ পৰক্ষণেই শাৰীৰিক কাজ কৰা উচিত নহে। কেন না, তখন আভ্যন্তর কাজ বেগে চলিতে থাকে। এ সময় বাহ্য কাজ কৰিতে সহজেই শক্তিৰ অভাব ঘটে।

খাদ্য সম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে। আজ কাল কেহ কেহ সন্দেশ মিঠাইর প্ৰতি খজাহস্ত হইবাছেন। সবিশেষ বিবেচনা কৰিয়া ছানাৰ সন্দেশ কিম্বা দাইলেৰ মিঠাই পরিত্যাগি করিয়াছেন বলিয়া বোঝ হয় না। কেন না, সন্দেশ মিঠাই কেবল যে ক্ষিপ্তাৰ প্ৰীতিক, এমন নহে, উহা অৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য। কেহ কেহ মিঠামে চিনি থাকে বলিয়া মনে কয়েন যে, বৃক্ষিবা চিনি খাইলে মধুৰমহ বোগ জন্মিবে। কেহ বা মনে করেন যে, সাহেববা যখন মিঠাই খান না, তখন উহা ভাল জিনিস হইতে পারে না।

দেশে এটা দুৰ্গতি বলিতে হইবে। কেন না, পূৰ্ব্বাপেক্ষা বিলাতে চিনিৰ ব্যবহাৰ ক্ৰমশঃ বাড়িতেছে। * পূৰ্বে সেখানে কম ছিল, কাৰণ চিনি তত সুলভ ছিল না। বস্তুতঃ চিনি যত সহজে দেহসাং হয়, অল্প কোন খাদ্য তত সহজে হয় না। বালক-গণের পক্ষে চিনি এই কারণে একটা উপাদেয় খাদ্য হইয়াছে। যে খাদ্যটি খাইতে ভাল লাগে, তাহা অহিতকৰ হইবে কেন ?

* সাহেবদের মিঠাই আশ্বাসের মিঠাই অপেক্ষা কম মিষ্ট মনে।

তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে বলিতে হয়, প্রকৃতির নিয়মের উপরে মানুষ উঠিয়াছে। বার্ষিক দুগ্ধপায়ী শিশুদিগের দুগ্ধে একটু চিনি মিশাইয়া দিলে দুগ্ধের নাইট্রজেন ও কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ আবশ্যকমত হয়, এবং তৎসঙ্গে দুগ্ধ পান করিতেও শিশুরা আনন্দ অনুভব করে। অত্ৰদিকে, শিশুরা দ্রুত পদার্থ খাইতে ভাল বাসে না। সুতরাং তাহাদিগকে জোর করিয়া দ্রুত খাওয়ান উচিত নহে; দেখিতে গেলে, প্রোট বৃদ্ধি গণের দ্রুত ভোজন দ্বারা উপকাব হয়।

দুগ্ধের উপাদান দেখিলে জানা যায় যে, শুধু দুগ্ধ গলাধঃ করা অপেক্ষা, তাহাতে ভাত কিম্বা সের প্রতি প্রায় ৭০ গোল চিনি মিশাইয়া খাইলে পরিপাক করিবার পক্ষে সুবিধাজনক হয়। এজন্য কেহ কেহ গো বৎসের শুদ্ধপান দেখিয়া তাহার মত অল্প অল্প করিয়া দুগ্ধপান করিতে বলেন। যাহাদের দুগ্ধ পরিপাক হয় না, তাঁহারা এই প্রকারে দুগ্ধপান করিলে দুগ্ধ পরিপাক করিবার অভ্যাস করিতে পারেন। ইহা সাধারণ নিয়ম বলা যাইতে পারে যে, কেবল নাইট্রজেন বা কোন কার্বহাইড্রেট বা কেবল তৈল পদার্থ না খাইয়া সকলগুলি যথোচিত পরিমাণে মিশাইয়া খাইলে জীর্ণ করিবার সুবিধা হয়। এতদনুসারে ভাতে দাইল মাখিয়া খাইবার রীতি চলিত আছে। এক বেলা ভাত অল্প বেলা মৎস্য বা মাংস না খাইয়া, ভাতের সঙ্গে মাংসাদি খাইলে ভাল। আমরা তাহাই করিয়া থাকি।

অল্পের উপাদানের অনুপাত দেখিয়া উহার ব্যবস্থা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু অত্যধিকের কি পরিমাণ আহার করা কর্তব্য, তাহা নির্দেশ করা তত সহজ নহে।

সহজ না হইবার কারণ এই যে, আমাদের ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ ঠিক জানিতে পারা যায় না। বাহিরে কত শক্তি কাজে লাগাই, তাহা পরিমাণ করিতে পারিলেও, শরীরের তাপ রক্ষার্থ এবং অভ্যন্তরে বস্তু সমূহের কার্যাব নিমিত্ত কতখানি শক্তির প্রয়োজন। তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যাহা হউক, দেখা যায় যে, (১) শীতকালে যত শক্তি আবশ্যক, গ্রীষ্ম কালে তত আবশ্যক হয় না; (২) গুরু পরিশ্রম করিতে যত আবশ্যক, লঘু পরিশ্রম করিতে বা আলস্তে দিন কাটাইতে তত আবশ্যক হয় না; (৩) ভারী দেহীর শক্তির পরিমাণ যত আবশ্যক, লঘু দেহীর তত নহে।

আবার, মানুষের দেহের দৈর্ঘ্যানুসারে দেহের ভাব না থাকিলে ক্ষীণ দেখায়। গড়ে ফুট প্রতি শরীরের ভার ১৩০০ সের হইলে দেহ সুন্দর দেখায়। এইরূপে, যে ব্যক্তির দেহ ৫৫০ ফুট লম্বা, তিনি ১৬৪ মণ হইলে তাঁহাকে নাতিস্থল নাতিক্ষীণ দেখায়।

কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ অনুপাত অল্প লোকেরই দেখা যায়। জেলখানায় এই হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। পাঁচ ফুট ১/২ মণ হইয়া পাঁচ ফুটের পর দৈর্ঘ্য যত ইঞ্চি হয়, তত ১৫০ সের যোগ করা হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায়, ৫৫০ ফুট দীর্ঘ লোক ১৮ মণ পড়ে। সাহেবদের ওজন গড়ে ১৬৩ মণ ধরা হইয়া থাকে। আমাদের দেশের লোকদের দেহের ওজন গড়ে ১৮ মণ মাত্র। সুতরাং সাহেবদের তুলনায় আমাদের কাজের এবং আহারের পরিমাণ কম হইবে।

কাজ পরিমাণ করিতে হইলে, কাজের একটা একক নির্দেশ করা আবশ্যক। ১ মণ ভারী জিনিস ১ হাত উচ্চে তুলিলে যে কাজ

হর, তাহাকে কাজের একক ধরা গেল। ইহাকে এক মণ-হাত কাজ • বলা যাইবে। এখন দেখা যায়, ১১৪ মণ ভারী কোন লোক ২০ মাইল হাঁটিয়া গেলে তাহার ৫৪০০ মণ-হাত কাজ করা হয়। কিন্তু প্রত্যহ ২০ মাইল পথ চলা আমাদের দেশের কয় জন লোক পারে? গড়ে প্রত্যহ ১৫ মাইল ধবিলে আমাদের পক্ষে মন্দ কাজ হয় না। এতদ্বারা প্রত্যহ ৪,৪০০ মণ-হাত কাজ হয়। অর্থাৎ দেহের ভাবের সের প্রতি ৭০ মণ-হাত মাত্র কাজ হয়। এরূপ কাজ জেলখানার কয়েদী-দিগকে প্রত্যহ করিতে হয়; দেখা যায় যে, সকল কয়েদীকে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা-দেব দৈনিক অঙ্গের পরিমাণ এই—চাউল ৮/০ ছটাক, দাইল ১/০ ছটাক, তৈল ১০ তোলা, লবণ ১১০ তোলা, তরকারী ১/০ ছটাক।

খুন, তেল, তরকারী বাদ দিয়া চাউল ও দাইলের + পরিমাণ দেখিলে জানা যায় যে, প্রত্যেক কয়েদী প্রায় পোণে ২ ছটাক নাইট্রোজেন এবং বার ছটাক কার্বহাইড্রেট খাইয়া থাকে। উভয়ের অনুপাত ১ : ৭ এবং মোট ওজন পোণে চৌদ্দ ছটাক।

বেহারী কয়েদীর ক্ষুদ্র ৮/ ছটাক চাউল না হইয়া ১০ ছটাক চাউল এবং ১/ ছটাক গমের আটা কিম্বা ১০ ছটাক জনারের ছাতু নির্দিষ্ট আছে। ইহা ব সঙ্গে দাইল ১/০ ছটাক লইয়া উপাদান হিসাব করিলে, নাইট্রোজেন প্রায় পোণে দুই ছটাক এবং কার্বহাইড্রেট দশ ছটাক পড়ে। তৈলের অনুপাত ১ : ৫১০ এবং মোট ওজন প্রায় বার ছটাক।

যিনি যাহাই বলুন, জেলখানার কয়েদী-

দিগের যে প্রকার আহারের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে তাহাদের শরীর শীর্ণ হইবার কথা নহে। বরং কোন কোন স্থানে কয়েদীদিগের শরীর বলিষ্ঠও হইতে দেখা যায়। আমাদের দেশের সাধারণ লোকে যে রূপ খাইয়া থাকে, জেলখানার কয়েদীদিগকে তদপেক্ষা কম বা নিকৃষ্ট অন্ন দেওয়া হয় না। আমাদের দেশে কয়জন লোকে প্রত্যহ ১/০ ছটাক + দাইল বা তদনুরূপ মংগু বা মাংস খাইয়া থাকে? খুন লক্ষা, বা শাক বা দিয়া ১ সের চাউলের ভাত খাইলে নাইট্রোজেন ও কার্বহাইড্রেটের অনুপাত ১ : ৭ হয় না।

যে ব্যক্তিব ওজন ১১৬ মণ, তাহার পরি-শ্রম অনুসারে কেহ কেহ এই প্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। (ক) আদৌ পরিশ্রম না করিলে, (খ) অল্প পরিশ্রম করিলে, এবং (গ) ক্ষুদ্র পরিশ্রম করিলে, * নাইট্রোজেন কার্বহাইড্রেট তৈল। *

(ক)	৫.৭	২০.১	২ তোলা
(খ)	৭.২	৩৩.৫	৩.৮ ,,
(গ)	৯.৭	২৯.৯	.৭ ,,

তৈলকে কার্বহাইড্রেটে ভাজিয়া নাইট্রোজেন ও মোট কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ এইরূপ দেখা যায়।

নাইট্রোজেন কার্বহাইড্রেট।

(ক)	৫.৭	২৪.৭ তোলা।	মোট ৩০.৪ তোলা
		বা ১০/৬ ছটাক	অনুপাত ২:৪.৩
(খ)	৭.২	২০.৬ তোলা।	মোট ২৭.৮ তোলা
		বা ১১/০ ছটাক	অনুপাত ১:৫.৩

* মটর দাইল লইয়া হিসাব করা গেছে। মধ্যে কয়েদীদিগকে মংগু, মাংস এবং দুই নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। এরূপ স্থলে ইহাদের ১/০ ছটাক দিলে ১০ দাইল কয়েদীদিগের খাদ্যক।

* ১৮ মণ-হাতে ১ foot-ton ধরা গেল। ১ হাত ১ হাত = ১ metre করিলে জুল হয় না।

(গ) ২.৭ ৪৫.৩ তোলা। মোট ৫৫ তোলা
বা ৪৮/০ ছটাক
অনুপাত ১:৪.৭

তবেই জলশূন্য নাইট্রোজেন ও কার্ব-
হাইড্রেট ১০।১২ ছটাক খাইলেই স্বচ্ছন্দে
চলে। এইরূপ ১৬/০ ছটাক অন্ন খাইয়া
থাকিতে হইলে কেবল প্রাণ রক্ষা করা হয়
মাত্র। এই সকল পরিমাণের সহিত নিম্ন-
লিখিত দৈনিক আহারের পরিমাণ তুলনা
করুন। কোন ভ্রমলোক প্রত্যহ এই প্রকার
আহার করিয়া থাকেন।

নাইট্রোজেন কার্বহাইড্রেট

চাউল ১৬/০ ছটাক	২.২	২৩.৭ তোলা
মুগদাইল ৮/০	১.২	৩.০
মংগ্র ৮/০	১.৮	০.৩
ছদ্ম ৮/১ সের	৩.৩	১১.২
ছানার সন্দেশ ৮/০ ছটাক	০.৫	৩.৩
স্বত তৈল ৮/০	—	১১.৫
সরকারী—		

১১.০ ৫৩.০ তোলা

উভয়ের অনুপাত ১: ৪.৭। মোট ওজন
৮৮/০ ছটাক, ইহার শরীরের ওজন ২/ মণের
অধিক। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম করেন না
বলিয়া আহারের পরিমাণ অধিক বলিতে
হইবে। তবে, ভ্রমলোকে আহারের সময়
পাত পুঁচিয়া খায় না।

পরিমাণ বাহাই হউক, কার্বহাইড্রেট ও
নাইট্রোজেনের অনুপাতের দিকে একটু লক্ষ্য
রাখা কর্তব্য। ভেতো বাঙ্গালীর পক্ষে
কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ সহজেই অধিক
হয়। উহার সহিত নাইট্রোজেন পদার্থের
মিশ্রণ আবশ্যিক। কিন্তু নাইট্রোজেন পদা-
র্থের এক প্রয়োজনের কারণ কি? কারণ
এই, এতদধিক কার্বহাইড্রেট বা তৈল দ্বারা

শরীর-কর পূরণ হয় না। অবশ্য নাইট্রো-
জেন পদার্থেও শক্তি আছে। বস্তুতঃ ১ গ্রাম
তৈল পদার্থ ২.২ নাইট্রোজেন এবং ২.৩ কার্ব-
হাইড্রেটের তুল্য শক্তি প্রদান করিতে
পারে। অর্থাৎ ঐ তিন পদার্থ হইতেই
শরীরে তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীরের
দৈনিক তাপ ব্যয় অন্ন নহে। কাজের
হিসাবে, ঐ তাপের পরিমাণ প্রায় ৫৪,০০০
মণ হাত এবং প্রাত্যহিক ভুক্ত অন্নের শক্তি
হইতে প্রায় ৬১,২০০ মণ হাত কাজ পাওয়া
যাইতে পারে। অতএব ৭২০০ মণ-হাত
কাজের শক্তিদ্বারা দেহের আভ্যন্তর ও বাহ্য
ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে।

দেহের শক্তিরূপ আয় ব্যয় দেখা গেল।
রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে আহার তত্ত্ব বুঝিতে
চেষ্টা করা গেল। কিন্তু মানবদেহ রাসায়ন-
নিকের সূক্ষ্ম তুলা-যন্ত্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম।
রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা যে পদার্থ ধরা
যায় না, শরীরগত হইতে তাহাকে দেহব্যয়
জানিতে পারে। এই সকল কারণে কেহ
বা আতপ চাউলের ভাত, কেহ বা নূতন
চাউলের ভাত জীর্ণ করিতে কষ্ট বোধ
করেন। কিন্তু রাসায়নিক বিচার তাহা
সূক্ষ্ম না হইলেও এতদ্বারা ভোজ্য বস্তুর
স্থূল নিরূপণ হইতে পারে। তাহার সাহায্যে
দেখা গেল, সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্য আজ
কালকার কঠিন জীবন সংগ্রামের পক্ষে
উপযুক্ত নহে। এখানে নিরামিষ ভোজন
ভাল, না আমির তক্ষণ ভাল, তাহার কথা
হইতেছে না। কেবল কার্বহাইড্রেটের
তুলনায় নাইট্রোজেন পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি
করিতে বলা যাইতেছে। শাক ভাত খাইয়া
একজন স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া আছে, এ কথা
ইহার বিপরীত প্রমাণ হইল না। কার্বহাইড্রেট

ছায়াও শরীর গঠিত হয়। তবে, পরিশ্রমী লোকের দেহে নাইট্রজেন পদার্থ যত সহজে দেহসাৎ হয়, কার্বোহাইড্রেট তত সহজে হয় না, এবং প্রাণিজ নাইট্রজেন যত সহজে হয়, উদ্ভিজ নাইট্রজেন তত সহজে হয় না।

আব একটি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া যাক। সে দিন এক ব্যক্তি দেশের লোকের মূৰ্ত্তা দেখিয়া দেখিয়া দুঃখ করিতেছিলেন। এই মহার্য আটা চাউলের দিনে লোকে সস্তা আলু খায় না দেখিয়া তাঁহার দুঃখ। চাউলেব সের ১০ আনা, আলুব সের ১০ আনা। স্থূল দৃষ্টিতে আলু সস্তা বোধ হয়। কিন্তু মনে বাধা উচিত যে, নূতন আলুতে ৮০ আনা জল এবং শুষ্ক চাউলে ১০ আনা মাত্র। তবেই এই হিসাবে ১ সের চাউলের দাম ১/৫ পরসী, কিন্তু আলুব সের ১০ আনা পড়ে। অত্ৰ দিকে দেখুন, ১ সের চাউলের ভাত রান্ধিলে জলযোগে তাহা ২১০ সের হয়। কিন্তু ভাতে যে পরিমাণ সাব থাকে, কাঁচা নূতন আলুতে প্রায় সেটরূপ। সুত্বাং ভাত এবং নূতন আলুর পুষ্টিকারিতা এক

রূপ। এখানে আমরা হিসাব করিয়া বাহা দেখিলাম, সাধারণ লোকের তাহা অজ্ঞাত নহে।

এইরূপ, দাইল অপেক্ষা মৎস্য মাংস উৎকৃষ্ট হইলেও, উহাদের মূল্য কখনও দাইলের সমান হইবে না। দাইল ১০ আনা সের এবং মৎস্য ১০ আনা সের হইলেও মৎস্য মহার্য হইল। কেনন, জল বাদে ১০ আনায় ৮০০ ছটাক দাইল পাওয়া গেল, কিন্তু ১০ সেরের অধিক মৎস্য পাওয়া গেল না।

ভেতাবাঙ্গালী দুর্নীতি তাই মিথ্যা নহে। বেহারী কয়েদী বাহা খায়, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী কয়জন খায়? কেহ যেন বলিয়া-ছিল যে, আমাদের দেশের লোকেরা অর্ধা-শনে থাকে। কেন না, দুইবেলা পেট ভরিয়া, ভাত পায় না। কিন্তু এক পেট ভাত খাই-লেই পূর্ণাশন হইল, বলিতে পারা যায় না। সাহেবদের দেহের ওজন, কাজ করিবার শক্তি আমাদের অপেক্ষা অধিক হয় কেন?

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

খোকার বিলাতের পত্র । (২)

শ্রীশ্রীচরণ কমলেশু—

এ খিড়কনা কেন, বৃষ্টি না। কোন কালে ছই ছত্র সাজাইয়া লেখা অভ্যাস নাই, আমার উপরেই সেই ভার! বিলাতের পথে যে আসে, সেই একটু না একটু কিছু লিখিয়া থাকে। আমার পাগলামি, আমিও আরম্ভ করিয়াছি! এক ত তোমরা বারে বার আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনিতে চাহিয়াছ, তাতে আমার আমার মনের ইচ্ছা যোগ দিয়াছে। এত দুঃখ সমস্ত জিনিষ দেখি-

য়াছি, এত প্রকার লোকের সহিত মিশি-য়াছি, এত উপভোগ করিয়াছি, বোধ হয় জীবনে আর করিব কিনা, জানি না। এই সমস্তের আশ্বাদন তোমরা পাও নাই, ইহাতে বড়ই আমাকে দুঃখ দিয়াছে। এখনই কোন আশ্চর্য্য জিনিস দেখিয়াছি, অমনই মনে হইয়াছে, আহা, বাড়ীর সকলে যদি থাকিত, দেখিতে পাইত। তাহা বধন হয় নাই, আমি আমার পোড়া লেখনী দ্বারা তোমাদিগকে সেই স্থানে বসায়মান করিতে প্রয়াস পাই-

তেছি। তোমরা ইহা পাঠ করিয়া, সেই সমস্ত স্থানে ও সেই সমস্ত অবস্থায় থাকিয়া যে উপকার ও যে অতিজ্ঞতা পাইতে, সেখানে না থাকিয়া বাহাতে তাহা পাইতে পাব, এই আমার অভিলাষ। কি উচ্চ আশা। সাধারণে জানিলে না জানি কত হাঁসিবে! এই পাশ্চাত্য জগতে ঐ ব্যবহার নাই। পাঠ যোগ্য হইলে শিশু বা কি, যুবাই বা কি? অপাঠ্য প্রবীণের বচনও হান্তস্পন্দ।

২২শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, প্রায় দশটা কি এগাবটাব সময় স্নয়েজে পৌঁছিলাম। এখানে জাহাজ বেশীকণ থামিবে না। আমাদের জাহাজের খালে ঢুকিবার পালা আসিলেই ছাড়িবে। যদিও আমাদের জাহাজে ফবাসী মেল ছিল, এবং আমাদের জাহাজ ফবাসীদের, তবু আমাদের প্রায় ঘণ্টা দুই তিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ফরাসী জাহাজ বলাব অর্থ এই যে, স্নয়েজ খাল কোম্পানী ফবাসীদের, কোন ফবাসী ইঞ্জিনিয়ার ইহা নির্মাণ করেন। শুনিয়াছি, পূর্বে নাকি স্নয়েজে আর একটি খাল ছিল। এখনও তাহার অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। এই খাল নীল নদের সহিত লোহিত সমুদ্রকে সংযুক্ত করিত। মিশর যখন স্বাধীন ছিল, তখন এই খাল আরম্ভ করা হয়। নেকো (Necho) নামক কোন শিল্পী এই কার্য ভার প্রাপ্ত হন। ইহা আজ প্রায় ২৫০০ হাজার বৎসরের কথা। দরিয়জ (Darius) নামক জনৈক কৃতবিদ্ব ব্যক্তি ইহা সম্পূর্ণ সমাধা করেন। (Herod ii, 157) এই স্থান কেবলই বাসুকামর, প্রস্তরময় (Sandstone) মধ্যস্থলে করেকটা হ্রদ আছে। এই স্থানের জল এখনই লবণাক্ত যে, ইহাদের নাম কট হ্রদ (Bitter lakes) হইয়াছে। এই

হ্রদগুলির উত্তরে আরও হ্রদ আছে। আমাদের জাহাজ মধ্যস্থলে দাঁড়াইল। স্নয়েজ খালে যেখানে প্রবেশ করা যায়, তাহাকে তেওফিক বন্দর কহে। এখন আমবা বন্দরের এক মাইল দূরে। স্নয়েজ-সহর আবও দূরে, প্রায় দেড় ক্রোশ দূর। দূরে আমরা ঐ সমস্ত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দেখিতেছি, ঐ ধুমু কবিত্তেছে, ঐ সহর।

এখানে দেখিবার বড় একটা কিছু নাই। এসিয়ার দিকে মুখাব কুরা Moses' wells আছে, সে অনেক দূর। জাহাজ কখন ছাড়ি, ঠিক নাই, আমবা তাই নামিলাম না। জাহাজের উপর হইতে যতদূর সম্ভব, উপভোগ করিতে লাগিলাম। এখান হইতে বীতিমত ইসমাইলিয়া, কাইবো এবং আলেকজান্ডারিয়াব জন্ত ট্রেন ছাড়ে। আমরা অপরাহ্নে, প্রায় দুইটাব সময়, খালে প্রবেশ করিলাম। খালটী বড়ই সৰ্ব। একখানি জাহাজের বেশী আসা যাওয়া কবা অসম্ভব জাহাজ থেকে, মনে হয়, যেন পাবে লাক দিয়া পড়া যায়। আফ্রিকা উপকূলেই প্রায় সমস্ত ষ্টেশন। ষ্টেশন অত্যন্ত নিকটে। এক হইতে অপব প্রায়ই দেখা যায়। ষ্টেশনগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। বহু যন্ত্রে সুন্দর বৃক্ষ সমূহ পালিত হইয়াছে। যে স্থান দিয়া জাহাজ বাইবার কথা, অর্থাৎ যে স্থল সর্কিপেক গভীর, সেই স্থল লোহ-স্তম্ভ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

খাল সাধারণতঃ তিন প্রকার। কতকগুলি খাল উচ্চ ভূমির মধ্য দিয়া গমন করে। এই অবস্থায় নানা প্রকার কল কজা দ্বারা জল রক্ষিত হয়। যেমন আমাদের মেদিনীপুরের খাল, সেখানে কত লোকের প্রয়োজন হইয়াছে। এই সমস্ত খাল সম্ভী

বিত বাখিবাব জন্ত কোন স্বাভাবিক হ্রদ বা জন্ত কোন জলের আকরের প্রয়োজন। অপব কোন প্রকার স্বাভাবিক উপায়ে কাষ্যসিক্তি না কবিতে পাবিলে, অগত্যা অস্বাভাবিক উপায়ে চৌবাচ্চা (Reservoir) সমস্ত প্রস্তুত কবিতে হয়। জল আকর্ষণ-মন্ত্রের প্রয়োজন হয়। ফ্রান্সের Lanquedoc Canal, অথবা স্কটলণ্ডের Caledonian Canal এই এই প্রকার খালের সুন্দর উদাহরণ।

দ্বিতীয় প্রকার বলিতেছিলাম, যে খাল নিম্নভূমি দিয়া যাইয়া থাকে। এই সমস্ত খালে ডবল কার্য্যকারণী লক দরকার। জোয়ারের সময় জল যাতাক আশিয়া একেবারে ভাসাইয়া দিতে না পারে, আবার ভাঁটাব সমস্ত জল যাহাতে না বাতি হইয়া গাইতে পারে; মোট কণায় খাল সর্বদাই একভাবে থাকে, এইজন্ত ডবল কার্য্যকারণী দরজাব প্রয়োজন। এইরূপ খাল হলণ্ডে এবং অন্যান্য নিম্ন দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বড় এই প্রকার খালের ব্যবহাবে কথা শুনি নাই।

তৃতীয় প্রকার। আমাদের দেশের যে খানে সেখানে এই খালের উদাহরণ। খাল বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহাকেই আমি এট বিভাগভুক্ত করিয়াছি। দুই জলবাশির সহিত যে মানবকৃত ক্ষুদ্র জলরাশি সঞ্জিলিত হয় এবং অল্পকোন প্রকার দরজা (lock) ইত্যাদি কিছুই আয়োজন হয় না, অর্থাৎ ঐ জলরাশি এই খালকে সর্বদা পূর্ণ রাখিতে পারে, ইহাই আমার তৃতীয় শ্রেণীর খাল। আমাদের দেশে এরূপ অনেক আছে বটে, কিন্তু সমুদ্রের সহিত সমুদ্রের সংযোগ করিয়াছে, এই শ্রেণীভুক্ত আজ পর্য্যন্ত একটা মাত্র খাল হইয়াছে, তাহার নাম সুরেজ খাল।

আমাদের বাঙ্গালা কথা 'খাল' বলিলে (lock) ইত্যাদি কিছুই কথা মনে হয় না। ওমুক নদীর সহিত ওমুক নদী পর্য্যন্ত খাল আছে, কেহ কি বুঝিলেন, কতগুলি দ্বার, কতগুলি চৌবাচ্চা ইত্যাদি আছে? বস্তুত উভিবা মেদিনীপুরের খালই আমাদের আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। এ আবার কি? কিন্তু ইংরাজী Canal কথা ব্যবহার কবিলেই ঐসব lock, reservoir, gate, pumping engine, এই সমস্তের কথা হৃদয় পটে অঙ্কিত হয়। হয় না কি? কোন বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থকার এই সুরেজ খাল সম্বন্ধে লিখিতে লিখিতে বলিতেছেন—

" * * Though it is called a canal, it bears little resemblance to the works we have described under that name, for it has neither locks, gates, reservoirs, pumping engines, nor has it, indeed, anything in common with canal except that it affords a short route for sea-borne ship. It is in fact, correctly speaking, an artificial strait or arm of the sea connecting the Mediterranean and the Red Sea from both of which it derives its water-supply."

Encyclopedia Britannica.

এই দুই সমুদ্র এক সমতলে হওয়াতেই এই খালের সৃষ্টি, এই সহজ উপায়ে হইয়াছে। নতুবা ঐ সমস্ত পদার্থের প্রয়োজন হইত। এই সহজ উপায়ে সমাধা করার পক্ষে আব একটা সুবিধা ছিল, এই দুই সমুদ্রই জোয়ার ভাঁটায় বড় বাড়ে কমে না।

পূর্বে বলিয়াছি, এই স্থানে সুরেজযোজকে পূর্বে এক খাল ছিল। আধুনিক সময়ে এই স্থানে খাল করিবার কথা ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নই, বোধ হয়, প্রথম উত্থাপন করেন। তিনি ইংরাজী সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে M. Lepere নামক জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের নিকট হইতে এই স্থানের এক বিবরণ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু সে সমস্ত বিবরণ,

লে সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়। আমরা অভীতের দিকে চাহিয়া বেশ বিচার করিতে পারি, তখন এই খাল হয় নাই বেশ হইয়াছিল। এই খালের উত্থন বড় প্রয়োজনও ছিল না। এই খাল যদি প্রস্তুতও হইত, অতি অল্প নাশ-কই এই চড়া ও লুক্কায়িত পর্বতময় ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের জার ক্ষুদ্র জলাশয়ে কেবল তাহাদের পালের উপর নির্ভর করিয়া আসিত, উল্লুঙ্গ সমুদ্রে তাহা বা “সেই বুরিয়ে নাক দেখান” পথে বাইতেই ভালবাসিত। কে চড়ার ঠেকিয়া মরিতে যায়। বস্তুত পবে যখন বাম্পীর-পোত নব ক্ষু-প্তিমার আবিষ্কার করা হইল, তখন এই প্রকার খালের সময় আসিয়াছে। এখন আর বাতাসের উপর নির্ভর কবিতে হয় না, খুব বাতাস বহিলেও বড় ক্ষতি নাই, না বহিলেও ভালই। এখন লোকে উহার প্রয়োজনীয়তা বোধে, কিন্তু তখন ততদূর বৃদ্ধি নাই। তাই বৃষ্টি বিধাতা তখন এই খালের সৃষ্টি করিয়াও কবিলেন না। জগৎ জানিল, ঐ স্থানে কোন খাল হইতে পারে, সে তাহার পোতের উন্নতির দিকে মন দিল। যখন আশাহুৰূপ পোত নির্মাণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইল, তখন জগন্মাতা ভগবতী ফার্দিনন্দ লেসেপ্সের (M. Ferdinand Lesseps) হাতে এই কার্য্যভার অর্পণ করিলেন। তিনি এই কার্য্য উহার রূপায় সুসম্পন্ন করিলেন।

আমরা যখন সুয়েজে আসিলাম, তখন সুয়েজ খাল নির্মাণ সহস্রাব্দী বৃত্তান্ত জানিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। এই সামান্য খাল জগতের কত উপকার করিতেছে, বলা যায় না। পূর্বে পশ্চিম ইউরোপ হইতে ভারতের পূর্ব দিক ১১৩৭৯ মাইল ছিল। এখন এই খাল দ্বারা পশ্চিম ইউরোপ হইতে ভারতের পূর্ব দিক ৭০০০ মাইল হইয়াছে।

জাতিরই এত উপকার করিতেছে, সেই মহান পদার্থের বিষয় একটু জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? তোমরা সকলেই ইহার বিষয় বেশ জানিতে পার, কিন্তু তবুও একটু যদি বলি, তবে বোধ হয় অত্যাশ্চর্য্য হইবে না। বিশেষতঃ এই অতি আশ্চর্য্য, সুকোশল-পূর্ণ, সুশোভন বিষয়কে একেবারে অনালোচিত রাখিয়া ফেলিয়া বাইতে ইচ্ছা হয় না।

মুর্সে ফার্দিনন্দ লেসেপ্সের ইচ্ছা ছিল, সুয়েজ যোজকের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড খাল কাটেন। খাল সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হওয়া চাই, এবং খুব সহজেই হওয়া চাই। এই স্থানে কয়েকটা উপত্যকাব জায় স্থান অর্থাৎ নিম্নভূমি আছে, সেগুলি ব সুযোগও তিনি লইবেন, মনস্থ করিলেন। মেনজালা হ্রদ, বালা হ্রদ, তিমসা হ্রদ এবং পূর্ব্বোক্ত ত্তিক্ত বা কটু হ্রদ, এই গুলি তাঁহার অনেক শ্রমের লাভ করিয়াছিল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল চেস্‌নি ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের মধ্যস্থ স্থান পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং একটা প্রবন্ধ লেখেন। সেই সময়ে এই দুই সমুদ্রে ত্রিশ ফিটের তফাৎ জানা ছিল। সকলেই জানিত ভূমধ্য লোহিত সাগর হইতে ত্রিশ ফিট উপরে!। সেইজন্য চেস্‌নি সাহেবের খালের নকশাও সেই মতের উপরে স্থাপিত।

১৮৪৯ হইতে ১৮৫৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মহাত্মা লেসেপ্স এই বিষয়ে তাহার জ্ঞান বুদ্ধিকে প্রখরতর করিতে লাগিলেন। কি উপায়ে খাল কর্তন করা যায়, কোথা হইতে কোন স্থান দিয়া কি প্রকারে বাইলে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইবে, এই সমস্ত চিন্তা তাঁহার মানস পটকে একেবারে এই ছয় বৎসর ধরিত্তা পূর্ণ করিয়া রহিল। তিনি যতদূর, এমন সময়

নাই যখন তিনি এবিষয় চিন্তা করেন নাই । ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ সৈয়দ পাশা মিশরের রাজপ্রতিনিধি হন । তিনি তৎক্ষণাৎই লেসেপ্সের জন্ত লোক পাঠাইলেন । খাল কর্তন বিষয়ে কোন বিশেষ কথার জন্ত তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগিতে বলিলেন । এই সাক্ষাতেই এই মহৎ কার্য্যেব আদ্য হইল । সেই বৎসরে, ৩০শে নবেম্বর, লেসেপ্সের উপর স্কার দিয়া কেহবো হইতে সহি করা এক কমিশন পত্র আসিল যে, তিনি “সাধারণ সুরেজ খাল কোঃ” নামে এক কোম্পানি খুলিতে পারেন । * পর বৎসবে অর্থাৎ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা লেসেপ্স, রাজপ্রতিনিধির হইয়া, কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাধারণ কার্য্যের অধ্যক্ষ বলিয়া অথবা সুশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া, বিখ্যাত, গণ্য, মান্য, সম্ভ্রান্ত ভ্রম-লোককে একটা আন্তর্জাতিক সভা করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন । সেখানে খাল সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচিত হইবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য ।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দেরই ডিসেম্বর মাসে এবং পর বৎসরের জানুয়ারিতে মিশরে দুই কমিশন বসিল । কমিশন উভয় সমুদ্রের বন্দর সমূহকে এবং তন্মধ্যস্থ মরুকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিল । অনেক পরীক্ষা, অনুসন্ধান এবং চিন্তার পর স্থির হইল, ভূমধ্যের পেলুসিয়ম উপসাগর হইতে সুরেজের নিকট দিয়া লোহিত সাগরের সহিত এক খাল কাটা যাইতে পারে, কিন্তু কি প্রকারে খাল কাটা যাইতে পারে, কোনটা সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়, এই বিষয়ে সকলের মত নানা প্রকার দাঁড়াইল । তিন জন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাঁহাদের মত বড়ই মন্তব্য,

তাঁহারা বলেন, খাল সমুদ্র হইতে ২৫ ফিট উচ্চে করা হউক । খালের এক দিকে পেলুসিয়ম উপসাগরে, অপর দিক লোহিত সাগরে মিশিবে । মধ্যে অনেক দরজা, কজা, চৌবাচ্চা কবা হইবে । এবং আবশ্যক মত নীল নদ হইতে জল শোষণ করিয়া আনা হইবে ! তাঁহাদের মতে এই সর্বাপেক্ষা উত্তম উপায় । সহজ দিকে আর বৃদ্ধি যায় না । অগ্রাহ্য বিদেশী সভাগণ সমুদ্র হইতে ২৭ ফিট নিম্নে খাল কাটার কথা বলিলেন । তাঁহাদের মতে লক ইত্যাদি কিছু দরকার নাই । সমুদ্র হইতে সমুদ্র যুক্ত হইবে, সমুদ্রই ইহাকে পবিপোষণ করিবে । খালের দুই দিকে দুই বন্দর করা হইবে ।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মহাসমারোহে প্যারিস মহানগরীতে এই কমিশনের এক অধিবেশন হয় । সেখানে ইংরাজ শিল্পীগণের মত একেবারে অগ্রাহ্য করা হয় ।! অপর উপায়েই খাল কর্তন করা হইবে, স্থির হইল ! কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইল । কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইবার পরে মহাত্মা লেসেপ্সকে আরও দুই বৎসব অর্থের জন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল । চারিদিকে অর্থ লাহা-র্যের জন্ত লড়াই হইতে লাগিল । তিনি তাঁহাব সমস্ত কার্য্যাদি শেষ করিয়া এই কার্য্যে লাগিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন । অর্ধেক অর্থ সুরোপ হইতে সংগৃহীত হয় । তন্মধ্যে ফরাসীগণই অধিক দান করে । অপব্যক্তি রাজপ্রতিনিধি পাশাই দেন । মহম্মদ সৈয়দ প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি প্রয়োজন হইলে জোর করিয়া কুলি দিবে । আরও কিছু সময় কাটিয়া গেল । অবশেষে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চমার্গে এই মহাকাব্য হইল ।

* The Universal Suez Canal Co.

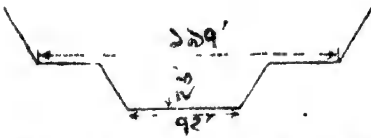
২৫,০০০ হাজার হইতে ৩০,০০০ হাজার পর্যন্ত লোক নিযুক্ত হইয়াছিল! প্রায় লোকই জোর করিয়া আনা হয়।

১৮৬২ খ্রীঃ পর্যন্ত কার্য যথানিয়মেই পরিচালিত হইল। কিন্তু তখন রাজপ্রতিনিধি মহম্মদ সৈয়দপাশা আন্তর্জাতিক মহামেলা দেখিতে আসেন। সেখানে সার জন হক্সারের (Sir John Hawkshaw) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে খালকার্য পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করেন। পাশা এত টাকা খরচ করিতেছেন, নিজে নিম্নার ভাগী হইয়া এক হাজার লোককে জোর করিয়া কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, কার্য সফল না হইলে তাহার কত কষ্ট! তাঁহার এই বিষয় জানিতে একান্ত ইচ্ছা হইল। খাহাতে অল্প কোন কর্মচারী হক্সাকে ঠকাইতে, ভুলাইতে না পারে, তাহার জন্ত পাশা আদেশ করিলেন যে, হক্সার সহিত কোন কর্মচারী যাইবে না। হক্সা আব কিছু করুন বা নাই করুন, তিনি খাল কাটান বিকল্পে কয়েকটি কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। কি কি বিষয় তিনি বলিলেন, তাহা এখানে উল্লেখ অনাবশ্যক, এই বলিলে বোধেই হইবে যে, যে আপত্তিগুলি তিনি করিয়াছিলেন, সেগুলি কোনটাই আজ কাল ঘটিতেছে না, ঘটেও নাই।

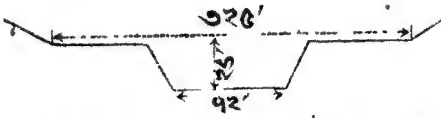
সৈয়দপাশা তাঁহার রিপোর্ট পাইবার পূর্বেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। তাঁহার ভ্রাতা ইসমাইল তাঁহার পরে রাজপ্রতিনিধি হন। ইসমাইল হক্সার বিবরণ পাইয়া বড়ই হতবিশিত হইলেন। যখন খাল কর্তন বিষয়ে সম্পূর্ণ আশা নাই, ইসমাইল জানিতে পারিলেন, তিনি তাঁহার জাহাজকে রক্ষা জোর করিয়া কার্যে নিযুক্ত করিতে সম্মত হইলেন। ইহা ত অবশ্যক-

বিক নয়। কাজ বন্ধ হইয়া গেল। সমস্ত লোকই প্রায় চলিয়া গেল। এই সময়ে কি কবা উচিত, লেসেঙ্গ তাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি এই ব্যাপার ফরাসী সম্রাটের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাট দেখিলেন, কাজটা হয় না, তাই, জোর করিয়া কাজ কবান তুলিয়া লওয়ায় অথবা দেশী কুলি না পাওয়ায় খাল-কোম্পানীর যে ক্ষতি হইবে, তাহার পূরণ স্বরূপ সম্রাট দয়া করিয়া ৩৮০,০০০ হাজার পাউণ্ড তাহাদিগকে দিতে রাজপ্রতিনিধিকে আদেশ করিলেন। এই টাকা দ্বারা বহুকষ্টে নানা প্রকার কল কজা নানা স্থান হইতে ক্রয় করিয়া কাজ চালান হইতে লাগিল। বহু শ্রমকর্মচারী নিযুক্ত হইল। অধিক অর্থ ব্যয় হইল, তাহাদের থাকিবাব জন্ত অনেক নতুন গৃহ সমস্ত প্রস্তুত করিতে হইল। সামান্য এক হক্সার কথাব জোরে মহায়া লেসেঙ্গের অনেক কষ্ট ভুগিতে হইল, কিন্তু তিনি অসীম সাহসের উপর নির্ভর করিয়া অমাত্য-বিক অধ্যবসায় অবলম্বনে এই কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিবার নয়। ভূমধ্যসাগর হইতে ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে জল বহিতে আরম্ভ কবে। সেই বৎসরের জুলাই মাস হইতে লোহিত সমুদ্রের জল বহিতে আরম্ভ করিল। অক্টোবর মাসে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ লোহিত হইতে ভূমধ্য এবং ভূমধ্য হইতে লোহিত সাগরে যাতায়াত করিতে থাকে। পূর্বে যে হ্রদগুলির কথা বলিয়াছি, সেগুলি এখন হ্রদ হইয়াছে, পূর্বে নিম্নভূমি, শুষ্ক মরুভূমি মাত্র ছিল। তিমসা হ্রদ ৫ মাইল লম্বা, কটু হ্রদ প্রায় ২৫ মাইল। সমস্ত খালটা ৮৮ মাইল লম্বা, তাহার

মধ্যে ৬৬ মাইলই খাল কাটিতে হইয়াছে। ১৪ মাইল জলের নীচে কাটিতে হইয়াছে (dredging) এবং অপর আট মাইলে মাত্র কোন কাজেরই প্রয়োজন হয় নাই। যেখানে সেখানে ১৯৬ ফিট চওড়া ২৬ ফিট গভীর। তলার বরাবরই ৭২ ফিট চওড়া।



আর যেখানে হ্রদ, সেখানের পাড় আবণ্ড ঢালাও কবা হইয়াছে ; কেন না, সেখানের বাগি আসিয়া খালকে বুজাইতে পারে।



হ্রদের মধ্যে গভীরতম স্থান লৌহস্তম্ভ দ্বারা (Iron-beacons) দর্শিত হইয়াছে। এই চিহ্ন গুলি প্রায় ২৫০ ফিট তফাতে। শুনা যায়, নাকি ৮,০০,০০০ কোটি ঘন বর্গ গজ মাটি খাল হইতে কাটিয়া বাহির করা হয়!!! পূর্বে বলিয়াছি, কত লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের পানার্থে পাম্প করিয়া নীল নদী হইতে জল আনা হইত ; আশে পাশে মিটা জলের নামও ছিল না! ৩০ টি মাটি কাটা জাহাজ লাগিয়াছিল। মোটে নাকি ২০,০০০ কোটি পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। সকলেই, বোধ হয়, অবগত আছেন, এখন ১৬ টাকার কমে পাউণ্ড হয় না। সৈয়দ বন্দরে (Port-Said) এছাইটা (Break water) আছে। পশ্চি মেরটী ৬৯৪০ ফিট এবং পূর্বেরটী ৬০২০ ফিট দীর্ঘ। ১৮৮৩ খ্রীঃ ১০ ফ্রাঙ্ক, ৫০ সেন্টিম (ইংরেজিতে ৮ সিলিং, ৬ পেন্স, ৩ ফারিং) আমাদের বাসিন্দা মুক্তার প্রায় ছয় টাকা)

প্রতি টনে দিতে হইত। তখন মাঝির (Pilot) জন্তও মোটের উপর টন প্রতি ৭০ সেন্টিম দিতে হইত। ৭০ সেন্টিম আমাদের প্রায় ছয় আনা। ১৮৮৪ সালের ১লা জুন তারিখে মাঝির ভাড়া উঠিয়া গিয়াছে। এখন ১৮৮৫ খ্রীঃ হইতে টন প্রতি কেবল ৩ ফ্রাঙ্ক ৫ সেন্টিম দিতে হয়। এতও কি কম টাকা! প্রতি টনে ৫ টাকা করিয়া ধরিলে, ৫০০০ টাকার কম কখন পড়ে না।

এই ৮৮ মাইল বাইতে আমাদের ২২শে অক্টোবর বেলা একটা কি দুইটা হইতে ২৩শে শুক্রবার প্রাতঃকাল পর্যন্ত লাগিল। তবেই বুঝিতে পার, জাহাজ কত আন্তে ২ অগ্রসর হইতেছে! ঘণ্টায় পাঁচ মাইলের কিছু বেশী চলিতেছে। দুই পারে কেবল মরুভূমি দেখিতে লাগিলাম। রাত্রি হইলে আমাদের জাহাজের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক আলো জ্বলান হইল। সেই আলোকে খাল বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। রাত্রিকে ঘনি করিতে পাশ্চাত্য জগত খুব মজবুত! আমরা আলোটি দেখিতে গেলাম। দেখিবার অনেক ছিল। আমি ও আমার বন্ধু নাটার অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখিলাম; কিন্তু প্রায় একটা রাত্ হইয়াছে, দেখিবার সাধ না মিটিলেও, আমরা নিদ্রার তাড়নার আর পারিলাম না। আমাদের ঘরে গেলাম। ঘরে গিয়া সেই ব্যাকফ্রাঙ্ক মনের সহিত মহা ঝগড়া হইল। নাটীক বলে, আমাদের যখন ইচ্ছা আমরা যত্নে আসিব, তাতে আপনার বলিবার অধিকার কি আছে? যদি আপনি ক্রম হইতেন, তিন্ন কথা। আমি চুপ করিয়া বসিয়াছি। পরদিন হইতে ব্যাকফ্রাঙ্ককে সাহায্য করিয়া

হুগ্গ হইয়া উঠিল। সাহেব রো আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে?' আমি কিছুই বলিতে চাহিলাম না। বাহা হউক, তিনি বলিলেন, "আমি বখন তোমার ভায় লইয়াছি, তখন কোন মতেই ঐ প্রকার লোকের সহিত থাকিতে দিতে পারি না। আমি কমিসারীর কাছে গিয়া-ছিলাম, তিনি সৈয়দ বন্দরের পরে তোমা-দের এক ভিন্ন ঘর দিবেন।" পরে আমরা এক ভিন্ন ঘর পাই।

পরদিন প্রাতঃকালে আমবা সৈয়দবন্দরে পৌছিলাম। এখানে আমাদের জাহাজ আবার কয়লা লইবে। প্রাতঃকাল হইতেই কয়লা বোরাই হইতে আরম্ভ হইল। আঃ এমন ময়লা যে বলা যায় না। সমস্ত কালী-ময় হইয়া গেল। প্রাতঃভোজ খাইয়া আমরা বন্দর দেখিতে যাইব মনস্থ করিলাম। প্রায় ১১ টার সময় আমাদের কালীময় জাহাজ ছাড়িয়া বন্দর দেখিতে গেলাম। আমরা পাঁচ জন। বন্ধু নাটার, মিসেস রো, মিষ্টাব রো, ডাক্তার আলকক্ এবং আমি। আমরা প্রথমে কিং (Henry S. King) কোম্পানীর আপিবে গিয়া কাগজ পত্র পড়িলাম। তারপর সহর দেখিতে গেলাম। এখানে দেখিবার বড় কিছুই নাই। তবে দোকান ইত্যাদি খুব ভাল। এমিয়া বিভাগের প্রায় সমস্ত জিনিস এইখানে পাওয়া যায়। এই সমস্ত দোকান দেখিয়া আমরা আমাদের একে একে কুকের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে কিছুকাল কাটাওয়া, আমরা জাহাজে কিরিব মনে করিলাম। পরিস্থিতি একটা নাপি-তের দোকান দেখিয়া মিঃ রো আমার সহায় হইয়া কেরি-করাইয়া কেলিতে যাইলেন। তখনকার দিনে আমবা এখন

কার ছবি দেখ, বোধ হয়, চিনিতে পারিবে না। বাহা হউক, তিনি নিজের পরসাব আমার সাধের জিনিসকে বিদায় দিতে বাধ্য করিলেন। লগুনে আসিয়া করিতেই হইত, তাঁহার কৃপায় আমার পূর্বেই সে কাজ করা হইয়া গেল। এখানকার একটা কথা বলি। এইস্থান বড় প্রেলোভনময়। মিঃ রো যদি আমার সহিত না থাকিতেন, নিশ্চয় আমাকে বিপদে পড়িতে হইত। প্রতি দোকানে এমন অশ্লীল সমস্ত ছায়ালিপি (Photograph) চিত্র আছে যে, অত্যন্ত সাধু ব্যক্তিও অবিচলিত থাকিতে পারিবেন না। আমি আগেই মিঃ রো দ্বারা সত-কিত হইয়াছিলাম এবং অনেক দোকান-দার আমাকে সেই সমস্ত ছবি দেখিতে ডাকিলেও আমি যাই নাই। তাহাদের এক গোপনীয় ঘর আছে, যেখানে দর্শকগণ ঐ সমস্ত অশ্লীল, কদর্য এবং অবশ্যই দৃষ্টির অযোগ্য ছবিগুলি দেখিতে যায়।

আমাদের জাহাজ সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সৈয়দবন্দর পরিত্যাগ করে। আমরা এখন পাশ্চাত্য জগতে। এখন আমরা আর লোহিত সাগরে নাই, ভূমধ্যে। পোর্ট সৈয়দ ছাড়ি আমরা ২৩শে অক্টোবর, শুক্রবার। আমরা মারসেলে (Marseilles) পৌছি ২৮শে অক্টোবর, বিগ্রেহরের পরে। এই পাঁচ-দিন আমাদের ভূমধ্যের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। আমরা ভূমধ্যের বন্দর হুশোভন মনোহর দৃশ্য দেখিতে ২ চলিলাম। আমরা কেণ্ডিয়া দীপের পার্শ্ব দিয়া সিসিলি এবং ইতালীর মধ্যে বেসিমা বোজহকর ভিতর দিয়া, বীর নেপোলিয়নের কীর্তি ধরায় করিকার উত্তর দিয়া বাতলেলে পৌছিলাম।

আমরা আগের গিরি এটনা, এবং মনোরম যেদিনা যোজক দেখিয়াছি। ইহা ভিন্ন বড় বেশী একটা কিছু এই কয় দিনে দেখি নাই,—তবে মধ্যে ২ আমবা অনেক জলের মধ্যে আলোক মঞ্চের স্থায় বিশাল প্রান্তর খণ্ড দেখিয়াছি। সে দৃশ্য বড় সুন্দর। আব এক কথা। আমি, আমি কেন, আমবা সকলেই, এতদিন আফ্রিকা-মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ুতে দগ্ধ হইতেছিলাম। কিন্তু এখন আব সে সমস্ত কিছুই নাই। দগ্ধ হওয়া দূরে থাক, যতই আমাদের বাবা শেষ হইয়া আসিতেছে, ততই যেন অধিকতর শীতলতা বোধ করিতে লাগিলাম। অবশেষে মা-সেলেব কাছে আসিতে আসিতে প্রায় জমিয়া যাইবার গোছ হইয়া উঠিল।

‘আমবা মারসেলে পৌঁছিলে, আমাদের বিভিন্ন এজেন্টের ইন্টারপ্রেন্টাব আসিয়া আমাদের জিনিস পত্রের ভার লইল। আমবা সকলেই আমাদের জাহাজের বিল শোধ করিয়া জাহাজ ত্যাগ করিবার জন্য উৎসুক হইলাম? জাহাজের বিল আবার কি? পূর্বেই বলিয়াছি, জাহাজ কোম্পানী কোন লিমিটেড কিম্বা সোডা ওয়াটার দেয় না। আরও খাবার সন্ময় ভিন্ন কোন মদ খাইলেই তাহার পূর্ণ দাম দিয়া পান করিতে হয়। সমুদ্রে একটু অসুখ হইলেই লেমনেড সকলের সহায়। এই উপায়ে জাহাজ কোম্পানী বেশ পরিশ্রম উপার্জন করে। তোমরা ভাবিতে পার, খাইবার সময় ভিন্ন কেহ মদ খায় না। কিন্তু আমি দেখিলাম, পাশ্চাত্য জগত মদের দাস, সকলে না হইলেও অনেককেই। আমাদের জাহাজে একজন ইংরাজ ছিল, জানিলাম, সে ব্যবসারে দক্ষ। ‘জাহাজে খাবারের জন্ত

গিয়াছিল। কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া ক্রুদ্ধ মনে গৃহে ফিরিতেছে। সেই ভদ্রলোক রোজ বাবুগিরি করিয়া এক বোতল ছ বোতল সুরা দেবীর সেবা কবেন। নেশার চোটে কি যে না কবেন, বলিতে পারি না। রোজই তবু পান করা চাই। জ্ঞান হইলে একটু লজ্জা হয় বটে, কিন্তু আবার পানের সময় হইলেই, আরম্ভ করেন। আহা! সহিত বাহা দেওয়া হয়, তাহাতে তাঁহার কুলায় না, তিনি আবার অল্প সময়ে পান করেন। বেশ বাপু, টাকা থাকে, কর, তবুও নয়। এ ব্যক্তি টাকা নাই, তবু পান কবা ছাড়িবেন না। মা-সেলে আসিলে তাঁহার মদেব বিল প্রায় পাঁচ পাউণ্ড হইয়াছে! নিজের হাতে এক পরিশ্রম নাই!!! একি ব্যাপার। এখন তাহার বাগ, জিনিস পত্র সমস্তই বিক্রয় কবিত্তে লইয়া যাইতে চায়, পূর্বে মনে ছিল না। আমাব বন্ধু সুন্দর নাটাব তাহার সমস্ত বিল পরিশোধ কবিলেন। এই এক ঘটনার দুই দিক দেখা যায়, জগতে মদ কি সর্বনাশ করিতেছে, এবং পাশ্চাত্য জগত পবনস্বায়, দান-পবনগতায় কতদূর অগ্রসর। নিশ্চয় জানি, বন্ধু নাটার তাহার নিকট হইতে সে টাকা ফিবিয়া পাইবার আশায় দেন নাই। সেই লোকের সহিত নাটারের জাহাজের আলাপ মাত্র, তাহার সম্বন্ধে কোন বিষয় জানা নাই। এই অবস্থায় আমাদের দেশের কোন ব্যক্তি কি, ৫ পাউণ্ড (প্রায় ৮০ টাকা) ত দূরের কথা, একটা টাকা দান করিতে অগ্রসর হইতেন? যখন ইহারি বোঝে যে, এই লোক স্বার্থই প্রয়োজনে পড়িয়াছে, তাহার সর্বদাই প্রাণ পণে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, আমাদের একে-জিনিস পত্র: ক্রয়

কাষ্টম হাউসে লইয়া গেল বটে, কিন্তু আমা-
দের জিনিস পরীক্ষা করিতে কেহই আসে
না। খোসামোদ করিতে পারিলে হয়। তবে
এখানে খোসামোদ সর্বদা খাটে না। আসল
জিনিস না দিতে পারিলে সহজে কার্য্যসিদ্ধি
হইবার নয়। তবে কি না, কখনও ঘুদ
দেওয়া অভ্যাস নাই, উহাকে পাপ বলিয়াও
মনে কবি, আর ঘুদ দিবাবও তেমন ক্ষমতা
নাই, কমে ত হইবে না, কাজেই অনেককণ
অপেক্ষা করিতে হইল। অবশেষে এক মহাশা
আসিয়া আমাব জিনিস পত্র হাঁটকাইয়া এক
খড়ির দাগ মারিয়া চলিয়া গেলেন। আমাকে
এখন আর ঘণ্টা খানেক ধরিয়া শুভাটতে
হইল। আমার জিনিস কুকের এজেন্টের
হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। সহর দেখিতে
গেলাম। শীতে প্রাণ ষাৎ, সহর দেখিব কি
ছাই। প্রথমেই কুকের আপিসে গেলাম।
সেখানে গিয়া কাগজপত্র পড়িব আশা ছিল,
কিন্তু সমস্তই ফরাসী ভাষার। মেসিলা নামক
কোন ব্যক্তি এই স্থানকে স্থাপন করেন
বলিয়া নাকি নাম মারসেলে হইয়াছিল।
ইহা অত্যন্ত পুরাতন সহর। খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রায়
৬০০ বৎসরে এই স্থান স্থাপিত হয়। এখন
ইহাই ফ্রান্সের সর্বোত্তম বন্দর। প্রকাণ্ড
ডক, প্রচুর গুদাম ঘর, এবং বন্দর সুন্দর
ভূগর্ভ দ্বারা সুরক্ষিত। এখানে দেখিবার
আর বেশী কিছু থাক আর নাই থাক,
আমার স্থানটা বেশ লাগিল। সমস্ত সহর
টাই পাহাড় কাটিয়া স্থাপিত করা হইয়াছে।
এখানে অনেক বাড়ী দেখিলাম, যাহার
একদিকের দেয়াল পাহাড়। Chateau
d'if বলিয়া সমুদ্রের মাঝখানে একটা দেখি-
বার যোগ্য পাহাড় আছে। আসল পূর্বে
এই প্রকার পাহাড় অনেক দেখিয়াছি বটে,

কিন্তু এটা লোকালয়ের, মারসেলের এত
নিকটে বলিয়াই এত বিখ্যাত হইয়াছে।
এখানে মিরাবৌ প্রভৃতি অনেক রাজধানী
কারার হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি এই
স্থানকে বেশী জানি, আলেকজান্ডার দুমোর
বিখ্যাত মন্টিক্রিস্টোর (Monte Cristo)
সেই আশ্চর্য্য ভয়াবহ ঘটনাবলীর দৃশ্য
স্থান বলিয়া। ইহা ভিন্ন এখানে দেখি-
বার যাদুঘর ইত্যাদি অল্প কিছুই বড় নাই।
আমরা এই স্থানটার গির্জাটা দেখিতে গেলাম।
এটা একটা দেখিবার জিনিস। একটি পাহা-
ড়ের উপর নিশ্চাণ করা হইয়াছে। সেইখানে
বৈজ্ঞানিক ট্রাম গাড়ীতে উঠিতে হয়। ট্রাম
গাড়ী বলিলে তোমরা বুঝিবে, মাস্টার উপর
দিয়া রেল গিয়াছে, এতাহা নহে। সেই
অত্যুচ্চ স্থান হইতে নীচ পর্য্যন্ত দুই মোটা
মোটা তার আদিয়াছে, সেই তাবের গান্ন
ধরিয়া এই পাহাড়ী গমনাগমন করে। পাহাড়ী
শুল্কের কথা দিয়া যায় !!

আমরা এই সমস্ত দেখিয়া অবশেষে
কোন ছোট্টেলে গিয়া আহার করিলাম।
ইতিমধ্যে আমরা ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছি।
মিঃ এবং মিসেস রো কখন কোথায় গিয়া-
ছেন, আমরা দেখি নাই। ডাঃ আলককের
সহিত সেই যে ছাড়াছাড়ি, আজও দেখা
হয় নাই। তবু আমরা প্রায় আটজন। সেই
দজি ভদ্রলোকও আমাদের সঙ্গে আছেন।
তাহার খাইবার খরচ আমাদের দিতে হইল।
আমরা রাতে কোথায় আর যাইব, পাছে-
পথ হারাইয়া ফেলি, তাই পূর্ব হইতেই
ষ্টেসনে গিয়া বসিয়া রহিলাম। ট্রেন ছাড়িবে
১০টার সময়, কিন্তু আমরা ৭টা হইতে ষ্টেসনে
বসিয়া ধবরের কাগজ পড়িতে লাগিলাম।
অনেক দিন এ রূপ পাওয়া হয় নাই। প্রায়

নয়টার সময় আমাদের এজেন্ট জিনিস পত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা টিকিট করিতে গেলাম। আমাদের দেশে মুটে আনা দুই পাইলে একেবারে রাজা হয়। এখানে মুটে রাজা মুখ। বোধ হয়; আমাদের অপেক্ষা বেশী উপায় কবে। তাহাদের সামান্যে চাইবার নয়। ফ্রান্সের ট্রেন সমূহের ভাড়া অত্যন্ত বেশী। মোটের জন্ত প্রায় ২২ পাউণ্ডে (১১ সেরার কম) ৭ ফুট, ৯৫ সেন্টিম, আমাদের টাকার প্রায় ৪৬০। আমাকে আমাব এই এক বান্ধব জন্ত প্রায় ১৫ সিলিং দিতে হইয়াছিল। আমরা ট্রেনে উঠিয়া চলিলাম আটজন। সকলে মিলিয়া আমাদের চলিলাম। প্রাতঃকালে প্রায় আটটার সময় আমরা লিয়নে পৌঁছিলাম। এখানে গাড়ী পরিবর্তন করিতে চাইবে। এই ভোরে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আমরা জিনিসপত্র লইয়া গাড়ী পরিবর্তন করিলাম। কেমনে সে দারুণ শীত বুঝাইব, বলিতে পারি না। আমি পূর্বে কখনও এত শীত ভোগ করি নাই। বরফ হাতে করিয়া থাকিলে যে প্রকার বোধ হয়, আমার সেই প্রকার লাগিতে লাগিল। এত কাপড় থাকা সত্ত্বেও আমার গা ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। আমার সে কষ্ট বলিবার নয়। ৭টা ১০ মিনিটে পাড়ী ছাড়িল। গত রাত্রে আমরা কিরূপ স্থান দিয়া আসিয়াছি, কিছুই জানি না। অন্ধকারে সমস্তই ঢাকা ছিল। প্রাতঃকালে ফ্রান্সের অনির্বচনীয় শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা চলিলাম, ট্রেন এত বেগে চলে যে, দেখা বড়ই দুষ্কর। আমাদের ক্ষুধানল জলিয়াছে, তাই এই সমস্ত তত বেশী উপভোগ করিতে পারিতেছি না। তবুও ফ্রান্সের সেই ফ্রান্সভার কেউ,

সেই ঘন শ্রাম বর্ণের দুর্দাদল সুশোভিত পর্বতমালা, সেই সমস্ত মধুর বীণাধ্বনির জ্বার শঙ্কায়মান বরণা, আহা! সেই মধু মধু চাতকেব স্তম্ভব সঙ্গীত, দূরে ঘনকরাশা রাশির মধ্যে বীর পরাক্রান্ত সূর্য্যের আরক্তিম লুকায়িত বদন মণ্ডল, মনোমুগ্ধকর সেই সমস্ত দৃশ্য, জীবনে আর দেখি বা না-ই দেখি, সন্দেহ একেবারে ছায়াচিহ্নের জ্বার অন্ধিত হইয়া গিয়াছে, কখনও মুছিতে না। আমার সাধা কি সে প্রকৃতির খেলাকে তোমাদের নিকট জ্ঞাপন করি। আবার এক এক স্থানে জ্ঞানবৈব সহিত মানব-কারুকার্যের যোগ, সৌন্দর্য্যকে কত শত গুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। মানুষ এক জিনিস করিয়াছে, প্রকৃতি আসিয়া তাহার সুবঙ্গা হবিবর্ণের বৃক্ষলতাদি দ্বারা সেই পদার্থকে সুশোভিত ও মনোবশ করিয়াছে, কবিতাছে। ফ্রান্স প্রায়ই পর্বতময়। আমাদের ট্রেন কখনও নিম্নে, কত শত হস্ত দূবে সমস্ত লোকালয় ফেলিয়া তাহাদের উপর দিয়া দারুণ গর্জনে ছুটিয়া চলিল। আবার কখন কখন পর্বত ভেদ করিয়া সুউজ্জ্বল মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দিবা দ্বিপ্রহরকে ঘণ্টা দুই একের জন্য অন্ধকার রাত্রি দ্বিপ্রহর কবিতা মানবজাতির কোশল, তাহাদের লীলা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানবপিতা ভগবানের রূপা প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে নানা স্থানে নানা ভাব, নানা স্থানে নানা প্রকার প্রকৃতির লীলাময় খেলা দেখিতে দেখিতে আমরা সদয় মনে সুস্থ হইতে লাগিলাম। কিন্তু এগুলি মস্তিষ্কের ক্ষুধা, এগুলি প্রাণের ক্ষুধা নিবারণে পটু, জঠরানল নিবারণ করা দূরে থাক, আরো উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল, আমরা ডিয়ন স্যামক (Dijon) আসিয়া

আমরা প্রেক্ষাক্ষেপ কবিলাম। আমার এখনিও কাঁটা চামচায় খাওয়া তত অভ্যাস হয় নাই। অন্ততঃ খাইতে পারিলেও তাতে খাওয়ার মত শীঘ্র হয় না। এখানে টেণ আহাষের জন্ত ১০ মিনিট থাকিবে। অর্ধেক খাওয়া না হইতে হইতেই ঘণ্টা বাজিয়া গেল। দৌড়িয়া গাড়ী ধরিলাম। আব কিছু না পারিয়া হোটেলে যে রট খানা দিবাছিল সেখানকে পকেটে করিয়া লইয়া আসিলাম। তাহা খাইয়াই কুখানল নিবাইলাম। কি ৬৮শা।

এখন আমরা ৭৩ই উত্তরে যাইতেছি, যতট দিবা শেষ হইয়া আসিতেছে, ৩৩ই শান্তের তীব্রতা বৃদ্ধি হইতেছে। কমল ইত্যাদি দ্বারা কোন বকমে জড়াইয়া প্রাণ বাচাইলাম। আমাদের টেণ প্যাবিসে ৫টা ৪৩ মিনিটে পৌঁছিল। পাশ্চাত্য জগতের স্বাভাবিক নীতিমুগাবেই স্রবাদের (স্রবাদের বলি কেন, তাহা হেতু এ মূলকে দেখাই যায় না) দিবা-বিশ্রাম লইয়াছেন। এখনই বাড়ি গিয়াছি। আবার এখানে আমাদের ডিনার খাওয়া আবার টেণ পরিবর্তন কবিলাম। প্যাবিসে গুইগী নৈবন, একটি দক্ষিণে, অপাট উত্তরে। দক্ষিণ ষ্টেশন হইতে উত্তর ষ্টেশনে যাইতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল। তথ্যই বৃষ্টিতেছে, কত বড় সহর। সেখানে আবার টেণ পরিবর্তন কবিবার কথা ছিল। কিন্তু টেণ পরিবর্তন কবিয়া কাঁচা আমা রেক্স একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! আমরা কোন কণ্ঠসরীর নিকটে গেলাম, তাহার নিকটে আমাদের কথা বলিলাম। তিনি একটু ইংরাজি জানেন, সেইজন্ত আমাদের গাড়ী থানা ক্যালের টেণের নিকট বোর্ড করিয়া দিলেন। আমরা জিনিস

পত্র লইয়া ছুটাছুটি হইতে একেবারে বাঁচিয়া গেলাম।

ক্যালের হইতে রাত্রি ১১টার সময় জাহাজ ছাড়িবে, তাই আমরা আর ঘুমাইলাম না। শান্তে আনবা সকলেই কষ্ট পাইতেছি, বিশেষতঃ আমি। সমস্ত রাত্রি এই ভাবে উঠা নামা কবিত হইবে, এই ভাবিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল! যাহা হউক, পাত মধ্য বাবে আমরা ক্যালের পৌঁছিলাম। শান্তে এক পা বাড়াইতে পারিতেছি না। তাহা হইলে কি হয়, যাইতেই হইবে, আমাদের জন্তে জাহাজ আর দাঁড়াইবে না। জাহাজের মধ্যে ক্যাবিনে গেলাম। সেখানে একটু গরম। বড় ক্লান্ত হইয়াছিলাম, সেইখানে একটু ঘুমাইলাম। বেশীকণ্ঠ আবার ঘুম হইল না। অন্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা ডোবরে (Dover) এ আসিলাম, তখন দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। আবার জিনিস পত্র লইয়া গাড়ীতে উঠিতে বাহতেছি, পুলিশ বাধা দিল, কাষ্টম হাউসে যাইয়া পূর্বে পাশ আনিতে হইবে। এই বাহ্রে জিনিস পত্র লইয়া কাষ্টম হাউসে গিয়া মহাঘাড়ের জাহাজ দাঁড়াইয়া থাকা কেমন কষ্ট, সকলেই বৃষ্টিতে পাবেন। আমার মূটেব পরমা সব সময়ে গিলাব সুবিধা নাই এবং দি৩৬ পারি নাই। আমার বাগা বহিষা বহিয়া হাত ব্যথা হইয়াছে। তাতে আবার কাষ্টম অফিসার আসিয়া সমস্ত জিনিস হাট্ কাইয়া লণ্ডনও কবিয়া দিল। আমি আব কি বলিব। বিলাত আসাব সাধ বেশ মিটিবছে, আমরা চক্ষে জল আসিল, হাথ! এট দারুণ অবস্থায় ভগবান আমাকে কেন ফেলিলেন। বন্ধু নাটাব আমাকে সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। উত্তরেই পল্লবের জিনিস পত্র লইয়াছি। যাহা হউক, যাত্রা প্রায় শেষ

হইয়া আসিয়াছে। মনে এই আশা জাগাইয়া আমাদের জিনিস গুছাইয়া আমরা আমার ট্রেণে উঠিলাম। এই ট্রেণে প্রাতঃকালে ভোরে ছয়টার সময় লগুনে পৌছিলাম। এখানে পুনরায় কাষ্টম হাউসে গিয়া আমরা আমাদের জিনিস পাশ করিয়া আনিলাম। এখনও একখানি গাড়ী আসে নাই। আমার জন্ত কোন লোকজন আসেন নাই। আমিও টেলিগ্রাফ করিবার সময় পাই নাই। বাত্রে, কোথায় টেলিগ্রাফ আপিস, কে জানে! বন্ধু নাটায়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, তাঁহাব

অবাচিত সাহায্য করার জন্ত ধন্যবাদ দিয়া এক মুটে করিলাম। সে আমার জিনিসগুলি এক ক্যালের (গাড়ী) উপর চাপইয়া দিল। আমি গাড়োয়ানকে আমার বাসার ঠিকানাঘাইকাইতে বলিলাম। সহজেই আমার বাসায় পৌছিলাম। আমার বন্ধুগণ আমাকে চঠাৎ দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য ও আনন্দিত হইলেন।

৪ঠা, পৌষ ১৩০৩
শুক্রবার।

স্নেহেব সেবক—
প্রভাত।

দার্শনিক মতভেদ । (২)

হিন্দুদর্শনে যে সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, আমরা দেখাইয়াছি, তাহা বিভিন্ন জ্ঞানাধিকারীৰ নিমিত্ত। এই জ্ঞানাধিকারিগণকে হিন্দুদর্শন তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) দ্বৈতজ্ঞানী, (২) দ্বৈতাদ্বৈতজ্ঞানী এবং (৩) অদ্বৈতজ্ঞানী। যতদিন ঐচ্ছিক বিষয়জ্ঞান প্রবল, ততদিন আমরা অদ্বৈতজ্ঞানে উপনীত হইতে পারি না। যতদিন ভেদজ্ঞান (Relative knowledge) বর্তমান, ততদিন অভেদ অপরিচ্ছিন্ন নির্মূল (Absolute) জ্ঞান অসম্ভব। সাংখ্যবাদিগণ এই কথাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। কপিল সাংখ্যে আমরা যে অদ্বৈতবাদের নিরাস দেখিতে পাই, তাহাব কারণ আর কিছুই নহে, কপিল দেখাইয়াছেন যে, দ্বৈতজ্ঞানীর অহুমান-তর্কে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ নহে। যুক্তি ও অহুমানে যেমন সগুণ ব্রহ্মবাদ অসিদ্ধ, অদ্বৈতবাদ তেমন অসিদ্ধ। অহুমানে যাহা অর্জিত নহে, তাহা অহুমানে পরিমেষ্য নহে। যাহারা অহুমান দ্বারা অদ্বৈতবাদ স্থাপন

কবিত্তে যাঠবেন, তাঁহারা নিশ্চয় বিফল হইবেন। শব্দব তাই কেবল শক্তির শাসন দ্বারা অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। অহু-মানে যদি অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হইত, তবে সবাই বিনা প্রয়াসে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইতে পারিতেন; তবে কষ্টসাধ্য যোগপথের আবশ্যকতা ছিল না। সামান্য অহুমান ও তর্কে অথগু অদ্বৈতজ্ঞান অসিদ্ধ বলিয়া তজ্জন্ত স্বতন্ত্র পথ নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই স্বতন্ত্র পথ পুরুষার্থ সাধন। এই পুরুষার্থ সাধন দ্বারা বিবেকোদয় হইলে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। তৎপূর্বে অদ্বৈতজ্ঞান অসম্ভব। আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিলে তবে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়। তখন সমস্তই “একমেবাদ্বিতীয়ং,” সুতরাং আত্মজ্ঞান ভিন্ন যখন অদ্বৈতজ্ঞান অসম্ভব, তখন অহুমান দ্বারা সেই অদ্বৈতবাদ স্থাপন করা বৃথা। সাংখ্যশাস্ত্রে যখন আত্মজ্ঞানই প্রতিপাদ্য, তখন অহুমান দ্বারা অদ্বৈতবাদের নিরাসন করিয়া সেই অদ্বৈতজ্ঞানের প্রকৃত পথ নির্দেশ করাটী সে সেই

উদ্দেশ্য-সাধক বলিতে হইরে, তাহাতে আর যুদ্ধে কি ? তাই বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন—

“বে শাস্ত্রের যে বিষয় মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই শাস্ত্রে সেই বিষয় বর্ণিত হইলেই, সে শাস্ত্রে সমগ্রাণ ও অবিকল্প বলিতে হইবে। অংশত কোন নিম্নিত বিষয় থাকিলে শাস্ত্রকে নিম্নিত বলা যায় না। যদি বল মাংসা শাস্ত্রে বহুপুরুষ স্বীকৃত আছে, সেই অংশ অবশ্য নিম্ননীয়। সে অংশ নিম্ননীয় নহে। * * * যেহেতু জীবের ইতর-বিজ্ঞানই সাংখ্যের প্রধান প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনসিদ্ধি বা অর্থের বাধ হইলে তাহাকে অপ্ৰামাণ্য বলা যাইতে পারে। নানাবিধ ক্রটি স্মৃতিতে আত্মার নানাত্ব এবং একত্ব বর্ণিত হইয়াছে। আত্মার নানাত্ব ব্যবহারিক এবং একত্ব পারমাণ্বিক। সুতরাং ব্যবহারিক এবং পারমাণ্বিক জ্ঞানে সেই নানাত্ব এবং একত্ব উভয়ই সিদ্ধ ও অবিকল্প। ব্যবহারিক জ্ঞানে নানাত্ব প্রতিপাদিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে আত্মার একত্বই হৃদিসিদ্ধান্ত। এ সকল বিষয় আমরা ব্রহ্মসীমাংসাতে সবিশেষ বর্ণন করিয়াছি।”

বিজ্ঞানার্চাধ্য যেমন সাংখ্যের ভাষ্যকার, তেমনই ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্য ব্রহ্মসীমাংসায়ও বৃত্তিকার। ব্রহ্মসীমাংসায় পূর্ণপ্রজ্ঞ মাধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদই প্রতিপাদন করিয়াছেন; কিন্তু দ্বৈতবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া নিগুণ ব্রহ্মবাদকে একেবারে বিরুদ্ধ বলেন নাই। সেই নিগুণ ব্রহ্মবাদ তাঁহার বিষয়ান্তর্গত নহে। যতদিন না জীবের ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হয়, ততদিন সে দ্বৈতজ্ঞানী। এই ভেদজ্ঞান যে একেবারে তিরোহিত হয়, তাহাও সম্ভাবিত নহে। জীব যত ধ্যানপরায়ণ হয়, ততই তাহার স্ফূর্তিবশে মনঃসংযোগ হয়। হুল ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের যতই সূক্ষ্মতা সম্পাদিত হয়, ততই অদ্বৈতজ্ঞানের আভাস অন্তরে উদ্ভূত হয়। সামিজ্ঞান হইতে অনাদির আভাস, সীমার হইতে অসীমের আভাস, অনিত্য হইতে নিত্যের আভাস, বহু হইতে একের আভাস। পরিবর্তনশীল জগৎ ও

জ্যেয় হইতে একমাত্র নিত্য, অপরিবর্তনীয়, অজ্ঞেয়ের আভাস, অনিত্য নামরূপ হইতে অনাম ও অরূপের আভাস প্রভৃতি বহু অদ্বৈতের আভাস অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পাকে, এবং যতই সেই আভাস অন্তরে প্রগাঢ়তা লাভ করে, ততই ভেদজ্ঞান ক্রমে সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া পরম সূক্ষ্ম আত্মপদার্থে চিত্ত সন্নিবেশিত হইতে থাকে। হুল হইতে এইরূপ সূক্ষ্মজ্ঞানের আবির্ভাব এবং প্রগাঢ় সংস্কার জন্মিলে যে অভেদের আভাস অধ্যাসিত হয়, তাহাই ক্রমশঃ ভেদ প্রতিষেধক হইয়া উঠে। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের সীমা এই পর্য্যন্ত। ইউরোপীয় সূক্ষ্মদর্শনেরও এই সীমা। এই দ্বৈতাবৈত বাদই ভেদাভেদজ্ঞান।

আমাদের হিন্দুত্বদর্শী এই ভেদাভেদজ্ঞান পর্য্যন্ত গিয়া জ্ঞানের পথে একেবারে থামিয়া যান নাই; তিনি আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন। যে পথ দিয়া এই সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহাই সমাধিপথ। ইউরোপীয় তত্ত্বদর্শিগণ এপথে মূলেই আসিতে চাহেন না; আসিতে চাহেন না কি, এ পথের এখনও পর্য্যন্ত অনুসন্ধান পান নাই। যাহা কিছু শুনিয়াছেন, তাহাই শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া তাহাকে Mysticism বলিয়াছেন। ক্রটিতে এই ত্রিবিধ জ্ঞানই নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই ত্রিবিধ মতানুযায়ী রামানুজ শারীরিক সূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনি উক্ত ত্রিবিধ মতই প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিকারভেদে ঐ ত্রিবিধ পথই প্রামাণ্য। যাহারা নিত্যাত্ম হুলদর্শী, তাহাদের নিমিত্ত দ্বৈতজ্ঞান, যাহারা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের সূক্ষ্মতা সাধনে তৎপর, তাহাদের নিমিত্ত দ্বৈতাবৈত বা ভেদাভেদজ্ঞান এবং যাহারা নিগুণ পর-

মায়াদর্শনের আকাজক্ষী, তাঁহাদের জন্ত অদ্ভুত অদ্বৈতজ্ঞান নির্দিষ্ট হইয়াছে। মহে। পনিষদের মতামুসারে রামানুজ ভগবান বোধায়নাচাণ্যের ব্রহ্মস্বরূপিত্ব আশোড়ন করিয়া শাবীক মীমাংসার ভাষা প্রণয়ন পুঙ্খক বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ বিবৃত করিয়াছেন।

ভেদ, ভেদাভেদ এবং অভেদ জ্ঞানানুসারে যেমন বেদান্তের নিবিধ প্রত্যাহার উৎপত্তি, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও তেমনি দ্বৈত এবং অদ্বৈত প্রস্থানে বিভক্ত হইয়াছে। মায়াবাদীরা যাহা শৈবদর্শন নামে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, সেই মত দ্বৈতপ্রস্থান, প্রত্যক্ষিত্তা এবং বসন্তদর্শন দ্বৈতপ্রস্থান।

দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অদ্বৈতজ্ঞান অধম, 'মধ্যম এবং উত্তম অধিকারীর নিমিত্ত। দ্বৈত জ্ঞানীকে জ্ঞানালোচনা যত যত্নতায় আইসে, ততই তিনি দ্বৈতাদ্বৈতভাবে পণিপূর্ণ হইতে থাকেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই যত্নজ্ঞানে আমবা অদ্বৈতের অনেক দূর আভাস প্রাপ্ত হই। সন্নীম হইতে ক্রমশঃ অসীমে, সাস্ত হইতে ক্রমশঃ অনন্তে উঠিতে থাকি। বাস্তবিক ভাবে গেল, অনন্তের কখনই অশব্দ বা সাস্ত্যব সন্তাবিত নহে; তবে যে আমাদের নিকট সকল বস্তুই সাস্ত ও সন্নীমরূপে প্রতীত হয়, সে কেবল আমাদের মায়িক জ্ঞানের দোষ। মায়িকজ্ঞানাজ্ঞান হইয়া আমরা অনন্তকে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি না। উপলব্ধি করিতে না পারি, তাহাকে ভাবিবার জন্ত এই মায়িকজ্ঞানের সহায়তা একান্ত আবশ্যক হয়। মায়িকজ্ঞানে আমবা সন্নীম ও সাস্তকে উপলব্ধি করিয়া, তবে সেই সাস্ত ও সন্নীমের মধ্যে অনন্তকে ভাবিতে সমর্থ হই। তাই ব্রাহ্মবিহার জন্ত ব্রহ্মস্বত্রে আছে :—

ব্রহ্মার্থঃ পাদবৎ ।

বেদান্তদর্শন । ৩য়, ২পা, ৩৩স্থ ।

শব্দর বলেন ব্রহ্মার্থ, উপাসনার্থ। সামান্ত জ্ঞানে অনন্তকে আনিবার জন্ত ক্রটিতে সেই অনন্তের পাদকল্পনা করা হইয়াছে। অপরিমেয়ক পরিমেয়রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। বাস্তবিক, অনন্ত নির্ণয় সম্ভার মায়িক দ্বিগুণায়ক কোন অংশ বা খণ্ড সম্ভাবিত নহে, কিন্তু আমাদের মায়িকজ্ঞানও অখণ্ড নহে। খণ্ডজ্ঞানে অখণ্ডের ভাবনাই উপাসনার অঙ্গ। সূত্রবাং ব্রহ্মার্থঃ অর্থে জ্ঞানার্থঃ এবং উপাসনার্থঃ বঝাইতোছে।

অপ্রেদায় পূর্ণবস্তুক অখণ্ড ও নির্ণয় ব্রহ্মেব এইরূপ পাদ কল্পিত হইয়াছে :—

“পাদোহস্য বিশ্বভূতানি ত্রিণাদভ্যন্তর্যং দিবি।”

“নৈকালিক ভূতসমুদায়রূপী এই জগৎ সেই বিবাকের একপাদ মাত্র। অবশিষ্ট আরও তিনটি পাদ আছে, উহা অমৃতস্বরূপ। সেই অমৃতাত্মা পাদবয়, ইহার স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবাস্তব বোধিত।”

এ প্রত্যক্ষমাধ্যমিকৃত অমৃতবাদ।

শব্দর বলেন, এই ক্রটিতে যে ব্রহ্মের পাদ কল্পনা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কেবল সামান্ত জ্ঞানে সেই বিবাককে আনিবার জন্ত। শব্দর এই অর্থ বিস্তারিত করিয়া ব্রহ্মরত মহাশয় বলিতেছেন :—

“এক নিববয়ব হইলেও তাহার মাত্রা ত সাধরবা।

এই মায়াব অবববদ্ব তাহাতে আরোপ করিয়া তাহাকে চতুপাদরূপে রবন করা হইয়াছে। উপাসনার জন্ত এইরূপ নিবংশে অংশের আরোপ, ভোগবৎ। দেখ অন্নপানাদি বা স্ত্রীপুত্রাদি বা গৃহশয্যা প্রভৃতি ভবিজ ভোগ হয়। কেবল ভোগ অগ্রসিদ্ধ। সুতরাং ভোগ করিতে হইলে যেমন অন্ন পানাদির সংসর্গ অপ্রাণবজক, তক্রপ উপাসনা করিতে হইলেও মায়িক ‘অনন্ত’ গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। অধিক কি, ব্রহ্ম ব্রহ্ম নিববব, এই মাত্র জ্ঞানেও দেখ, মায়িক ‘অনন্ত’

হইযাছে, যেহেতু, বৃহৎ জ্ঞান, ক্ষুদ্রজ্ঞান সাপেক্ষ এবং নিরবয়বজ্ঞান অবয়বজ্ঞান সাপেক্ষ । অতএব মায়ার অংশ গ্রহণ না করিলে ব্রহ্মভাবনাই অসম্ভাবিত । ব্রহ্মকে ‘অতিবৃহৎ’ এইমাত্র ভাবনা করিতে চহলেও বোলকলা এবং চারিপাদ এইরূপ মায়ার অংশ অগ্রহণ করনা কঠিন হইবে, পরে উপাসনা করিতে পারায়, নতুবা এ পথান্ত এমন কোন উপায় বা যুক্তি উৎপন্ন হয় নাই, যদ্বারা বিনা মায়ার সাহায্য ব্রহ্মের নিবংশ স্বরূপে ধ্যানের বিষয় হইয়া থাকে ।

ব্রহ্মমীমাংসায় ৩ ঐ বেদান্তসূত্রের এইকপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইয়া থাকে :—

“জীব ও স্রষ্টার সত্ত্বক বিজ্ঞাপনার্থ যেন চন্দ্র বরপদে অগ্রসিদ্ধ হইলেও ‘পাদ’-এ বিধৃত্তানি’ ইত্যাদি শব্দে স্রষ্টার পাদশব্দ প্রয়োগ হয়, সেইকপ জীব ও স্রষ্টাব্যবস্থা অংশবিশিষ্ট অব্যবস্থাপনার্থ অলৌকিক ঈশ্বানন্দের আনন্দ শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে । পরম্পূর্ণাধিগত হইয়াছে যে, যেমন লোক জ্ঞানার্থ বাজাতে দেবরাজ শব্দ প্রয়োগ হয়, সেইরূপ অলৌকিক ঈশ্বরিক জ্ঞান বিজ্ঞাপনার্থ জ্ঞানাদি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ।”

কি ব্রহ্মমীমাংসা, কি অদ্বৈত শাস্ত্রবিশেষ, সকল মতেই শ্রুতির প্রতিপাদ্য নিগূর্ণ ও অংশও ব্রহ্মই গৃহীত হইয়াছে ; কেবল উপাসনার্থ তাঁহাব রূপ ও নাম কল্পিত হইয়া সামান্য জ্ঞানে তাঁহার ধ্যান করা হইয়াছে মাত্র । এই সামান্য জ্ঞানের ধ্যান অবলম্বন করিয়া উপাসনা পথে ভক্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহার স্মৃতি হইতে স্মৃতির এবং স্মৃতির হইতে স্মৃতিময় জ্ঞানে উপনীত হয়েন । দৈত্যাদি জ্ঞানের চরমসীমায় আসিয়া ভক্ত সঙ্গত ব্রহ্মের উপাসনার সিদ্ধ হন । এই সঙ্গত ব্রহ্মের ধ্যান ও উপাসনা ক্রমে ক্রমে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হয়, রামানুজ তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন :—

“যদিও রামানুজের উপাসনা করিলে প্রসিদ্ধি বা প্রসিদ্ধি ও অংশবিশেষে বিস্তারিত ঈশ্বরোপাসনা

সময় অধিকার জন্মে । পশ্চাৎ বাহ্যের (অনিয়ত প্রদান, সঞ্চয় ও বাহ্যদেব এই চতুর্ভুজ ব্রহ্মোপাসনা) উপাসনার অধিকারী হওয়া যায় । তদন্তর স্মৃতিব উপাসনার সমর্থ্য জন্মে । পূর্ব অন্তর্যামী সাক্ষাৎকরণের শক্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ।”

এই ধ্যান ক্রমে সজ্জাত হয়, রামানুজ তাহা বলিতেছেন :—

“যানক তৈলধারাবর্ণবিজিতস্মৃতিসম্ভাবকপা ।”

তৈলধারার স্মৃতি অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিপবম্পরা স্মৃতিব আবির্ভাবের নাম ধ্যান ।

স্মৃতি জগতে ভগবানের যে স্মৃতি প্রতিমা প্রতিবিম্বিত আছে, সেই স্মৃতি প্রতিমার ভাবনা ক্রমে ক্রমে স্মৃতি ঈশ্বরে সমুৎপন্ন হইতে থাকে । এই স্মৃতি সঙ্গত ঈশ্বরের ভাবনায় ক্রমে ব্রহ্মের বিভব বা ঈশ্বর্যভাবনা ও জ্ঞানস্রোত হৃদয়ে উদ্ভূত হইতে থাকে । তৎপরে সেই ভাবনাস্রোত তৈলধারাবৎ ভগবানের স্মৃতির চতুর্ভুজভেদ করিতে থাকে । স্মৃতি ও সম্পূর্ণ ষড়গুণবিশিষ্ট বাহ্যদেব হৃদয়ে ধ্যানস্থ হইলে অন্তর্যামী পবম্পরা ধ্যানে চিত্ত সংযোজিত হয় । ব্রহ্মব্যানের এই পম্পরাবৎ যে স্মৃতি বা ভাবনাপবম্পরা তৈলধারাবৎ অবচ্ছিন্নরূপে অনুভূত হয়, তাহাই ধ্যানরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । রামানুজ সঙ্গত স্মৃতিব এই ধ্যান নির্দিষ্ট করিয়াছেন । এইখানে দ্বৈতাদ্বৈতজ্ঞান পবিসমাপ্ত হইয়াছে, কারণ, রামানুজ বলেন, এইখানে ভক্ত “শেষ-কপী ব্রহ্মে লীন হইয়া সমুদায় অভ্যাসিত সিদ্ধি সম্ভোগ করেন ।”

রামানুজের এই ধ্যান গীতার অভ্যাস যোগরূপে বিবৃত হইয়াছে :—

“অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসো নাস্তগামিনা ।

পরমং পুংসং দিবাং বাতি পার্থাত্মচিন্তনং ।”

“হে পার্থ ! অভ্যাসযোগযুক্ত অর্থাৎ পুনঃ

* সর্বকলম সংগ্রহে রামানুজদর্শন ।

পুনঃ স্মরণরূপ যোগযুক্তযোগী একাগ্রচিত্তে দিব্য পরমপুরুষকে স্মরণ করিতে করিতে সেই পরম পুরুষকে লাভ করে ।”

একাগ্রচিত্তে এইরূপ ভগবানকে স্মরণ করিত করিতে শেষে কিরূপে শেষরূপী ব্রহ্মে লীনতা জন্মে, তাহাও গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

“সৰ্বভূতহ্মাক্ষানং সৰ্বভূতানি চাস্মিন ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সৰ্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ৬ অ ২৯ ॥

“যোগাত্ম্যাস দ্বারা যাহাব চিত্ত সমাহিত হইয়াছে এবং যিনি সৰ্বত্র ব্রহ্মই দর্শন করেন, সেই সমাহিতচিত্ত সমদর্শী যোগী ব্রহ্মাদি স্থাবর পঞ্চাঙ্গ সৰ্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সেই সমস্ত ভূত দর্শন করেন ।”

জীব যখন এই দ্বৈতাত্মবৈজ্ঞানে ব্রহ্ম ভাবনাধ্যানস্থ ব্রহ্মে লীন হয়েন—অবিচ্ছিন্নরূপে লীন হয়েন, তখন তাঁহার সমাবির অবস্থা ।

(১) স্থূল সাকার

অর্চা, বা, প্রতিমাদি

বিভব, বা রামাদি অবতার ।

(২) মানসিক সাকার, বা, চতুর্বাহ ।*

অনিরুদ্ধ

প্রত্যয়

সম্বর্ধগ

বাহুদেব

(৩) সূক্ষ্ম সাকার

সূক্ষ্মবাহুদেব

অস্তর্যামী ।

এই ধ্যানপর্যায় Herbert Spencer এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :—

“The coalescence of Polytheistic conceptions into the Monotheistic conception and the reduction of the monotheistic conception to a more and more general form in which personal superintendence becomes merged in universal immanence.”

First Principles.

সমগ্র দেবতাদিগের ধ্যানরূপ এক ব্রহ্মের ধ্যানরূপে এবং সেই ব্রহ্মরূপ

এই সমাধি-সম্পন্ন জীব ক্রমে নিগুণ ধ্যানে অধিকারী হয়েন ।

বৈজ্ঞানিকের চিত্তে সগুণ ব্রহ্মই ‘প্রতি-পাদিত; নিগুণের জ্ঞানে তিনি অজ্ঞ । এই সগুণের ধ্যান যত কেন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতমে অগ্রসর হউক না, সে সমস্ত জ্ঞানই সাকার ও মূর্তজ্ঞান । এজন্ত আর্ধ্য-শাস্ত্রে উপাসনা দ্বিবিধ হইয়াছে, সাকার ও নিরাকার । সমস্ত ধ্যানই সাকার, কেবল একমাত্র নিগুণের ধ্যান নিরাকার । গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে এই দ্বিবিধ উপাসনা কথিত হইয়াছে । রামানুজ যে নির্দিষ্টধ্যানের কথা কহিয়াছেন, সেই সগুণ ঈশ্বর ধ্যান সমস্তই মূর্তধ্যান । রামানুজের সাকার উপাসনা পর্যায়ক্রমে এইরূপ নির্দিষ্ট হইতে পাবে :— উপাসনা—(১) স্থূলসাকার, (২) মানসিক সাকার, এবং (৩) সূক্ষ্মসাকার ।

বিধাতা—বিশ্বব্যাপী, অস্তর্যামী, পরমাত্মার বিলীন হয় ।

গীতায়ও উক্ত হইয়াছে :—

“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংতুংধে ভজামাহম্ ।”

মনবর্য়ানুযতন্তে মনুষ্যাঃ পার্ধ্ব সর্গশঃ ॥ ৮ অ ২২ ॥

এই সাকার উপাসনাই ধ্যানপথের শেষ লীমানহে । সাকার উপাসনার বৈজ্ঞানিক

* শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে এই চতুর্বাহতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ঈশ্বরব্যাপীর চিত্তের এইরূপ জীভেন্দ্রিয়চরিতাবৃত পার্শ্বকমাজেরই এই চতুর্বাহতত্ত্ব জানাযোহে ।

ক্রমে বৈতাত্তিকভাবে উপনীত হইলে অদ্বৈত-জ্ঞানের অধিকারী হইলেন। তখন তাঁহার অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরভাবনা বা স্মৃতিপবনশা শেষ-রূপী ব্রহ্মে লীন হইলে, তিনি নির্কিষয় ব্রহ্ম-ধ্যানাধিকারে উপনীত হইলেন। এই ব্রহ্ম-ধ্যানে তাঁহাকে “নির্কিষয়” হইতে হইবে। রামানুজ যোগানে সাকার উপাসনা শেষ কবিলেন, সেইখান হঠাৎ সাংখ্যের অধিকার আবিস্কৃত হইল। রামানুজ ৩ অধ্যায় ও মধ্যম অধিকারীর জন্য যে নির্দিষ্টাঙ্গ ও ধ্যানযোগ নির্দিষ্ট কবিয়াছেন, সাংখ্য তাহার পরিশেষ কবিয়া সমস্ত সমাধি-পথ সম্পূর্ণ কবিয়া দিয়া-ছেন। এই ধ্যানপাথের দ্বৈতাদ্বৈত সীমাব পবন অদ্বৈতসীমাব প্রাপ্ত। সাংখ্যের অধিকার এই নিঃশব্দে ধ্যান। তাই রামানুজ যে ধ্যানের লক্ষণ দিয়াছেন, তাহা অদ্বৈত-জ্ঞানমূলক নির্কিষয়ক ধ্যান-লক্ষণ হইতে ভিন্ন হইয়াছে। সাংখ্যের ধ্যান নির্কিষয়ক ; মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত কবাই উদ্দেশ্য। চিত্তে সংসারবীজ মাল্গই না থাকে, একরূপ উদ্দেশ্যে নির্কিষয় সমাধি। সেই নির্কিষয়ক, নির্কিষয় এবং নির্বীজ সমাধি লক্ষণ কপিল দেব এইরূপ নির্দেশ কবি-য়াছেন :—

ধ্যানং নির্কিষয়ং মনঃ । ৬ অ ১৫ ।

রামানুজ এবং কপিলদেবের ধ্যানলক্ষণে আপাততঃ বৈষম্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন আমরা এইরূপ অধিকারভেদ দেখি, তখনই কেবল বুঝিতে পারি, তাঁহাদের মতভেদের কারণ কি ? একরূপ বৈষম্যকে মতভেদ বলা অসম্ভব। তাঁহারা একই পথের বিভিন্ন দেশের ধর্ম নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন মাত্র। ধ্যান-পাথের বিভিন্ন অবস্থার ধর্ম কখনই এক হই-বার সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং তাঁহাদের ধ্যান

লক্ষণ অবশ্যই বিভিন্ন হইয়াছে। একজন তত্ত্বাবয়ক এবং একজন বুদ্ধের চিত্ত কখনই সমান হইতে পারে না।

রামানুজের ধ্যান ভগবানের শেষ (অনন্ত) রূপে নিমজ্জিত হইয়া বিলীন হইয়াছে। এই ধ্যান তীত্র হইলে সাংখ্যের লাভ হয়, আরও তীত্র হইলে সামীপ্য এবং তদপেক্ষাও তীত্র হইলে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু যখন জীব সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া একেবারে ভগবৎস্বার শেষরূপে নিমজ্জ হইয়া বিলীন হন, তখন তাহার সাংখ্য মুক্তি লভ হয়। সন্তান ব্রহ্ম ধ্যানপথে এই শেষরূপী ভগবানে বিলীন হওয়াই শেষ সীমা। তখন তীত্রধ্যানে ব্রহ্ম দর্শন ঘটে। তৎপরে সাংখ্যের নির্কিষয় মুক্তি। যখন জীব অনন্তে বিলীন হন, সেখানেও সাংখ্য বলিতেছেন, এখনও জীব প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে নিষ্কৃত হইতে পারেন নাই ; কারণ, অনন্তেও ত্রিগুণ রহিয়াছে। অনন্ত মূল প্রকৃতির প্রধানা মুক্তি। সাংখ্যে তাহা মহত্ত্ব বা মহান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই ব্রহ্ম জ্ঞানময় মহত্ত্ব হইতে ত্রিগুণ নিঃশব্দ পুরুষে উপনীত হইতে হইলে নিঃশব্দগুণ্য * সাধন কবিত্তে হয়। এই নিঃশব্দগুণ্য সিদ্ধ হইলে তবে ত্রিগুণাতীত পুরুষের সাক্ষ্যকার ঘটে, এই সাক্ষ্যকারে নাম আত্মসাক্ষ্য-কার বা পরম পুরুষ বা পরমাত্মদর্শন।

এই আত্মসাক্ষ্যকারে উপনীত হইবার জুই পন্থা আছে, এক সন্তান ঈশ্বরের ধ্যান

* গীতারও এই নিঃশব্দগুণের উপদেশ। প্রথম অধিকারীর পক্ষে সাক্ষ্য উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। এই সাক্ষ্য উপাসনার কর্মযোগ অবলম্বন পূর্বক চিত্তের একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া নিবৃত্তি ও লিঙ্গম পথে অগ্রসর হইল, তখন বতঃই নিময়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং জ্ঞানযোগের অধিকার অর্জে।

পথ ; অত্ৰ, সাংখ্যের তত্ত্বজ্ঞান পথ । রামা-
কৃষ্ণ, পতঞ্জলি, গৌতম, কণাদ প্রভৃতি সন্তান
ব্রহ্মবাদিগণ সন্তান ঈশ্বরের ধ্যানপথে গোণ-
ভাবে অদ্বৈতবক্ষসিদ্ধিতে উপনীত হয়েন,
কাপিল সাংখ্য সন্তান ঈশ্বরিক ধ্যান-নিরপেক্ষ
কেবল প্রকৃতিবিবেকসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা
সেই যোগসিদ্ধিলাভ করিতে চাছেন । এই
খানে সাংখ্যযোগ হইতে অত্ৰ যোগের প্রতি-
স্নাতা । সন্তান ঈশ্বর-ধ্যান কোথায় আসিয়া
সাংখ্যযোগের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহা
আমরা দেখিয়াছি । সাংখ্যযোগীগণের সহিত
অপবাপব যোগীর পভেদ বটে সাংখ্যযোগী
প্রকৃতিতত্ত্বদর্শন মধ্যে সন্তান ঈশ্বরের মূর্তি
দেখেন না, অপবাপব যোগীগণ সেই প্রকৃতি
তত্ত্ব ঈশ্বরের মূর্তি দেখিতে পান । সাংখ্য-
যোগী যে প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞানে, মূলতত্ত্ব উপ-
লব্ধি করিতেছেন, যাহা প্রকৃতির কর্তৃত্ব-
শক্তি ও চিদাভাস, তাহা অপবাপব যোগী-
গণের নিকট ঈশ্বরিক তত্ত্ব । কিন্তু সাংখ্যের
নিকট তাহাব নাম প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মক
মূলতত্ত্ব । সাংখ্যযোগীগণ কেবল ঈশ্বরের
প্রতিষেধার্থ বস্তুতত্ত্বজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া যানে
ঈশ্বরমূর্তির অবলম্বন ছাড়িয়া দেন । পূর্বেই
বলিয়াছি, ঈশ্বর্য্য-বৈবাগ্য সাধনই তাহাদের
প্রধান উদ্দেশ্য । তাহারা সেই মূলতত্ত্বকে
প্রকৃতি বলিলেন এই অত্ৰ যে, তাহা হইতে
নাম-রূপ ও আকার সজ্জত হয় ; প্রকৃতি নাম-
রূপ ও আকার সৃষ্টিকারিণী ; যাহার প্রথম
পরিণাম অনন্ত বা শেবরূপী মহত্ত্ব । এই
সন্তান মূলতত্ত্বই ঈশ্বর । যাহা প্রকৃতির
অশেষ পরিণাম মধ্যে নিত্য, যাহার রূপই
প্রকৃতি, তাহাই ঈশ্বর—ঈশ্বরই জগতের
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্তা । তিনি সর্বশক্তি-
মান নিত্যবস্তু, সর্বশক্তির শক্তি কার্য্য-

কাৰণ-অতীত অপরিবর্তনীয় কর্তৃত্বাধার ।
তাহা ত্রিগুণবাবিনী ঈশ্বর্য্যশালিনী প্রকৃতির
মধ্যে চিদাভাস ; তাহা সন্তান চিৎশক্তি ।
সাংখ্যের সন্তান মূলতত্ত্বের সহিত যোগী-
গণের সন্তান ঈশ্বরের বিভিন্নতা এই মাত্র ।
মহানরূপে যে প্রকৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম, কবণ
ও আকারের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাই
পূর্ণাণে বক্ষাক্রমে উল্ল হইয়াছেন । মূলতত্ত্ব
এক হইলেও বিভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত
দার্শনিকগণ দশনকে নানা পন্থায় বিভক্ত
করিয়াছেন । কেহ দ্বৈতপথে, কেহবা দ্বৈতা-
দ্বৈত পথে ঈশ্বরিক সাধনতত্ত্ব দেখাইয়াছেন,
কেহ বা অদ্বৈতপথে তাহা প্রদর্শন করিয়া-
ছেন । সেই অত্ৰ, তাহাদের বিভিন্ন নাম-
কবণ এবং বিভিন্ন সাধনাবস্থা বিভিন্ন ধর্ম্ম
নির্দিষ্ট হইয়াছে । সকলেরই উদ্দেশ্য সেই
একই, নিত্য পবমতত্ত্ব উপনীত হয়েন ;
বিভিন্ন দার্শনিকেরা একই পন্থার বিভিন্ন
অবস্থা বা একই স্থানে উপনীত হইবার
বিভিন্ন পন্থার নিবাকরণ করিয়াছেন মাত্র ।

আমরা এমত কথা বলি না যে, নিগুণ-
বাদী সাংখ্য একেবারে দ্বৈতজ্ঞান বিবর্তিত ।
দ্বৈতজ্ঞান-প্রধান জ্ঞায়, ঐশ্বর্য্যিক, এবং বক্ষ-
নোমাংসায় আত্মার ভেদজ্ঞান, অংশজ্ঞান,
এবং বস্তুত্ব থাকিলেও সেই আত্মার একত্ব
একেবারে অস্বীকৃত হয় নাই ; তবে সেই
একত্ব তাহার মুখ্য প্রতিপাত্ত নহে । তত্ৰা
সেই দ্বৈতবাদী দর্শনসমূহে আত্মার বস্তুত্ব
এবং ব্রহ্মের সন্তানত্ব পারমার্থিক হইয়াছে ।
বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, সাংখ্যদর্শনে আত্মার
বস্তুত্ব পারমার্থিক নহে, তাহা ব্যবহারিক
জ্ঞান মাত্র । বস্তু দিন না প্রকৃতি পূর্ণতত্ত্ব
বখাবধ জ্ঞানোদয় হয়, বস্তু দিন না সেই
জ্ঞানোদয় হেঁতু বিবেকের সঞ্চার হয়, উক্ত

দিন দৈতজ্ঞাননিবন্ধন আশ্রয় অংশহ ও বহু জ্ঞান অবগুস্তানী। প্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞান যত দিন বিচার্য থাকে, তত দিন সাংখ্যযোগীকে দৈতজ্ঞানী হইয়া প্রকৃতির পরিণাম এবং আত্মাব বহুত্বও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাই সাংখ্য-তত্ত্বজ্ঞানে আশ্রয় বহুত্ব ব্যবহারিক রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই ব্যবহারিক জ্ঞানাবলম্বনে সাংখ্যযোগী কোন ক্রমে আশ্রয় একত্বে উপনীত হইবেন বলিয়া সেত অদ্বৈত জ্ঞানই তাহার পারমার্থিক। প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্বনির্ণয় কামান সাংখ্যযোগী অবস্থা এমত এক অবস্থায় উপনীত হইবেন, যখন তিনি ভেদজ্ঞানী এবং অভেদজ্ঞানী, উভয়ই। যখন তাঁহার এই অবস্থা, তখন তাহার দৈত ও অদ্বৈত, উভয় জ্ঞানই আংশিকরূপে বর্তমান। কিন্তু রামানুজ যেখানে দৈতাদ্বৈতের সীমা নির্দেশ করিয়াছেন, নিগুণবাদী সাংখ্য সেখানে কোন সীমাই নির্দেশ করিতে চাহেন না। সাংখ্য সেখানে বিলক্ষণ সগুণ বা বিদ্যমান দেখেন; সুতরাং এক দৈত-জ্ঞানের সামান্য আখ্যায় দৈতাদ্বৈতবাদিকেও নিক্ষেপ করেন; সেই দৈতাদ্বৈতবাদের আর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না। এইজন্য অদ্বৈতবাদীগণ, কি দ্বৈতাদ্বৈত, কি দৈতবাদ, উভয়কেই এক সামান্য দৈতবাদ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ঈশ্বরোপাসনা সকল দৈতবাদীর স্থির লক্ষ্য। যদি লক্ষ্যই স্থির না থাকে, তবে উপাসনা কাহার জন্য। এজন্য দৈতবাদী দার্শনিকগণ উপাসনার সৌকর্য্যার্থ নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্য ঈশ্বরোপাসকগণের এই স্থির লক্ষ্য স্বরূপ নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করিতে চাহেন না।

কারণ, সগুণ বস্তু মায়েবই ঈশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম অনিত্য এবং পরিবর্তনশীল। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সাধর্ম্ম্যই এই। পাছে সাংখ্যযোগীগণ এই কীটকে আশ্রিয়া বাঁধিয়া পড়েন, তাই তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য সাংখ্যকার দেখা দিয়া দিয়া গেলেন যে, এই সগুণ ঈশ্বর্য্যো পরাতর ভাব বিদ্যমান থাকিতে তাহা অনিত্য জানিবে; হোমাদেব লক্ষ্য এ অনিত্যবাসে নহে। হে নিগুণ চৈতন্য নিত্য, স্থির ও অচঞ্চল, সেই নিত্য বামে হোমাদেব লক্ষ্য।

নিগুণবাদী জৈমিনিবর্গ এই মুক্তি লক্ষ্যস্তানীয়। সেইজন্য তিনিও সেই সগুণ ঈশ্বরকে লক্ষ্য ভেদ করিয়া নিগুণ পরমাত্মার বিরামলাভ করিয়াছেন। জৈমিনি ও কপিল নিজে নিজে যে স্থলে আসিয়া পিঙ্গাম লাভ করিয়াছেন, অপরকেও সেই গন্তব্য স্থলে লইয়া যাইতে চাহেন বলিয়া তাঁহার নিজ নিজ দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বিজ্ঞানতীক্ষ্ণ বুঝাইয়া দিলেন, কপিল কেবল নিজ নির্দিষ্টপন্থার ব্যাঘাত নিবারণ জন্য সগুণ ঈশ্বরের অবলম্ব পরিহার করিয়াছেন মাত্র; তাই তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর অসিদ্ধ; নহিলে তিনি এমত কথা বলেন নাই যে, ঈশ্বর একেবারে নাই। তাঁহার অর্থ, সাংখ্যযোগপথে ঈশ্বর অসিদ্ধ হইলেও, যাহারা সে অবলম্ব ধরিয়া সমাধিপথে অগ্রসর হইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বর-ভক্তি অসিদ্ধ নহে। পাতঞ্জল সাংখ্যে সে কথা আরও পরিষ্কৃত হইয়াছে। ভগবান্ পতঞ্জলি সেই ভক্তিপথ ধরিয়া জ্ঞানপথে উঠিয়াছিলেন এবং অপরকেও তাহা উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাই, ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, যে ঋষি যে পথ ধরিয়া সিদ্ধি-

লাভ করিয়াছেন, তিনি :সেই সাধনপথে সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়া অপরকে তাহা নিঃসংশয়ে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রে যোগপথের পদে পদে অঙ্কপ'ত হইয়াছে। কোন খানে কোন বিয় ঘটিলে তাহা'ন নিবারণ জন্ত ঋষি উপায় নির্দ্ধাবণ করিয়া গিয়াছেন। গৌতম প্রভৃতি সন্তগ ঈশ্বরবাদিগণ নানা যুক্তি দিয়া দ্বৈতপ্রস্তানকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুদর্শনে বৈদিক যুক্তিপথের সকল দেশে সমান আলোকপাত হইয়া অতিপবিত্র হইয়াছে। সকলোই একই নির্দ্ধাণযুক্তিব পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। যিনি যে অধিকারীর নিমিত্ত নিজ নিজ দশানের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সেই অধিকারীর পক্ষে বৈতাব। অপর অধিকারীর পক্ষে সে পথ তত প্রশস্ত না হইতে পারে, কারণ, অপর অধিকারীর

নিমিত্ত তাহা প্রস্তুত হয় নাই; কিন্তু যে অধিকারীর জন্ত তাহা প্রস্তুত হইয়াছে, সে অধিকারী তাহাতে সম্পূর্ণ উপদেশ লাভ করিয়া নিজ পথে অগ্রসর হইতে পারেন। প্রাচীন কালে যখন কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান-পথের অনেক পথিক পাওয়া যাইত, তখন সেই সেই পথের পারদর্শিতা প্রতিপন্ন হইত। একালে যখন সেই পথই পরিত্যক্ত হইয়াছে, তখন সে পথের নানা দোষোদ্ঘাটন করা কেবল মিথ্যা বাক্য ব্যয় মাত্র। এক্ষণে যাহা মতভেদ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহা আমাদের মিথ্যাদৃষ্টি মাত্র। প্রাচীনকালে সেই সেই গন্তব্যপথের পথিকগণের নিকট তাহা প্রতিপথকে স্পষ্ট, নিদণ্টক, পবিত্র ও মননকৃত করিয়াছিল।

শ্রীপূর্ণজ বসু ।

সমাজ-সমস্যা ।

ভারত সমাজে পবিবর্তন ঘটয়াছে। কিন্তু কেন ঘটল ?

(১) ইংরাজের পবিচ্ছদ আঁটা সাঁটা, আমাদের শিখিন, ইংরাজ বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহিত হয়েন না, আমবা বালো বিবাহিত হই, ইংরাজ সমাজে বিধবা নব-ভর্তী গ্রহণ করিতে পাবেন, আমাদের সমাজে শ্রেষ্ঠ জাতীয় বিধবাগণ তাহা পাবেন না, বঙ্গ সমাজে কোন জাতীয় বিধবাগণই তাহা পাবেন না বা করেন না। ইংরাজ বালয়া যে একটা জাতি, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সহিত আহাবাদি এবং আদান প্রদান চলে, তবে বংশগৌরবাদি উপেক্ষিত হয়, তাহা নয়। কিন্তু আমাণিগের দেশে অনেক "জাতি;"

তাহাদের মধ্যে পবম্পরে আহা'র বিবাহাদি চলে না। ইংরাজের ভোজন প্রণালী আমাদেব মতন নাহ, উপবেশন পদ্ধতিও সতন্ত্র। কথা এই, ইংরাজে এবং এদেশোয়ে প্রভেদ এত বেশী যে, তাহার সংখ্যা করা সহজ, সাধ্য নাহ। কিন্তু ইংরাজ বিজেতা, আমবা বিজিত, ই বাজ প্রভু, আমবা দাস। উপযোগী বা অন্ত্রপযোগী হউক, উপকারী বা অপকারী হউক, যাহা প্রভু-সমাজে প্রচলিত, তাহার প্রতি দাসবর্গের একটু টান থাকি স্বাভাবিক। এই কারণে অনেক লোক আমা-সমাজ-বিদ্বেষী এবং পর-সমাজ-প্রিয়। বিদ্বেষ বা অহুসাগ কেবল মনে মনে থাকে ক্রা, কার্যেও পরিণত হয়; এবং তাহা হইয়াছে।

(২) দোকানের সম্মুখে একটা বাঁড় শুই-
রাছিল, ইহাই দেখিয়া একজন ময়রার দোকান
চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। সে গল্প সকলেই
জানেন। ইংরাজ ক্ষমতাশালী, ইংরাজের
জাতীয়ত্ব আছে। ইংরাজ আমাদের প্রভু।
কিন্তু আমরা দাস, এবং আমাদের আছেই
বা কি গুণ! যদি কোন গুণ থাকিত, তবে
দাস হইব কেন? যাহারা ক্ষমতাশালী এবং
প্রভু, তাহাদের মধ্যে যে সকল প্রথা পদ্ধতি
দেখা যায়, বোধ হয়, সে গুলি ক্ষমতা এবং
প্রভুতা বৃদ্ধির উপযোগী। এই প্রকার বিচারে
অনেকে দেশীয় প্রথার প্রতি বিবর্ত্ত এবং
বিদেশীয় প্রথাতির প্রতি অস্বস্তিক। এ প্রকা-
র প্রথা, বাঁড় দেখিয়া দোকান স্থির করিবার
নত। কিন্তু এ প্রকার যুক্তি ও সিদ্ধান্ত
অনেক লোকের পক্ষে স্বাভাবিক।

(৩) ইংরাজ আমাদের রাজা। রাজ্য
সহিত ব্যবহারে ইংরাজী ভাষাই চলে।
কাজেই ইংরাজী শিক্ষা আমাদের পক্ষে
প্রয়োজনীয়। সম্পদ, সম্মান ও গোবব লাভ
করিতে হইলে ইংরাজীতে সুশিক্ষিত না
হইলে চলে না। কাজেই ইংরাজী সাহি-
ত্যের চর্চাই অধিক। ইংরাজ উন্নতিশীল
জীবন্ত জাতি; তাহাদের সাহিত্য, দর্শন,
বিজ্ঞানাদিও প্রভূত। সে সকল বিদ্যায়
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে, ইংরাজের প্রতি অসু-
স্থ হইবেন, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

(৪) যে ব্যক্তি বিস্তৃত ইংরাজীতে লিখিতে
শক্তি কথ্য কহিতে পারে, সে সুশিক্ষিত বলিয়া
আমুস্ত হয়। যে ইংরাজের চালে চলে,
লোকে তাহাকে ইংরাজীতে সুশিক্ষিত বলিয়া
মনে করে, কারণ বহু শিক্ষার ফলে উক্ত
প্রকার চাকি চলনে অসুস্থ হয় বলিয়াই
লোকে অসুস্থ। আদর্শ পুষ্টিবার জন্ত

অথবা মনে মনে আত্মাভিমানের তৃষ্ণা জন্ত
অনেক ইংরাজী প্রথা অস্বস্তিক করিয়া
থাকেন।

(৫) ইংরাজের সহিত মিশিবার আমাদের
বিশেষ প্রয়োজন। দেশের লোকের সহিত
আমাদের মিশ না থাইলেও ক্ষতি নাই;
কারণ চাকুরী ত দেশীয়েরা দিবে না? ইংরা-
জের সহিত মিশিতে হইলে অথবা সৌভা-
ত্যের পথ পরিষ্কার করিতে হইলে, ইংরাজ
যে প্রকা-ব্যবহারে সমুদ্র হইবেন, তাহা অব-
লম্বন করিবার জন্ত লোকে প্রবৃত্তি জন্মে।
“সাহেববা একপ কার্য না করিলে কি
ভাবিবে,” এই চিন্তায় অনেক দেশীয় আচা-
র ব্যবহারাদি বিবর্ত্ত হইয়া থাকেন। তদ্বি-
পর্যায় সাহেবদিনের সামাজিক শিষ্টাচারের
বাধা নিয়ম জানা, এবং তাহা অবলম্বন,
সাহেবদিনের সহিত মিশিবার জন্ত প্রয়ো-
জনীয়। এজ্ঞেও অনেকে ইংরাজী প্রথার
অস্বস্তিক করেন।

(৬) এম কাবণটির আরও একটু বিশদ
বিস্তারিত প্রয়োজন। যাহা উচ্চ পদস্থ,
তাহাদের পক্ষে সাহেবদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা
স্থাপন প্রয়োজনীয় হয়। যাহাদের পারি-
বারিক ব্যবহার ইংরাজ জাতির অস্বস্তিক
নহে, সাহেবেরা তাহাদের বাড়ীতে দেখা
শুনা করিতে যান না। উচ্চ পদস্থ লোক-
দিগের পক্ষে একপ মেশামেশিতে উন্নতির
পথ পরিস্কৃত হয়; সেই জন্ত তাহাদের পক্ষে
ইংরাজ জাতির ব্যবহারাদি প্রবর্ত্তনের
প্রয়োজন হয়।

(৭) অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এমন
অনেক সাহেব আছেন, যাহারা দেশীয় লোক
দিগকে বিদেশীয় প্রথা অস্বস্তিক হইতে দেখিলে
চটয়া বান। “ইহারা আমাদের স্বকল

হইতে চার" ভাবিয়া কষ্ট হয়েন। কিন্তু এ
পকার মনের ভাব অপেক্ষা বিপরীত রক
মেব মনেব ভাব অধিক। সে কথা দৃষ্টান্ত
দিয়া বলিতেছি। এ'জন ভট্টাচার্য্য অব্যাপক
ব্রাহ্মণ নগ্নপদে সামান্য পবিচ্ছদে একজন
স্ববেশে ভূষিত হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত।
সে ব্যক্তি হাকিমের করুণা ভিক্ষা কবে,
তাঁহাকে হুজুর বলে, অথচ তাঁহাব স্পষ্ট অ-
বিদ বলিয়া জ্ঞান করে। ইহাতে হাকিমের
মনে বিবক্তি এবং অভিমান জন্মে। তিনি
ভাবেন যে, যে ব্যক্তি বিজিত, আমি বাহ্যে
রাখা বা প্রভু, এবং যাহা অপেক্ষা আমি কত
শুণে উন্নত, সে ব্যক্তি কেন আমাকে স্নান
ববিবে? কেন সে আপনাকে আমা অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ ভাবিবে? বিস্ময়ে ব্যক্তি ইংরাজের
কবস্মণ পাইলে সোভাগ্যবান ভাবে, ইং-
রাজের প্রথা পদ্ধতি ভা। বা. অবলম্ব-
কবে, এবং স্বদেশীয় অবস্থা যথিত বলিয়া
চিন্তা কবে, তাহাকে দেখিলে হাকিমের
মনে হইবে যে এ স্থানে দেশ ভগ সম্প্র-
হইয়াছে, তাহাই এখানে দাস। কাজে
ইংরাজী প্রথা অবলম্বিত দেখিলে যে ইংরাজ
দেশীয়দিগের উপর বিবক্ত হইয়া থাকেন,
একথা সৰল সময়ে ঠিক নহে। ইংরাজী
প্রথা অবলম্বনে সাহেবদের নিকট সুশিক্ষিত
এবং সংস্কৃত-কচি সম্পন্ন এবং সংসাহসী বল-
িয়াই অদৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা অধিক। একা-
রণেও অনেকে ইংরাজের সামাজিক প্রথার
অনুকূল।

(৮) এমনও অনেক লোক আছেন, যাহারা
বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন করিতেছেন যে, ইংরাজ
জাতির কোন কোন আচার অনুষ্ঠান সমা-
জের পক্ষে কল্যাণকর। ভিন্ন রকমের
আচার ব্যবহার প্রথা পদ্ধতিগুলি দ্বারা দিন

দেখিতে হয়; তাহাতে তাহার শৃণের সমা-
লোচনা ও উপযোগিতার বিচার চিন্তাশীলের
নিকটে অপরিহার্য্য। সুধু চিন্তা কবিয়াই
চুপ কবিয়া থাকেন, এমন লোকও আছেন,
কিন্তু এমন অনেক লোক আছেন, যাহারা
যাহা উপযোগী এবং কল্যাণকর বলিয়া মনে
কবেন, তাহার অনুষ্ঠান কবেন এবং সমাজে
প্রবর্তিত করাইবার জন্ত চেষ্টা কবেন।

(৯) পরিবর্তন নিয়ম। সমাজেই সকল
সমাজেই পরিবর্তন ঘটে। চীন সমাজেও
পরিবর্তন হইতেছে। তাহার পব বিদেশী-
দের সংঘর্ষ, ভিন্ন প্রকারের আচার ব্যব-
হারের সংঘর্ষ। পরিবর্তন নিকর হইবার
নহে, তবে নিয়মিত হইতে পারে।

ভারত সমাজ পরিবর্তন ঘটয়াছে, এবং
প্রাচীনতম অধিকতর পরিবর্তনের দিকে
সমাজ্যবর্তি দৃষ্ট হইতেছে। এই পরি-
বর্তনের ফলে অনেক প্রাচীন আচার ব্যব-
হার, প্রথা পদ্ধতি, বিলুপ্ত হইয়াছে, বা
বিনষ্ট-প্রায় হইতেছে, এবং বহুতর নূতন
প্রথা পদ্ধতি প্রাচীনের স্থান অধিকার
করিতেছে। যাহা কিছু প্রাচীন, তাহাই
মন্দ, এবং যাহা নবীন, তাহাই ভাল, একথা
কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না;
এবং ইহাব বিপরীত কথাও সাহস করিয়া
বলা যে অবিবেচকতা, তাহার সন্দেহ নাই।
পরিবর্তনের ফলে যে কোন ২ উপযোগী
এবং মঙ্গলদায়ক সংস্কার ও অনুষ্ঠান তিরো-
হিত হইয়াছে, তাহা পরে প্রদর্শন করিব।
যাহা উপযোগী এবং মঙ্গলপ্রদ, তাহার
তিরোধানে যে সমাজে অশুভ অশুবিধা
এবং অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তাহা আর বলিতে
হইবে কেন? কোন ২ স্থলে আবার
প্রাচীনতা আঁটুট, রহিয়াছে বলিয়া অধরা

এই পরিবর্তনের সময়ে কালোচিত মঙ্গল-প্রদ নবভাব সমাজ শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারিতেছে না বলিয়া, ক্রেশ, এবং অশান্তি উৎপাদিত হইয়াছে। ক্রেশ অন্তর্বিধা এবং অশান্তি সকলেই অনুভব করে, কিন্তু এ সকল কি কাবণে ঘটিল, তাহা সাধারণ লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পবিবর্তন ইহার কারণ, সন্দেহ নাই : কিন্তু এই পরিবর্তনের কোন অবস্থা ইহার কারণ, তাহা স্থির করা দুষ্কর। এই জন্ত সাধারণ লোকে যে কোন পরিবর্তনকেই অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেছে এবং তাহার বিবোধী হইতেছে। যাহারা শিক্ষিত এবং বিবেচক, তাহাদের মধ্যেও কাবণ নির্দেশ বিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

সামাজিক পরিবর্তনের উপর যখন আমরা দিগেব জাতীয় জীবন নির্ভর করিতেছে, তখন এ বিষয়ের সমালোচনায় যদি সমগ্র বঙ্গ সাহিত্য নিবোধিত হইত, তাহা হইলেও ক্ষতি ছিল না। কতকগুলি কৃশিক্ষিত এবং চিন্তাবিহীন লোকের হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক বাধ্যাক্রম উন্নত চীৎকারে, দেশে কাণ পাতিবার ঘো নাই। সাধারণ লোক সর্বত্রই লঘু-প্রকৃতিক; কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে আমা-

দিগের দেশে এই লঘুতা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, অনেক সময়ে দেশের উন্নতির আশায় হতশ হইয়া পড়িতে হয়। এই কৌশল এবং উন্নততার মনোও কয়েক জন বুদ্ধিমান এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি সামাজিক পবিবর্তন এবং তাহার ফলাফল বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জানি না, এ সকল গ্রন্থ দেশে বহুল পঠিত হইয়াছে কি না। এই প্রবন্ধে যদি সেই সকল গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে সমাজ-সমস্যা কথ্য আলোচিত হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ সেই গ্রন্থগুলির প্রতি অনেক লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারিবে, আশা করা যায়। আমি মুখ্যভাবে তিন জন গ্রন্থকারের পুস্তক অবলম্বন করিয়া সমালোচনা আবদ্ধ করিতেছি; কিন্তু পবোক্ষভাবে অজানা ব্যক্তির মতামতও সমালোচিত হইবে। প্রথমতঃ ৮ ভূদেব মথোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত সামাজিক-প্রবন্ধ, পাবিবাবিক-প্রবন্ধ, আচার-প্রবন্ধ, এবং স্বপ্নলক ভারতবর্ষের ইতিহাস, দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত যুগান্তর এক বক্তৃতামালা; তৃতীয়তঃ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রণীত হিন্দুত্ব, এই সমালোচনার আলোচ্য মূখ্য গ্রন্থাবলী।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ব্রহ্ম ও জগৎ । (৬)

অজ্ঞেয়ং যোহন্তত্বং প্রায়
যে উভে নানার্থে পুরুষঃ সিনীতঃ ।
ভ্রমোঃ প্রায় আদ্যনান্ত স্পৃহু ভবতি
হীন্ততে হর্বাৎ যঃ প্রেরো বুনীতে ।

(কঠোপনিষৎ, ২।১)

গৌড়গ (পরমার্থ) ও প্রের (সুখ) পরম্পর

বিভিন্ন। এই উভয় বিভিন্নরূপে পুরুষকে আবদ্ধ করে। যে এই দুইয়ের মধ্যে প্রেরকে গ্রহণ করে, তাহার মঙ্গল হয়, আর যে প্রেরকে গ্রহণ করে, সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।

(সীতানাথ দত্ত কৃত অনুবাদ)।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা, প্রের এবং প্রের

চিরদিন মনুষ্যের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। আপাত-মধুর অবিদ্যার বিবিধ লাস্ত্রলীলাময়ী মোহিনীমূর্তি দুর্বল মনুষ্য হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে মোহ-মুগ্ধের আয় করিয়া তোলে। মানব তাহার সেই দৌন্দর্য্যে—বাহুবর্ণভূষার আয়ুহারা ও দিগ্-ভ্রাস্ত হইয়া তাহার চরণে আশ্রয়সমর্পণ করিয়া, সেই মোহিনী-দন্ত মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া, সমস্ত ভুলিয়া যায়। কিন্তু দুইটা দিন মাত্র চলিয়া যাউক, দেখিবে, সেই মোহিনীর যে কটাক্ষবিভ্রম তোমার চিত্তের একটা গুণান্তর উৎপাদিত করিয়া তোমায় সর্বতো-ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাই দুইটা দিন পরেই কাল ভুজঙ্গের মত তোমার অন্তঃকবণে হলাহল ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আর তুমি সেই তীব্র বিবেকের আলায় ছটফট করিতেছ;—সেই বিবেক প্রত্যপে তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি, মন, দেহ একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাহাকে পবনামৃতবোধে বাহুজ্ঞান হারাইয়া—প্রাণ ভরিয়া পান করিয়াছিলে, হায়! তাহাই আজ—এই দুই দিনের পরেই—ঘোরতর জালাময় বিষাকারে পরিণত হইয়া তোমার অন্তর্দাহ উপস্থিত করিয়াছে। অবিদ্যা রাক্ষসীর প্রতাপই এইরূপ; সংসারাসক্তির পরিণামই এইরূপ। এইরূপেই ঐ দুটা মানবকে মজাইয়া তাহার সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যা একরূপ নহে। বিদ্যার সংসর্গে ঋতুযাত্রদয় এক অপূর্ব পীযুষধারায় অভিষিক্ত হইয়া থাকে। যদিও, বিদ্যা যখন প্রথম মুহূর্ত্তে মানবের নয়নপথবর্ত্তী হয়, তখন যদিও আপাততঃ তাহাকে বড় কদা-কার বলিয়া বোধ হয়; বড় ভয়ানক বলিয়া মনে হয়, তথাপি ইহার সংসর্গ পরি-

ণামে অমৃতরস অভিসিক্তন করিয়া দেয়। বিদ্যা যখন প্রথম উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন এ কি এ? কে এই ঘনকৃষ্ণ বসন পরিধান করিয়া, ঘোরকৃষ্ণবসনে স্বীয় শরীরের সর্বাংশ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিয়া আমার সম্মুখে উপনীত হইল? কে এ, যাহার শরীর হইতে—যাহার আচ্ছাদিত বপুঃ হইতে দারুণ জ্যোতিরিশি বহির্গত হইয়া একটা দারুণ উষ্ণতার উচ্ছ্বাস আন্দোলিত করিয়া তুলিল? কিন্তু একবার ঐ অবগুণ্ঠন মোচন কর, ঐ তেজ একবার মাত্র কোন রূপে সহ করিয়া উহাকে হৃদয়ে তুলিয়া লও, দেখিবে, কোথায় সে কৃষ্ণচ্ছায়া চলিয়া গিয়াছে, কোথায় সেই দাহকারী তেজ অন্তহিত হইয়াছে। তাহার পরিবর্তে কমনীয় পরমাশান্তি বিধায়িনী ও সহস্রাক্রেশের পরমৌষধিময়ী স্নেহমাধা একটা দেবীমূর্তি প্রোতভূত হইয়া গুহ্র-হাস্তের কিরণমালায় তোমার হৃদয়ে এক অতি সুন্দর স্রবমাব আবির্ভাব করিয়া দিয়াছে!! বিদ্যার প্রতাপই এইরূপ; আপাতকঠিন হইলেও পরমার্থের পরিণামই এইরূপ।

এই অবিজ্ঞার নাম জগৎ এবং এই বিজ্ঞার নাম ব্রহ্ম। জগৎ ও ব্রহ্ম, অবিজ্ঞা ও বিজ্ঞা দ্বারা মানব দৃঢ়নিয়মিত এবং নিয়ত-নিবদ্ধ। শ্রুতি বলেন—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত শ্তৌসংপরীত্য বিবিনাক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোহভিশ্রেয়সো বৃণীতে শ্রেয়ো নন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।” (কঠোপনিষৎ)।

“জ্ঞানী ব্যক্তিই ব্রহ্মকে গ্রহণ করে, আর অজ্ঞবুদ্ধি ব্যক্তিই যোগ-ক্ষেম-অভিলাষে সংসারে আসক্ত হইয়া পড়ে।” হায় মনুষ্য! এই মহা দাবদাহদাক্ষণ সংসারে শতবার স্রবৎ হইয়াও বুঝিলে না! ব্যাধ

নিগূঢ়রূপে দূর হইতে জাল পাতিয়া রাখি-
রাছে;—ভূমি তাহাতে শতবার পড়িয়াও,
আবার বহিঃ-মুখ-বিবিধ পতঙ্গবৎ, তাহাতেই
পড়িবার জন্ত পুনরপি ধাবিত হইতেছ।
হায়! এমন করিয়া কি লোকে মজিতে
পারে? এমনি করিয়া কি বুদ্ধি-জ্ঞান-
বিশিষ্ট মানব নিজপদে কুঠারাঘাত করিতে
পারে? হা অন্ধ! ঘোরাক্ষরে ক্ষণ-
প্রভাবৎ—যে একটু ক্ষণিক সুখের আশায়
এইরূপে নিয়ত প্রধাবিত হইতেছ,—জানি-
তেছ না যে, উহা পরক্ষণেই আবার তোমা-
রই চক্ষে শত-শতী-ভেদ্য অন্ধকারের দারুণ
জ্বালার আবির্ভাব করাইয়া তোমায় পথভ্রান্ত,
ক্ষুব্ধ ও পাতিত করিয়া দিবে? তাই বলি,
এমন অন্ধতা কেন? দেখিতেছ, বুঝিতেছ
যে, যাহার আশায় জালে পড়িতেছ, সে যে
ছই দিনের জন্য। যাহা ছই দিনের অন্য—
যাহার পরিগ্রহ পরক্ষণেই বিবাদ আনিয়া
দেয়,—যাহার প্রাপ্তি পরমুহূর্ত্তেই আরও
আশা বাড়াইয়া দিয়া নিয়ত চিত্তচঞ্চল্য-
জনিত ঘোর তৃষ্ণার উৎপাদন করায়,—
বলি, বুঝিয়া, জানিয়া দেখিয়া—এই স্বাধী-
নতা-পূর্ণ মানব তাহার জন্ত এত লালায়িত
হয় কেন?

“অবিদ্যামায়মন্তরে বর্তমানঃ,
স্বয়ম্ভীরাঃ পণ্ডিতম্ভন্যমানাঃ ।
নন্দম্যানাঃ পরিযন্তি যুগাঃ,
অজ্ঞেনৈব নীরমানা বধাক্ষাঃ ।”

এইরূপ মূঢ়ের জ্ঞান ইত্যন্ততঃ বিক্ষেপ-
কারি-অবস্থা সাধ করিয়া লোকে ভাকিয়া
আদ্য কেন? মানবমনে বিধাতা শক্তি
(Preferential Power) এবং স্বাধীনতা
(Free-will) নিহিত করিয়া দিয়াছেন।
একটু পরিত্রাণ করিলেই, মনুষ্য আপন-
পুথের কণ্টক ছাড়িয়া লইয়া, সুখম করিয়া

লইতে পারে। তবে কেন এই অজ্ঞানতা?
তবে কেন নিজ হাতে তুলিয়া বিষ-পাত্রে
চুষন? কে বলিবে, ইহার কারণ কি?

মানুষ নিজেই নিজের পথে, অতি যত্নে—
ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বহস্তে—কণ্টক রোপণ করিয়া
ফেলিয়াছে। সাধে এ সংসার দুঃখময়?
সাধে কি এই দারুণ যন্ত্রণা ও হাহাকার অহ-
রহ মনুষ্যকে ব্যতিব্যস্ত ও দিশেহারা করিয়া
তুলিয়াছে? এই যে চীৎকার, এই যে
চারিদিকে ভয়াবহ দাবানল জলিয়া উঠিয়া—
ঘোরগজ্জনে অশান্তির উষ্ণবায়ু চালিত
হইয়া, প্রতিমুহূর্ত্তে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া
দিয়াছে,—ইহা মনুষ্যের স্বহস্তে-বিরচিত
কার্য্যের পরিণাম মাত্র! এ দুঃখের জন্য
দায়ী কে? ঐ যে অদূরে ভয়াব্ধ অন্নহীন
কঙ্কাল-মূর্ত্তির “ভিক্ষা দে”—“মুষ্টিভিক্ষা দে”
চীৎকার ও আর্তনাদ শুনিতেছ—ঐ যে
নীরব নিঃশ্বাসপ্রসৃত অমৃতপ্ত পাপীর অক্ষ-
সিক্ত-বদনে নৈরাশ্যের ভয়াবহ চিহ্ন দেখি-
তেছ,—কে ইহার জন্ত দায়ী? পুরাকালে
খ্রীষ্টানদিগের সেই সুবিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থে যে
আদিম নরনারীর বিধাতার উদ্ভাষিত “ফল-
হরণ” বৃত্তান্ত রহিয়াছে, তাহাতে যে বিধা-
তার আদেশ-উল্লঙ্ঘন-জনিত মানবজাতি-
মধ্যে প্রথম দুঃখ ক্লেশের বীজ উদ্ভূত হইবার
অতি মনোহর গল্প লিখিত আছে,—ভূমি কি
মনে কর, উহা উপন্যাস মাত্র? যদি তাহা
মনে করিয়া থাক, তবে আমি বলিব, ভূমি
ভুল বুঝিয়াছ! আমি বলি, উহার প্রত্যেক
অক্ষর সত্য। মানবই ত নিজে মাধ করিয়া—
ইচ্ছাপূর্ব্বক—এই ধরাধামে—মঙ্গলময় জন্ম-
রের পরমমঙ্গলময়রাজ্যে—এই দুঃখবহির
বীজ নিজ হাতে রোপণ করিয়াছে। তাই ত
এই ক্রন্দন! তাই ত এই হায়! হায়! তবে

দিগন্ত অহর্নিশ প্রতিধ্বনিত !! দুইটা ভিন্ন পথ ছিল না। মনুষ্যের চলিবাব জ্ঞান, বিধান এই রাজ্যে দুইটা মাত্র পথ ছিল। যথোপযুক্ত ক্ষমতাবশত অভাব ছিল না; বিধাতা শক্তিও দিয়াছিলেন। তুমিই ত ভুল করিলে ! তুমিই ত দৈবদত্ত স্বাধীনতাব অপব্যবহার করিয়া ফেলিলে। এক পথ দিয়া চলিলে শাস্তি পাইতে, চাপ থাকিত না, বিধাতার পুত্র বিধাতার নিকটেই পৌঁছিতে পারিত। তখন তোমার হাত্রে এসংসার হাসিত, তোমার স্ত্রী পুত্র আত্মীয় হাসিত। তুমিই ত পথ বাছিয়া লইতে পারিমে না। সেই স্রবের পথ ছাড়িয়া দিয়া, এই চাপের পথ দিয়া চলিতে আবদ্ধ করিলে। যখন চাপে পথে, পাপ পথে ইচ্ছা পূর্বক তুমি পদ-নিষ্ক্ষেপ করিয়াছিলে, তখনই ত বিধাতা তোমার বিবেক (Conscience) দ্বারা ঐ পথে চলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কৈ, তুমি ত তাঁহার আদেশ গ্রাহ্য করিলে না। সেই দিনই ত তোমার 'কপাল ভাঙ্গিয়াছিল'। সেই দিনই জানি, তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছিল'। সেই দিনই জানি, তোমার অদৃষ্ট পড়িল। তাই বলি মানব। তুমি দোষ দেও কাহাকে ? নিজে যে পথ বাছিয়া লইয়াছ, কাহারও আদেশ না শুনিয়া, স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া—যে পথ দিয়া চলিয়াছিলে, সে পথে আজ যদি তোমার পদে কণ্টক বিদ্ধ হয়, সে পথে আজ দস্যু-তরুর তোমার সর্বস্ব লুটিয়া লয় ও তোমার জীবনাস্ত উপস্থিত করে—তবে সে জ্ঞান দায়ী কে ? সে জ্ঞান কে দোষী ?

অদৃষ্ট বল, কর্মফল বল, ভগবদিচ্ছা বা বিধাতার লীলা, যাহাই বলনা কেন, একথা কিন্তু স্থির নিশ্চয় যে, মানব সংসারে বিজ্ঞ-

দিত থাকিয়াও, উহার আপাততঃ মনোমুগ্ধ-কব লীলার বিষম পরাক্রমে আত্মহারা হইয়াও, যাহা বা দৃঢ়চেতা,—যাহা বা স্বাধীনতা ও শক্তির পরিচালনা করিতে পারেন, তাহার জানেন যে না, না, সংসারের এ পদগোরব, এ বিভা-বিভব, এ ক্ষমতা-ঐশ্বর্য, এ সুখ-সম্পদ ইহা বা কিছুই নহে। ইহাদের জ্ঞান, অসাবের পরিভোগেব জ্ঞান, প্রাণীরা জ্ঞোব শ্রেষ্ঠ জীব মানব কখনই নির্মিত হয় নাই। অবিজ্ঞাব জ্ঞান মানব নহে। মনুষ্য বিদ্যার জ্ঞান। ক'ই বলি, নাই কি ? তেমন মানুষ আছেন, যাহারা "জগৎকেব" মনোমাদন বেগুনাদে মুগ্ধ হন না। তাহারা চান, সেই আশ্রাব—"বন্ধেব" স্ফুটতব বংশীরব। যাহারা দুইচারি দিনেব সুখসম্পদে, ভোগ-বিলাসিতায়, গা ঢালিয়া দেন না; তাহারা চাহেন, সেইরূপ আনন্দ, যাহাব আর কদাচ বিরাম ঘটিবেনা; যাহা পরিণামে বা ভোগে দিবস হইবে না; এবং যাহা পাইলে আর অজ্ঞ কোন আনন্দের অভিল্যষ থাকিবে না।

সে আনন্দ কিরূপ ? সে আনন্দ,—এক মানব ব্রহ্ম। এ নীরস জগতে সে আনন্দ মিলে না। ঐ বিশাল আনন্দের মহাসাগর সেই একমাত্র ব্রহ্ম। যাহা হইতে এ জগৎ প্রকটিত, অথবা যাহা ভিন্ন জগতে বিভীষ কিছুই নাই,—সেই আনন্দে মজিলে আর কিছুতেই চিত্ত মজিতে চায় না। তাহাকে পাইলে আর মন কাহাকেও পাইতে চায় না।

সাংখ্য, শ্রায় ও বেদান্ত—সমস্ত দর্শনেরই এক মাত্র প্রয়োজন "নিরতিশয় আনন্দলাভ"। সেই নিরতিশয় সুখ কি ? বেদান্ত বলেন— "নিরতিশয় সুখক ব্রহ্মেব"। আমরা এই প্রবন্ধের বিগত পঁচ সংখ্যায় সেই আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জগৎকেব সম্বন্ধ বিষয়ে

ত্রিবিধ দর্শনের ত্রিবিধ সিদ্ধান্ত দেখাইয়া আসিয়াছি। সেই প্রণালীবয় পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু ‘প্রণালীতে’ যত মতবৈধ থাকুক না কেন, ‘ব্রহ্ম প্রাপ্তি’ সম্বন্ধে ত্রিবিধ দর্শনের কোনও রূপ মতবৈধ নাই। এখানে এক পথ। এখানে “ঋজু কুটিল নানা পথজুবাং নূনানেকৌ গম্যস্বমসি পরসামন্য ইব”। এখানে গম্য-স্থান একটা মাত্র। সমুদ্র দর্শনের মতে, এ আনন্দলাভের উপায়—এ বিদ্যাপ্রাপ্তির এবং অবিদ্যা-পরিহারের—

একমাত্র উপায় জ্ঞানাজ্জন। একমাত্র ‘জ্ঞান’ উপাজ্জন করিতে পারিলেই সংসারাসক্তি আপনা আপনি শিথিল হইয়া যায়। তখন চিত্তবিক্ষেপ দূবে যাইয়া নিবর্তনায় আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। একমাত্র জ্ঞানই, ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বাব স্বরূপ ও মোক্ষ জনক। “তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নাশ্চ পশ্চাবি দ্যাতেহয়নাব”। এজ্ঞান কিসে লভ্য করা যায় দর্শনশাস্ত্রে তাহাবও নামাংসা আছে। কিন্তু সে কথা আব একদিন বলিব।

শ্রীকোর্কিলেশন ভট্টাচার্য।

আম্বুর-যুদ্ধজয়ী বীরের কথা।

মানব জীবন এবং সংসার-প্রাপ্তি মহা সংগ্রামময়। অন্তরে এবং বাহিরে অবিরত মহা সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে নর-নারী আকুল, ব্যাকুল এবং অস্থির। ছনিবার্য তাহার আক্রমণ, ছরতিক্রমণীয তাহার পবাক্রম, স্ফুটিভেদ্য তাহার তীব্রতা। মহা-সংগ্রামে সকলে হ্রাহি হ্রাহি বনে ভুবন পূর্ণ করিতেছে। প্রজ্জ্বলিত চুম্বিয তীব্র দাহন, মহা শঙ্কট। মানুষ অবিরত তাহাতে পুড়িয়া মরিতেছে। বুঝিবা এ সংসার রসাতলে যায়!

অন্তরে মহাসমর—শ্রেয় এবং প্রেয়ে,—নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিতে, বৈরাগ্য এবং আসক্তিতে। শ্রেয়ের, নিবৃত্তির এবং বৈরাগ্যের মহা অস্ত্র—সংযম। প্রেয়ের, প্রবৃত্তির এবং আসক্তির মহা অস্ত্র—মোহ এবং অহংকার। সংযম, ক্রমাগত, তরঙ্গায়িত মহা সিন্ধুস্ত্রের কর্ণধারের জাল, স্বর্গের সোজাপথ হারাবকে দেখাইতেছে,—এক গতি, এক-

লক্ষ্য, এক পবিপাম—একই মুক্তি। বলিতেছে—“চাকল্য বিনাশ কর, কঠোর হইতে কঠোব হও, রিপুকে সাধন-স্বপ-কাঠে বলি দেও, তাবপব সবলমনে সবল পথে চল। না-ই বা পাইলে লোকের প্রশংসা, না-ই বা পাইলে জগতের সম্মান, না-ই বা পাইলে ধন ঐশ্বর্য, তাতে কি? ঐ দেথ স্বর্গ, ঐ দেথ মুক্তি, ঐ দেথ ভক্তি, ঐ দেথ প্রেম-ময়ী মহাবিদ্যা—না। কি ছাব সংসার, উহা ক্ষণস্থায়ী, ছুদিনের, এ শরীর অস্থায়ী, এরিপু সকল অস্থায়ী। ইন্দ্রিয়গণ অস্থায়ী। সার এবং নিত্য-কালস্থায়ী যে অবিনশ্বর প্রেম পূণ্য, যোগ ভক্তি, তাহার জন্ত লালায়িত হও,—দেখ, দেখ, চাহিয়া দেখ, ঐ বিশ্ব-বিমোহিনী, অরূপ-রূপ-ধারিনী, নিরাকার-সাকার চিত্তরী মাতৃমূর্তি। বল মাঠে: মাঠে:—কিসের ভয়? রিপুকুলকে বলি দেও, ইচ্ছা এবং বাসনা-দৈত্য সকলকে বিনাশ কর, নিবৃত্তি-নিরাজনা-তটে স্বত্তর ইচ্ছাকে বিসর্জন

দিয়া, দেব-বসন পবিধান কবিয়া, নিকাম
 সৌন্দর্যবেশে মহামায়া মহা পবিত্র মন্দিরে
 প্রবেশিত হও ।” শ্রোয়ের এই স্তমহান, সুপ-
 বিদ, অমোঘ উপদেশ নির্দেশিত পথে চলিতে
 কাহাব না সাধ হয় ? মানুষ অন্তরে মহে
 স্ববীৰ মহাবাহী শুনিয়া দলে দলে ছুটিতেছে ।
 দীপুকব, জ্ঞানী মুখ, ধনা দবিজ, বুদ্ধ বালক,
 অবিভেদে সকলে দল বাঁধিয়া মহাপ্রাঙ্গণে
 ছুটিতেছে । একটী নয় দশটা নয়—কোটা
 কোটী নবনাবী সমবেত, কোটী কোটী
 সম্প্রদায় একত্রিত । মানস ভেদাভেদ ভুলিয়া
 যেন মহাপাণ্ডব বদ্ধ হইয়াছে । সকলে
 কণ্ঠেব বলিষ্ঠাচ মাইতঃ মাইতঃ । এত একি ?
 আসিতে আসিতে সকলেই থামিয়া যাই-
 তেছে কেন ? কোটী কোটী লোক যাহা
 কবিরাজি লক্ষ্যে আসিল কণ্ঠ—এখা
 ধামে পৌছিল কণ্ঠ ? কে যেন সকলকে
 পথ হঠাত ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে ।
 সত্য সত্যই পথে মহা সংগ্রাম বাঁধিয়া গিয়াছে ।
 মার-পিণ্ডনেব অনাচারে বাণীশ্বর অস্তুর ।
 পেয়েব মহাদূত মোহ এত মায়া, পথিমধ্যে
 যাত্ৰীগণকে অধুসারে যেন জিজ্ঞাসা কবি
 তোহে কোথায় যাব ? দুই ফেননিত অশ্রুশয্যা
 ভুলিয়া, স্ত্রের নিকেতন যুবতী ভাৰ্যা পবি
 ভাগ কবিয়া কোথায় মতিতে যাইতেছ ?
 মানব-শাকা ফের, ফের, ফের । ঐ পথে
 ইঞ্জিয়-নিগ্রহ, বিপ্লু-বিচ্যুতি, শবীৰ-পাত,
 বিপদ, বিপদ—কেবল বিপদবাশি । জ্ঞান
 আহার নাই, পিপাসাব জল নাই, শবনেব
 শয্যা নাই, ইঞ্জিয়েব পরিভূপি নাই—নাই,
 নাই, কিছুই নাই । সুখ নাই, তৃপ্তি নাই,
 ধন নাই, সম্পদ নাই, গাড়ী নাই, বাতী নাই,
 বশ নাই, সম্মান নাই, আছে কেবল কষ্ট,
 দুঃখ, এবং বিপদ । কেন মত্ত মাতঙ্গের মত

ধাউতেছ, ফের, ফের । এ রাজ্যে আমি
 তোমাকে রাজা করিয়া দিব । রিপূর পরি-
 চর্যাব জন্ত দাস দাসী দিব, বিলাসেব উপ-
 যোগী আতব দিব, গোলাপ দিব, আর কি
 চাও ? বশ দিব, মান দিব, গাড়ী দিব, বাতী
 দিব । ফের ফের, দেশেব মধ্যে এক মহাজন
 হওয়া থাক ।” মানস চাহিয়া দেখিল, কি একটা
 মানমুগ্ধকব মূর্তি দাঁড়াইয়া মোহন সুরে এই
 সব কথা বলিতেছে । আবে কি পা চলে !
 কুহক-মগ্নে সে যেন হত জ্ঞান, আনিত
 আসিতে দাঁড়াইতেছে, কেহ পলাইতেছে,
 কেহ অগ্রসব হইতে হইতেও ভাবিতেছে ।
 এই স্তলে সংঘম এবং অহঙ্কার ও মোহেব
 ভাষণ বৃদ্ধ হইতেছে । এই মহা সমবে—
 মানুষ্যব জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, সব লোপ পাই-
 তেছে । শেষে অনেক মানবই পবাজিত হই-
 তেছে । আসিতে আসিতো কবিয়া যাইতেছে
 পোণে ষোল আনা লোক । লক্ষ্যে পৌছিয়াছে,
 এ জগতে কয় জন ?—অশ্রুলিৰ কর গণিয়া
 তাহা নির্দেশ করা বাইতে পাবে ।

এই ত গেল ভিত্তবেব বৃদ্ধ । বাহিবেব
 বৃদ্ধ ইহাবই পাতকপ, কিস্ক আবো ভাষণতব ।
 ভিতরে যাহাব উপদেশ, বাহিবে তাহাব কাজ ।
 দলে দলে লোক ধন্য-মন্দিরে আসিতেছিল,
 পথে কাহাকেও সন্দেহী স্ত্রীর প্রলোভনে,
 কাহাকেও অধর্মের কুহক মস্ত্রে ভুলাইয়া নব-
 কেব পথে লইয়া যাইবাব জন্ত পাপ দম্মাগণ
 অবিবত চেষ্টা কবিতেছে, টানাটানিতে সকলে
 অস্থির । কেহ বাব আনা পথ আসিয়া বৃদ্ধ বয়সে
 শেষে যুবতীব প্রণয়ে পড়িয়া মারা গেল, কেহ
 বা টাকার মায়ায় দয়া মারা বিসর্জন দিয়া নি-
 স্কম-রাস্তার গণভেদী বড়মাজুৰী কুটীর নি-
 স্কণ করিয়া ধনে মানে পুজিত হইতে লাগিল ।
 ভিতরের যুদ্ধের আড়ম্বর নাই, শব্দ নাই—কিন্তু

বাহিরের যুদ্ধের আড়ম্বরে ও হুজুগ-শব্দে জগৎ পরিপূর্ণ। ভীষণ সংগ্রাম। কেহ গৈরিক জামা আঁটয়া, গৈরিক পাগড়ী মাথায় দিয়া ধর্ম্মমন্দিরে যাইতেছিলেন, অমনি আসক্তি-সিপাই ও চৌকিদার তাঁহাকে কাণে ধরিয়া গাড়ীতে চড়াইয়া, প্রাশংসা বশের মুকুট মস্তকে তুলিয়া মহাবাদ্য সহ আগন্তিক রাস্তা বরাবর যুবাইয়া বেড়াইতেছে; এবং জগৎকে দেখাইতেছে, কার শক্তি কত? কেহ স্ত্রীপুত্র পবিত্র্যাগ করিয়া লক্ষ্যে যাইতেছিলেন—প্রত্নিত তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া সহস্র নাবীর এক-পতি করিয়া বিদ্যাসেব মধ্যে শোষণইয়া দিতেছে! এবং দেখাইতেছে, কার শক্তি কত? কেহ ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া, চিরকোনা-ব্রত বইয়া বজ্রতার চোটে গগন ফাটাইত, আজ সংসার-যোগ-মন্দিরে তাহাকে বমণীর পদ-তলে লুপ্তিত করিতেছে, কেহ প্রতিবাদকূপ মহা অস্ত্র হস্তে করিয়া পাপী দমনের জন্ত ধর্ম্মের সহস্রে ঢুকিয়াছিলেন, আজ তিনি মত্তমাত-ঙ্গের জ্বায়া পাপ-পঙ্কে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, এবং নিজ-স্বভাব দোষে, তবুও, আজও অন্তের নিন্দা করিয়াই স্বীয় স্বভাবের পরিচয় দিতেছেন। মহারাজ্যে মহাসমর—মহা সংসার-চক্র-ব্যাহে শত শত অভিমত মহারথী প্রাণ হারাইতেছেন! সংসারটা বুড়িয়া এখন বেন কেবল দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতেছে। জয় পরাজয় বিধাতা অন্তরীক্ষে থাকিয়া লিখিতেছেন। মহাচক্রী মহালীলা।

পাঠক, কলকাল ভাবিয়া দেখ—কথাগুলি সত্য কি না? তোমার অন্তরে বাহিরে মহা সংগ্রাম চলিয়াছে কি না? তুমি যাহা করিবে জ্ঞাপিতেছ, করিতে পারিতেছ, না পদে পদে বাধা পাইতেছ? পদে পদে তোমাকে প্রতি-

কূলের হস্তে লাজিত এবং অপমানিত হইতে হইতেছে কি না? ভাবিয়া বলত, যাহা বলিতেছি, তাহা ঠিক কি না?

পৃথিবীর ধর্ম্ম-ইতিহাস একথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই যে, যুদ্ধে পুণ্যবলেরই জয় হইতেছে। অসংখ্য জাতি এবং সম্প্রদায় আত্মব-সংগ্রামে পরাজিত হইয়া মরণের পথে যাহেনও, এখনও পুণ্যবলের শক্তি অপরাজিত। কিন্তু সে পুণ্যবল্য এবং সে পুণ্যজাতি আজ কোথায়, সেখানে কেবল সংঘের জয়, মোহ এবং অহঙ্কারের পরাজয়। আমি খুজিয়া খুজিয়া হারান হইলাম, সে রাজ্যের খোজ খবর পাই না। হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রিস্টান, সব সম্প্রদায় খুজিয়া দেবিয়াছি, সেই জনাবিল, অপরা জিত, বিনয় পুণ্যজ্যোতি অতি অল্পই দেখিয়াছি। নবোদিত ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের কথাই বল এবং পুনঃপতিত হিন্দুসম্প্রদায়ের কথাই বল, পুণ্যজ্যোতিতে বাঁহাব বদন উজ্জ্বল হইয়াছে, মহাসংঘমে বাহার রিপুকুল ধংশ হইয়াছে, চাবুকের অজেয় সিংহাসনে বেদুত এবং অটল, নির্ঝিকার এবং নিরমল, সদা প্রবল এবং নিরলস, এমন লোকের সহিত অতি অল্পই সাক্ষাৎ হইয়াছে। গেকরা পরিষা ধনের পুটুলি লইয়া বিলাস গাড়া হাঁকায়, এমন গোঁগী দেখিয়াছি, যুবতীর চরণে চরিত্র উৎসর্গ করিয়া মহাজনত্ব পায়, এমন ধার্মিক ও? দেখিয়াছি;—দীর্ঘ তিলকবানী নিরামিষ-ভোজী পর ধন লুণ্ঠনকারী বৈষ্ণব দেখিয়াছি, দীর্ঘ উপাসনা-মগ্ন হিংস্রক, নিন্দুক, কপট, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী ভণ্ড তপস্বী দেখিয়াছি, কিন্তু এমন লোক কম দেখিয়াছি, পাপে পরাজিত হওয়া বাহার পক্ষে অসম্ভব, যিনি জীঠের জ্বায়া বিগুহ চরিত্রে চিরকোনার্য অবলম্বন

কবিয়া, কেবল পরসেবায় এবং পরচিন্তায়
জীবন কাটাতেছেন। ধর্ম কথায়, উপাস-
নায়, বক্তৃতায়, পোষাক পরিচ্ছদে, না চরিত্রে
এবং জীবনে, তুমি ভাই বণিতে পার কি ?

সুদীর্ঘ জীবনপথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া দুই
দশ জন আড়ম্বরহীন জীবন্ত, জয়ী সাধকের
সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে মাত্র। আর
যত দেখি, সব যেন সংসার-সংগ্রামের পব-
জিত জীব। আজ এক বারের কথা বলিতেছি।
একজন পরিদর্শক — তিনি চিরকুমাব—
এখন তাঁহার কাল চুল নাড়ি খেতে হইয়াছে
—এবং কলিকাতায় মাদোৎসব দেখিতে
আসিয়াছিলেন। যখন পূর্ণ উৎসাহে মাদোৎসব
চলিতেছে, এমন সময়ে তাঁহার একজন “বসু
দেব-কুটুম্বকম” আত্মীয়ের দাক্ষণ্য অব হয়।
মাদোৎসব কোথা দিয়া চলিয়া গেল, তিনি
ঐ রৌপ্যের শয্যাপাশ্বে বাসিয়া অহবহ কেবল
শুশ্রূষা করিতেছেন। সভা হইল, সমিতি
হইল, কত উপাসনায় কত ভবেন প্রাণ সরস
হইল, কত বক্তৃতার স্রোত বহিল, কত
ইভিনিং-পার্টিতে আমোদ চলিল, বৃদ্ধের
উৎসব-ক্ষেত্র বোগী শয্যা। আজ ফান্টন
মাসেব ১০ তারিখ। আজ তিনি “বসুদেব-
কুটুম্বকম” দেশে যাত্রা করিলেন !! উপাসনাই,
নৃত্য নাই, বক্তৃতা নাই, কথা নাই,—নাঁবব
আড়ম্বরহীন একটা বৃদ্ধ কেবল দরিদ্র সেবা,
কেবল পরসেবা করিয়া বসে হইতেছেন। সাধন
তাঁহার পরসেবা, যোগ তাঁহার পরসেবা, বক্তৃতা
তাঁহার পরসেবা—জীবন তাঁহার পরসেবা।
খাটিয়া খাটিয়া, কেবল পরের জন্ত খাটিয়া
খাটিয়া জীবন প্রায় শেষ করিয়াছেন। তাঁহার
নাম এদেশের বড় কেহ জানে না।
তাঁহার কথা বড় কোন সংবাদপত্রে উঠে
না। তিনি বে দলে, তাঁহাকে লইয়া সে দলও

বড় উচ্চবাচ্য করে না। গাড়ী নাই, বাড়ী
নাই, সহায় নাই, সঞ্চাল নাই, তিনি গরিব,
তিনি অতি গরিব। তাঁহার মান নাই, সম্মান
নাই, তাঁহার আহার সামান্য—কেবল কতক-
গুলি শুধু ভাত বলিলেই হয়। পরিধান সামান্য
—কেবল সামান্য খানের কাপড়। আকৃতি
চেহারা, কিছুই ভাল নহে। তিনি বড় গরিব,
তিনি বড় গরিব। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে,
বোধ হয়, তিনি যেন জীবন-সংগ্রামের মহা-
সুদ্ধে জয়লাভ কবিয়া আসিয়াছেন। আমুর-
সংগ্রামে কেহ কখনও তাঁহাকে পবাজিত
হইতে দেখে নাই। তাঁহাকে দেখিলে, বোধ
হয় যেন, তাঁহার খেতে ক্ষুধা ভেদ করিয়া কি
এক স্বর্গীয় পবিত্রতার জ্যোতি বাহির হই-
তেছে। মুখে কথা নাই, তবু শাস্ত আছে;
হাত নাঁবব, কিন্তু কাজে ভরা; সে জয়ী বীর
মৃত্যুর রাজ্য ছাড়িয়া এক অমৃত এবং
অমর রাজ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। দেখিয়া
দেখিয়া, আমি সে অপরূপ দেখিয়া দেখিয়া
মজিয়াছি। তিনি দেশবিধাতা বিবেকানন্দ
নহেন, তিনি অমর ভক্ত কেশবচন্দ্র নহেন,
তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নহেন, তিনি নেতা
শিবনাথ নহেন, তিনি যোগী বিজয়কৃষ্ণ নহেন,
তিনি বড় গরিব, তিনি বড় গরিব। তিনি যেন
রিপু জয় করিয়া অমূল্য সংযমব্রতে দৃঢ় এবং
বলিষ্ঠ। শুনিয়াছি, তিনি বেস্তানে থাকেন,
সেখানকাব লোকেরা গরী বলিয়া তাঁহাকে
মাঝ করে। ব্রাহ্মসমাজের আর সব লোককে
যাহারা নিন্দা করে, তাহারাও তাঁহার নাম
শুনিলে অবনত-মস্তক। তিনি চরিত্র-গুণে
অমর ভূবনমোহনরূপে প্রতিষ্ঠিত। সে গরিব,
এই ধরায় যেন কি এক নিত্যানন্দ লাভ
করিয়া মহাবীর হইয়াছেন। তাঁহাকে প্রশংসা,
তাঁহাকে কোটী কোটী প্রশংসা।

আমি সংসারে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দি, যিনি অতীন্দ্রিয়ত্ব পাইয়াছেন ; যিনি অসার ছাড়িয়া সার ধরিয়াছেন, যিনি নিজ ইচ্ছা এবং নীচবাসনাকে পরাজয় করিয়া দেব-ইচ্ছাব অনুবর্তী হইয়াছেন। তিনি রাম-কৃষ্ণই হউন, বা তিনি শাকা-সিংহই হউন, তিনি যেরূ-তনয় যিহুই হউন, বা তিনি ম্যাটসিনিই হউন, তাঁহাকে কোটী কোটী প্রণাম। আর আমি, তুমি, সে, বাহাবা কেবলশ্রোত-ভাডিত শৈবালেনব্রাহ্ম প্রবৃত্তি-ভাডনায় ভাসিয়া ভানিয়া সংসারের ঘাটে ঘাটে, তটে তটে কিবিত্তেছে, তাহাবা নীচ হইতেও নীচ, দীন হইতেও দীন। আমবা প্রতিমহুর্ন্তে সংসার সংগ্রামে পরাজিত হই-তেছি এবং অহঙ্কারে জগৎ কাপাহিয়া নিজ নিজ প্রাবান্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতেছি ! আমা-

দের টাকা কড়ি, যশ মান, বিদ্যাবুদ্ধিতে ছাই পড়ুক। বাহাতে আমাদিগকে অমর কবিত্তে পারে না, তাহাকে আন্দব করিয়া বৃথা জীবন কাটাইলাম ! প্রবৃত্তি-সাগরে ভাসিলাম, কিন্তু নিবৃত্তি-হ্রদে ডুবিলাম না। মোহে মজিলাম, কিন্তু সংসারের অতীত হইতে পাবিলাম না। পরাজিত হইতে জন্মিয়াছি, প্রবৃত্তিকুলে দ্বাধা পরাজিত হইতেই লাগিলাম। আমাদেব সাধন ভজন সবই ভগ্না নহে কি ? অটল ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া, প্রবৃত্তিকে পরাজয় কবিয়া, সংসারে এক যান সহায় কবিয়া যে ব্যক্তি যশ মানের অতীত ধামে নিব্বিকাল, নিগিষ্ট এবং নিবলস না হইতে পাবিল, তাহার কায্য কি মহাছেলেমা নয় ? কে বলিবে, নয় ?

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

৩৬। আসাম প্রদেশের বিশেষ বিবরণ ।—শ্রীশবচন্দ্র দত্ত ও শ্রীগঙ্গাগতি দাস প্রণীত, মূল্য ১/০ ; কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রীট, এম, এম, মজুমদারের দোকানে প্রাপ্তবা। আমবা এই পুস্তক খানি পাড়রা বারপর নাই মন্ত্বই হইয়াছি। আসাম প্রদেশ সমস্ত জাতবা কথা ইহাতে সুন্দরকপে বিবৃত হইয়াছে। এত সংক্ষেপে কোন দেশেব সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ কবা যায়, আমাদেব ধারণা ছিল না। লেখকগণের ক্ষমতা দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। পুস্তক খানি শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ পাঠ্য-তালিকা ভুক্ত করিলে আমরা সুখী হইব।

৩৭। চরিত-মুক্তাবলী ।—শ্রীকাশী চন্দ্র ঘোষাল প্রণীত, মূল্য ১/০। অশোক, মণিকা, খিওডোসিয়স ও কনষ্টান্সিয়া, তুকারাম, দয়ানন্দ সরস্বতী, সফ্রেটিস, তেগ বাহাদুর, টেলিমেকাস এবং বলরাম ছাড়িয় কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কাশী বাবু কথেক খানি ক্ষুদ্রপুস্তকে সাধু মহাজনদিগের জীবন-কথা লিখিয়া আমাদেব বিশেষ ধন্য-

বাদই হইয়াছেন। তাঁহাব নির্দাচন ভাল, ভাষা পাঞ্জল। কাশী বাবু এইরূপ সংগ্রহের বাবা বঙ্গলাব প্রভূত উপকার করিতে পাবিবেন বলিয়া আমাদেব বিশ্বাস।

৩৮। মর্ম্মগাথা ।—শ্রীমতী নগেন্দ্র বাল্য স্মৃতিপ্রণীত, মূল্য ১/০। কোমল এবং মধুব-প্রকৃতি বালিকা এবং মহিলাগণ স্মন্দর স্মন্দব কবিতা লিখিয়া প্রতিপন্ন কবি-তেছেন, স্বাশিক্ষা প্রদেশে সফল ফলি-য়াছে। বাহাবা স্বাশিক্ষা প্রবর্তনে যত্নবান, তাহাদিগেব আনন্দের সোমা নাই। বিধা-ভাব রূপায়, মাতৃজাতি অশিক্ষাব ঘোবাক-কাব হইতে মুক্তি পাইতেছেন, ইহাপেক্ষা সুখেব বিষয় আব কি আছে ? মর্ম্মগাথার গ্রন্থকর্ত্তা বালিকা, কিন্তু তিনি এই গ্রন্থে যে ক্ষমতাব পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রবীণার যোগ্য। তাঁহার লেখা এখনও দোষ-শূন্য হয় নাই বটে, কিন্তু আশা করা যায়, শক্তির অপ-ব্যবহার না হইলে এবং সাধনা থাকিলে, কালে তিনি পরিচয়ের যোগ্য লেখিকা হইতে পারিবেন। বিধাতা এই কবির মস্তকে আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

৩৯। শিক্ষাপ্রবেশ।—শ্রীশঙ্কর
বিদ্যাবল্লভ প্রণীত, মূল্য ১০। টেক্সটবুক কমিটি
কতক এই পুস্তক পাঠ্য তালিকা ভুক্ত হই-
য়াছে। শঙ্কর বয়সে এবং জ্ঞানশিক্ষায়, দয়া
এবং কাব্যদক্ষতায় প্রবীণ ব্যক্তি। স্বর্গায়
বিদ্যাসাগর মহাশয়েব হর্নি উপযুক্ত ভ্রাতা।
তাহাব অনেক সংগুণ ইহাতে আছে।
লেখ্যব শক্তি, তন্মধ্যে প্রধান। শিক্ষাপ্রবেশে
অনেক অত্যাশঙ্ক্যকীয় বিচার পাঞ্জগ ভাবের,
নিপুণতাব সঙ্কিত বিবৃত হইয়াছে। ক্রমি-
কার্য সম্বন্ধায় যে নমদায় কথা ইহাতে
আছে, তাহা বহুদশনেন দল। প্রাইমারী
বিদ্যালয়ে এ পুস্তক পঠিত হইলে, ছাত্র
দিগের বিশেষ উপকার হইবে।

৪০। ভারতীয় চরিত্রমালা —
মহাবাজ প্রতাপাদিত্য।—শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী
প্রণীত মূল্য ১৫। সংস্কৃত ভিপিচরিত্র
প্রাপ্ত্য। ভারতীয় চরিত্রমালাব প্রথম গ্রন্থ
ছাপিত শিবজীব ভাবচরিত্র, দ্বিতীয় গ্রন্থ
প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্য বঙ্গবাস্তব
কলেব গোবব, কেবল তাহা কেন তিনি
বঙ্গের এবং ভারতের পৌবব।

“যশোর নাব দাম, প্রণীত ভাটিভা নাম
মহাবাজ বঙ্গভক্যম্বু।

নাহি মানে পান্দসায়, কেহ নাহি আট ভায়
ভয়বত নৃপতি দ্বাবয়।

বরপুর ভবানীব প্রিয়তম পুথিবীব,
বায়ন হাজাব যাব চাটী।

যোডল হলকা হাট, অয়ত ত্বাক সাশী
যুদ্ধবাল সেনাপতি কালী।”

ভারতচন্দ্রেব এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে মহা-
বাজেব অসাধারণ ক্ষমতাব পরিচয় পাওয়া
যায়। প্রতাপাদিত্যেব কোন বিশেষ উল্লেখ-
যোগ্য জীবনচরিত্র না থাকলেও, এদেশে
লোকের মুখে মুখে তিনি অমব। অসাধারণ
প্রতিভা, ধর্মভাব এবং বীরত্ব একাবাবে
সঙ্কিত থাকায় তিনি আমাদের সকলের পূজ্য।

স্বর্গে হই দেবরাজ, বাহুবী পাভালে,
প্রতাপ আদিত্য দাতা, অবনী মণ্ডলে।

এই প্রবাদে তাহাব দবার অলিখিত
ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রতাপের
অসীম সাহস এবং নিষ্ঠুরতার কথা সকলেই

জানেন, ভারতের সম্রাটগণ তাহার ভয়ে
সিংহাসনে প্রকম্পিত হইতেন; সুতরাং
সে সম্বন্ধে অধিক কিছু লেখা বাহ্য।
তাঁহার ধর্মভাব কিরূপ ছিল, শাস্ত্রীভাষার
তাহা উল্লেখ কবিতেন।

‘প্রতাপ, শক্তি উপাসক ছিলেন। তিনি একপ কঠো-
রতা সহকারে ভগবতীব ভজনা কবিতেন যে, জন-
সাধারণ তাহাকে দেবীর, পবমাসুগৃহীত ও ববপত্র
বা নিবচনা কবিত। তাঁহার অখব নিবব। অসা-
ধারণ, ক্রি যোরতর যুদ্ধস্থান অথবা নানা প্রকার প্রাণ
পরিপণাবলাস ভবন, কোন স্থানে ঐন যুদ্ধ তন্তেন
না, সকল সময়েই তাঁহাব অখব নিবব। প্রকটিত
হইত। তিনি শাক্ত হতাত্ত বৈষ্ণবদেবী চিন-
না। দক্ষ বিষয়ে তসার অস ন উদাব। ছি। তিনি
মুসলমান প্রজা দগব জনা আপন পাবেব স্থান স্থানে
নারদ নিশাণ কবিয়া দেন।

শাক্ত ধর্মের উদয় উদয় হইলে মধুরী
সাম্রাজ্যিকতা তিষ্ঠিতে পাবে না, মহাজন-
দাগণ জাবন ইতিহাসে তাহা প্রকটিত
বহিয়াছে। প্রতাপাদিত্য কেবল পানত্রে
নব, বর্ষেও মহাপুত্র ছিলেন। এই
মহাত্মাব পুণ্যমব জাবন কাহিনী পাঠ কবিত
কাহাব না ইচ্ছা হয়? শাস্ত্রী মহাশয় আপন
অসাধারণ ক্রিয় এবং প্রতিভা, গবেষণা এবং
বিজ্ঞতা সহ এই অমূল্য জাবনচরিত্র সংগ্রহ
এবং লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের
লেখনাতে পুষ্প চন্দন বর্ণিত হইক। তাঁহাব
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। শাস্ত্রী মহাশয় ভারতব
পুষ্প বন্ধোদ্ধাব কবিত যে কঠোর পরিশ্রম
কবিতেন, সময়ে সময়ে পুলিসেব অত্যা-
চাবে অত্যাচারিত হইয়াও আপন ব্রত পরি-
ত্যাগ কবিতেন না, ইহা আমাদের, এই
ততভাগ্য ভাবতবাদীদের, কথাসম্বন্ধ ব্যক্তি
দিগের আদর্শ। শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের
সকলের প্রণম্য। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া
অকাতরে মাতৃসেবার জ্ঞা খাটিতেন। বোর
দাবিদ্রোব সহিত সংগ্রাম কবিয়াও তিনি
দেশসেবায় রত বহিয়াছেন। তাঁহার গভীর
স্বদেশপ্রাণতা আমাদের অনুকরণীয়। তাঁহার
জাবনের এই স্বদেশপ্রাণতা, এই প্রেমের
পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে প্রতিকলিত। যেমন
গবেষণা, তেমনি ভক্তিবিশ্বলতা। তিনি
তন্ময় চিত্তে তৎপ্রস্তু ভাষার প্রতাপ-প্রবর্তন

করিয়াছেন। এখন এ দেশে তাঁহার এই বহু যত্নের ধন সাদরে গৃহীত হইলে হয়। কিন্তু তাহা কি হইবে না? আমাদের আশা আছে, যে দেশে মাইকেল এবং বিদ্যাসাগরের জীবনীর প্রথম সংস্করণ অতি অল্প সময়ে নিঃশেষ হইয়াছিল, সে দেশে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জায়গা অতি সুন্দর জীবনচরিত অতি অল্প সময়ে নিঃশেষ হইবে। গল্প, ছবি, উপকথা এবং কবিতার স্থলে এইরূপ সার গ্রন্থের আদর হইলেই বাঙ্গালীর মহত্ব প্রকাশ পাইবে।

৪১। শকুন্তলা-রহস্য।—অর্থাৎ পদ্মপুরাণান্তর্গত শকুন্তলাপাখ্যান ও মহাকবি কালিদাস-রচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলের আলোচনা। শ্রীবিহারিলাল সরকার সংকলিত, মূল্য ১/ এক টাকা। কালিদাসের শকুন্তলা, এদেশেই অমর গ্রন্থ। যতদিন যাইতেছে, ততই পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ইহা অদর বাড়িতেছে। বঙ্গভাষায় শকুন্তলা-তত্ত্ব লিখিয়া চন্দ্রনাথ অমর হইয়াছেন। চন্দ্রনাথের চিন্তা শক্তি, কাব্যানুরাগ, গভীর গবেষণা, তদীয় শকুন্তলা-তত্ত্বের প্রতি ছত্রে জাজ্ঞলমান বহিঃগাছে। বিহারিলাল অভিনব প্রণালীতে শকুন্তলা-রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের গল্প এবং কালিদাসের গল্প সমালোচনা করিয়া, এই গ্রন্থে, গ্রন্থকার অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে, কালিদাসের প্রতিভা, অসাধারণত্ব এবং বিশেষত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পুরাতন কথা লিখিলেও যে তাহা নীরস হয় না, চর্কিত চর্কণ করিলেও যে মিষ্টত্ব যায় না, কালিদাসের নাটক শকুন্তলা তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। বলিলে মিথ্যার পুনরুক্তি হয় না যে, কালিদাস কেবল এই গ্রন্থ খানি লিখিলেও অমর হইতে পারিতেন। বিহারিলাল কালিদাস-প্রতিভা প্রতিষ্ঠার জন্ত যে প্রভূত যত্ন ও কষ্টস্বীকার করিয়াছেন, এ জন্ত সকলের নিকটই তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

বিহারিলালের ক্ষমতা অসাধারণ, তাঁহার গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যও অসাধারণ। তত্বে পুত্রি তাঁহার ভাষাভাষ্য আরো অসাধারণ।

যে সকল প্রতিভাসম্পন্ন লেখকগণের মহীয়সী শক্তিতে এখন বাঙ্গালা ভাষা গোবাবিত, বিহারিলাল তদাধো একজন। এই গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ “নিজস্ব ও পরস্ব” প্রবন্ধে তাহার এই অসাধারণ ক্ষমতার পবিত্র রহিয়াছে। বাহা বা বাঙ্গালা ভাষায় পাঠযোগ্য উপযুক্ত পুস্তক নাই বলিয়া ভ্রূণ করেন, তাঁহা দিগকে আমবা হব প্রসাদশাস্ত্রী বাণ্যাকির জয়, চন্দ্রনাথের শকুন্তলা তত্ত্ব ও অত্যন্ত পুস্তক সমূহ, ভূদেবের প্রবন্ধ-পুস্তক সমূহ, রাজকৃষ্ণের বিবিধ প্রবন্ধ এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহ প্রভৃতি পড়িতে অনুবোধ করি। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিহারিলালের এই শকুন্তলা-রহস্যও পড়িতে বলি। বঙ্কিমচন্দ্র এবং কালাপ্রসন্নের গ্রন্থ সকলের উল্লেখ কবিলাম না, কেননা, তাহা বা সুপরিচিত। বিহারিলালের এই গ্রন্থে যে অসাধারণ ক্ষমতা পনিফুট হইয়াছে, তাহা পড়িয়া আনন্দ মোহিত হইয়াছি। আমাদিগকে এই পুস্তক উপহার দেওয়ার জন্ত গ্রন্থকাব্যকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

৪২। Helps to Logic by Koki-leswar Bhattachajca, M.A., মূল্য ৪০/০ কণওয়ালিসম্প্রদ, বি, বার্নার্ডিৎ দোকানে প্রাপ্তব্য। Designed for F. A. Students, কোকিলেশ্বর বাবু নবাবাবতের পাঠকগণের নিকট বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। তাহার পাণ্ডিত্য, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে, অনুমান করি। এখানি তাঁহার ইংবাজি গ্রন্থ। এ পুস্তকে তাঁহার ঐ পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিফুটি পাইয়াছে। কোন জটিল বিষয়কে সহজ করিয়া বুঝান সর্বোপেক্ষা কঠিন কাজ। দর্শন-সমুদ্র-মন্ডন করিয়া কোকিলেশ্বর বাবু, সংক্ষেপে, সরল ভাষায় যে অমূল্যতত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেছেন, তাহা পড়িয়া বুঝিয়াছি, কঠিন বিষয় সহজ করিয়া বুঝাইবার শক্তি কোকিলেশ্বর বাবুর অসাধারণ। এই এক গুণে তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। মুক্তিগঞ্জ কলেজে-অধ্যাপনা কালে, বোধ হয়, তিনি লজিকের জটিল তত্ত্ব সমূহ পাঠকগণকে

বুঝাইবার সহজ উপায় ভাবিতেছিলেন । এই *Helps to Logic* সেই চিন্তার ফল । লজিক তত্ত্বকে সরল, সহজ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কোকিলেশ্বর বাবু গভীর পাণ্ডিত্য শক্তির পরিচয় দিয়াছেন । পুস্তকখানি এফ-এ পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে । এই একখানি পুস্তক পড়িলে এই বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ হইবে, আমাদের বিশ্বাস । পরীক্ষার্থীগণ একবার পরীক্ষা করিবার দেখুন ।

৪৩ । চণ্ডী ।—শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত, এবং চণ্ডী মাহাত্ম্য শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম-এ বিবচিত, মূল্য ৮০ । এই পুস্তকখানি উপহার পাঠ্য আমবা সাবপন নাই আনন্দিত হইয়াছি । বাংলাদেশ হইতে চণ্ডী-পাঠ শুনিয়া আসিয়াছি । চণ্ডী-তত্ত্ব-মাহাত্ম্যে আমাদের প্রাণ পরিপূর্ণ । শিত্রদেব আমাদের ঘবে প্রাণি মাসে চণ্ডী পাঠেব নানন্দা করিয়াছিলেন । আমাদের দেশে এখনও সে বিধান আছে । যে সকল পরিবার শক্তি মন্ড্রে দীক্ষিত, চণ্ডী তাহাদের অন্ন, পান, জল । বাংলা হইতে আমাদের সমাদৃত চণ্ডী আজ বঙ্গ ভাষায় অন্তর্বাদিত হইয়াছে, গৌরবের সীমা নাই । “পণ্ডিত বামগণি জ্ঞানবত্তের অনুবাদ এখন লক্ষ্যাপা । কবির নবীনচন্দ্রের অনুবাদ অক্ষবান্ধব বালিকা সাধাবণেব পাঠোপযোগী নং ১” নবীন চন্দ্রের অনুবাদ অপেক্ষা এই অনুবাদ যে বিশিষ্ট, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া বাবু গোবিন্দ লাল দত্ত একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা নব্য-ভারতে মুদ্রিত করিতে এখনও ইচ্ছা আছে । স্মরণ্য যে সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই । ফরিদপুরের ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার মহাশয় চণ্ডীর আর একখানি পদ্যানুবাদ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, সে গ্রন্থের উল্লেখ পর সংখ্যায় কবিবার ইচ্ছা আছে । বঙ্গ চণ্ডীর আদর এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় । মহেন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থের পরিশেষে দেবেন্দ্র বাবুর

চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে । দেবেন্দ্র বাবুর দার্শনিক জ্ঞানের গভীরতা এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রখরতা দেখিয়া আমরা মোহিত, স্তম্ভিত এবং অবাক হইয়াছি । উহা এতই সুন্দর হইয়াছে যে, বলিতে সঙ্কেচ হয় না, উহা বাংলা ভাষায় গোবন্দ স্বরূপ । পুস্তকে প্রকাশিত না হইলে উহা আমবা পাঠক গণকে উপহার দিতাম । বঙ্কিম বাবুর লেখনী নাবব হইয়াছে অবধি এমন সবস লেখা আমরা আর পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না । এই প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করা উচিত । শক্তি-মন্ড্রে দীক্ষিত এখন কোন ভক্ত এদেশে নাই কি, যিনি এই কাজ করিয়া ধন্য হইতে পাবেন ? মহেন্দ্র বাবুর বাংলা ভাষায় ক্ষমতার প্রভূত পরিচয় এ গ্রন্থে পাইয়াছি, তজ্জন্ত তিনি আমাদের ধন্যবাদেব যোগ্য । অধিক ধন্য বাদের যোগ্য এই জন্ত যে, তিনি দেবেন্দ্র বিজয় বাবুর দ্বারা “চণ্ডী মাহাত্ম্য”রূপ অমূল্য বস্তুর উদ্ধার করিয়াছেন । যবে যবে চণ্ডী এবং তৎসহ চণ্ডী মাহাত্ম্য, গীতাবল্য, পঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত হউক ।

৪৪ । অপূর্ব স্বপ্ন (কবিতা) শ্রীকাম পাল মিশ্র কর্তৃক উৎকল ভাষায় রচিত । লেখক এখনও বিদ্যালয়েব ছাত্র । এই অবস্থায়ও তিনি যে প্রকার বচনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রশংসা কবিত হইবে । প্রশংসা কবিত একটু ভয় হয়, কাবণ অনেক ছাত্র এই প্রকার বাহবা পাইয়া অনেক সময়ে উদ্দেশ্য-বিমুখ হইয়াছেন, দেখিয়াছি । কবিতা লেখা ভাল, কিন্তু তাড়াতাড়ি পুস্তকাকারে ছাপাইবার প্রয়োজনীয়তা কি ? নবীন লেখকদিগের পক্ষে একজন প্রবীণ সুলেখকের উপদেশের কথা উল্লেখ কবিতৈছি । তিনি লিখিয়াছেন যে, কোন নবীন লেখক যেন কোন রচনা লেখার পর একবৎসর অতিবাহিত না হইলে তাহা প্রকাশ না করেন । এ উপদেশের সারবাক্য বঙ্গ না হইলে বুদ্ধিতে পায় বার না ।

হীরাবিল ।

সিরাজের মাথের হীরাবিল ও তাহার উপরিস্থিত প্রাসাদ অনেকদিন হইতে কাল-পূর্ণে নিমগ্ন হইতে আবস্ত হইয়াছে। তাঁহার নিজ স্মৃতি যেমন বিস্তৃতির মহাক্ষকারময় অনন্ত গর্ভে চিরনিদ্রিত বহিয়াছে, সেইরূপ তাহার প্রাসাদাদিব চিরু কালসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে হইতে না জানি কোন্ অনিশ্চিত দেশে আশ্রয় লইতেছে। বিধাতার ইচ্ছা, মুর্শিদাবাদের সহিত সিরাজের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়। যে হতভাগ্য অতুলনীয় কপ-রাশি ও অতুল সম্পত্তি লাভ কবিয়াও সংসারে দুইদিন ভোগ করিতে পাইল না, তাহার আর স্মৃতিচিহ্ন থাকিবার প্রয়োজন কি? মুর্শিদাবাদ তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর হইলেও, হতভাগ্যের প্রদত্ত অলঙ্কার সে অনায়াসে ভাগীরথী জলে বিসর্জন দিতে পারে। তাই কাল একে একে মুর্শিদাবাদের সকল অলঙ্কারগুলি খুলিয়া কতক বা ভাগীরথী জলে, কতক বা বসুন্ধরা-হৃদয়ে মিশাইয়া দিয়াছে। যদিও সকলের প্রদত্ত অলঙ্কার রাশি মুর্শিদাবাদনগরী একে একে উন্মোচন করিতেছে, তথাপি যাহার দ্বারা সিরাজ তাহাকে শোভাশালিনী করিয়াছিলেন, সেইগুলি কালপ্রবাহে ভাসাইয়া দেওয়া তাহার সর্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। কারণ সিরাজ যে তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন ও সৌন্দর্য্যময়ী করিবার জন্য এতিনিয়ত যত্ন পাইয়াছিলেন। সিরাজ বড় সাধ করিয়া হীরাবিল ও তাহার উপরিস্থিত প্রাসাদের নির্মাণ করেন। বাফালা, বিহার, উড়িষ্যার অধীশ্বর হইয়া সেই প্রাসাদে বহানন্দে কুবিন্ধুকাটাইবার

ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু সিংহাসনে আবোহণ কবিবার কিছুদধিক এক বৎসর পবে তিনি ইহ জগৎ হইতে চিববিদায় লইতে বাধ্য হন। সিরাজের যৌববাজ্যকালে হাবাবিলেব প্রাসাদ নির্মিত হয়। মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে বাদশাহ সাহ জাহানের জ্যায় মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে সিবাজেরও সৌন্দর্য্যপ্রীতিব কথা শুনা যায়। মুর্শিদাবাদের দিত্য নবাব সৃজা উদ্দৌলারও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ছিল বটে, কিন্তু সিবাজ তাঁহার সে প্রীতিক্রমে অনেক পরিমাণে অতিক্রম কবিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যপ্রীতি দেবতারও বাঞ্ছনীয়। যদিও সিরাজহৃদয়ে তাহা বিলাসাবরণে আচ্ছাদিত ছিল, তথাপি সময়ে সময়ে তাহাকে আবরণোন্মুক্তও দেখা গিয়াছে।

হীরাবিলেব প্রাসাদ মুর্শিদাবাদের মধ্যে অতি মনোরম দৃশ্য ছিল। হীরক-স্বচ্ছ ঝিলসলিলরাশি তাহার পদপ্রান্ত চুশন করিয়া বেড়াইত, এবং নিজ বক্ষে তাহার প্রতিচ্ছবি লইয়া জীবৎ সমীর তাড়নেও কাঁপিয়া উঠিত। যখন জ্যোৎস্নালোকে বিধৌত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যসারভূত প্রাসাদরহ্ন হাসিতে হাসিতে ঝিলসলিলের জীড়া নিরীক্ষণ করিত, সেই সময়ে কিছুদূরে ভাগীরথীবক্ষ হইতে তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা দেখিলে মনঃপ্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। এই সুন্দর প্রাসাদে সিরাজ যৌবনসুখ আনন্দোপভোগ করিতে আরম্ভ করেন। আলিবর্দি খাঁর সহিত প্রতি-নিয়ত অবস্থান করায়, তাঁহার বিলাসোপভোগের তাদৃশ সুযোগ ঘটিয়া উঠিত না, হীরাবিলেব প্রাসাদে সেই শিলাসা মিটা-

ইতে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। অপরাকর্ষ-
বিনিমিত নর্তকীরূপ লইয়া তিনি সেই
প্রাসাদে বিলাসতবঙ্গে ভাসমান থাকিতেন,
এবং আসবপানে বিভোর হইয়া কলকঙ্গি-
গণের মধুর সঙ্গীতে আবণ্ড আবিষ্ট হইয়া
পড়িতেন। সিবাজ সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্বে
মাতামহের অনুরোধে স্বাপান পবিত্র্যাণ
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মোহনাস্ত্রে
তাহাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন।
কখনও বা মোসাহেব ও অন্তঃস্বর্গের তোষা-
মদবাক্যে এবং ভাঁড় বা কাহিনী-কথক-
দিগের বহুশ্রুতিতে বিনয় আনন্দ অন্তঃস্ব
করিতেন। সময়ে সময়ে নৃত্যকী ও মো-
সাহেবরূপ লইয়া সাধের তবনী আবোতগে
হীরাঝিলের স্বচ্ছ সলিলবাশি আনন্দিত
করিয়া বেড়াইতেন। দ্রোণাপুলকিত
ধামিনীতে ঝিলবক্ষবিহাবিনী তরা হইতে
যখন নর্তকীগণের কণ্ঠধ্বনি দিগন্ত স্পর্শ
কবিত্তে ধাবিত হইত, তখন তাহাদের
মধুর চুপনে ভাগীবথীর তরঙ্গলহরীও মুচ্ছিত
হইয়া তীব্রক্রোড়ে চলিয়া পড়িত। এই
প্রাসাদেই সিবাজ উদ্যোগী তাঁহার মনো-
মোহিনী কৈজীর রূপস্বধা পান করিয়া
উন্মত্ত হইতেন, এবং অবশেষে তাহার
বিধাসঘাতকতায় তাহাকে জীবন্ত অবস্থায়
গৃহাবদ্ধ করেন। * এই ধানেই তিনি
তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী লুংক উদ্দেশ্য
সহিত পবিত্র প্রণয় উপভোগ করিয়াছিলেন
এবং রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্বে হইতেই একে একে
সকল প্রকার বিলাস বিজয় বিসর্জন দিতে
আরম্ভ করিয়া আলিবর্দীর সিংহাসনের
পবিত্রতা রক্ষা করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন।

হীরাঝিলের প্রাসাদকে দেশীয়গণ মনস্ব-

গঞ্জের প্রাসাদ বলিয়া থাকেন। সিবাজ
উক্ত প্রাসাদে মনন স্থাপন করিয়া দরবার-
কার্য্য সমাধা করিতেন। ফলতঃ রাজকার্য্য
হইতে সামান্য আমোদ প্রমোদ পর্য্যন্ত
সিবাজের মনস্ত ব্যাপারই হীরাঝিলের
প্রাসাদে সম্পাদিত হইয়াছিল। সিবাজের
সেই সাধের হাবাঝিল এক্ষণে ভাগীবথীর
সঙ্গে নিশিয়া গিয়াছে, এবং তাহার উপরিস্থ
প্রাসাদও কালগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। দুই
একটি চত্বরের ভিত্তিভূমি জঙ্গলাবৃত্ত হইয়া
এখনও তাহার স্থান নির্দেশ করিয়া
দিতেছে। আমবা এস্থলে হীরাঝিলের
নির্মাণ হইতে আবস্ত করিয়া তাহার সহিত
সংস্রষ্ট প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার
উল্লেখ করিতেছি।

আলিবর্দী খাঁ ভাগীবথীর পূর্বে তীবের
প্রাসাদে বাস করিতেন। মুর্শিদাবাদের যে
স্থানকে সাধারণতঃ কেল্লা বলিয়া থাকে, সেই
খানে বহুদিন হইতে নাবিকদিগের প্রাসাদ
ছিল। সিরাজ সৌন্দর্য্যপ্রিয় হওয়ার, তথা
হইতে অল্প কোন স্থানে একটা মনোরম
প্রাসাদ নির্মাণের কল্পনা করেন। ভাগীবথীর
পশ্চিম তীবে বর্তমান জাকরাগঞ্জের সমুখ-
ভাগে তাহার স্থাননির্মাণ হয়। হিন্দু ও
মুসলমান গৌরবের সমাধিস্থল সোড় হইতে
নানাবিধ প্রস্তবাদি আনীত হইয়া প্রাসাদের
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়াছিল।
প্রাসাদ সাধারণতঃ ইষ্টকে নির্মিত হয়। কিন্তু
স্থানে স্থানে প্রস্তর বসাইয়া সিরাজ তাহাকে
শোভাশালী কবিরার চেষ্টা করিয়াছিলেন।
তরঙ্গায়িত পল হুগিয়া প্রাসাদের কাঞ্চি-
গুলি অপবিসীম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিত।
ভিন্ন ভিন্ন চত্বরে প্রাসাদ বিভক্ত হয়, অথবা
এক একটা প্রাচীর চত্বরই, এক একটা প্রাচীর

* কৈজীর বিবরণ লুংক উদ্দেশ্য নামক গ্রন্থে আছে।

প্রাসাদেই পরিণত হয়। তাহাবা এমতাজ মহাল, বঙ্গমহাল প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। এই বিশাল প্রাসাদ এত দূর বিস্তৃত ছিল যে, কোন বিদেশীয় লেখক বলিয়াছেন যে, ইহাতে তিনটা ইউরোপীয় নদপতির আবাসস্থান নির্দিষ্ট হইতে পারিত। * প্রাসাদের প্রান্তদেশে এক কৃত্রিম ঝিল খনন করিয়া তাহাব নাম হীরাবিল প্রদান করা হইয়াছিল, নওয়াজিস্ মহম্মদ খাঁ মতিবিলেব অনুকরণে সম্ভবতঃ সিবাজেব হীরাবিল কইয়া থাকিবে। † ঝিলেব উত্তম পার্শ্ব হঠক দায়া বাঁধান হয়। এই সূচ্যক প্রাসাদের নির্মাণ শেষ হইবার পূর্বে সিবাজ মাতামহ আশিবর্দি খাঁকে প্রাসাদ দর্শনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। রক্ত নবাবের সহিত অনেক কর্মচারী, বাজা, জমিদার ও জমিদারদিগের প্রতিনিবিগণও ভাবী নবাবেব সূর্য্য প্রাসাদ দেখিতে অগ্রসর হইলেন। নবাব আশিবর্দি খাঁ প্রাসাদ দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হন। তাহাব অনুচরবর্গও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সিরাজের কচির ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন। কেহ বা ভিন্ন ভিন্ন চত্বরের কেহ বা সূর্য্য কক্ষশ্রেণীর, কেহ বা পলতোলা কার্ণিসের এবং কেহ বা হীরাবিলের প্রশংসায় সিরাজের বালক-সুলভ অন্তরকে অধিকতর স্ফীত করিয়া তুলেন। যখন সকলে ভিন্ন ভিন্ন চত্বরে বা একোঁঠে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় বৃদ্ধ নবাব কোন একটা প্রকোষ্ঠমধ্যে

প্রবিষ্ট হইলে, সিবাজ মাতামহেব সহিত কোতুকাচ্ছনে তাঁহাকে সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। নবাব দৌহারের বহুত্ব দ্বারা দাবিয়া বলিলেন যে, আজ তোমা ই ভয় হইয়াছে, এক্ষণে তোমাকে কি তাহাব চিনে আমাকে মুক্ত করিয়া দিবে। সিবাজও হানিতে হানিতে উত্তর কবিলেন যে, আমাব প্রাসাদের জন্ত কোন বন্দোবস্ত না করিলে ইহার নির্মাণশেষ ও দৌন্দ্যাবস্থা হইবে না। তজ্জন্ত ইহার পোনকপ উপায় বিধান করিতে হইবে। নবাবেব প্রকোষ্ঠমধ্যে বদ্ধ হওয়ার কথা শুনিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তাহাব সমস্ত অনুচরবর্গ আসিয়া তথা উপস্থিত হইলেন। সিবাজ তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন যে, এই সকল জমিদার ও জমিদারদিগের প্রতি-নির্দিষ্ট নিকট হইতে একটা কবের ব্যবস্থা করা হউক। নবাব সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাতে সম্মত হইয়া হীরাবিলেব প্রাসাদের জন্ত যে কেবল কব নির্দেশ কবিলেন, এমন নহে, কিন্তু সিবাজেব জন্ত একটা গজও স্থাপন করিয়া দিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে ৫০১৫৯৭ টাকার আ-ওয়াব আদায় হয়। * মনসুর শব্দে বিজয়ী বুঝায়। সিরাজ মাতামহের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার প্রাসাদের নাম মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ ও নবস্থাপিত গজটাও মনসুরগজ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যে স্থলে গজটা স্থাপিত হয়, তাহাকে অদ্যাপি মনসুরগজ বলিয়া থাকে। দেশীয় ঐশ্ব্যকার-গণ সিরাজ উদৌলার প্রাসাদকে মনসুর-গঞ্জের প্রাসাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। †

* *Seir Mutaqherin Vol II P. 28.*
(Translator's note)

† জং হকীর প্রকৃতি মতিবিল হীরাবিলে এক মলে করিয়া অব করিয়াছেন। অকৃত পক্ষে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা হইতে সত্যিখিল ভাগীরথীর পূর্ব তীরে এই প্রাসাদ স্থাপিত হইয়াছিল।

* *Grant's Analysis of the finances Bengal 5th Report P. 285*

† *Mutaqherin, and Riyazu-s-salatim.*

কিন্তু ইউরোপীয়গণ সাধারণতঃ তাহাকে হীরাবিলেব প্রাসাদ বলিয়াছেন। * হীরাবিলেব প্রাসাদ নির্মাণ হইলে, যুবরাজ সিবাজ মুর্শিদাবাদে অবস্থান কালে সেইখানেই বাস করিয়া আমোদ প্রমোদে কালাতিবাহিত করিতেন। কেল্লার মধ্যে থাকিলে বিলাসোপভোগেব তাদৃশ সুবিধা হইত না বলিয়া, তাঁচাব হীরাবিলেব প্রাসাদে বাস কবাই একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তথায় তাহাব সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি নবাব হইলেও কেশা পরিত্যাগ করিয়া মনসুরগঞ্জ মসনদ স্থাপন পূর্বক রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিতেন। তাহার পর রাজ্যচ্যুত হইয়া প্রিয়তমা মহিবী লুৎফ উল্লের সহিত কিয়ৎ পরিমাণ সম্পত্তি লইয়া ১৭৫৭ খ্রিঃ অন্দের ২৪শে জুন শুক্রবাব রাত্রিতে সাধেব হীরাবিলেব প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন কবিতে বাধ্য হন। তাহার পর আব সিবাজকে হীরাবিলেব প্রাসাদে পদার্পণ কবিতে হয় নাই। মুর্শিদাবাদে ধৃত হইয়া আনীত হইলে তিনি জাঃগাংগে নিহত হন।

সিবাজউদ্দৌলার পলায়নের পূর্বেই মীরজাকর পলাশী প্রান্তব হইতে আসিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। তিনি সিরাজেব পলায়নের কথা শুনিয়া মনসুরগঞ্জেব প্রাসাদ অধিকার করিয়া বসেন। কিন্তু ক্লাইবের আগমনেব পূর্বে মসনদে উপবিষ্ট হন নাই। ক্লাইব পলাশী হইতে দাদপুবে, পরে বহরমপুরের নিকট মাদাপুরে শিবির সন্নিবেশ করেন। তাহার পর ২৯শে জুন পর্য্যন্ত কাশীমবাজাবে অপেক্ষা করিয়া, ঐ দিবস মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। হীরাবিলেব

উত্তর মোরাদবাগে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। মোরাদবাগ হইতে ক্লাইব মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে মীরজাকরের সহিত নাক্ষাং করিতে গমন করেন। মনসুরগঞ্জের প্রাসাদের দরবার গৃহের উত্তর দিকে বিশাল নবাবী মসনদ স্থাপিত ছিল, সিরাজ সেই মসনদে বসিতেন। ক্লাইব মীরজাকবেব হস্তধারণ করিয়া মসনদেব উপব উপবেশন কবাইয়া নূতন নবাবেক এক পাত্র মোতর নজর প্রদান করিলেন।* তাহার পব অস্ত্রাস্ত্র ইংরাজ ও দেশীর কর্মচাবী ও সম্ভ্রান্ত জনগণ তাহাকে যথারীতি নজর প্রদান করিলে, মীরজাকব সমস্ত নগরে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা নবাব বলিয়া বিবোধিত হইলেন। মীরজাকবেব মসনদে উপবেশন কবাব পর, হীরাবিলেব প্রাসাদস্থিত সিবাজউদ্দৌলার ধনাগার লুণ্ঠনের বাবস্থা হইল। মীরজাকর, ক্লাইব, তাহার সহকাবী ওয়ালস্, কাশীমবাজাবেব ওয়াট্‌স, লিংগটন, দেওধান বানটাদ এবং মুন্সী নবকৃষ্ণ প্রভৃতি সেই কোষাগার লুণ্ঠনের সময় উপস্থিত ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার এট প্রকাশ্য ধনাগারে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ বোঁপা মুদ্রা, ৩২ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা + ৬৫ সিক্কাক অমুদ্রিত স্বর্ণপিণ্ড, ৩ বাক্স অলঙ্কারখচিত হীবা জহরত, ৩২ বাক্স অখচিত চুণী পাত্রা প্রভৃতি প্রস্তর খণ্ড মাত্র থাকার উল্লেখ দেখা যায়। এই প্রকাশ্য ধনাগার ব্যতীত সিবাজউদ্দৌলার অস্তঃপুরস্থ আর একটা ধনভাণ্ডারের কথা কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। তৎকালে অর্থশালী ভারতবাসী মায়েই নিজ নিজ

* Mutaqherm Trans. Vol I. P. 772, also Orme, Vol II. P. 181.

+ হটর জনক্রে ২ কোটি ৩০ লক্ষ বোঁপা মুদ্রার কথা লিখিয়াছেন।

অন্তঃপুরে একটি স্বতন্ত্র ধনাগার স্থাপন করিতেন। নবাব বাদশাহের ত কথাই নাই। কথিত আছে যে, সিরাজউদ্দৌলার ধনাগার মধ্যে ৮ কোটি টাকা সঞ্চিত ছিল। ইংরাজেরা নাকি তাহার কোনই সন্ধান পান নাই। তাহা মীরজাফর, তাঁহার কর্মচারী আমিরবেগ খাঁ, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। রামচাঁদ পলাশীর যুদ্ধের সময় মাসিক ৬০ টাকা বেতনে কার্য করিতেন, কিন্তু তাহার দশ বৎসর পরে মৃত্যুকালে তিনি নগদে ও হস্তীতে ৭২ লক্ষ টাকা, ৪০০ বড় বড় সোনার ও রূপায় কলস, তন্মধ্যে ৮০টা সোণার ও অবশিষ্টগুলি রৌপ্য নিষ্প্রিত। এতদ্ব্যতীত ১৮ লক্ষ টাকার জমিদারীও ২০ লক্ষ টাকার জহরত রাখিয়া যান। নবকৃষ্ণও মাসে ৬০ টাকা বেতন পাইতেন, তিনিও মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। * মীরজাফরের প্রিয়তমা ভাৰ্য্যা মণিবেগম হীরাবিলের প্রাসাদ লুণ্ঠনের জন্তই অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁহার যাবতীয় হীরা, জহরত এই লুণ্ঠন হইতেই লক্ষ। † রামচাঁদ, নবকৃষ্ণ যে সমস্ত অর্থ পাইয়াছিলেন, যদি ক্লাইব তাহা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর তাহার অংশ পাইতে হইত না, সমস্তই সেই ব্রিটিশপুত্রের হস্তগত হইত। মীরজাফরের নিকট হইতে ইংরাজেরা ৩০৮৮৭৭৫০ টাকা আদায় করেন। কিন্তু একেবারে সমস্ত টাকা হেঁচকা হয় নাই, ঐ টাকার কতকংশ সিরাজের প্রাক্ষাণ্য ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, ধনাগার উদ্ধৃত হইবামাত্র

তাহা হইতে ৮০ লক্ষ টাকা নৌকা-কলিকাতায় রওনা হইয়াছিল।* ইংরাজ সাধারণের প্রাপ্য অর্থ হইতে একা ক্লাইব সাহেবই ২৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে সিরাজের সমস্ত সম্পত্তি বিতরিত হইয়া যায়। সিরাজের প্রাসাদ ধনে পরিপূর্ণ থাকায়, বর্তমান সময় পর্যন্ত এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভগ্নাবশিষ্ট প্রাসাদের মধ্যে অল্পসন্ধান করিলে এখনও অনেক অর্থ পাওয়া যাইতে পারে।

মীরজাফর সিংহাসন আনোহণ করিয়া প্রথমে হীরাবিলের প্রাসাদেই বাস করিয়াছিলেন। তিনি তথায় চিরদিন বাস করেন নাই, কিছুকাল পবে ভাগীবখীর পূর্বতীরে কেল্লামধ্যে আলিবদ্দির প্রাসাদে আসিয়া বাস করেন। † নবাব হইবার পূর্বে জাফরগঞ্জের প্রাসাদ তাঁহার আবাস স্থান ছিল, কিন্তু মসনদে উপবেশন করার পর স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌবৎকে জাফরগঞ্জের প্রাসাদ দান করেন। মীরজাফর বংশধরেরা সদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। মীরজাফর বংশধরেরা জাফরগঞ্জের প্রাসাদ অধিকার করায়, নবাব পুনর্ব্বার তথায় গমন কবেন নাই, এবং নিজে মুর্শিদাবাদ-কেলা মধ্যস্থিত প্রাসাদে আসিয়াই বাস করেন। তাঁহার রাজাচ্যুতির পূর্বে যখন কলিকাতার গবর্নর ডাব্রিট্ট মৌরাদবাগে উপস্থিত হন, মৃত্যুকরীণে লিখিত আছে যে, সেই সময়ে নবাব মৌরাদবাগে ডাব্রিট্টার সহিত সাক্ষাতের পর পুনর্ব্বার ভাগীবখী পার হইয়া তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। ‡ মৌরাদবাগ ভাগীবখীর

* রামচাঁদ প্রিন্সুলজাফরের ও নবকৃষ্ণ শোভা-
বাজারের অধিপতি

† Muteherin, Trans. Vol. I. p. 773.

* Hunter's Statistical Account of
Murshidabad P. 188.

† Muteherin, Trans Vol II P. 8.

‡ do do do P. 14

পশ্চিম তীরে হীরাবিলের নিকটেই অবস্থিত ছিল। স্তত্রাং নবাব মীরজাফর খাঁ যে সে সময়ে পূর্বতীরের প্রাসাদে বাস করিতেন, ইহা হইতে তাহা বিশদরূপে বুঝা যাইতেছে। * ভান্সিটার্ট মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মারকাশীমকে মননদ প্রদান করেন। ভান্সিটার্ট মীরজাফরকে হীরাবিলের প্রাসাদে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। † কিন্তু মাবজাফর তাহাতে সম্মত না হইয়া স্ত্রী প্রবর্তনা ভাষা মণি বেগমের সহিত বলিষ্ঠা চিত্তপূর্বে আসিয়া বাস করেন।

মাবকাশীমের সহিত যখন ইংরাজদিগের বিবাদ আশ্রয় হইল, সেই সময়ে জগৎশেঠ দিগকে ইংরাজদিগের পক্ষ জানিয়া, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া মুন্সেলে পাঠাইবার জন্ত মাবকাশীম নাবভূমের ফৌজদার মহম্মদ তকীখাকে আদেশ দেন। মহম্মদ তকীখা শেঠদিগকে প্রথমতঃ হীরাবিলের প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে মুন্সের হইতে নবাবের প্রেরিত লোক উপস্থিত হইলে তাহাদের হস্তে জগৎশেঠদিগকে সমর্পণ করেন।

ইহার পর হইতে আব হীরাবিলের সহিত সপক্ষ কোন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না। এক্ষণে সে প্রাসাদ কালগর্ভে অন্তর্হিত। জাকরাগঞ্জের পরপারে অদ্যাপি তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। হীরা-

* হীরাবিলের প্রাসাদ ভঙ্গ করিয়া মীরজাফর কেল্লামধ্যে পরে নূতন প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মুতাফরাণের ভ্রমুবাদক হীরাবিলের প্রাসাদকে ভগ্নদশায় পতিত দেখিয়াছেন। তিনি আলিবর্দীর প্রাসাদেরও উক্ত দশা দেখিয়াছেন। আলিবর্দীর প্রাসাদকেও লোকে সিরাজ উদৌলার প্রাসাদ বলিত।

Vansittart's Narrative Vol I P. 124.

বিল ভাগীরথীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কেবল তাহার পোস্তার কিয়দংশ ও একটি পরঃপ্রণালীর নিদর্শন ভাগীরথীর জলাপসরণে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সিরাজ উদৌলার প্রাসাদকে সাবাবনে লালকুঠী বলিত। সে প্রাসাদের অবিকাংশই বিলুপ্ত, কেবল এমতাজ মহল নামক চত্বরের ভিত্তির কতক ভগ্নাবশেষ আজিও অবস্থিতি করিতেছে। তাহার পশ্চিম পার্শ্বের ভিত্তিটী সম্পূর্ণই আছে, পূর্ব পার্শ্বের সমস্ত ভিত্তি ও উত্তর, দক্ষিণের কতকাংশ এক্ষণে ভাগীরথীগর্ভস্থ। এই ভিত্তি উত্তরদক্ষিণে দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২৫ হস্ত হইবে, পূর্ণ পশ্চিমেও সম্ভবতঃ তাহাই ছিল, কিন্তু ভাগীরথীপ্রাচীরে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, এক্ষণে কেবল উত্তর দক্ষিণে, দুই পার্শ্বেই প্রায় ৭৫ হস্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই চত্বরের মধ্যস্থলে একটি গৃহের ভিত্তি আজিও বিরাজ করিতেছে। তাহা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান, ও প্রায় ৩০ হস্ত হইবে। এই সকল ভিত্তি এক্ষণে নিবিড় জঙ্গলের দ্বারা আবৃত, আশ্রয় প্রভৃতি দুই একটি বৃহৎ বৃক্ষও তাহাদের উপর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই একটা পথশাস্ত্র পঞ্চদশ সময়ে সময়ে সেই সকল বৃক্ষের শাখায় বসিয়া, সিরাজের সাবের ভবনের ভগ্নাবশেষ দেখিবার জন্ত বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে পথিকদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে। সিরাজ উদৌলার সমস্ত চিহ্নই প্রায় মুর্শিদাবাদ হইতে লয় পাইয়াছে, কেবল ভাগীরথীর পূর্বতীরে তাহার নির্মিত মদীনাটী ও সিরাজ উদৌলার বাজার প্রভৃতি দুই একটি স্থান অদ্যাপি তাহার ক্ষীণ স্মৃতি আনয়ন করিয়া দেয়। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, হীরাবিলের প্রাসাদ নির্মাণের সময়

বর্দ্ধি খা দিরাজ উদৌলার জন্ত একটি গঞ্জ স্থাপিত করিয়া দেন, এবং তাহার নাম মনসুরগঞ্জ হয়। যে স্থলে গঞ্জটা স্থাপিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহাকে মনসুরগঞ্জ বলে, মনসুরগঞ্জ আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে, এবং হীরা-ঝিলের ভগ্নাবশেষ হইতেও বড় অধিক দূরে নহে। হীরাঝিল হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে মোরাদবাগ অবস্থিত ছিল, রেণেলের কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্রে হীরাঝিল ও মোরাদবাগ উভয়েরই নির্দেশ দেখা যায়। মুর্শিদাবাদের মধ্যে মোরাদবাগ ও মতিঝিল ইংরাজদিগের প্রিয় বাসস্থান ছিল। পলা-শীর যুদ্ধের পর ক্লাইব মোরাদবাগে আসিয়া অবস্থান করেন। মীরজাফরের পুত্র মীরন এইখানে তাঁহার অভ্যর্থনায় নিবৃত্ত থাকি-তেন। ওয়ারেন হেস্টিংস মুর্শিদাবাদের রেসি-ডেন্ট নিযুক্ত হইয়া মোরাদবাগেই বাস করিয়াছিলেন। মীরজাফরকে অপসৃত করিয়া মীরকাশীমেব হস্তে রাজ্যভার দিবার জন্ত ভান্সিটার্ট মোরাদবাগে আসিয়া বাস করেন।

হীরাঝিলের অব্যবহিত দক্ষিণে একটি ভবনের কিছু কিছু চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় একটি গৃহেব ভিত্তি ও দেওয়ানের কতক ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান আছে। এই ভবনটা বাজা মহেন্দ বা নার জুলভের। রায় জুলভ সিবাজের রাজত্ব কালে মন্ত্রী কার্য করিয়াছিলেন, এবং মীরজাফরের সময়েও দেওয়ানের পদে অভিযুক্ত হন। হীরা-ঝিলের নিকটেই তাঁহার বাসভান ছিল। গৃহটির ভগ্নাবশেষ ব্যতীত ভবনের চতু-র্দিকেই ঈষ্টকবাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। ভূগর্ভে প্রোথিত সোপানাবলীর কয়েকটি সোপানও দৃষ্টিপাণ পতিত হব। মহেন্দ সায়াপ নামে একটি নাতিদীর্ঘ পুষ্করিনী রাজা মহেন্দ বা রায়জুলভের নাম ঘোষণা করিতেছে। বর্ষাকালে তাহার সুহিত ভাগীরথীর সংযোগ হয়। রায়জুলভের সেই বাসভবনের ভূমি এক্ষণে কৃষক কর্ষণ করিয়া শস্ত বপন করিতেছে। কালে সমস্ত মুর্শিদা-বাদের যে উক্ত দশা না হইবে, ইহা কে বলিতে পারে? শ্রীনিখিলনাথ রায়।

আত্ম বা নিগূঢ় বৈষ্ণব দর্শন । (৪)

৪২। অনেকের (তাহাদের মধ্যে সাধ-নাতিমানী ও সাধনাপ্রিত লোকেরও নিত্য অন্তঃসত্ত্বা নাই) একপ্রকার ধারণা যে, যে-কোন পাত্র-বিশেষেই হউক, প্রেম জন্মিলে সর্বার্থ সিদ্ধি লাভ হয়। শুদ্ধসত্ত্ব অথবা নিরঞ্জনাত্মা বিশ্বদ্রষ্টার সঙ্গপ্রাপ্তির তাৎপর্ষ্য কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই—স্মরণ ভাবধন অন্তরঙ্গ-সম্পর্ক ব্রহ্মাত্মা সজ্জন ভগবজ্জন সাধুর—স্বভাবের সঙ্গপ্রাপ্তিরও তাৎপর্ষ্য কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই—স্মরণ ভাবধন অন্তরঙ্গ-সম্পর্ক ব্রহ্মাত্মা সজ্জন ভগবজ্জন সাধুর—

জাতীয় যে কোন এক বিষয় হউক, তৎপ্রতি প্রকৃত নিঃস্বার্থ প্রেম সঞ্চারিত হইলেই, সকলই সিদ্ধ হইল—সকলই করতঃগুণ্ড হইল। অন্ধভাবে অবিচারে, এই প্রকৃত নিঃস্বার্থ প্রেম, যে কোন আধার বিশেষে উপরত হইয়া দাঁড়াইবে, সে আধার সমল হউক আর নির্মল হউক, অসারগর্ভই হউক আর সারগর্ভই হউক, অসাধু অসত্যীই হউক আর সাধু সাক্ষীই হউক, ভগবৎস্বীয় হউক আর ভগবৎকর্তৃকই হউক, ইত্যাদি

হউক আর শ্রেষ্ঠ জীবই হউক, আধার-
গত কোন বিশেষত্বের অপেক্ষা নাই, সে
আবার প্রাপ্ত প্রেমের বিনিময়ে সর্বত্র,
সর্বকাল, সমভাবে পূর্ণফল প্রদান করিবে ।
এই ধাবণা বিজ্ঞান-বিকল্প, অশাস্ত্রীয় এবং
পূর্বগত প্রকৃত সাধুদিগের অভিজ্ঞতা মূলক
জ্ঞান-সংস্কারের সঙ্গে অসঙ্গত । শুদ্ধ তাহা
নহে, এই ধারণা নিরতিশয় দোষাবহ, অমূ-
লক ও প্রকৃত সাধন-বিবোধী ।

৪৩। বাসায়নিক সংযোগে অধর্মণ ও
উত্তমণ বা যাতক ও মহাজন ভাবাপন্ন ছই
বিকল্প সম্বন্ধ পদার্থে মিলিয়া, একাকার গত
হইয়া যায় । উল্লিখিত বিকল্প ভাবাপন্ন ছই
স্বতন্ত্র মানুষও দৈব ঘটনায় পরস্পরে-এক-
ত্রিত ও পবিত্রিত হইলে, সময়ে উভয়ে
অন্তর্মুখে তদেক হইয়া যায় । উভয়ের তখন
এক মন এক প্রাণ । যখন উভয়ের এই
অন্তর্মুখি তদেকত্ব বা প্রেমমিলন লাভ
হয় ; তাহাদের উভয়েরই তখন কাজে কাজেই
একই স্বার্থ, একই শক্তি, একই উদ্দেশ্য
একই ভাব । পরস্পরকে পরস্পরে স্বতঃই
আত্মীয় বা আত্মীয়তর জ্ঞান করে, পরস্পরের
দেখা সাক্ষাৎ হইলে উভয়েই অপূর্ণ তৃপ্তি
লাভ করে, পরস্পরের সুখ হুঃখে পরস্পরে
সুখ হুঃখ অনুভব করে । প্রেমে মিলিত
ছই জনের নিজ নিজ স্বার্থ ও সুখ, তখন
আত্মবিন্দু অবহেলা করিয়া, পরস্পরের
পরকীর বিন্দুগত হইয়া দাঁড়ায় । তখন
উভয়ের কেহ, শুদ্ধ নিজের সুখে সুখানুভব
করে না, শুদ্ধ নিজের স্বার্থে স্বার্থানুভব করে
না, পরস্পর পরস্পরের সুখ ও স্বার্থে, সুখ ও
স্বার্থানুভব করিয়া থাকে । প্রেম-প্রবীণ
পদকর্তা সুবিখ্যাত চণ্ডীদাস নিম্নোক্ত একটি
পদ্যে প্রেমিকের ভাব অতি সুন্দররূপে
বাস্তব করিয়াছেন—

"যর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর ।

পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥"

প্রেমে মিলিত ছই জনের আবাস ভূমি
নিজ নিজ দেহে নহে, কিন্তু পরস্পরের পর-
কীয় দেহে, এবং তাহাদের আপনার জন
নিজে নিজে নহে, কিন্তু পরস্পরে—তাহা-
দের আপনার জন্তও অজ্ঞাত ব্যক্তিগত,
তাহাদের আবাসস্থানও অজ্ঞাত দেহগত ।
যেমন রাসায়নিক সংযোগে, তেমনি অজ্ঞাত
ব্যাপারে মিলিত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে কোন
বিশেষ স্বরূপগত পরিবর্তন (constitu-
tional change) লক্ষিত হয় না । বিশেষ কোন-
রূপ স্বরূপগত ঔৎকর্ষসিদ্ধি বা তদতিরিক্ত
সংক্রান্ত হইবার জন্ত, পরস্পরের মধ্যে স্বরূপ-
গত পরিণামসিদ্ধির সূচনা কুত্রাপি কখনও
দেখা যায় না । যে কিছু পরিবর্তন পরস্পরের
মধ্যে লক্ষিত হয়, তাহা শুদ্ধ যাতকের স্বরূপে
মহাজনের স্বরূপ-মিশ্রণ ফল, অথবা উত্তমণ
ও অধর্মণ ভাবের যোগ-সমষ্টি ফল । তদতিরিক্ত
আর কিছুই নহে ! হৃয়ের মিলনে অবশ্যই
উভয়ের সামাজিক শক্তি ও বল বদ্ধিত হইয়া
থাকে, কিন্তু স্বরূপ-গত কোন অতিরিক্ত
ঔৎকর্ষ লক্ষিত হয় না ।

৪৪। পাত্রান্তরের সঙ্গে মিলিত হইলে,
মানুষ অজ্ঞাতসারে, অন্তর্মুখে, তদাকারে
আকারিত হইতে থাকে—তদীয় অন্তঃসত্ত্ব
স্বকীয় স্বরূপে, স্বকীয় প্রকৃতিতে আশ্রয়দান
করিতে থাকে । প্রেম সম্বন্ধের এবং সম্বন্ধ যাত্রা
রই ইহা একটা অবশ্যসত্ত্বাবী বৈজ্ঞানিক কল্প ।
শৈশবকালে কোন কোন শিশু (কেহ কেহ
তাহাদের মধ্যে তিন-চারি বৎসর বয়সও
হইয়াছিল) দৈব কর্তৃক ব্যাধি ভয়কাদি জ্ঞান
হস্তে নিশ্চিত হইয়া, সেই সেই ব্যক্তির দেহে
ও যত্নে বধ্যক্লিষ্টানে প্রতিপালিত হইবার প্রবৃত্তি

বাদ সময়ে সময়ে প্রামাণিক সূত্রে জনসমাজের কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হইতেছে । আজকাল সভ্য জগতে একরূপ ঘটনা অসম্ভব বা অপ্রকৃত বলিয়া উড়াইয়া দিবার স্থল নাই । সেই সেই ব্যাবাদি জন্তুর সংসর্গে ও আত্মগতো ২৩ বৎসর মাত্র বাস করিয়া সেই সেই ছুঁতাগা শিশুগণের অবস্থা শীঘ্রই আশ্রয়জাতীয় পথা-দির প্রকৃতি ও চলন চর্যাতে পরিবর্তিত হইয়া, তাহাদের জৈব-দত্ত মনুষ্য প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ গতি, পরিণাম ও বিকাশ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় । একপ অনেক গুণি ঘটনা লোকচক্ষে পতিত হইয়া, প্রামাণিক ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠায় স্থান প্রাপ্ত হইতেছে । এখানে এই সকল শিশু শীঘ্রই আশ্রয়জাতীয় প্রতিপালক জন্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ স্নেহ-সম্বন্ধ-হেতু তাহার স্বভাবসিদ্ধ বস্তুজ্ঞেয় যেমন এক দিকে বিলোপ হইতেছে, তেমনই অপরদিকে প্রতিপালক জন্তুর নিরুপজাতীয় বস্তুত্ব, সেই স্থানে শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চারিত হইতেছে, এবং অবশেষে তাহাদিগকে পূর্ণপালন প্রকৃতিতে পরিণত করিতেছে । অমৃতের অবিকারী স্বাবিনতার অভিমান, নিজের ব্যক্তিত্বের গর্বে পূর্ণগর্ভিত মাল্লষের, সংসর্গদোষে, কি পর্য্যন্ত না অধঃগতি, কি পর্য্যন্ত না উর্গতি, সংঘটিত হইল !!! এক সংসর্গ দোষে মানবপ্রকৃতি বহুনিম্নভূমিতে অধনীত হইয়া পাশব প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইল !!! সংসর্গগুণে, সংসর্গসঙ্গে, মানব-প্রকৃতি কি উন্নীত হয় না ? আত্ম ও পরমা-ত্ম-সম্পন্ন সাধু সজ্জনের সংসর্গে ও আত্ম-গতো হইয়া কি উত্তম পর্য্যন্ত উচ্চ অবস্থার উপনীত হইতে পারে না ?

৪৫। “সংসর্গজা দোষা গুণা ভবন্তি” ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রোক্তি না হইলেও, অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অতিক্রম করিয়া পতি-

তের উক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। “ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিবেদা, ভবতি ভাবার্থে তরণে নৌকা।” ইহা বেদান্তদর্শন—ভাষ্ক-কার মহাশাস্ত্রজ্ঞ আচাৰ্য্যের পাদবর্ণী মহা-পুণ্ড্র ভাবান শাস্ত্রোক্ত্যে উক্তি নিয়া প্রদত্ত । শ্রীচৈতন্য চিহ্নামৃত গ্রন্থে সর্ব-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতবর কৃষ্ণাচাৰ্য্য গোস্বামী “সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সঙ্গসংসারের কয়, লগা মাত্র সাধুসঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়” এই উক্তিতে সাধু-সঙ্গের যৎপোনান্ধি ও যথাবথ গুণ কীর্তনই করিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে “তে পুনস্তাক্ষ-কালেন দশনাদেব সাবধঃ” সাধুবা দর্শন নাহেই পরিহ্র কপেন, এই উক্তি অবশ্যই শাস্ত্র বাক্য বিনা বহুসংখ্যক লোকের কাছে আদরণীয় হইয়া থাকে । প্রাপ্ত বরাণ্-নিবোধত” “তৎ বিজ্ঞানার্থ স গুণসেবাভি-গচ্ছৎ” সদৃশক আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া নিবো-ধিত হও, গমন পুণ্যের সম্যক জ্ঞান লাভার্থ তিনি গুণ সন্নিধানে গমন করিবেন, ইত্যাদি প্রত্যাশদেশ সর্বজননাত্য বোধাত্ম শাস্ত্র হইতে উক্ত । সর্বকালের সাধু সজ্জনগণের ও সর্ব শাস্ত্রের সঙ্গতি সকল এক বাক্যে সাধু সঙ্গেরই মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছে । শ্রীম-ভগবদ্গীতায় “যদা যদাহি ধর্ম্মশ্চ মানির্ভবতি” হইতে “ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” এই শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে ভগবানের ধর্ম্ম স্থাপনার্থে সাধুরূপে অবতারণারই উল্লেখ হইয়াছে । একরূপ কথা কোন প্রকৃত শাস্ত্রে, কোন প্রকৃত অভিজ্ঞানের উক্তিতে প্রকাশ নাই যে, অত্মসঙ্গে, “বার-তার-সঙ্গে” প্রেম-সম্বন্ধ সংঘটনা হইলে, সর্বার্থ সিদ্ধি লাভ হয় । সুতরাং সাধু সঙ্গ ভিন্ন সঙ্গতি লাভের আর অস্ত্র পণ নাই—“নাত্তঃপন্থা বিদ্যতে : অরহ ‘ওনার’ ইহা সাধু সঙ্গ-শাস্ত্র-উক্তিতে এক বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে ।

৪৬। বেক্সপ রাসায়নিক ব্যাপারে উত্তমণ ও অধমণ সম্বন্ধে সম্বন্ধ দুটি স্বতন্ত্র পদার্থপরস্পর সান্নিধ্য ও সাহিত্য প্রাপ্ত হইলে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া, একাক্ষভুক্ত হইয়া যায়, মনুষ্য বা জৈবিক ব্যাপারেও অনুরূপ বিরুদ্ধ ধর্মাক্রান্ত দুটি মানুষ বা জীব দৈব কর্তৃক সান্নিধ্য বা সাহিত্য প্রাপ্ত হইলে, অন্তর্স্থূথে পরস্পরের দিকে সন্নিহিত হইতে থাকে! মহাজন ধর্মীর সম্মুখে ধন দান, এবং খাতকধর্মীর সান্ত্বন্যে ও সন্তুষ্টিতে সেই ধন গ্রহণ, এই ভাবে, উভয়ে ধনাংশে সমান হইয়া, একত্র হইতে থাকে। একদিব্ হইতে মহাজন, খাতকের সন্তুষ্টি প্রবিষ্ট হইয়া তৎসঙ্গে আনন্দসাৎ হইতেছে, আর এক দিব্ হইতে খাতক তদ্বনে ধনবান, এবং তদৈশ্বর্যে ঐশ্বর্যবন্ত হইয়া, তদাকারে পরিণত হইতেছে—অন্তর্স্থূথে একাকার প্রাপ্তি হইতেই—গাঢ় প্রেমের উৎপত্তি হয়। মহাজন সন্নিধানে তাহার খাতক, তাহারই একটা ধন ভাণ্ডার; যে ধন সে নিজেই; খাতক সন্নিধানে তাহার লব্ধ ধনৈশ্বর্য তাহার মহাজনেরই সম্পত্তি বা সেই মহাজন নিজেই এবং সে তাহার কাছে সেই ধন প্রাপ্তিহেতু অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণগ্রস্ত। এই রূপে এখানে দুজনেরই আশ্রিত ভূমিত্বগত হইয়া যাইতেছে। এইরূপে যখনই উভয়ে এক ভাবাপন্ন হইল, যখনই উভয়ে ধনাংশে ঐশ্বর্যাংশে স্বরূপাংশে সমান হইল, তখন প্রেম সম্পূর্ণ হইয়া উভয়ে, পর পর দেহগত প্রভেদ সত্ত্বেও, এক প্রাণ এক মন হইয়া দাঁড়াইল। প্রথম মিলনে হয়ত সচরাচর কোন প্রেম চিহ্ন প্রকাশ পায় না। শুধু প্রতিপদের চক্রকলার জায়, সেই প্রেম চিহ্ন অব্যক্ত ও অননুভূত থাকে, কিন্তু কিছু

ব্যাপক কাল উত্তমণ ও অধমণ ধর্মাক্রান্ত ব্যক্তিদ্বয় মিলিত হইতে হইতে তাহাদের অন্তরস্থ প্রেম চিহ্ন কলায় কলায় বর্দ্ধিত হইয়া, প্রকাশ পাইতে থাকে এবং সময়ে তাহা পূর্ণ মাত্রা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মলিন হৃদয়ে এই ঋণজনিত প্রেম বীজ ক্ষেত্রের অপ্রস্তুত অবস্থা হেতু শীঘ্র অঙ্কুরিত হইতে পারে না।

৪৭। প্রকৃত প্রেম সূতরাং নিববচ্ছিন্ন ঋণদায়ে অস্থির, সর্বত্রই ঋণ ভারে ভারাক্রান্ত এবং নানা উপায়ে প্রাপ্যন্ত স্বীকার করিয়াও সেই ঋণ পরিশোধের চেষ্টায় বিবৃত, সেই জ্বালায় সর্বক্ষণ জ্বালাতন। যেখানে জাত-সারেই হউক আর অজাত সারে হউক, এই ঋণদায়ের অভাবসিদ্ধ অস্তিত্ব—এই ঋণ-ভারের অবিশ্রান্ত পেয়ণ পীড়া, এই ঋণ-পরিশোধের স্বতঃসিদ্ধ চেষ্টা ক্ষুণ্ণিত পাইতেছে, সেই থানেই প্রেমের বীজ প্রকৃত প্রস্তাবে অঙ্কুরিত হইয়াছে, বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। লৌকিক ভাবে উপকার ঋণ প্রত্যুপকারে পরিশোধ করিবার যে চেষ্টা, তাহা, প্রকৃত না হউক, কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহা তদতিরিক্ত আর কিছুই নহে। চেষ্টা-সাধ্য বহু প্রকার প্রত্যুপকার চেষ্টা করিতে করিতে যখন খাতক দেখিতে পায় যে, তাহার ঋণ মাত্রা কোনক্রমেই হ্রাস হইতেছে না, এবং সহস্র সহস্র প্রত্যুপকার সাধনেও তাহার হ্রাস প্রাপ্তির কোন প্রকার সম্ভাবনা দেখিতে পায় না, তখনই সেই হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমাত্মক হইয়াছে বলিয়া মানিতে হইবে। যে ঋণ প্রত্যুপকারে পরিশোধিত হইল বা হইতে পারে, যেন হয়, তাহা প্রকৃত কৃতজ্ঞতাও নহে, প্রেমমুক্ত নয়ই। ঋণ হইতে প্রকৃত কৃতজ্ঞ-

জ্ঞতার উৎপত্তি এবং প্রকৃত কৃতজ্ঞতার মধ্যে প্রেমবীজ নিহিত থাকে । প্রেম দরদে প্রকাশ পায়,—ব্যথায়, বেদনায়—জ্ঞানায় প্রকাশ পায় । প্রেমিক আর ব্যথিত একই কথা । প্রেমিক দরদের দরদী, ব্যথার ব্যথিত, বেদনার বেদনী । যেখানে এই অকারণ ঋণ সম্বন্ধ ঘটে, সেখানে এই ঋণ প্রেমবীজ রূপে খাতকের অন্তরে নিপতিত হয় । যেখানে এই অকারণ ঋণ প্রাপ্ত হইয়াও খাতক সে সম্বন্ধ যথা-যথ অনুভব করিতে পারে না এবং প্রেমের কোন চিহ্ন সেখানে প্রকাশ পায় না, সেখানে ইহা নিশ্চয় যে, খাতকের হৃদয়গত কোন আবজ্ঞনায়, সেই প্রেমবীজ প্রাবৃত হইয়া পড়িয়াছে । অথবা তাহা প্রকৃত আগ্রহ স্থল প্রাপ্ত হইতেছে না । যেখানে প্রাপ্ত-ঋণের পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা-সূচক কোন প্রকার প্রত্যাশার ক্ষুধা হওয়া দূরে থাকুক, অনিষ্ট ও অপকাব চেষ্টা পর্য্যন্ত দেখা যায়, সেখানে ইহা নিঃসংশয় যে ক্ষেত্র-টিতে হৃদয়মালিন্যের অবধি নাই । কিন্তু একবার এই অকারণ ঋণ সম্বন্ধ ঘটিলে খাতকের আর কোন ক্রমেই নিস্তার নাই । শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, ইহ-জন্মেই হউক আর জন্মান্তরেই হউক, জ্ঞাত-সারেই হউক, আর অজ্ঞাত সারেই হউক, যখনই আত্মোন্নতির স্বাভাবিক হেতু পরস্পর ক্রমে সেই চিত্ত-মালিন্য জালিত বা অপসারিত হইয়া যাইবে, তখনই তাহার অন্তর্নিহিত প্রেমবীজকে অঙ্কুরিত হইতেই হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ঋণ-ভারে প্রপীড়িত হইয়া, সেই ঋণ-দায় হইতে অব্যাহতি লাভের স্বভাবতঃই আয়োজন করিতেই হইবে । দেহ-লীলা সম্বরণ করিয়া, অন্যত্র গমন করিলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই । এই ঋণ-দায় সম্বন্ধে

কোন বঙ্গীয় সাধক ভক্ত কবি বলিয়াছেন, যে ।

শমন সঙ্গে আছে তার, স্বর্গ গেলেও নাই নিস্তার,
আসতে হবে পুনবার, পরিশোধ দিতে ।

গলায়ে না পাবে পার, এ ঋণ থাকিবে ॥

৪৮ । ইহাবই নাম ঋণে দারে, প্রেমের জ্ঞানায় বিব্রত হওয়া । ঋণ দাতা, মহাজনের সম্মিধান হইতে বত দূরবর্তী থাকুক না কেন, ঋণ-সম্বন্ধ সংঘটনার কাল হইতে বতকাল ব্যবহিত থাকুক ও গত হউক না কেন, তাহার চিন্তাবজ্ঞনা, তাহার অন্তর হইতে বিদূরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে খাতক, প্রাপ্ত ঋণের পরিশোধ দায়ে বিষম দায়গ্রস্ত হইয়া পড়ে । তাহাব সেই অপরিশোধিত ঋণ তখন দাবানল রূপ ধারণ করিয়া, তাহার অন্তরকে দগ্ধ করিতে থাকে । এই জ্বালা, মহাজনের সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া, কৃত ঋণ পরিশোধের উপায়-স্থলত না হইলে, কিছুতেই নিবারিত হইবার নহে । এই অপরিশোধিত ঋণদায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ত,—এই দুঃসহ ঋণ ভার বিমোচন জন্ত, খাতককে হয়ত ইচ্ছা-সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ পর্য্যন্তও স্বীকার করিতে হয় । এই জন্ম গ্রহণ তাহার ঋণদাতা মহাজনকে ধরিবার জন্ত—তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার জন্ত । তাঁহাকে পাইতেই হইবে । সেই ধনী মহাজন সমক্ষে আত্ম বিক্রয় করিবার জন্ত—তাঁহার অলিখিত ঋণখণ্ড পরিশোধ করিবার জন্ত, প্রেমদানে, প্রত্যাশার দানে, তাহার পূর্নকৃত ঋণভার কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্ত, তাহার প্রাণ এখন প্রবল পরাক্রমে তাহার মহাজনভিষুখে টানিতে থাকে, তাঁহী । তাহাকে ইহ সংসারে পুনরাবর্তন পর্য্যন্তও স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয় । তব্ধিই অস্ত কিছুতেই তাহার তৃপ্তি লাভ হয় না—

স্বর্ণ-স্বৰ্ণ ভোগেও সে সুস্থির থাকিতে পারে না। ঋণী যদি কখনও জ্ঞাতসারে প্রতাপ-কার সাধনে, প্রাপ্ত ঋণের বিপরীত পবিশোধ দিয়া থাকে, তাহা হইলে এখন তাহার জ্ঞান শতশুণ বুদ্ধি পাল্লিয়া থাকে। যখন তাহার তাদৃশ চিত্ত শুদ্ধ হয় নাহি, তখন তাহার স্বপ্না বৎ ভাল ছিল, কিন্তু চিত্ত শুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যয়ন্যবও ক্রমশঃ আবিক্যা প্রাপ্তি হইতে থাকে। কেবল নিম্নলিখিত চিত্তেই অনিচ্ছাপূর্ণ অকাম অল্প তাপাশি প্রজ্জলিত হইয়া থাকে।

৪৯। এই সংসার-ক্ষেত্রে কখন কখনও এমনও হইবে যে, দুই জনের পরস্পর সাক্ষাৎ মিলন হইয়া মাত্র, একজন আর এক জনের গাঢ় প্রেমে নিগীত হইয়া পড়ে। একজন সম্বন্ধে অপরের এমনি মনোনিবেশ বেদনা আচ্ছাদিত থাকে যে, হয় ত তাহার চাক্ষুষ মাত্রই সে অমনি মন-বেদনার মুচ্ছাপন্ন হইয়া পড়ে। একপ ধটনা স্থলে সচরাচর দুইটা কারণ উপস্থিত হইতে পারে। তন্মধ্যে একটা এই যে, বিরুদ্ধ ধর্মাত্মক দুই জনে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে পরস্পরের জন্ত ঈশ্বর বর্জিত বা প্রাকৃতিক কারণে সংস্পৃষ্ট হইয়া, দৈবযোগে বা হুটাত, মিলিত হইয়া, উভয়ে গাঢ় প্রেম সংঘটন সম্বন্ধ হওয়া পড়িল। আর একটা কারণ, এবং যাহা ইতিপূর্বেই ইঙ্গিত হইয়াছে, তাহা এই যে, কোন জঘন্যত্বে কোন ঋণ বন্ধন ঘটন হেতু অপরিশোধিত ঋণ-জালা প্রজ্জলিত হওয়াতে, তাহা যথাস্থানে বৎসিক নিবারণ সম্বন্ধে ইহ সংসারে আসিয়া, অনেক অজ্ঞাত অমু-সন্ধানের দর মৈব কর্তৃক কোন সুসময়ে তাহার প্রকৃত অথচ অজ্ঞাত মহাজনকে সহসা প্রাপ্ত হইয়া, ঋণী তরুণ বিকারগ্রস্ত হইয়া

পড়িল। অথবা পূর্বজন্মের অপরিহৃত ও অপরিশোধনীয় প্রেম সপক্ষ, যাহা সহসা কোন দৈব বিচ্ছেদ ঘটনাতে অবরোধ প্রাপ্তি হেতু প্রেমিকের সংসার বা আতি-বাহিক দেহে প্রস্থত ছিল; এবং যে জন্ত তাহার প্রেম-পবণ হৃদয়, এতদিন কোন ক্রমেই প্রসন্নতা লাভ করিতে সক্ষম ছিল না, তাহা যথা পাত্র দশনে সহসা প্রেমিক হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া, সেইভাবে প্রেমোচ্ছ্বাস প্রাপ্ত হইল। যাহারা প্রকৃত কোন প্রেমের কিছু মাত্র তত্ত্ব বুঝেন, তাহাদের কাছে এই শেযোক্ত কারণটা নিতান্ত অজ্ঞেয়তার আবরণে পোবৃত হইলেও, সুসঙ্গত বলিয়া অনু-মিত হইবে। দৃষ্ট কারণের অসম্ভবে সমস্তই অদৃষ্ট কারণাৎ হইয়া মান নিত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত কারণটাকে ঋণ বা প্রেম ব্যাপা-নের উল্লিখিত বেদনা, দরদ, জালা, অইচ্ছা ও মনোপিড়া প্রভৃতি ক্ষুণ্ণিত পাইবার স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রেমের দামে অস্থির হইবার, ঋণভারে ভারাক্রান্ত হইবার, বথেষ্ট যুক্তি প্রথমোক্ত কারণে সম্ভবপর বলিয়া অনুমান-সিদ্ধ হয় না। সে প্রেমে লোকে বিষম ঋণদারে, কেন অকারণে আপনাকে দায়গ্রস্ত মনে করিবে? সে প্রেমে পূর্ব প্রাপ্ত ঋণের ভারত ও গুরুত্ব লোকে কেন অকারণে সেক্ষপ অনুভব করিবে? সে প্রেমে স্থল বিশেষে “a debt immense of endless gratitude and endless obligation” লোকের অন্তরে অব্যবহািক জন্ত স্থান পাইবে? প্রকৃত প্রেমে, খাতক, মহাজনের কার্যসাধনে নিঃস্বার্থভাবে আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিয়াও যেন আরও কত করিতে অবশিষ্ট রহিল, এরূপ অভূষিত তাহার সক্রিয়-চিত্তে সর্বক্ষণ উদয় হইতে থাকে।

প্রথম কারণে একপ অকাবণ অতৃপ্তি কেন জন্মিবে? প্রথম কাবণটী এই সকল প্রেমের সহজর দানে অপাবক। দ্বিতীয় কারণে ঐ সকল প্রেমের এক প্রকাব সঙ্গত উত্তর পাওয়া যায়। প্রাণ দিয়াও যে ঋণীৰ সম্যক পরিতৃপ্তি লাভ হয় না, অথচ তাহাব যে কি ঋণ এবং কত ঋণ, তাহা তাহার কিছুই জানা নাই। ঋণ ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রহিল, অথচ তাহাব দায়ে ঋণী যৎপবোনাত্তি বিব্রত হইয়া পড়িল। কি দিয়া যে সেই অজ্ঞাত ঋণ সে শোধ করিবে, তাহা সে ভাবিয়াই পাব না। একপ ভাবক্ষুণ্ণি মূঢ় কেবল দ্বিতীয় কাবণেই অহুমান-সিদ্ধ হইয়া থাকে।

৫০। কিন্তু এই সমস্ত ঋণ অবিকাশ হইলে নিশ্চয় পাত্র কর্তৃক বিতপিত না হওয়াতে, সেই ঋণ-সম্বন্ধ হইতে ঋণীর অন্তরে যে মহাজনজাতীয় তদাকাবদ্ধ লাভ হয়, তাহা কোন ক্রমে তাদৃশাতীত বা তদতিরিক্ত নির্মল হইবাব কোন প্রকাব সম্ভাবনা নাই। মহাজন যেখানে সাধু সজ্জন, নিপুণ অন্তরঙ্গ সম্পন্ন ও কৃষ্ণপ্রেমে অবজব দেহ, সেইস্থলেই কেবল নির্মল তদাকাবদ্ধ প্রাপ্তি কৃষ্ণ বা বিশ্বজনীন প্রেম এবং আত্ম ও পবমাত্ম বা স্বরূপ-তত্ত্ব ক্ষুণ্ণি সম্পাদিত হইতে থাকে। কেবল এই জাতীয় ঋণ সম্বন্ধে বা তজ্জনিত প্রেম-সম্বন্ধে লোকের অন্তর্ম্মল কালিত হইয়া চিত্ত-নৈর্মল্য লাভ হয়। অত্ম ঋণে বা অত্ম প্রেমে তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। ঋণী যে জাতীয় ঋণ-প্রাপ্ত হয়, সেই ধনের দারদ্র অথবা ঋণদাতা ধনীর প্রকৃতি-গত পার্থক্যই অন্তর্ম্মল্যের নিমিত্ত-কারণ হইয়া থাকে। তত্ত্বের সেখানে অত্ম কারণে প্রাপ্তি বা অহুমান-সিদ্ধ হয় না। প্রেম তাহার কাকগাঙ্ক হইতে পারে না। এই

জগৎ শ্রীচৈতন্য-পার্ষদবব প্রেমিক-শিরোমণি পূজ্যপাদ বায় বামানন্দ তাঁহাব সুবিখ্যাত অগাব জ্ঞানগর্ভ সাধ্য-সাবন নিম্ন তত্ত্ব বলিয়া ছেন—যে “নিত্যাসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয। শ্রবণাদি (হেতু) শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥” অগ্রে শুদ্ধচিত্ত না হইলে, চিত্তয় ধনেব ঋণ প্রাপ্তিতেও তখনই তখনই কৃষ্ণ প্রেমোদয় হয় না। তবে তাহাব নিবন্তব সমাগমে চিত্তেব আবর্জনা যে তখন হইতে দগ্ন হইবার সূত্রপাত হয়, তাহাতে আব সন্দেহ নাই। সাধু সজ্জনেব অন্তরঙ্গ নিববচ্ছিন্ন কৃষ্ণ বা বিশ্বজনীন প্রেমে অব অব বসিয়া তদঙ্গ নিঃসৃত নিবত্তন, পবানন্দ ধন, মন্বা প্রকৃতি-নিহিত, নিত্যাসিদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেমেব ‘বিদেহ বোজকে সন্দেহ বাঞ্জে পবিগত ও অদ্বুবিত কবিয়া যথা সময়ে তাহাকে দেহব্যাপী কৃষ্ণ-প্রেমাক্তে তদাকাবিত কবিয়া তুলে। এই নিশ্চয় চিত্ত-মল্লয় চিত্তয় ধনেব মহাজনোতেও প্রেমোৎপত্তি হেতু চিত্তশুদ্ধি হইবাব কোথাও কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু সর্বত্র চিত্তশুদ্ধি-হেতু প্রেমোদয় হইবাব কথাই আছে। সর্ব-বিধ প্রেম-সঞ্চার তলে এক কথা সমান খাটি-তেছে—যে, “প্রেমে চিত্ত-শুদ্ধিলাভ হয় না”; ঋণীর চিত্ত নির্মল হইলে, সেখানে স্বতঃই সহজেই প্রেমবীজ অকুরিত হইবা থাকে। সাধু মহাজনের উক্তি প্রসিদ্ধই আছে যে “শুদ্ধচিত্তে উপজয় পিরীতি রতন।” সূত্রবাং চিত্তশুদ্ধি ও ঋণ প্রাপ্তি, এই কারণ দ্বয়ের মিলন হইতে সর্বত্র প্রেম জন্মিয়া থাকে। পরানন্দবন শ্রীকৃষ্ণ দেহের সংসর্গ কামনায় ও তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ অহুধ্যানে, চিত্ত-শুদ্ধিলাভ হওয়াতে ব্রজগোপীগণের প্রাকৃত কামও অপ্রাকৃত নির্মল প্রেমে পরিণত হইয়াছিল, এবং অহরহঃ তাঁহার সহজ ভাবনা প্রযুক্ত তাঁহার

শকুণগণেরও সঙ্গতি লাভ হইয়াছিল, ভাগ
বতাদি শাস্ত্রে একরূপ অনেক উল্লেখ আছে ।
অপ্যায় রামায়ণে (৭) কুন্তকর্ণ সঙ্গে রাবণের
সীতাহরণ সঙ্গন্ধে যে কথোপকথন হয়,
তাছাড়া বামচন্দ্রেরই রূপ পরিগ্রহ কবিতা
সীতাহরণ কার্য্য সমাধা করিলে, এতাদৃশ
কোন অনর্থোৎপত্তি হইতে পারিত না, একরূপ
ভাব ব্যক্ত হইলে, রাবণ উত্তর কবিলেন যে,
সে রূপ পরিগ্রহ করিলে কবিব ? তাহাব
পৌকারিক আয়োজন স্বরূপ সেইরূপ ব্যানে
ধনিত গিয়া দেখি যে, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে
যাবতীয় সৃষ্টৈশ্বর্য্য ইন্দ্র ও ব্রহ্ম পৰ্য্যন্ত
আমাব তুচ্ছজন হইতে লাগিল, সীতাসহ
বাসস্থল কোন ছাব ।।।

‘বু—’অনীতা ভবতা যদা পতিবতা সাক্ষীর্বাবনীভূতা
‘স্ব’জ্ঞদাক্ষসমাবধা নচ কথং বামা সমজ্ঞীকৃতং’ ।
ব—‘ঈহু’ চেষ্মি পুণ্ডরীক নয়নং দুর্লভাদা শ্যামলং,
তুচ্ছং ব্রহ্মপদং ভবেদনুদিনং পবনধু সঙ্গ প্রসঙ্গকু’ ॥

নিম্নলি চিন্ময় দেহের এমনি পবিত্রকা-
বিতা শক্তিই বটে ।।। মলিন দেহ সংসর্গের
কি মোহপ্রদ, মালিন্যপ্রদ শক্তি নাই ? মলিন
জাতীয় প্রেম কি মোহোৎপাদক নহে ? সে
প্রেমের নাম কি মোহ নহে ? স্ত্রী পুত্রাদিতে
নিঃস্বার্থ ভাবে আসক্ত হইয়া কি জীব বদ্ধ
হয় না ? মৃগ-শিশুতে আসক্ত হইয়া কি

ভবত রাজাব সাময়িক দুর্গতি লাভ হইবার
কথা শাস্ত্রাদিতে প্রচারিত নাই ?

৫১। মানুষ যেখানে পরমাত্ম তত্ত্ব লাভ
কবিতা, কৃষ্ণপ্রেমে দিবানিশি জর জর অঙ্গ,
সেখানে সেই প্রেম কৃষ্ণপ্রেমিক মহাজনেব
ব্যক্তিদেহ অতিক্রম পূর্ব্বক স্বভাবতঃই সর্ব্ব
ব্যাপী—বিশ্বব্যাপী হইয়া বিশ্বজনীন প্রেমে
পরিণত হয়। তখন তাহার নবীন পাবমায়িক
চক্ষে তাহাব কৃষ্ণপ্রেমিক মহাজনেব ব্যক্তিগত
ব্যবহারিক খণ্ডত্ব, সমষ্টিগত অখণ্ড সত্তাতে
পরিব্যাপ্ত। তাহা তখন যাবতীয় ব্যক্তি আধাব-
গত—সদাধাবগত হইয়া প্রকাশ পায়।
তখন তাহাব ঋণভাবের গুণত্ব কেবল এক
মাণ ঋণদাতা মহাজনেব ব্যক্তি আধাব সঙ্গন্ধে
উপলব্ধি হইয়া ক্ষান্ত হয় না, কিন্তু যাবতীয়
আবার সঙ্গন্ধে তাহার উপলব্ধি হওয়াতে
সেই প্রেম অনন্ত অসীম আকার পরিগ্রহণ
কবে। তখন তাহার ঋণভাবেরও সীমা
নাহ প্রেম বিস্তারেরও সীমা নাহ। তখন
সে ঋণ নিত্যকাল অপরিবেশোদনীয় আকার
ধারণ কবিতা অব্যাহত থাকে। বিশ্বজনীন
নিত্য দাসত্ব বত অসীমাব কবিতাও অনন্ত
ভবিষ্যতে সেই ভবন্ত ঋণমোচনেব কোন সম্ভা
বনা থাকে না। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণ প্রেম।

ক্রমশঃ

শ্রীকালীনাথ দত্ত ।

নবযুগ ।

(১)

বেজেছে নূতন বাণী জীবন পুলিনে ;
হৃদয়ে বিশ্বাস ভরি,
পুণ্যতনে পরিহরি,
এস সবে স্মরা করি যে চাহ নবীনে,—
বেজেছে নূতন বাণী জীবন পুলিনে ।

(২)

শুন, শুন প্রতিধ্বনি গভীর বিশাল,
সুরে সুরে ছাইতেছে আকাশ পাতাল !
কলির কলুষ প্রাণ
হ’য়ে গেছে অবসান,
স্মরণে দাঁড়াইয়া পুন সত্যকাল ।

(৩)

হের, ওই চরাচর উঠেছে আগিয়া,
চৌদিকে আঁধার জাল পড়িছে ধসিয়া।
আনন্দে অসীমে লুটে
ব্রহ্মাণ্ড চলেছে ছুটে,
নবযুগে নব গীতি গাহিয়া গাহিয়া।

(৪)

লাগিছে গানের ঢেউ আকাশের গায়,
অগণ্য তারকারাশি ফুটিতেছে তায় ;
আহ্লাদে আপনা হাবা
নব জন্ম ল'য়ে তারা
কি-বে-কি করিবে সবে ভাবিয়া না পায়।

(৫)

লেগেছে ধরার গায়ে বাঁশী'র লহরী,
পুলকেতে কায়া তার উঠিছে শিহরি ;
রোমাঞ্চ-ফুলের হাসি
ফুটিতেছে রাশি রাশি
নব আশা, নব ভাব প্রাণের ভিত্তি।

(৬)

শুধা হ'তে শুনিবারে পেয়েছে তটিনী
জীবনের সম্মুখে নতন কাহিনী ;
গলিত নির্ঝর-ধারে
বোধিবারে নাহি পাবে,
চলিয়াছে, ছুটিয়াছে কূল-বিপ্লাবিনী।

(৭)

একেবারে শত পাখী উঠেছে মাতিয়া,
শত কবি অশ্রুধারা ফেলেছে মুছিয়া।
বিসুদ্ধ হয়েছে বন্ধ,
গাঁথিয়া নতন ছন্দ
স্বপ্নল উজ্জ্বল দিতেছে ঢালিয়া।

(৮)

একিরে নতন যুগে নতন উজ্জ্বল !
শিশু মুখে অর্থপূর্ণ বচনের বাশ !
হেথা সখাগণ ভাবে,
হোথা সখীগণ হাসে,
বিশ্বপ্রাণে নবতর প্রেমের বিকাশ।

(৯)

দাঁড়িয়ে সমুদ্র তীরে মুগ্ধ কবির,
অসীমে বিস্তৃত তাঁর দৃষ্টির প্রসব,
পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞের মত
পড়িছেন অবিরত
বিশ্বের বিশাল কাব্যে সত্যের আঁধার !

(১০)

ছুটিয়াছে কোটা যাত্রী অনন্ত সঙ্গমে ;
তীর্থযাত্রা নাহি শুধু বাঙ্গালী-ধরমে ?
মোরা কি কীটের মত
ধূলি-আলিঙ্গনে রত
প'ড়ে রব মর্ম্মজালা কুথিয়া মরমে ?

(১১)

কোথা নব বৃন্দাবনে যমুনার তীরে
জগতের নাম ধ'বে কে ডেকেছে ধীরে ;
জগৎ ছুটিছে তাই,
আমরাও চল যাই
ভাসিয়ে এ মিথ্যারশি বিশ্বস্তির নীরে।

(১২)

গাও তবে, গাও আজি নুতনের জয়,
পুরাতন চ'লে যাক্, হউক বিলয় ;
পশ্চাতে মর্ত্তের রাত্তি,
সমুখে স্বর্গের ভাত্তি,
এক ভাবা, এক ধর্ম্ম,—শান্তির আলয়।

ত্রিনিত্যক্লম্ব বহু।

সুজা বাই

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর উষ্ম রাজ-পুতানা-বুঁদী রাজকুমারীর নিঃশ্বাস জীবন কাহিনী। বুঁদীবাজ্য তখন বীরত্বে বিখ্যাত, গোববগর্বে উন্নত। এমন সময়ে রাজা নারায়ণদাসের গৃহে মাধুরীময়ী, কলহাস্ত-পরায়ণা তম্বী স্নানরী বালিকা সুজাবাই তাহার শৈশবের চঞ্চল সুন্দর শোভাখানি লইয়া পিতৃ গৃহেব অন্তরঙ্গ অভিভাবক-আশ্রিত অম্লগত সকলের সম্মুখে সর্বদা ক্ষুদ্র পরী রাণীর মতন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত।

বুঁদীবাজ নারায়ণদাস গৃহে যেমন স্নেহ-ময় ছিলেন, তেমনই যুদ্ধ প্রতিভার জ্ঞান তাঁহার দেশব্যাপী সুনাম ছিল। অনেক রণক্ষেত্রে তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়া কীর্তিমান হইয়া গিয়াছেন। রাজপুত বমণীবা গোধুম পেষণ করিতে করিতে মধুবকর্থে, উদ্বেল হৃদয়ে তাঁহার অদ্ভুত বীরত্ব গাথা গান করিত; রাজ্যের অবাধ্য উশ্বাল মন্দ লোকেরা রাজা নারায়ণদাসের শাসন ভয়ে সংযত থাকিত। তাঁহার সাহসের কথা শোনে নাই, তখনকার দিনে দেশে এমন কেহই ছিল না। ভর কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না।

কিন্তু একাধারে অনেক গুণের সমাবেশ সম্বন্ধে সর্বোপরি দোষ ছিল, অহিফেণ-সেবন-সক্তি। জীবনের ঐ এক কলঙ্ক ভিন্ন দ্বিতীয় দোষ কিছু ছিল না। ইহারই বিষয় তজ্জালস প্রভাব তাঁহাকে সময়ে অকর্মণ্য করিয়া রাখিত। শত্রুর মানস অনেক বিষয়ে তিনি আত্মসংযমী ছিলেন, কিন্তু এই মন্দ অভ্যাসটির এত বশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ক্রমেই যাত্রা অধিক হইতে অধিক ভয় হইয়া

চলিতেছিল। তবে, রাজা নারায়ণদাসের চরিত্রের দোষগুণ একত্র করিলে গুণের ভাগই যে অনেক অধিক হইয়া পড়ে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সুজা বাইয়ের জননী চিতোব রাজ বংশের কুমারী কন্যাকে তিনি যেমন ঘট-নায় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে নিতা-স্তাই কোতুলজনক। বুঁদী ও চিতোর, এই উভয় রাজবংশ তখন পরস্পর মধুব মিত্র-সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল; একেব আবদ্ধকে অল্পে প্রাণপণেও সাহায্য কবিতেন। চিতো-রের রাণা রামমল্ল একবার পাঠানদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিরুপায়েব ভবসা, অসহায়ের সহায় রাজা নারায়ণকে সংবাদ দিবামাত্র তিনি সহস্রাঙ্গ মনোনীত সৈন্তসঙ্গে বজুর উদ্ধারে চলিলেন। বুঁদীর নগবদ্যব হইতে শত্রু সাজ্জিত গরিব সৈন্তশ্রেণী দৃঢ়পদক্ষেপে ক্রমাগতঃ রাজপথ বহিয়া গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে মধ্যাহ্ন সময়ে সৈন্ত-দের আহার ও শ্রান্তিদূরের জন্ত একটি ছায়া-শীতল গ্রাম মনোনীত হইলে, তখন বিশ্রামের জন্ত রাজা স্ত্রী প্রচারিত হইল। অশ্বাবতা-রিত রাজা প্রথমেই তাঁহার প্রাত্যাহিক ‘মোতাতের’ মর্যাদা রক্ষা করিলেন। পরে সময়ে আহাষারি শেষ হইল। এদিকে মোতাত ধরিয়া উঠিয়াছে, নিদ্রিত না হইয়া তিনি আর পারেন না। অদূরবর্তী একটা বৃক্ষছায়াবিশিষ্ট স্থানের স্থানে রাজা তখন রাজ-শয্যায় শায়িত হইলেন। এমন সুখস্বপ্নের ঘোরে যখন তিনি পাঠান জয় করিতেছিলেন, তখন অধরোষ্ঠ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং দন্তপাঁতি

ও শুক জিহ্বা নির্গত হইয়া পড়িয়াছে, কষ্ট
খাস একবার সশব্দে আব একবার নিঃশব্দে
চলিতেছে এবং মক্ষিকাদল নিশ্চিন্তে রাজার
মুখ ও ললাট অধিকার করিয়া বসিয়াছে।
এমন সময় ঐ গ্রামস্থ তৈলকারের যুবতী
জী বৃক্কতলবর্তী কূপে জল আনিতে কলসী
কক্ষে সেখানে উপস্থিত। যুবতী জল ভবিল,
কলসী কক্ষে তুলিল, পবে সে বিখ্যাত বাজা
নারায়ণদাসকে দেখিবাব কোতুলটা ও তাগ
কবিত্তে পারিল না। কিন্তু দেখিবামাত্র
বমণীর ক্ষুব্ধিত অধব ও বিস্ফারিত নয়নে
বিজ্রপবিস্ময় চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, আবার
ত হা যেন মলিন হইয়া গেল, ধীবে সে
বলিল,—“পোড়া কপাল আমাদের রাণাব,
ইহারি ভবসার আছেন, তবেই বিলক্ষণ।”
কথাটি কহিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্ত সবে
সে পা বাড়াইয়াছে, অমনি সর্সনাশ, বাজা
নারায়ণদাস শয্যাব উপর উঠিয়া বসিয়া
পলকের জন্ত একবার সেই বিজ্রপপরায়ণা,
গমনোদ্যতা যুবতীকে তাঁব অপাক্ত ভঙ্গীর
সঙ্গে দেখিয়া লইলেন। পরে তাহাকে
সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“মর্দানি, মৎ
ভাগো!” ভয়-বিহ্বল রমণী আর অগ্রসর
হইতে পারিল না, রাজা যাইয়া তাহার
সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। তখন বিনা বাক্য-
ব্যয়ে রাজা একখানি লৌহদণ্ড আনাইলেন।
যুঝি মস্তক চূর্ণের ব্যবহার অতবড় লোহার
লাঠি আনা হইল, এই আতঙ্কের অতিশয্যে
রমণীর মুখ ফুটিতেছিল না, শরীর ঘর্ম্মাক্ত
হইয়া উঠিতেছিল। রাজা লৌহদণ্ড উঠা-
ইলেন, পরে দুইদিকে দুইখানি হাত দিয়া
অবলীলাভক্কে, অনায়াসে, লোকে যেমন
সহজে যেতেন একখানি দীর্ঘ সরল লাঠির
দুই প্রান্ত একত্র করিয়া তেঁরু তিহি লৌহ-

দণ্ড খানিকে ইচ্ছানুসারে গোলাকাব করিয়া
ঠিক একটা হাঁসলীম মতন কবিলেন। তাহাই
রমণীর গলায় পবাইয়া দিয়া তাহাকে বল-
লেন,—“আমাব পুনরায় মা আসা পর্যন্ত
তুমি তোমাৰি যোগ্য এই সুন্দর অলঙ্কার
পবিষা থাক, আব ইহার মধ্যে যদি তোমার
মনোনীত কোনও বীবপুরুষ ইচ্ছা খুলিতে
পাবেন, ভাল, বাজা নারায়ণদাস তাহাকে
হাজাব আসবুফি এমদাদ্ দিবে।”—বিস্মিত,
অমৃতপ্ত, লজ্জিত বমণী রাজদত্ত অভিনব
অলঙ্কার গলায় পরিয়া গৃহে গেল, এদিকে
বাজা দ্রুতগতিতে চিতোবের দিকে অগ্র-
সব হইলেন। যথাকালে চিতোবের নিকটে
উপস্থিত হইয়া তিনি দেখেন, দুর্দ্ব্য পাঠা-
নেবা দলে দলে চিতোব নগর ঘিরিয়া
আছে; প্রজাসাধাবণ উৎপীড়িত, ধনধান্ত
লুণ্ঠিত, রাণা রুদ্ধদ্বার নগরে আবদ্ধ। তখন
বিনাবাক্যব্যয়ে রাজা নারায়ণ দাস তাঁহার
সুশিক্ষিত, সাহসী সৈন্তদল সঙ্গে পাঠান সৈন্তের
উপব পড়িলেন। চিতোর হইতে নগর
প্রাচীরেব বাহিবে হিন্দু-মুসলমান সৈন্তের
দারুণ যুদ্ধ কোলাহল শোনা গেল। অল্প
কালের মধ্যেই বৃন্দীরাজ সৈন্তের অমানুষিক
সাহস ও সমর কৌশলে পাঠান সৈন্যদলের
জয়কোলাহল বিস্মষ্ট আর্তনাদে পরিণত
হইয়াছে। একদল পলায়িত পাঠানসৈন্য
তাড়িত পদ্মপালের মত প্রাণ বাঁচাইল।
চিতোরের মজার্ত পথ তখন পরিষ্কার হই-
য়াছে। উপকারী বীরবন্ধ বৃন্দীরাজের জন্ত
তখন চিতোর নগরদ্বার আনন্দ আপ্যায়িত
উৎসবের সহিত উন্মুক্ত হইয়াছে। বৃন্দীরাজ
চিতোরে উপস্থিত হইলে কৃতজ্ঞ মহারাণা
প্রেরা লিঙ্গনের সহিত তাহাকে গ্রহণ করি-
লেন। তাহার এই শুভাগমন উপলক্ষে সর্দার

চিতোরনগরে উৎসবের উচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল। রাজপথে পত্র পুষ্প-পতাকার শোভা, পণ্যবীথিকার লোহিত বস্ত্র ও ফুলমালার শোভা, জনতা শ্রোতে স্বীপুরুষ সকলের মুখে আনন্দচিহ্ন, প্রাসাদ ও পূর্ণকুটার সমস্তই সম্ভ্রান্ত। রাজা নারায়ণের বজ্র প্রাতি কর্তব্যের এই বিরোচিত দৃষ্টান্ত, তাঁহার সাহস ও সমর কৌশলের কথা অবিলম্বে বাজান্তঃপুরের রমণীরা বিশ্বাস-আনন্দ একাগ্রতাব সঙ্গে শুনিলেন। ভারতে তখন স্বাধীনতার দিন, তখনকার শিক্ষা, তখনকার সাধনা, তখনকার মাহুয়ের মনের ভাবের সঙ্গে এখনকার তুলনা হয় না। কুলমালারা সে সময়ে গৃহকর্ম করিতে কবিতা বীরপুরুষের কীর্তি কাহিনী গান করিত, কুমারী কণ্ঠ সাহসী যোদ্ধাযুবকের কণ্ঠে ববমাল্য দান করাকে পরমলাভ মনে করিত। চিতোবরাজ্যান্তঃপুরে যখন সকলেই প্রশংসাকার্ত্ত বাজা নাবা য়ণের অপূর্ব বীরত্বের কথা বলিতেছিল, তখন রাণা রায়মল্লের অনুচা স্ত্রী প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন “আগি রাজা নারায়ণের রাণী হইব, নতুবা আমার কুমারী রহিব।” বৃন্দীবাজ কোনস্থানে একথা শুনিতে পাইলেন। এবার তাঁহার ভাগ্যে যে একঘাত্যর একাধিক লাভ লেখা ছিল, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বীর-বালার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া রাজা নারায়ণ দাসের স্তম্ভ হৃদয়ে সহসা কেমন অজ্ঞাতপূর্ব স্বপ্নের হিল্লোল বহিতে লাগিল। তিনিও তাঁহাকে স্তম্ভ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। রাণা আনন্দের সহিত এ বিবাহে সম্মতি দিলে অবিলম্বে অক্টোবরের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহোৎসবের মধুর বায়ু বাজিয়া উঠিল। রাণার অভিপ্রায়ে বিবাহোৎসবের

এক অঙ্গও অপূর্ণ রহিল না। ক্রমাগতঃ কয়েকদিন পর্য্যন্ত রাজবাটীর লুচি মণ্ডা, পায়স পিষ্টক লোভে চারিদিকে দেহি দেহি রব উঠিল। নৃত্যগীতবাদ্যে নগর অশান্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে, যথাকালে, সকলের শুভ আশীর্বাদ ও আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে বৃন্দীবাজ তাঁহার নবপরিণীতা বাণী সঙ্গে আপনার বাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে, এই উপলক্ষে রাজা নারায়ণদাস যে কুমারী তরুণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই সূজা বাইয়ের জননী।

যশস্বী বৃন্দীবাজ নারায়ণদাস স্ত্রী জীবন অতিবাহিত করিয়া ১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ইহলোক হইতে বিদায় হইলে, তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা সূজা রাজ্যের ভাব গ্রহণে বাধ্য হইলেন। পিতার স্থায় যদিও অমন অসাধারণ গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন না, তথাপি সেই অপূর্ব শারীরিক ও মানসিক শক্তি তাঁহাতেও যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছিল। যে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত ছিল, সেই আন্তরিক অনুরক্ত না হইয়া পারে নাই। তখনকার সমুদয় রাজপুত্র-দিগেব যবো সকলে তাঁহাকে একজন সপ্রতিভ ও নোজস্তপরায়ণ বলিয়া জানিত। আজাহুদীর্ঘবাহু, কমণীয়কান্তি রাজা সূজার শরীর সৌষ্ঠবের কথা ইতিহাস একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছে।

কিন্তু পরিভ্রমের বিষয়, তাঁহার সুলক্ষণ ও সঙ্গুণে মুগ্ধ আত্মীয় অন্তরঙ্গ এবং প্রজাপুত্র সকলেই তাঁহার শোচনীয় পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হইয়া গিয়াছিল। বড় ইচ্ছা ছিল, আশ্রিত অন্তরঙ্গদের স্ত্রী করিবেন, কিন্তু করাল কাল তাহা অপূর্ণ রাখিয়াছে। তাঁহার মূল্যবান জীবন প্রকৃত্তি হইবে না হইবে

অকালে ঝবিরা পড়িয়াছিল; সেই সঙ্গে দেববালার ছায় রূপগুণবতী, নিরপরাধিনী ঝালিকা সুজাবাইয়ের সহিত ঢল'ড সৌন্দর্যবাশি চিতাভঙ্গে পবিণত হইয়াছিল।

পিতায় কথা মনে কবিয়া রাজা সুজা চিতোর রাজবংশের সহিত পূর্বভাব অব্যাহত রাখিতে অনিচ্ছা করিলেন না। চিতোবেব তৎকালীন বাণা বত্বের একটি তথ্যকে তিনি সাগ্রহে গ্রহণ কবিলেন এবং তাহারি পরিবর্তে রাণা রত্ন বৃন্দী রাজকুমারী সুজাবাইকে পত্নী রূপে লাভ কবিয়া স্মৃণী হইলেন। এই দাম্পত্যমিলনফলে প্রথম কিছুদিন বড় সুখেই কাটিল। দেবঢল'ড রূপমাধুরীর অপূর্ণ আকর্ষণে সুজাবাইকে তাঁহার স্বামী তপ্ততচিতে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল তাহাই নয়, তাঁহার মধুব কোতুকপরায়ণ বিস্তৃত প্রফুল্ল-স্বভাবে চিতোবেব নবীন বাণা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়, সেই স্বভাবই যে কালস্বরূপ হইবে, কে জানিত? এ সুখ-ভোগ যে অতি অল্প দিনের জন্ত, তখন স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই। বিদারুণ নিয়তিগ নির্ধর্ম মুহূর্ত্ত অবিলম্বে উপস্থিত হইল এবং আরও দুঃখের বিষয় সুজাবাইয়ের অকপট, সরল, স্বাভাবিক বিজপবারণ অভ্যাগ-জনিত একটি সামান্য কথায় রাজস্থানে এই শোচনীয় বিরোগান্ত নাটকের অভিনয় শেষ হইয়া পড়িয়াছে;—তাঁহাবি সন্নিগ্ধ, মধুর সৌন্দর্য্যকে তিনি আপনি আত্মবিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

একবার রাজা সুজা চিতোরের আসিয়াছেন। সুজাবাইয়ের আনিয় উল্লেখ করা নাই। এই উপলক্ষে কখন চিতোরের নিকটের অরণ্য অঞ্চল করিতেছে।

ভ্রাতার এই আগমন উপলক্ষে সুজাবাইয়ের একদিন বড় সাধ হইয়াছে, অন্তঃপুরে বহুতে আয়োজন করিয়া রাণা ও রাজা সুজাকে আহাব করাইবেন। সেদিন শিশিরযৌত মল্লিকা ফুলের মতন শ্রতাবেই স্নাত হইয়া সুজাবাই শুভবস্ত্র পরিধান করিলেন; তাঁহার আজ আনুলায়িত কৃষ্ণকেশরাশি পৃষ্ঠদেশ ছাইয়া পড়িয়াছে; উৎফুল্ল উৎসাহমনে সুজা বন্ধনশালাব ভাব প্রাপ্ত স্মরণীদেব সঙ্গে যোগ দান কবিয়া একাগ্রমনে বন্ধনশিল্পেব পলা-কণ্ঠা দেখাইতেছেন। অন্তঃপুরেব অছাত্র মহিলা এবং পরিচারিকাবা তাঁহাকে এত পবিত্র না কবিয়া কেবল পর্যবেক্ষণ কবিতে অন্তর্যোব কবিলে হান্তমুখে তিনি তাহা অগ্রাহ্য কবিয়া ভাই ও স্বামী যে সব দ্রব্য ভালবাসেন, তাহা স্বহস্তে প্রস্তুত করিতে একবিন্দু ক্রান্তি প্রকাশ করিলেন না। বাজাস্তঃপুরের সুবেশ সুন্দর পরি-চারিকাগণ সযত্নে, সাগ্রহে তাহাদের রাজ-লক্ষ্মী বাণীর সঙ্গে ছায়ার ছায় থাকিয়া কাজ করিতেছে। মর্ম্মব-প্রস্তর-নির্ম্মিত সুদৃশ্য-আহার গৃহে পুষ্পগুচ্ছ ও মালার শোভা অপূর্ণ দেখাইতেছিল। সুপরিচ্ছন্ন আহার স্থানে মৃদাবান বস্ত্রাশন বিছাইয়া সমুখে, পার্শ্বে আর্দ্র, স্নিগ্ধ, সুবাসিত সুন্দর পরপুষ্পশোভিত ফুলদানী সাজাইয়াছে। বথাকালে রাণা ও রাজা সুজা অন্তঃপুরে আসিলেন। তখন যেন মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণা সুজাবাই আপনহস্তে একে একে বিবিধ ধান্যপূর্ণ সুবর্ণরজত পাত্র সকল তুলিয়া আনিয়া উভয়ের সমুখে সাজাইয়া দিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যবান ত্রীমন্ত গৃহের স্বর্গীয় পারিবারিক সুবদৃশ্য কুটুম্বা উঠিল। রাহিরের শুভ কঠিন রাজনৈতিক যশাস্বিত্তি উদ্বেগ কোলাহল হইতে অবলম্ব লাভ করিয়া

গৃহেব এটি অপার্থিব পবিত্র শোভা শাস্তি
এবং নিঃস্বার্থ সবল সমস্ত স্নেহেব স্নিগ্ধ সান্নিধ্যে
আসিয়া তাঁহা উভয়েই বিগুপ্ত সুখানুভব
কবিলেন, উভয়েবই মুখশ্রী আনন্দোজ্জল
হইয়া উঠিল । কিন্তু বাণা অশ্রান্ত উৎসাহিত
সুজাবাইয়ের বৈদগ্ধ্যানিহিত সুন্দর মুখখানি
দিকে একবার তাকাইয়া দেখিয়া পবঙ্গণেহ
পার্শ্ববর্তী রাজা সুজাকে সদোবনে এণ্ট
বক্রভাবে কহিলেন, —“দেখ, আজ গোমাব
জন্তে মহারাণী কেমন পবিশম কবিত্তেছেন।”
শুনিয়া ভাই ভগ্নী দুইজনেই নিতান্ত সবল
মনে শুধু মৃত্ত হাসিলেন । উল্লয়ে আত্মবে
বসিলে মক্ষিকার ভাষে সুজাবাই তাঁহাদের
নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে সুবানিত স্নিগ্ধ
‘পুষ্পবস্ত্র’ বাজন কবিত্তেছিলেন । অনেকক্ষণ
পর্যন্ত সেই আত্মাব গৃহে সুজাবাই গঙ্গেস্নে
উভয়ের মনোবঞ্জন করিত্তেছিলেন এবং
মধ্যে মধ্যে আত্মাব পনাগণ বাণা ও রাজাব
বাক্যলাপ ও সুজাবাইবেব প্রকুল কণ্ঠস্বব
এবং মধুব হাস্যধ্বনি শুনা যাট্টেছিল ।
কিন্তু সেই আনন্দই সকলেব শেষ আনন্দ
এবং সুজাবাইয়েরও তাহাই শেষ হাসি ।
আত্মাব শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়
সুজাবাই কিছু কৌতুকর ভাবে এবং কিছু
বা নিশ্চয়ভাবে বলিলেন, —“সুজা সিংহের
মতন বীরোচিত আত্মাব করিয়াছেন, আব
মহারাণী যেন ছেলেখেলা খেলিয়াছে !” —
এমন কৌতুক কথা কতজনে বলিয়া থাকে,
কেহই কিছু মনে করে না, কিন্তু সুজাবাইয়ের
এই কথার রাগারক্ত আপনাকে দক্ষ অ-
মানিত বোধ করিলেন । মনেব এহ অবস্থা
তিনি সংবত করিতে পারিলেন না । সুজার
কথার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখের ভাব
আশ্চর্য্য পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া

সেখানে কাহাবই বুদ্ধিতে বিলম্ব হইল না,
হিতে বিপরীত হইয়া উঠিয়াছে । রাণা
ক্রোধাবস্ত্রিম নয়নে পত্নীব দিকে দেখিলেন,
আবার তখনি স্থগার সঙ্গে দৃষ্টি অপসাবিত
কবিয়া রাজা সুজার দিকে তাকাইলেন ।
রাণাব ক্রোধোদ্রেকের এই কারণটিকে
নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিয়া রাজা সুজা
হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন এবং তিনি
রাণাকে বলিলেন, তাঁহার ভগিনী এই
কথার মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে
না । তাহা মনে করাও অস্বাভাবিক । সুজাব
কৌতুকপব্যয়ণ স্বভাবের উহা একটি অগ্র-
পশ্চাৎবিবেচনাহীন উক্তি যে আর কিছু
নয় । পবন্ত, বড় অপবাদ কবিলেও সুজা-
বাইকে তাঁহার ক্ষমা কবা কঠব্য । সরল
ভাবে ইহাই বলিয়া তিনি বাণাকে নিরক্ষা-
তিশবে অসুখোব কবিত্তে লাগিলেন যেন
এজন্ত তিনি নিজগুণে সুজাকে ক্ষমা
কবেন । বাণা, অবশেষে স্বাকৃত হইলেন ।
স্বাকৃত হইথেন কিন্তু প্রাণেব দারুণ জ্বালা
জুড়াইল না । বাহিরে আপাতঃ শাস্তমুষ্টি
দেখাইলেন, কিন্তু বাণা সুজার সহিত
তাঁহার তুলনাব সেই কথাটী তাঁহাকে
নিরন্তর দক্ষ করিতে লাগিল । এই ঘটনাব
পর রাজা যে কয়দিন চিতোরে রহিলেন,
রাণার পূর্ববৎ আপ্যায়িত আলাপের কোনই
ক্রটি হইল না । রাজা সুজা ক্রমে সে দিনের
সে কথা ভুলিলেন, কিন্তু কুটিলস্বভাব রাণা
রক্ত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, প্রতি-
শোধ না লইয়া তিনি ছাড়িবেন না । ‘সিংহের
জীবনবিনিময়ে’ তাঁহার গৌরবগর্ভ রক্ষিত
হইবে, নতুবা নহে ।

অনুতপ্ত, ব্রাহ্মসম্মতী সুজাবাইয়ের
উদ্দেশ্যের অজ্ঞ নাই । “হাঁ, কেন বলিলে

ঘাইলাম” বলিয়া নিভূতে নীরবে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্বামীৰ ক্রুদ্ধ স্বভাবের কথা তিনি জানিতেন, তাই তাঁহার পিতৃ-গৃহের একমাত্র স্নেহাবলম্বন, সমুদায় বুঁদী বাজ্যের একমাত্র আশা ভরসাহুল রাজা সুজাব অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নিরপরাধিনী শতাব্দ, সহস্রবার আপনি আপনাকে ধিক্কাব দিয়াছেন। এই ভাবে ক্রমাগত কয়েক দিন অতীত হইলে, রাজা সুজা নিরাপদে চিতোর হইতে গৃহে ফিরিবার পৰ, চিতোবে তাঁহার বুঁদী উপস্থিত সংবাদ আসিলে, সুজাবাই অপেক্ষাকৃত শান্ত হইলেন। তাঁহার প্রতি বাণ বাবহাবেও কোন পৰিবৰ্ত্তন হয় নাই, পূৰ্বেবই মতন তিনি স্বেচ্ছায় সুজাব কক্ষে কাল কাটাইতে-ছিলেন। সুজাও ক্রমশঃ নিশ্চিন্ত হইতে-ছিলেন। আশু দিন গেল, ততদিনে ক্রমে সে কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু, বাণাব হৃদয়ের সেই বিদ্রোহবিষ বিলুপ্ত হয় নাই; অন্তঃকণ তাঁহার অভিসন্ধির সুযোগ অপেক্ষা কবিতেছিলেন। এই নিম্মম প্রতিহিংসাপরায়ণতায় কি ভয়ানক ফল ফলিবে, তিনি বাবেকের জন্তও ভাবিলেন না; এই অযোগ্য, অসঙ্গত ক্রোধের পরিণামে ভগ্নীটির কি অবস্থা হইবে, সে চিন্তাও মন হঠাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে মুছিয়া ফেলিলেন। রাজ্যধীশ্বর তিনি মোহের অধীন হইয়া স্বেচ্ছায় আপনি পুড়িয়া মরিলেন, অত্ৰেকেও মিল্লপরাধে মষ্ট করিলেন;—সেই সঙ্গে সর্ব-লেশের সজিত সহসা বিস্তীর্ণ রাজ্যবর একটি স্বর্গভেদী কক্ষ ক্রন্দন-কোলাহল আগিয়া উঠিল।—শীতাবসানে সুজাব বসন্ত ঋতু জাহাঙ্গীর-দরবারে বহুর পরিপূর্ণ শোভাসম্পন্ন-রাজদরবারে পুড়িয়াতে দেখা দিল, কিন্তু হায়

সেই বিবিধবিহঙ্গকাকলীগীতমুখরিত, সুবাসিত, ফুলকুসুমিত বনভূমির অন্তবালে ঘেন অদূবর্ত্তী ভবিষ্যতের কি একটা নিদাক্ষণ বিষাদবেদনাব মৰ্ম্মান্তিক ককণাপ্লুত আভাষ লুকাইয়া ছিল, কেহই দিন থাকিতে তাহা জানিল না।

এমন সময় রাণা বহু একদিন রাজা সুজাব নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, “বসন্তোৎসব উপস্থিত, তিনি স্বাক্ষত হইলে উভয়ে একত্রে কয়েক দিন যুগযাব আনন্দ ভোগ করিতেন। বুঁদীবাজেব বিখ্যাত অরণ্যে এ অভিলাষ যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হইতে পারে।”—সংবাদ পাহবা মাত্র উদারবুদ্ধি, সবলপ্রাণ বাজাসুজা আনন্দ আপ্যাবিতের সঙ্গে বাণা রত্নকে আহ্বান করিলেন। তাঁহাবি অধিকার মধ্যে চম্বল নদীর পশ্চিমদিকে উচ্চ পর্বতের পাশে পাশে বহুদূরব্যাপী মহাব্যগ্রেশ্রী রাজকীয় যুগয়ার জন্ত নিদিষ্ট ছিল। সেই মহাবনে নানাবিধ ভয়ানক হিংস্রজীব জন্তব অভাব ছিল না। নিভীক ছদ্মাস্ত জন্ত হইতে নানা জাতীয় বিচিত্র সুন্দর হরিণ এবং খরগোস দলে দলে বিচরণ করিত। ইহাদেব দিবা-নিশি অবিরাম সশব্দ ক্রৌড়ায় সমুদায় বন প্রদেশ আন্দোলিত হইত। তাহারি মধ্যে সাহসী পুরুষেরা অস্ত্রসজ্জিত হইয়া মহানন্দে বারবিক্রমে সিংহ-গাৰ্দুল তলুক বরাহমহিষ প্রভৃতি বিবিধ হিংস্রজন্তকে কখন বা অস্ত্রে এবং কখন বা একাকী বাহবলে বিনাশ করিতেন। যুগযাক্রৌড়ায় রাজপুতের যেমন তম্বরতা, এমন আর কিছুতেই নয়; এই উপলক্ষে তাহারা সকলই ভুলিয়া বাইত।

যথাসময়ে সেই বনের একস্থানে রাণা এবং রাজাসুজার উভয় দলে দেখা হইলে কোনও মনোনীত স্থান শিবার সন্নিবেশের

জ্ঞান নিষ্কিষ্ট হইল। সে দিন সেই মহারণ্য মধ্যে চাবিদিকে সৈন্ত ও শিবির বেষ্টিত স্থানে অস্ত্র সজ্জিত রাজাসুজ্ঞা-তাহার ভগিনী-পতিকে সাদর আহ্বানে গ্রহণ করিতে অখাবোহণে অগ্রসর হইলেন; তাহার বীরস্বোচ্ছল নবীন মুখশ্রীতে এই উপলক্ষে আনন্দ ও উৎসাহ চিহ্ন প্রকাশ পাঠতেছিল। উভয়ে সাক্ষাৎ হইবামাত্র বাজাসুজ্ঞার হ্রায় রাণা-রত্নও আপ্যায়িত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পবনিন মৃগয়াব আনন্দ উপ-ভোগে আশায় বাজাসুজ্ঞা নিশাপে শিবির মধ্যে সুখকল্পনা করিতেছিলেন, আর এক-দিকে ক্রুব, ক্রুদ্ধ, দ্রুতগা রাণা তাহার স্থপিত অভিসন্ধির কৃতকার্যতা অদূর্বর্তী ভাবিয়া অধীর আনন্দে নিদ্রাহীন রজনী অতিবাহিত করিতেছিলেন। ক্রমে নিশাব-সানে সকলে জাগ্রত হইল। বুদী ও চিত্তাব-বাজের সঙ্গে যে ক্ষুদ্র সৈন্তদল আসিয়াছিল, তাহাদিগকে অরণ্যের ভিন্ন ভিন্ন দিকে মৃগয়া করিবার অভিপ্রায় দিয়া রাজাসুজ্ঞা ও রাণা-রত্ন নিষ্কিষ্ট কয়েকটিমাত্র শবীর রক্ষক সঙ্গে অবিলম্বে প্রস্তুত হইলেন। দেখিতে দেখিতে অখাবোহী সৈন্তদের উৎ-সাহ শব্দ ও আলোড়নে ও তাহাদের দাবা পশ্চাক্রান্ত, আঘাতিত জীবজন্তুর আর্ত-নাদে বনভূমি চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই মহানলোচ্ছ্বাসের দিনে রাজা হইতে সামান্য সৈনিক পর্যন্ত সকলেই আপনাপন শীকারে ব্যস্ত ও অগ্রমনস্ক, কাহারও দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। যে কয়জন মুষ্টিমের অখারোহী শরীররক্ষক রাণা ও রাজাসুজ্ঞার সঙ্গে ছিল, তাহারা দুইজনের নিকটে থাকিয়াও, মৃগয়াব কোলাহলোচ্ছ্বাসে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে। সেই বিরাট বনভূমিমধ্যে যখন

বীরবাহিত মৃগয়াব এই মহামহোচ্ছ্বাস বহি-
তেছিল, তখন অল্পক্ষণেব মধ্যে বাণা ও রাজা
পরস্পর একটু সন্নিহিত পড়িয়াছিলেন। কিন্তু
তখনও সম্পূর্ণ দৃষ্টিরজ্জ্বাল হইয়া যান নাই।
ঠিক এমন সময়ে বাণা তাহার পাশ্বে বর্তী
একজনকে উদ্ভ্রান্তেব মতন চীৎকার স্বরে
বলিলেন,—“বড় শীকারের এইত এখন
সময়।” বলিয়াই সেই হিতাহিত বুদ্ধিহীন,
ক্রুব, ক্রোধাতুর্ব, পামব রাণা রাজাসুজ্ঞাকে
লক্ষ্য করিয়া তাহার অব্যর্থ শব্দসন্ধান করিল।
বাজাসুজ্ঞাব ভাগ্যে নিরীহ হরিণ শিশুর
হ্রায় ব্যাধহস্তে মৃত্যু লেখা ছিল না, তাই
মোভাগ্যবশতঃ সহসা তিনি বিস্ময়চকিত
দৃষ্টিপাতে দেখিতে পাইলেন, রাণাব নিক্ষিপ্ত
শব মুহুর্তে তাহাকে নষ্ট করে। নিমেষের
মধ্যে রাজা সুজ্ঞা আশ্চর্য্য কোণে হাতের
ধনুক সমুখে উঠাইলেন, আর তখন তাহা-
তেই সবলে প্রতীহত হইয়া বিবাক্ত তাক
মাবান্ধক শব ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।
তখনও, এমন ভয়ানক অবস্থাতেও, উন্নত
উদাববুদ্ধি রাজা সুজ্ঞা নিশ্চয় বোধ করিলেন,
সহসা অগ্রমনস্কতায় রাণার মনোবুদ্ধির
অগোচরে ইহা ঘটিয়াছে, কিন্তু আবার—
তখন সুজ্ঞা বিস্মিত, ব্যথিত, ব্যাকুল ভাবে
দেখিলেন, কোন ভয়ানক চক্রান্তফলে আজ
হত্যাকারীদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছেন, হার,
রাণা-রত্ন তাহারি একজন!

দেখিতে দেখিতে আর একটা—আরো
একটা তীর আসিয়া পড়িল। রাজা সুজ্ঞা
আপনাকে রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইতেছেন,
এমন সময় আর কালগৌণমাত্র না করিয়া
বিস্ময় রাণা উন্নত বড়ের মতন খোঁড়া
ছুটাইল, অমনি দেখিতে দেখিতে উন্নত
তরবারী দ্বারা রক্তাক্ত অতি

আঘাত করিল। রাণার এই অমাহুতিক উদ্যম দেখিবামাত্র রাজা সুজা বিষয় এবং মনোবেদনায় ক্ষণেকের জন্ত আত্মহার্য হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার এতদিনের প্রিয় ভগিনীপতিকে একটা কথা জিজ্ঞাসারও অবসর পাইলেন না; অস্ত্রের দারুণ আঘাতে অবসর, মুক্তি ও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সশব্দে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার জ্ঞানের সঞ্চার হইল; মারাত্মক আঘাতে কাতর, রক্তাশ্রুত, ধূল্যবলুষ্ঠিত রাজামিরাজ বুদীধর একবার চোখ মেলিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন, অস্তিমকালে নিকটে তাঁহার কেহই নাই। অদূরে পরম শত্রু ভগিনীপতি অশ্বাবোহনে পলায়ন করিতেছে। তখন তাঁহার জ্যোতিহীন নয়ন ও শোণিতশূণ্ডভ্রমুখে অবসর অমৃত্যু তাপযাতনা-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; সেই রক্তাক্ত অবসর শবীরে দরলে উঠিতে চেষ্টা করিলেন, পাবিলেন না। কিন্তু তখন দারুণ কষ্টকর প্রয়াসের সঙ্গে তীব্রকণ্ঠে পলায়মান রাণাকে পাপী, কাপুরুষ সোধোনে তাহার বাহুবল পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। রাণা রক্ত ফিরিয়া দেখিল। দেখিল সে যা চায়, তাহা তখনও শেষ হয় নাই। অশক্ত, দুর্বল রাজা সুজা ক্ষমি শয্যায় অকোপবেশনে থাকিয়া তাহাকে তখনও অপমান বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, ইহা তাহার অসহ্য বোধ হইল। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সে রাজা সুজাকে শেষ অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় মৃতকর, প্রতিশোধ-পিপাসু রাজাসুজা তাঁহার অস্তিম কর্তব্যের অনন্তসাধারণ প্রয়াসের সহিত অধারোহী রাণাকে অতি বলে আকর্ষণ করিলেন। শত চেষ্টা করিয়া রাণা ছিন্ন-ধাকিতে পারিল না, প্রাণীর উপর

পড়িয়া গেল। তখন উভয়েই ভূশযায়, কিন্তু রাণা আঘাতিত অথবা কোন অংশেই অবসর নয়, তথাপি মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজাসুজা কি এক অসম্ভব শক্তি অমৃত্যু করিয়াছেন, তিনি হত্যাকারী, কাপুরুষ, বিভ্রান্ত রাণাকে নীচে ফেলিয়া তখন তাহার উপরে যাইয়া পড়িলেন। যাউনা-কাতব তিনি অসীম ধৈর্য্য এবং কৃতঘ্নচরতার সঙ্গে তখন রাণার বুকেব উপর উঠিয়া বসিয়াছেন। রাণা দৈত্যবল প্রকাশ করিয়াও সে অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিল না। তখন রাজাসুজা একহস্ত বাণীর কণ্ঠ আকর্ষণে, আব একহস্ত ছোবার জন্ত প্রসারণ করিলেন। আলোক-রশ্মিপাতে সুশোণিত অস্ত্র অগ্নিয়া উঠিল, তখন দৃঢ়হস্তে হতভাগ্য রাণার বক্ষে তাহাই আমূল বিদ্ধ করিলেন! বিকৃত মৃত্যু যাতনা-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য ক্রোধাতুর চিতোরাদিপতির জীবন-রঙ্গমঞ্চের যবনিকা পতিত হইল। পরানন্দি সাধনের জন্ত এত দিনের অস্থিরতা, উবেগ এবং দুষ্টিস্তা এ সকলেবই অবসান হইয়া গেল। ঐ যে রাজা সুজার হাতের ছুরিকা হস্তচ্যুত হইয়াছে, আবার তিনি চক্ষু অন্ধকার দেখিয়াছেন, এবারে তাঁহারও প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল; শাস্ত, তৃপ্ত, প্রফুল্লমুখে তিনি ভগিনীপতির জীবনহীন দেহের উপর নীরবে পড়িয়া গেলেন। এইরূপে “সিংহের জীবন বিনিময়ে” রাণা রক্তেব সব সাধ মিটিল।

সকলের মনোবুদ্ধির অগোচর এই নিদাক্ষণ ঘটনার উভয় রাজ্যের সমবেত হাহাকার ও ক্রন্দন কোলাহল বর্ণনার অতীত। এই অসম্ভব ভয়ানক দৃষ্টান্তের সংবাদে দেশের বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী যে যেখানে ছিল, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিল

না। কিদ্দ তাহারি মধ্যে দুইটি প্রাণীর মনোবেদনার সঙ্গে আর কাহাব তুলনা? দারুণ শোকসন্তাপে তাঁহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। চিতোর ও বুন্দী রাজ্যান্তঃপুরের দুইটি নিরপরাধিনী অবলা তাঁহাদের অকলঙ্ক জীবনের উষাকালে একই দিনে উভয়ে উভয়ের অনন্যাবলম্বন প্রাণাধিক পতি ও ভাই হারাইয়া সংসারের অতুল ঐশ্ব্যের অধিকাবিনী হইয়াও নিতান্ত আশ্রয়হীন ও মন্দভাগ্য বোধ করিতেছিলেন। সর্বোপরি, হতভাগিনী সজাবাইয়ের কোমল প্রাণ অসম্মত শোক সন্তাপেব সঙ্গে অল্পতাপে পুড়িয়া বাইতেছিল। কক্ষণে অন্তঃপুরে সেই আহারের অন্তঃস্থান, কক্ষণে সজাবাইয়ের সেই কথা। না বলিলে নিতান্তই এমন সর্বনাশ হইত না।

পরিতাপেব এই খানেই অবসান হয় নাই। সজাবাই প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয়া হইয়াছেন। চির-অনন্দ-কৌতুকময়ীর উজ্জল মুখশ্রী আজ গভীর বিষাদ ছায়ায় আচ্ছন্ন। জীবনের কেবল মধ্যাহ্নে তাঁহার সমুদার সুখসাধ বিদায় দিয়া যে শৈলসঙ্কুল মহাবনে তাঁহার প্রাণাধিকেরা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইখানে, তাঁহাদের পাশে আপনাকেও বিসর্জন দিতে অগ্রসর হইলেন। অপার্ণিব্যাহিমায়ী, কৃতনিশ্চয়া সজাবাইকে সংকর হইতে নিবৃত্ত করিতে কাহারও সাধ্য

হইল না। আর রাজা সজার প্রেমময়ী পত্নী যিনি ভাগ্যক্রমে দেবোপম স্বামীকে তাঁহার ইহ পরকালের অবলম্বন মনে কবিয়া সুখে দিনপাত করিতেছিলেন, তিনিও সহসা মর্শ্বে ভেদী অশ্রুপাতের সঙ্গে সজাবাইকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“তোমার পায়ে পড়ি আমার ফেলিয়া তুমি একাকিনী মরিতে যাইও না। এ অভাগীকেও সঙ্গে লইয়া যাও।”—রাজাসজার সেই স্নেহ প্রেম-পুতলীকে সজা ফিরাইতে পারিলেন না। দুই জনের নিকটই পৃথিবী তখন অন্ধকার, দুই জনেরই সাধ অহ্লাদ সব পুড়িয়া ভস্মাভূত : ধীরে ধীরে তাঁহারা তখন পিতৃগৃহ, পিতৃগৃহ, আত্মীয়, স্বজন, আশ্রিত, ভৃত্য সকলের নিকট নিশ্চয় বিদায় গ্রহণ করিলেন। সে দিনের শোকাশ্র মুছিতে না মুছিতে আবাব অভিনব অশ্রুজলে সকলের বুক ভাঙ্গিয়া খেল।

হায়, নন্দাত্যের মহাবন! যেখানে রাজাসজা ও রত্নের দেহাবশেষ তখনও যেমন তেমনি ছিল, সেইখানে আব এক চিতায়ি সহস্র লোহিত লোণ জিহবা বিস্তারে জলিয়া উঠিয়াছে। সিংহীতে সিন্দূরবিন্দু ও আভরণ-ভূষিত দুইটি নিরপরাধিনী নিকম্মা অনায়াসে, অগ্নানুগে প্রাণাধিকের জন্ত প্রাণ বিসর্জন করিলেন। অপূর্ব, অতুলনীয় রূপ বোবন-মাধুরী মুহূর্ত্তে ছাই হইয়া গেল।

ঐকিশোরীমোহন রায়।

বিদেশী বাঙ্গালী । (৬)

লালা বাবু।

অগ্ন্যবধি যে ব্যক্তি কাঙ্গাল, তাহাকে আর কাঙ্গাল সাজিতে হয় না। মাতৃগর্ভ হইতেই যে ব্যক্তি চক্ষুহীন হইয়া জন্মিয়াছে,

তাহার আর অন্ধ সাজিয়া ফল কি? ভাগ্য দোষে বাগ্যাবস্থা হইতেই যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গল, কপর্দকশূন্য এবং জিন্ন কছাড়িত, তাহার পক্ষে বৈরাগ্য অবলম্বন করা বড় কঠিন কথা নহে।

ধরিদ্রতা বাহাকে আভাবিক বৈরাগী করিয়াছে, তাহাকে আর নূতন করিয়া বৈবাগ্যাত্রে দীক্ষিত হইতে হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি চক্ষুকেগনিভ সুকোমল কুসুমশয্যায় উপবিষ্ট হইয়া সুবর্ণ মুকুটে মস্তকাচ্ছাদন পূর্বক অতুল প্রতাপের সহিত রাজকীয় সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করেন, তাঁহার পক্ষে সহসা বৈরাগ্য অবলম্বন করা বাস্তবিক আশ্চর্য্য এবং অসাধারণ কথা বলিতে হইবে। বাহার প্রশ্নতুল্য কোমল পদে কখনও কণ্টক স্পর্শ করে নাই, জগতের 'দুঃখ ও অভাব' বাহার কাছে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই, তিনি কেন বৈরাগী হইবেন? খণ্ডসুখ পরিত্যাগ করিয়া যিনি অশ্বশুখের জন্ত লালায়িত হইলেন, ক্ষণভঙ্গুর জীবনের তুচ্ছ সুখের দিকে না তাকাইয়া যিনি অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখের দিকে আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মীলন করেন, তিনিই প্রকৃত বৈরাগী এবং তিনিই প্রকৃত ফকির। কোনও বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গীত-পুস্তকে অনেক মহাপুরুষ গাহিয়াছেন—

“ফকিরি কববি? পারবি তো মন?
ফকিরি নয় সামান্য, হ’তে হয় দীন দৈন্য
ফকির ছিল ঐচ্ছিক,
যাঁর ধর্মেতে জীবন।
ফকিরি কোর্সি—কিন্তু পারিঁ তো মন?”

এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে যে প্রসিদ্ধ মহাত্মার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি বাস্তবিক এক প্রকৃত বৈরাগী ছিলেন। তীত্র বৈরাগ্য তাঁহার জীবনের রমণীয় ভূষণ ছিল; পারলৌকিক উন্নতির জন্ত ইহলৌকিক সুখকে বিসর্জন করিয়া তিনি তীত্র বৈরাগ্যাত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এক্ষণ মহাত্মা সচরাচর মিলে না, এমন আশ্চর্য্য “ফকির” সহজে পাঁওয়া যায় না। বাহার বাঙ্গালনে গিয়াছেন,

অথবা বৃন্দাবনের বিবরণের পাঠ করিয়াছেন, লাল বাবুর পরিচয় তাঁহাদের নিকট নুতন নহে। এই মহাত্মা অতুল ধন ধান্য, সুন্দর সম্পত্তি, ইন্দ্রাবতী তুল্য গৃহ, ইন্দ্রজিৎ তুল্য পুত্র, অতুলনীয় প্রভুত্ব, দেব-দুর্লভ সাংসারিক সুখ, গুরুর্কুলবাসিত সোণার সংসার, এ সকল অসার শুষ্ক তৃণের গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া, ধরিদ্রতর হইতে দরিদ্রতম অবস্থায় ধর্মজীবন যাপন করেন। সুদূর অধোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে লাল বাবু “অবতার” বলিয়া খ্যাত; বৃন্দা জীলেকেরা এখনও বালক বালিকাদিগের সম্মুখে বলিয়া লাল বাবুর উপকথা, লাল বাবুর কাহিনী, লাল বাবুর “ভজন” (সঙ্গীত), লাল বাবুর দৌহা, লাল বাবুর জীবনী প্রভৃতি শুনার। ধন্য লাল বাবু! তোমার স্বর্ণস্থিত আশ্রয় পরমেশ্বরের আশীর্বাদ পড়ুক!

এই প্রস্তাবের মহাপুরুষ লাল বাবু নামে বিখ্যাত হইলেও, তাঁহার আদি নাম লাল বাবু নহে। ইহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। যে সুপ্রসিদ্ধ বাজবংশের ইনি বংশধর এবং যে প্রাচীন হিন্দুবংশের ইনি মুখোজ্জ্বল করেন, সেই বংশের কিছু পরিচয় না দিলে, লাল বাবুকে আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না।

কলিকাতার উত্তরে প্রসিদ্ধ পাইকপাড়া গল্লীতে বহুপ্রাচীন কাল হইতে এক অতি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশ “পাইকপাড়ার রাজবংশ” বলিয়া সুপরিচিত। এই উত্তরবাড়ী কায়স্থ বংশের আদিপুরুষ দিল্লীতে মোগল সম্রাটের অধীনে অতি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, ক্রমে এই বংশের লোকেরা দিল্লির সম্রাটের সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার নবাব

সাহেবের মতাই প্রভৃতি কৰ্ম সম্পাদন করিতে থাকেন। ওয়ারেন্ হেস্টিংস সাহেবের (পার্লি-মেন্টে) বিচার কালে স্মৃতি বর্ক সাহেবের মনোমোহিনী বক্তৃতামালায় যে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ও অতুলনীয় প্রভুত্বশালী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি এই বংশ-আকাশের অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন, এবং সে দিন যে যুবপুরুষ একটা মার্জার ও মার্জারীর বিবাহে তিনলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কলিকাতা নগরবাদীবর্গকে উচ্ছ্রান্ত হানাইয়া-ছিলেন, সেই উচ্ছ্রান্তেতা যুবকও এই বংশের বংশধর। বলা বাহুল্য, সুপ্রসিদ্ধ লালো বাবু এই রাজবংশেরই অন্যতম নেতা ছিলেন। এই কায়স্থবংশ “সিংহ” উপাধিতে খ্যাত। এই বংশ চিবকালই ধনদান্যে পবিপূর্ণ এবং এই বংশের লোকেরা চিরকালই রাজসম্মানে সম্মানিত।

লালা বাবুর বাল্যকালের বিবরণী আমরা পাই নাই। যৌবনকালের জীবন সম্বন্ধে যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহার মধ্য হইতে সত্য নিষ্কাশন করা এড়ই দুষ্কর। এই সময়ের কথা লইয়া অনেকে অনেক প্রকার অভিযুক্তি দিয়াছেন। যাহারা নিন্দাবোধ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত নিন্দার কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ দিতে পারেন নাই। এত বড় লোকের জীবনী সম্বন্ধে নিন্দার কথার বিশেষ বিশ্বাস যোগ্য সুপ্রমাণ না পাইলে, আমরা পত্রস্থ করিতে সম্মত নহি। শোনা কথা সোণার ভ্রাম্য সহসা কেমন করিয়া গ্রহণ বা বিশ্বাস কবিত্তে পারি? কিন্তু একথা বলা বাহুল্য, যাহারা দুই একটা কথা লইয়া নিন্দাবোধ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন “লালা

বাবুর নিকলক ধর্মজীবন, বাঙ্গালী জাতির পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন এবং অতুল।”

লালাবাবুর সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা আমরা তাঁহার নিজের উক্তি হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। বৃন্দাবনে গিয়া বৈরাগীর জীবন যাপন করিবার সময়ে, তিনি নিজে বলিয়া-ছেন :-

“যে সময়ে আমি আমাদের বাটার নেতা অর্থাৎ কর্তা ছিলাম, সে সময়ে আমাকে সাহায্য করিবার কেহই ছিলনা, সকল কৰ্ম নিজের হাতে করিতে হইত, নিজের চক্ষে দেখিতে হইত। আমিও নিজের হাতে কাজ কবিত্তে ভাল বাণিতাম। দেও-য়ান, নায়ব, গোমস্তা প্রভৃতি ছিল বটে, কিন্তু কাহাবও হাতে কৰ্ম সমপণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না। জন্মের সাংসারিক কৰ্ম হইতে আবস্ত করিয়া বাহিরেব কাছারীর এবং বিত্ত জমিদারীর সমুদয় কৰ্মই আমি নিজে করিতাম। প্রয়োদশ হইতে স্ত্রীযুক্ত গর্যস্ত গাধার জায় থাটতাম, মাথার শ্রম পায়ের পড়িত, তথাপি কৰ্মের শেষ হইত না, হুতরাং ধর্মালোচনার অবকাশ ছিলনা। সাধারণ মুখ হাত ধুইয়া শর্যাব গদিতে বসিয়া তুলনী অথবা পদ্মকান্তের মালাটি লইয়া কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত ‘বাম’ ‘রাম’ অথবা কৃষ্ণ কিবা হরি হই উচ্চারণ করিতাম, তদনন্তর গৃহ দেবতার মন্দিরে গিয়া দেবমূর্তি দর্শন করতঃ অন্তরে ফিরিয়া আসিতাম। কখন কখন ভাগবৎ বা রামায়ণ অথবা মহাভারত শুনিতাম, কখন বা বৈষ্ণবদিগকে ডাকাইয়া হরি সংকীর্তন করিতাম।”

তিনি আরও বলিয়াছেন, “ধর্মালোচনার সময় ছিল না বটে, কিন্তু তজ্জন্ত চিন্তিত অন্তঃকরণে জীবন যাপন করিতাম। সময়ে সময়ে চিন্তের শান্তি নষ্ট হইত, কখনও বা গোপনে কাঁদিতাম, কখনও বা বিলক্ষণ দুঃখের সহিত আহার করিতে বসিতাম, ভাবিতাম, পত্রের জায় পেট ভরিত্তেছি, কিন্তু আহার জন্ত কিছুই করিতেছি না।” ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এতরূপে তাঁহার সাংসারিক জীবন অতি-বাহিত হইত।

আমাদের দেশে বড় বড় ধনবান তালুকদার বা জমিদারেরা স্বচক্ষে আপনাদের বিস্তৃত জমিদারী প্রায়ই দেখেন না। লাল বাবুও এ পর্য্যন্ত নিজের চক্ষে জমিদারী দেখেন নাই। বাটী হইতে অনেক দিন অল্পপস্থিত থাকিলে কর্ম্মের বিশেষ ক্ষতি হইবে ভাবিয়া নিবর্ত্তন জমিদারী গুলি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি হুজা প্রকাশ করিলেন। দেওয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন, “চন্দ্রিশ পরগণার কয়েকটা প্রবান প্রবান জমিদারী দেখিবার ইচ্ছা আছে, অতএব আমায় যাতায়াতের বন্দোবস্ত কর।” আজ্ঞা পাইবা মাত্র, দেওয়ানজী লালবাবুর সম্মানযোগ্য বন্দোবস্ত সুসম্পন্ন করিলেন। যথা সময়ে লালবাবু জমিদারী দেখিতে বণনা হইলেন। সুপ্রিয়া সহবাসিনীর নিকট যথাবিধি বিদায় গ্রহণ করিয়া লালবাবু শিবিকায় আবেহণ করিলেন। প্রমাসাক্রমী সহবাসিনীর “বামেতব নয়ন না’চল।’ লাল-সহবাসিনী বুঝিলেন না যে, এই বিদায়ই শেষ বিদায়; তিনি জানিতে পারিলেন না যে, তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম স্বামীকে তিনি আর দেখিতে পাইবেন না। লালবাবু পাক্ষাতে চড়িয়া চলিয়া গেলেন, পাক্ষী অদৃশ্য হইল, সহবাসিনী অশ্রুপূর্ণাঙ্গ হইতে নীচে আসিয়া গৃহকর্মে প্ররতা হইলেন। একমাস কাল পর্য্যন্ত জমিদারী দেখিয়া লালবাবু পাইকপাড়ায় ফিরিয়া আসিবার জন্য উৎসুক প্রকাশ করিলেন, সহচর ও সেবকদিগকে যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদেশ দিলেন, আগমনের বন্দোবস্ত যথারীতি শেষ হইল। সঙ্গে পাক্ষী-বাহক আট জন বেহাবা, চোপদার, আড়-দালী, চপরাঙ্গী, চাকর, খাজানী, পাচক

ব্রাহ্মণ, গোমস্তা, নায়েব, তববারাবাহী হিন্দু-স্থানী পাইক, লাতিবাহী গ্রাম্য লাঠিয়াল প্রভৃতি মোদনী কাম্পিত করিয়া চলিল। সুবর্ণ ও রোপ্য-খচিত মনোমোহক শিবিকায় আবেহণ করিয়া গৃহাভিমুখে কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ রওয়ানা হইলেন। বৈশাখ মাস, গ্রীষ্মকাল, অত্যন্ত গ্রায়, অনেক দিন বৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং প্রাতেঃ, অপরাহ্নে এবং বাত্নিতে পাক্ষা চলিত, পৌষের সময় যাত্রীরা বিশ্রাম লাভ করিত। পাক্ষা আনিতে আসিতে হঠাৎ একস্থানে থামিয়া গেল, শিবিকা স্থব হইতে লালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন “পাক্ষী গিয়া কোন্‌ ?” ভৃত্যবো বলিলেন, “হুজুব। পাক্ষী যাইবার পণ নাট।” ঘুরাইয়া লইয়া গেলে অল্প পথ দিয়া যাইতে হয়।” লালবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন “এখানে কি মোটেই বাস্তা নাই?” নায়েব উত্তর দিল “মহাশয়। একটা বাস্তা আছে কিন্তু বাস্তা দিয়া যাইতে হইলে জনৈক গৃহস্থের বাটীর ভিতর দিয়া যাইতে হয়।” লালবাবু বলিলেন, “গৃহস্থটা কে, তাহার অনুসরণ কব।” অনুসন্ধানে জানা গেল, যাহার বাটীর ভিতর দিয়া বাস্তা, সে লোকটা একজন রজক অর্থাৎ ধোবা। শিবিকাভ্যন্তর হইতে ছুঁহুঁ হইল, “ক্ষতি নাই, এই বাটীর অন্তরস্থ পথ দিয়াই পাক্ষী লইয়া চল, দেখিও তোমরা কোনরূপ অত্যাচার অথবা গোলমাল কিম্বা অভদ্র ব্যবহার করিও না।” মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ বাটীর মধ্যে শিবিকা প্রবেশ করিল। তখন অপরাহ্ন শেষ হইয়াছে, সন্ধ্যাব প্রথম অবস্থায় প্রকৃতি সুন্দরী মলিন মুখ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রজকের বাটীতে পাক্ষী প্রবেশ করিলে লালবাবু দেখিলেন, তিনদিকে কয়েকটা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটির, এক দিক খালি, মধ্যে এক অনতিবিস্তৃত অথচ প্রশস্ত সমতল ভূমি খণ্ড, ইহার স্থানে স্থানে কদম্ব, বকুল, পলাশ, টগর, রক্ত প্রভৃতি ফুলের গাছ ; ইহাই ধোবার বাটীর “উঠান” (yard) অথবা “ছত্র”। এই রমণীয় এবং পরিষ্কার ভূমিখণ্ড দেখিয়া লালাবাবু পাকী হইতে নামিলেন এবং একটা গাছের তলে গালিচা প্রসারণ করিয়া তদুপরে উপবেশন পূর্বক ধূমপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চাকরেরা সুবর্ণ-নির্মিত মুখ-নল এবং বোপা নির্মিত আলবোলা লইয়া নিকটস্থ সরোবর ভবিত গেল, কেহবা সেকালের প্রণামত চক্ৰমকি প্রস্তরের সহিত লোহের বিবাদ ঘটাইয়া সর্ক-ভূকের দর্শনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে প্রায় সন্ধ্যা দেখা দিল। লালাবাবু দেখিলেন, এই উঠান-খণ্ডের এক পার্শ্বে এক সুদৃশ্য স্থলপদ্ম ফুলের গাছের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটা দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা আপন পিতাকে সম্বোধন পূর্বক বলিতেছে “বাবা ! দিন গেল, সন্ধ্যা হ’লো, বাসনার আগুন দে।” এই কথা এই গৃহ-স্বামী রজকের একমাত্র ছহিতা। পল্লী-গ্রামের অনেক স্থানে ধোবার (বস্ত্র সিদ্ধ কারবার) “ভাটী”কে “বাসনা” বলে, বিশেষতঃ চবিশপরগণায় এই ‘বাসনা’ শব্দ ‘ভাটী’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৃদ্ধ ধোবা আফিম-খোর ছিল, আফিমের নেশায় হকা হাতে করিয়া বিমাইতেছিল, এই জন্ত কথা স্মরণ করিয়া দিল “বাবা ! দিন গেল, সন্ধ্যা হ’লো, বাসনার আগুন দে।” রজক-কন্ডা যে অর্থে এস্থলে “বাসনা” শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, পাঠক মহাশয়কে আমরা তাহা বুঝাইয়াছি, কিন্তু এই কয়েকটি কথা ইজের বজ্রাংগনা

অধিক তেজে লালাবাবুর অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করিল। লালাবাবু ভাবিলেন, “দিন যাইতেছে, সন্ধ্যা হইতেছে, আবার দিন যাইতেছে, আবার সন্ধ্যা হইতেছে, কিন্তু বাসনায় কি আমরা আগুন দিয়াছি ? এ ঘোরতর সংসার-রূপী বাসনাকে তীব্র-বৈরাগ্য-রূপী অগ্নি ভিন্ন কে জ্বালাইতে পারে ?” পাঠক মহাশয় দেখিবেন, যে অর্থে রজক-কন্ডা ‘বাসনা,’ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল, লালাবাবুর জন্ম-সরোবর সেই শব্দের জন্ত অর্থ দ্বারা আলোড়িত হইতেছিল। লালাবাবু আবার ভাবিলেন, “জীবন-দিন গত হইতেছে, সন্ধ্যা-মৃত্যু নিকট প্রায় পরকালের জন্ত কি প্রস্তুত হইতেছি ? কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু-ছাগদিগকে কি বলি দিয়াছি ? মায়ামরিচাকায় মন-যুগ নিত্য জ্বালাতন হইতেছে, কিন্তু তবুও সংসারের অসার মায়াকে তাগ করিতে পারিলামনা ; সুখের বাসনাকে বৈরাগ্যের জ্বলন্ত অগ্নিতে জ্বালাইতে পারিলামনা।” লালাবাবুর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল, দিব্য-চক্ষু খুলিয়া গেল, তিনি পরিবর্তিত হইলেন ; সেই রজকের গৃহের উঠানে গায়াহু সমীরণের সঙ্গে সঙ্গে লালাবাবুর মন-পাখী যেন উড়িয়া গেল, তিনি যেন নূতন জীবন, নূতন মন, নূতন ধন পাইয়া সুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার যেন স্মরণ হইল—

“দিবা অবসান হ’লো, কি কর বসিয়া মন।

এ ঘোর ভব-নদী উত্তরিতে, করেছ কি আরোজন ?”

যাহা হউক, রজক-কন্ডাকে পুরস্কার দিয়া লালাবাবু আপন সেবক ও সহচরদ্বয়কে পাকীর সমুখে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, “তোমরা পাইকপাড়ায় কিরিয় যাও ; বলিও রজককে ‘রজক-জের’ অঙ্গামী হইয়াছে

আব তিনি পাইকপাড়ায় আসিবেন না।” চাকরেরা অনেক মিনতি করিল, কিছুতেই লালা বাবুব মন ফিবিল না, স্ত্রুতবাং সেবকেরা এই অত্যন্ত অস্বাভাবিক অথচ অস্বাভাবিক সমাচার জানাইবার ক্ষমতা ক্রমশঃ পাইকপাড়ায় দিকে দৌড়িল। তাহারা অদৃশ্য হইলে, লালা বাবু আপনার পোষাক খুলিয়া ফেলিলেন এবং ধূতির এক পার্শ্ব ছিঁড়িয়া কোপীন মাত্র সঞ্চল করিয়া সেস্থান পবিত্রাণ করিলেন। মূল্যবান পোষাক তথায় পড়িয়া রহিল। বাত্রি দশটাব সময় একটা ক্ষুদ্র গ্রামে যাইয়া পৌঁছিলেন, এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আহ্বান দিল, পর দিবস সেকালের নবাবী রাস্তা ধরিয়া পদবক্ষে বৃন্দাবন অভিমুখে প্রয়াণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক মাস কষ্ট ভোগ করিয়া খ্রীষ্টীয় ১৭৯২ অব্দের এপ্রেল মাসে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে, লালা বাবু শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। পাইকপাড়ায় চাহাকার ধ্বনি উঠিল, কলিকাতার তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, নানা লোকে নানা উপকথা উড়াইল; কিন্তু কেহই লালা বাবুব সন্ধান পাইল না। বৃন্দাবনে গিয়া তিনি সংবাদ দিলেন, সে সংবাদ পাইকপাড়ায় পৌঁছিল, সমগ্র সহর তাঁহাকে ধন্ত ধন্ত বলিতে লাগিল।

শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ আর কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ রহিলেন না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ধনবান কায়স্থের সম্মানিত উপাধি স্বরূপে “লালা” শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই লালা শব্দের প্রকৃত অর্থ—যে লালাস করে, অর্থাৎ বাহ্যিক দ্বারা অপরে প্রতিপালিত হয়, স্ত্রুতবাং ইহা অত্যন্ত বড়লোকের খেতাব। এখন এই প্রাচীন উপাধি উত্তর পশ্চিম, অযোধ্যা, গজাব শ্রুতি প্রদেশে অসম, ব্রজ, বৈশ্য,

শুদ্ধ প্রভৃতি সমুদয় হিন্দু ধনবান পুরুষের সম্মানার্থ ব্যবহৃত হয়, স্ত্রুতবাং ব্রজধামে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ লালা বাবু উপাধিতে সম্মানিত হইলেন, তাঁহাব বাঙ্গালীদিগের চিত্ত স্বরূপ ‘বাবু’ উপাধিও ‘লালা’ উপাধির সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল, কেহ কেহ “রাজা বাবু” বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেন, কিন্তু লালা বাবু উপাধিতেই তিনি এখন ভারত-বিখ্যাত।

বৃন্দাবনে তিনি মন্তক মুণ্ডন করাইলেন এবং বৈরাগ্য-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া বৈরাগী বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেন। প্রার্থনা, উপাসনা, পূজা, দ্বাবে দ্বাবে হরি-সঙ্কীৰ্ত্তন, ভিক্ষা দ্বারা জীবন যাপন, চুংখাব চুংখ মোচন, হরিকথা শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা বৃন্দাবনে তাঁহাব নিকলক্ষ জীবন যাপিত হইতে লাগিল। যতটুকু খাদ্য হইলে তাঁহার ক্ষুধার শান্তি হইতে পারে, ততটুকু পক্কান্ন মাত্র ভিক্ষা করিতেন। ভিক্ষা দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেই যমুনার ঘাটে বসিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া তাহা ভক্ষণ করিতেন, সঙ্গে জলপাত্রও রাখিতেন না, কর দ্বারা যমুনার জল উঠাইয়া পান করিতেন। ক্রমে ক্রমে লোকে জানিতে পারিল, তিনি সামান্ত লোক নহেন, লালা বাবু কলিকাতার একজন বড় ধনবান রাজা। সমগ্র ব্রজধাম লালা বাবুকে ধন্ত ধন্ত কবিত্তে লাগিল, সমগ্র উত্তর পশ্চিম প্রদেশে তাঁহার ধর্মজীবনের কথা প্রচার হইয়া পড়িল। এ দিকে কলিকাতা হইতে লালা বাবুর সেবক, কর্মচারী ও গৃহের লোকেরা আসিয়া পৌঁছিল, লালা বাবুর অসুখ ও ইচ্ছামত বাহা কিছুই আদেশ হইল, তাহা শ্রদ্ধা হইল, লালা বাবু টাকা লইয়া ব্রজধামে এক সুবিহৃত জমিদারী খরিদ করিলেন, ঐ জমিদারী এখনও বর্তমান, উহা লালা বাবুর ষ্টেটনামে

ধাত, হাব বাষক আর প্রায় দেড় লক্ষ ট. প। এই জমিদারী চালাইবার জন্ত রীতি মত দৃষ্ট, দেওয়ান, নায়েব ও কাচারী আছে, বন্দাবনে হাব হেড কোর্টর। লালার বাবু এই সম্পত্তি খবিদ কবিতা হুকুম দিলেন “এই জামদারীর অংয়েব একটি পরমাণু আমায় বাণিতে যাটবে না, ইহা দেবসেনা ও পনোপকারেব জন্ত ব্যয়িত হইবে।” এপর্যন্ত ঐ নিয়ম অবাবে বন্ধিত হইয়া আসিয়াছে। বন্দাবনে ছয় বর্ষকাল অধিবাস করিবার পরে গালা বাবু এক প্রকাণ্ড মন্দির প্রস্তুত করিয়া ইহা প্রকাশ করেন, ঐ মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। উহা নির্মাণ করিতে নয় বর্ষকাল ব্যয়িত হয়। ঐ মন্দিরে কৃষ্ণচন্দ্রের বিগ্রহ স্থাপন করেন, তদন্তর গোবিন্দ-গির্গিতে গমন কবিতা তপঃ অবলম্বন পূর্বক একাকী ভগবৎ ভজনে নিযুক্ত হইলেন। গোবিন্দনে সপ্তবর্ষকাল অবস্থান কালের পরে তাঁহার পনলোক প্রাপ্তি হয়। গোবিন্দনে তাঁহার বর্মণীয় সমাধি এখনও বর্তমান, প্রতি বৎসর মহাসনাবোহে উহা উৎসব হইয়া থাকে। পবাদ আছে, ভিক্ষা কবিতা যমুনা তটে যাহতেছিলেন, এমন সময়ে একটা দ্রুতগামী (পলায়িত) তেজস্বী অশ্বের সম্মুখে পড়িয়া তিনি তুণ্ড কর্তৃক পদদলিত হইলেন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। লালার বাবু ব্রজধামে “অন্তম অবতার নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার সম্মুখে অসংখ্য কাহিনী শুনা যায়, প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথার উল্লেখ করিব না। তিনি যে মন্দির নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব,

অতিথি, পবিত্রাজক, কাকাল প্রভৃতিব অল্প সংস্থান হয়। বন্দাবন্ত আব ও ভাল হইলে আরও উপকার হইতে পারে। *

লালার বাবু ধর্ম্য জীবন বিনয়, নম্রতা, স্ত্রীশীলতা, ভক্তি, প্রেম, পনোপকার প্রভৃতিতে ব্যাপিত হয়। তাঁহার ধর্ম্যজীবন প্রকৃত বৈবাগী—প্রকৃত বৈষ্ণবের ধর্ম্যজীবন ছিল। এখনকার কালে পেটে অন্ন না থাকিলেই লোকে বৈবাগী হয়, এই জন্ত এত বড় “বৈবাগী” বা “বাবাজী” কথাগুলো এখন বাঙ্গালা দেশে তামসাব শব্দ বলিয়া পরিগণিত হয়। লালার বাবুর বৈবাগ্য-জীবন ভক্তি ও প্রেমামাণ ছিল, তাহার বন্দাবন জীবন মথার ধর্ম্যজীবন ছিল। আবাব, বিচার জ্ঞান, বিবেক, বিজ্ঞান, ভদ্রতা প্রভৃতি বিষয় তিনি মতান্বিত ছিলেন; অসাধারণ প্রেম ও ভক্তিবলে তিনি পাষণ্ডদময় ব্যক্তিও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। খালি পায়ে, খালি গায়ে, খালি মাথাব তিনি দ্বাবে দ্বাবে যখন মরুপ স্বরে হবি সংকীর্ত্তন করিতেন, তখন বাস্তব নোকেব শতাব্দ জনতা হতত, হিন্দুস্থানীরা অবাক হইয়া এই অবাবাবণ বাঙ্গালা ভাবনোকে দেখিত। শুনা যায়, লালার বাবু কেশ-শূণ্য মাথায় কখনও কখনও খাব্য দ্রব্য থাকিত, পক্ষা বা আসিয়া তাহা খুঁটিয়া খাইত। আমবা লালার বাবুর জীবনী সমাপ্ত কবিতা, এমন মহাপুরুষের জীবন লিখিতে লিখিতে আমাদের যে আনন্দ হইয়াছে, অনেক ধনবানের ধনভোগে তাহা হয় না। ধন্য লালার বাবু! বঙ্গের বাহিরে তুমি বাঙ্গালীর মুখোজ্জল করিয়াছ, তোমার আত্মায় ভগবানের আশীর্বাদ পড়ুক।

শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী।

* এই প্রবন্ধের কোনও কোনও অংশের সমাচার জন্ত বন্দাবনস্থ লালার বাবুর পুত্রের বর্তমান ম্যানেজার বাবু শিবকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।—লেখক

রাজগৃহ । (৩)

স্থান-মাহাত্ম্য সর্বদেশের সর্বকালের মহা-জনেরা কীর্তন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে স্থান-মাহাত্ম্যাপেক্ষা তীর্থ-মাহাত্ম্যেরই আদর অধিক। কাশী-বন্দাবন, পুরুষোত্তম-কামাখ্যা যাইতে এদেশের বহু লোকে ব আগ্রহ আছে, কিন্তু বুদ্ধের জন্মস্থান, বিহারস্থল, এবং কীর্তি-স্থল, ত্রিচৈত্বের জন্মভূমি, রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি দেখিতে কাহার সাধ? অকীর্তির অন্ধকারময় স্থান সমূহ আজ মহা ধুমধামে পূর্ণ, আর এদেশের মহাজনদিগের জন্মভূমি, বিহার-ভূমি বনে, জঙ্গলে পরিপূর্ণ!! বলিলেকি হইবে?—এদেশ হজুগের জন্মই মুক্ত-হৃদয়।

রাজগৃহে পদার্পণের পর হইতেই আমাদের হৃদয় মনকে দাকণ চিন্তা-জর আক্রমণ করিল। বে দিকে চাই, কেবল ধ্বংসাবশেষ! কিন্তু সব ব্যাধ ভল্লকের বিহার-ক্ষেত্র। কোন মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন, “যে দেশে একজন মহাপুরুষও জন্মিয়াছে, সে দেশ ধন্য।” মহাপুরুষ বলিয়া মহাপুরুষ নহে—বুদ্ধদেবের জন্ম মহাপুরুষ এই ধরায় বড় অধিক জন্ম গ্রহণ করেন নাই। এহেন মহাপুরুষের বিহার এবং সাধন স্থল রাজ-গৃহের বর্তমান অবস্থা দেখিলে এমন লোক নাই, যাহার অশ্রুপতন না হয়। কিন্তু দেখে কে? দেখিবার লোক এ ভারতে অধিক মিলে কি? অকীর্তি-কীর্তনের লোক এদেশে অনেক মিলে, ভণ্ড মহাজনের গাড়ী টানার লোক অনেক জুটে, কিন্তু প্রকৃত মহা-পুরুষের গুণাবলী ও স্থান-মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার লোক মিলে না। মিলে না

প্রকৃত মহতের মহাপূজা—প্রকৃত সাধুর সম্মান। পঞ্চপাহাড় বেষ্টিত রাজগৃহে দেখি-বার কি আছে? ভগ্ন অট্টালিকা রাশির ইষ্টক-স্তূপ আছে, ভগ্ন প্রাচীরে বন চিহ্ন আছে, অসংখ্য পুষ্করবার শুষ্ক বন্দ আছে—আর রাস্তাহীন জঙ্গল, জঙ্গল—কেবল জঙ্গল আছে। হোসেনাবাদের নবাবের জঙ্গলে বিনা পরসায় কাঠ কটিতেছে অসংখ্য লোক, কিন্তু তবুও জঙ্গল নিঃশেষ হয় না। কটকে কটক, শাখায় শাখা মিশাইয়া অসংখ্য কণ্টকাবৃত পূত-মহা-জন চরণে গুঁ সুরক্ষা করিতেছে। পাখীগণ মধুর হইতেও মধুরতর সুরে, নানা ভাষিতে গাইয়া, গাভীয়া আরো গাভীয়া মিশাই-তেছে, এক শব্দ প্রতিধ্বনিত শত শব্দ হইয়া প্রাচীনত্বের উদ্যোগ ঘোষণা কর-তেছে এবং বহু জন্তুদল এই মাহাত্ম্যায় স্থানে বিহার করিয়া প্রাচীন মাহাত্ম্যের গৌরব সুরক্ষা করিতেছে। পঞ্চপাহাড়ের মধ্য দিয়া সরস্বতী মৃদু মৃদু বহিতেছে—কিন্তু একখানি কৃষকেরও কুঁড়ে ঘর নাই! নির্বিঘ্নেও নির্বাণই ভাল, নীরব হইয়াছেত উদ্যমান-তাই ভাল, প্রকৃতি দিব্যারাত্রি যেন এই কথাই বলিতেছে। কদাচিৎ পথশূন্য কণ্টকাক্রান্ত জঙ্গলে আমাদের জন্ম কোন হতভাগ্য যদি কখনও যায়, তাহার কাণে কাণে কে যেন এই কথাই বলে—“কেন আসিয়াছ, যে দেশ ডুবিয়াছে, তাহার পূর্বস্মৃতির উদ্দীপনায় আর কাজ কি? নিঃজনতা ছাড়িয়া সহরে যাও, সহরে যাও।” একদিন নয়, দুদিন নয়, প্রায় এক মাস কাল, দিবসে এবং রজনীতে—বিজন এদেশের এই মহা উদ্যাস

সঙ্গীত, মহা হস্তিত আমাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছে। আমরা রাজগৃহে বাহা বাহা দেখিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব, প্রতিশ্রুত হইয়াছি। কিন্তু পরিচয় দিয়া লাভ কি? বাহা ডুবিয়াছে, তাহা কি এ ভারতে আর জাগিবে? বুদ্ধদেবের মহা সাধনার মাহাত্ম্য এদেশে আর কি প্রতিষ্ঠিত হইবে? নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মহা শিক্ষা আর কি পুনরুদ্ধাপিত হইবে? ধর্ম এখন কথায়, চরিত্র এখন বাহুপোষাকে, জাঁক-জমকে, হিঠৈষণা এখন ভণ্ডামি এবং কপট-তায় আচ্ছন্ন, এই হজুগপ্রিয় মহাযুগে এ সকল কাহিনী বর্ণনায় ফল কি? এক বৎসর পর্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া বৃষ্টিতেছি, কোনই ফল নাই। রাজগৃহের গভীর নীরবতা আমাদিগকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিতেছে, রাজগৃহের কুহক-স্বপ্ন আমাদিগকে জগৎ হইতে ক্রমাগতই অন্ধকারের দিকে বাইতে আদেশ করিতেছে। নির্বাণ, নির্বাণ—মহা নির্বাণই যেন ভাল, বলিতেছে। তবে কেন প্রতিশ্রুতির-কঠোরতা স্বরণ করিয়া আবার রাজগৃহের কথা লিখিতেছি? বিভ্রম, মহা বিভ্রম।

বিহার হইতে রাজগৃহাভিমুখে যে রাস্তা আসিয়াছে, তাহা ডাক-বাঙ্গলা পর্যন্ত আসিয়াই একরূপ শেষ হইয়াছে। আর একটু দক্ষিণে বাইয়াই, সরস্বতী উপকূলে, অথবা কুণ্ডু সমূহের তীরে শেষ হইয়াছে। তারপরও একটা রাস্তা, পাহাড়ের মধ্য দিয়া, চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তার দুই দিকেই জঙ্গল। এই রাস্তা জরাদেবীর মন্দিরকে পশ্চিমে রাখিয়া, বাণ-গঙ্গার উপর দিয়া দক্ষিণে—আরো দক্ষিণে, নোয়াদার দিকে চলিয়া গিয়াছে। ডাক-বাঙ্গলার উত্তরে কীর্তি

স্তূপ—প্রাচীর-বেষ্টিত বৃহৎ প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ বহু বিস্তৃত। ইহার তিন দিকের প্রস্তর এবং মৃগ্ময়, এবং সুদৃঢ় পাহাড়-সম উচ্চ প্রাচীর অদ্যাবধিও দণ্ডায়মান। উত্তরের প্রাচীর আধুনিক রাজগৃহ গ্রামের দহুয়া লুটিয়া লইয়াছে, তাহার চিহ্নও নাই। এই প্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণ ভূমিতে একটা প্রাচীন শিব মন্দির আছে, মহামায়ার মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, দুই তিনটা পুকুরের চিহ্ন আছে, আর আছে অসংখ্য ইষ্টক এবং প্রস্তর খণ্ড। সুনীলাম, এই প্রাঙ্গণ হইতে ইষ্টক খুঁড়িয়া লইয়া আধুনিক ভেজান (?) রাজগৃহ গ্রাম মস্তক তুলিয়াছে। বহুস্থানে মৃত্তিকা খনিত রহিয়াছে, দেখিলাম, ছোটছোট ইট এবং ছোলট প্রস্তর রাশি লোকেরা ফেলিয়া গিয়াছে, বড় বড় সব অপহরণ করিয়াছে। যেখানে খনন করা যায়, কেবল ইট এবং পাথর পাওয়া যায়। এতটা জমী পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু চাষ করার উপায় নাই, কেবল ইট, কেবল পাথর। লোকেরা বলে, এখানে কোন রাজার বাড়ী ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইহাকেই রাজা বিশ্বময়ের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহারই বাড়ী হউক, এ যে এক মহা সমস্ত্রাণ, মহাকীর্তি-পূর্ণ স্থান, তাহাতেই আর সন্দেহ নাই। সারং কালে কতবার এই প্রাঙ্গণ-প্রাচীরের উপরে উঠিয়া ভাবিয়াছি, হায়, সোণার প্রতিমা বিসর্জিত হইয়াছে, মহাকালের গর্ভে এই ভগ্ন প্রাচীর, প্রাচীন-কাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া মহা স্বপ্ন মানব-প্রাণে জাগাইতে আজও কেন বিদ্যমান? এই দেশের লোকেরা সারারাত অশিক্ষিত, কোন চিন্তা নাই। চিন্তা—পণ্ডিগের জায় কেবল আহায় এবং রিপুচালক, তাহার ভাবে জা, জানে না।

এই প্রাচীর কতকাল ধরিয়া ধরিয়া বন্ধে
দাঁড়াইয়া মহাযুগেব মহাকাহিনী ঘোষণা
করিতেছে। বিস্মৃতি এবং স্মৃতি, দুই যেন
এখানে জাগ্রত। চৈতন্য এখানে বিস্মৃত; জড়
এখানে জাগ্রত স্মৃতিতে প্রজ্জলিত। প্রস্তব স্তূপ
নয়—যেন আরক-লিপিবাশি। মানবাপেক্ষা
এই প্রাচীন জড়-প্রাচীর, নীবব ভাষায়, আমা-
দিগকে অনেক কথা বলিয়াছে, শিখাইয়াছে।
সে সকল তব্ব কথা কতক কতক “পুণ্যপ্রভা”
নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সরস্বতী
নদী, পঞ্চ-পাহাড়-বেষ্টিত প্রাঙ্গণ পবিত্রাঙ্গ
করিয়া বৈতরণীর দিকে * যাইতেছিল,
কেহ তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া, ডাক বাঙ্গালার
পূর্বদিক দিয়া, কৃষির উৎকর্ষ সাধনের জন্ত
নূতন পথ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। তাই এখন
ডাক বাঙ্গালার পূর্বে কর্তিত সরস্বতী।
এইখান দিয়াই বার মাস জল চলে;
পশ্চিমের পথ রুদ্ধ। তবে বর্ষার সময়
পাহাড়ে নদী বোধ করে, কাহাব সাধা?
সেই সময়ে পশ্চিম দিকেব স্রোত বহমান
হয়। ডাকবাঙ্গালার কতকটা পশ্চিমে বৈত-
রণী তীর্থ, সেখানে অনেক কৃত্রিম কুণ্ড
আছে। কৃত্রিম এই অর্থে বলি, পয়সার
খাতিরে পাণ্ডা তাহা কবিয়াছে, বোধ
হয়। উষ্ণপ্রস্রবণ সকল মানুষে করে নাই।
পাহাড় সকল মানুষে করে নাই। আরো
যে সকল কীর্তিব ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাও
আমাদের দ্বার মানুষে করে নাই। তাহা
অন্য-দেবতার সৃষ্টি। তাহা অকৃত্রিম, পুণ্য-
প্রবাহ। ডাকবাঙ্গালার পূর্ব-দক্ষিণে অনেক
দরগাহের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। আরো পূর্ব
দক্ষিণে বুদ্ধকুমার কুণ্ড। দক্ষিণে, সরস্বতীর পূর্ব-

* উৎকলের বৈতরণী নয়, এখানেও বৈতরণী
জীব আছে। পরে তাহার কথা বলিব।

কূলে, বিপুলাচলের নীচে, স্ব্যাকুণ্ড প্রভৃতি।
সরস্বতীর পশ্চিম উপকূলে, বৈভাব পাহা-
ড়েব একটু উপবে, ব্রহ্ম ও সপ্তঋষি কুণ্ড প্র-
ভৃতি। ডাকবাঙ্গালার আমবৃক্ষবাজিতে বেষ্টিত।
স্থানটা স্মৃশীতল, কবিত্বপূর্ণ, স্মৃতিপূর্ণ, ভীতি-
পূর্ণ, নিৰ্জন—মহানিৰ্জন। এই কবিত্বের খনি
নিৰ্জন কুটীবে আমবা এক মাস কাটাই-
লাম। কি স্বপ্ন-স্বপ্নে উৎসাহ-মদিবায় আমা-
দের দিন কাটিয়াছিল, একমাত্র অন্তর্যামীই
জানেন। নিৰ্জনতার মহাপ্রাণ বিনি, তিনি
যেন আমাদেরকে কোলে করিয়া এই স্বপ্ন-
ময়, স্মৃতিময়, মাহাত্ম্যময় রাজ্যে রাখিয়া-
ছিলেন। যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা
লিখিতে লেখনি কম্পিত হয়। আমবা
বক্তা মাংসধারী মানুষ হইয়াও একমাস মহা-
যোগে যেন যুক্ত ছিলাম। স্থান-মাহাত্ম্য,
পাঠক, তোমবা মান আব না মান, আমি
মানি। আমি মানি, স্থান-মাহাত্ম্যে মাটি
সোণা হয়, বিষ্ঠা চন্দন হয়, পাপী উদ্ধার
হয়। ভক্তের পুত চরণ বেণু স্পর্শে আর
কি হয়, তাহা ভক্তগণই জানেন। আমি
তাহা কি লিখিতে পারি? ডাকবাঙ্গালার
পেয়াদা রামলাল হইল আমার উপদেষ্টা,
সামান্য পাণ্ডা লোকনাথ হইল যেন গুরু, হুতা
হইল বন্ধু, দিবসে মধুকব এবং রজনীতে ভল্লক-
দল হইল সাথী। ঘুরিয়া, ঘুরিয়া, বসিয়া বসিয়া,
শুইয়া শুইয়া, অস্পষ্ট এবং অক্ষুট কত তব্বই
যে শুনিয়াছি, মহা নীবব আকাশ তাহার সাক্ষী
রহিয়াছে। স্থান-মাহাত্ম্য তুমি পাঠক, না মান,
আমি মানি। কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্য কীর্তন
করিতে পারি, সে শক্তি আমার নাই। আমি
বাঙ্গালী, আমি হুজুগপ্রিয় অধ্যম বাঙ্গালী।

আমাদের যোগ কুটীরের কিঞ্চিৎ দক্ষি-
ণেই দুই প্রকাণ্ড পাহাড়। পাঠক ম্যাপের

প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। পূর্বে বিপুল, পশ্চিমে বৈভার। মধ্যে সরস্বতী নদীতে একটি কুণ্ড করা হইয়াছে; এখানে পদধৌত কবিতা পশ্চিমের বৈভার পাহাড়ের উপরে উঠিতে হয়। ইহাই প্রথম কুণ্ড। ইহার নাম সরস্বতী কুণ্ড।

যে দিন আমরা রাজগৃহে পৌঁছলাম, তাহার পর দিন বড়গাঁয়ে মেলা বসিয়াছিল। প্রতি পক্ষ উপলক্ষে সেখানে মেলা বসিয়া থাকে। তা ছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবারেই মেলা বসে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এখন যেন মেলায় সমাধি। এখানে কোন সময়ে যে কিছু ছিল, অসভ্য লোকেরা বংশপরম্পরায় তাহা স্মৃতিতে বাহিয়া বহিবা আনিয়াছে। লোকেরা এই স্থানের মায়া ছাড়িতে পারে না। 'প্রতি দিনই লোক ভাসিগেছে, প্রতি সপ্তাহেই মেলা বসিতেছে, প্রতি মাসেই, প্রতি বৎসরেই কত নরনারী সাজিয়া দলে দলে মিলিতেছে। আমরা দেখিলাম, প্রতি দলেব সঙ্গেই দুই একটি ঢাক বাজিতেছে, আর নর নারী মহা উৎসাহে গাতিয়া চলিয়াছে। বড়গাঁয়ের মেলায় পর দিন রাজগৃহে প্রাতে মেলা বসিল। কত দূর দূর—অতি দূরতর স্থান হইতে প্রত্যয় হইতে কত নর নারী সমবেত; প্রতি দলের সঙ্গেই ঢাক। ঢাকের বাদ্যে পাহাড় প্রতিধ্বনিত, আজ প্রকম্পিত। সূর্য্যকুণ্ড আজ লোকে পূর্ণ, এখানে আজ জ্ঞান করিলে মহাপুণ্য। সরস্বতী কুণ্ডের পূর্ব্বদ্বারে বিপুলের নীচে, সূর্য্যকুণ্ড, রামকুণ্ড, গণেশ কুণ্ড, চন্দ্রমা কুণ্ড (সোম-কুণ্ড) সীতাকুণ্ড। একটি ছাড়া আর সকলের জলই উষ্ণ, বোধ হয় যেন একটি উষ্ণ ঝরণা বিভক্ত হইয়া এই সকল কুণ্ডে উৎপন্ন করিয়াছে। ইহার নিকটেই একটি প্রাচীন মন্দিরে হাটকের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। আমরা প্রত্যবে মেলা দেখিতে গেলাম। সে জনতা ভেদ করে,

কাহার সাধ্য? রাজগৃহের কনষ্টেবল আমাদিগকে জনতা ভেদ করিয়া লইয়া চলিল। অতিকণ্ঠে সূর্য্যকুণ্ডের ধারে পৌঁছলাম। সূর্য্যকুণ্ড প্রায় ১২ হাত চওড়া, ১২ হাত দীর্ঘ; এই সন্ধ্যা স্থানে অসংখ্য লোকের স্নান। নিশ্চল উষ্ণ জলবাশি আজ কর্মময় হইয়া গিয়াছে। সেই কর্মে অসংখ্য নরনারী মানন্দে এবং সোৎসাহে ডুব দিতেছে। নারীদিগের হস্তে মোরা এবং পিঠক। কুণ্ডের চৌবাচ্চার পূর্ব্ব প্রাচীরে সূর্য্যের মূর্তি, সেখানে দুই চারিটা প্রদীপ জ্বলিতেছে, কয়েকজন পাণ্ডা দাঁড়াইয়া পিঠক ও মোরা মূর্তিকে স্পর্শ করাইয়া কতক ফেরত দিতেছে, কতক রাখিতেছে। কুণ্ডের চতুর্দিকে অসংখ্য পাণ্ডা পয়সা বোজ-গারেব চেষ্টা করিতেছে। স্নান হইলে বাদ্য বাজাইয়া দলে দলে নরনারী আর্দ্র বস্ত্রে নিজ নিজ গ্রামাভিমুখে যাইতেছে। প্রায় দশটা পর্য্যন্ত এই মেলা দেখিলাম। কি জানি যেন অনেকেই আমাদিগকে খুব আদর অভ্যর্থনা করিল। নানকসাহীর দুই চারি জন বন্ধাজি আমাদের চেহারা দেখিয়া বড়ই প্রশংসা করিলেন। কনষ্টেবলের সঙ্গে আমরা এই দিনই মুকদ্দম কুণ্ড দেখিতে গেলাম। ইহা বিপুলচালের উত্তর গাত্রে; সূর্য্যকুণ্ডের পূর্ব্ব, ডাকবাজালার পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে স্থাপিত। পূর্ব্ব ইহাকে শূদ্রীখক কুণ্ড বলিত। উষ্ণ জল প্রবল ধারায় পাহাড় ভেদ করিয়া ইহাতে অবিরত পড়িতেছে। মুসলমান সাধু মুকদ্দম সাহ ইহাকে আশ্রয় করিয়া অবধি ইহার নাম মুকদ্দম কুণ্ড হইয়াছে। এখানে বাহা বাহা দেখিলাম এবং অন্যান্য স্থানে বাহা দেখিলাম, পরে বিবৃত করিব। এই দিন রাত্রে একটি ঘটনায় আমরা বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম! আমাদের ডাকবাজালার পেরাদা রামলালের দ্বী স্বামীর জন্ত ১৭ কোষ

পথ হাটিয়া উৎসবের পিষ্টক লইয়া উপস্থিত হইয়া ছিল। কি জীবন্ত ভালবাসার আকর্ষণ। অসভ্য মহিলা স্বামীসেবার জন্য অম্লানচিত্তে তীর রোদ্র এবং উন্নত ধূলির বস্ত্রা মাথায় বহিঁয়া কতদূর হইতে আসিয়াছে! স্বামী এই উপাদেয় তণ্ডুল ও গুড়মিশ্রিত মালপোয়া না খাইলে সব যেন বার্থ হয়, তাই এতদূর আসিয়াছে। পথ কষ্টে ডাকবাংলায় আসিয়াই রাত্রে ভেদ বমি আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রে রামলাল হাট হাট করিয়া কাঁদিয়া বলিল, তাহার স্ত্রী মারা যায়। আমি ছুটিয়া গেলাম। বাইরা দেখি, বাস্তবিকই ওলাউঠার লক্ষণ, হাতে পায়ে খিল ধরিয়াছে। মৃত্তিকা শয্যায় বামলাল স্ত্রীকে কোলে করিয়া হাট হাট করিয়া কাঁদিতেছে। ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, পথ্য নাই—আমাদের সঙ্গে অধিক লোকও নাই! গ্রাম অনেক দূর, কাঁকী ভূতা রাত্রে গ্রামে ঘাঁটতে সাহস পায় না, বায়ে ব্যাঘ্র ভয়ুক বাহির হয়। কি করা যায়, ভাবিতে লাগিলাম। আমি বিধাতার উপর নির্ভব করিয়া গ্রামে ঘাইব, স্থির করিলাম। ঈতিমধ্যে হঠাৎ একটা প্রক্রিয়া মনে হইল। কুণ্ডের পরিষ্কার জল ঘরে ছিল, বিধাতার নাম স্মরণ করিয়া ৫ মিনিট অন্তর অন্তর ঐ জল দিতে বলিলাম। ঐরূপ

দিতে দিতে, বিধাতার কৃপায়, রোগী একটু ভাল হইল। ভেদ বমি থামিল। জল ত জল নয়, আজ যেন বিধাতার কৃপারূপে রামলালের স্ত্রীর শরীরে প্রবেশ করিতেছে। কিসে কি হয়, কে জানে? সামান্য শীতল জলে দাকন ওলাউঠা আরোগ্য হইতে লাগিল। শেষ রাত্রে দেখা গেল, বোগীর পেট ফুলিয়াছে; তখন জল বন্ধ করিলাম। পব দিন বোগী একই অবস্থার রহিল। ১ কি ২টা বাজে, তবুও প্রস্রাব হয় নাই। এক মাত্র উপায় ঐ শীতল জলের পটী তলপেটে দেওয়া গেল এবং শিলাওর সব চিড়া ভিজাইয়া তাহার জল বোগীকে পথ্য দিলাম। কি ২.১৫ ঘণ্টা, এক কি দেড় ঘণ্টা পরেই রোগীর প্রস্রাব হইল। দুই দিন পব রোগীকে অন্ন দিলাম। আবার চারি দিন রাখিয়া, শেষে সঙ্গোপে রোগীকে বাড়ী পাঠান গেল। বিধাতার কৃপা যখন অবতরণ করে, তখন সামান্য জিনিস মহা ঔষধের কাজ করে। রামলালের কুটারে ইহাব প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। দাম্পত্য প্রেমের যে গভীর মনোমুগ্ধকর নীরব অভিনয় দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিব না। ভালবাসা বড় লোকের ঘরে, না কাঙ্গাল গরিবের কুটারে, তাহা কে জানে? ক্রমশঃ

বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য।

প্রথম ভাগ।

শ্রীদীনেশচরণ সেন, বি-এ, প্রণীত।

বহুদিন হইতে আমরা দীনেশ বাবুর এই গ্রন্থখানির অপেক্ষা করিতেছিলাম। রয়াল আর্টপেজী ৪৩০ পৃষ্ঠার প্রথম ভাগ সমাপ্ত হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। দেখিলে বুঝা যায়, বাঙ্গালার ছাপাখানার কত উন্নতি হইয়াছে। কুমিল্লা

চৈতন্য-বঙ্গ পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ছঃখের বিষয়, মফঃস্বলের ছাপাখানার ভ্রম সংশোধনের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত নাই। একান্ত বিস্তর মুদ্রাপ্রমাদ গ্রন্থ মধ্যে রহিয়া গিয়াছে।

ছয় বৎসর পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থকার এ পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। পুস্তকে

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনা করা হইয়াছে। ছয় বৎসরেও যে মফঃস্বলে বঙ্গিয়া প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে, ইহা কেবল অদীম দৈর্ঘ্য, একান্ত অল্পবাগ, অবিরাম পরিশ্রম ও অটল অধ্যবসায়ের নিদর্শন।

পণ্ডিত রামগতি ত্রায়রত্ন ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গভাষার ইতিহাসের বীজ বপন করেন। সেই বীজ হইতে দীনেশ বাবুর এই প্রকাণ্ড কাণ্ড। তাঁহার গ্রন্থে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ ভিন্ন বাঙ্গালার ধর্ম, সমাজ ও আচার ব্যবহাবেব ধাবাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে বাঙ্গালার এই অপূর্ব ইতিহাস দীনেশ বাবু সংগ্রহ করিয়াছেন। 'এই ইতিহাস সংগ্রহ কবিত্তে প্রাচীন পুস্তকের অল্পসূক্ষ্মানে পরীতে জঙ্গলে তাঁহাকে কতদিন অনাহাবে অনাশ্রয়ে ভ্রমণ কবিত্তে হইয়াছে। একাকী, অসহায়, বৃহৎ পুস্তকালয় বা সুশিক্ষিত সাহিত্যবিৎ হইতে দূবে থাকিয়া, জটিল সাহিত্য-রহস্যের মীমাংসায় কতদিন নিরুদ্যম ও ভ্রমেৎসাহ হইতে হইয়াছে। ইহার উপর তাঁহার নিজের তাদৃশ সচ্ছলতা ছিল না,—এত যত্নে সংগৃহীত ইতিহাসখানি কেবল হাতের লেখা পুঁথিতে আবদ্ধ থাকিয়া কীটের ভক্ষ্য হইবে; কি কোন দিন মুদ্রিত হইয়া বিদ্যৎ সমাজেব সন্মুখে উপহার দিতে পারিবেন। আবার সে সমাজ পূর্ব বঙ্গীয় অজ্ঞাত অপরিচিত লেখকের লেখায় কোন দিন কি ঘোহের পক্ষে দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন? সহস্র বাধা, সহস্র বিড়ম্বনা বাঙ্গালা-লেখকের—বিশেষতঃ যাহারা মৌলিক ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত। সেই সহস্র বাধা দীনেশ বাবু অতিক্রম করিয়াছেন; বাঙ্গালা ভাষার

অনেকগুলি গুপ্তরত্ন তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং এই সুরহৎ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। কিন্তু শুনিয়া আমবা ত্রাসিত হইয়াছি, তিনি শয্যাগত হইয়াছেন। ভগবান তাহার মঙ্গল করুন। শিক্ষিত বাঙ্গালীর পুস্তকাগারে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" আসন সংগ্রহ করিবে, সে বিষয়ে আমাদেরব সন্দেহ নাই।

একাকী এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে হইলে পুনরুল্লেখ, অসমীকরণ, মতবিপর্যয়, বীতিভঙ্গ প্রভৃতি দোষ অনতিক্রমণীয়। আচ্ছাদেব বিবয়, এ গ্রন্থে আমরা মত বিপর্যয়েব কোন নিদর্শন পাই নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রম-ভঙ্গে দুঃখিত হইয়াছি।

আমবা গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছিলাম এবং বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে তাহার প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন হইবে, আশা করিয়াছিলাম। আমাদের সে আশা সফল হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষাব ইতিহাস লিখিবার জন্ত দীনেশ বাবু বহু-ভাণ্ডার সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু ইতিহাস লেখেন নাই। মাসিক পত্রিকার কতকগুলি প্রবন্ধ একত্র করিয়া দিলে যেমন দেখায়, তাঁহার গ্রন্থখানি সেইরূপ হইয়াছে। ভাষাও ইতিহাসেব উপযোগী হয় নাই, গাভীর্য ও ওজস্বিতাকে বিসর্জন দিয়া মাধুর্য ও চটুলতাকে আশ্রয় করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ইংরাজী গ্রন্থের তুলনা বা ইংরাজী শব্দের ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলে ভাল হইত।

বঙ্গভাষার ইতিহাসের এখন উপকরণ সংগ্রহের সময়। ইতিহাস লিখিবার এখনও সময় হয় নাই। সঞ্জয়, কবীন্দ্র, খেলারাম প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ

রূপে সংগ্রহ হয় নাই, হইয়া থাকিলেও মুদ্রিত হয় নাই, মুদ্রিত হইলেও সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নাই। সুতরাং সেই সকল গ্রন্থের সমালোচনা ভাল কি মন্দ হইল, পাঠকগণের বিচার করিবার অধিকার নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদের রচনা-কাল-নির্দ্ধারণে ঐতিহাসিক যথেষ্ট ব্যবহার করিলেন কি না, তাহারও বিচার হইতে পারে না। অথচ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, এইরূপ গ্রন্থ সকলের সমালোচনায় পরিপূর্ণ। গ্রন্থকারের জীবনী সংগ্রহে প্রয়াস তাদৃশ দেখা যায় না, গ্রন্থ-সমালোচনার আয়াস যত অধিক। বঙ্গদেশের প্রাচীন গ্রন্থকারের জীবনীসংগ্রহ গ্রন্থকারের (অতি দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু দীনেশ বাবুর মত উপ-যুক্ত লোকও শীঘ্র মিলিবে না। আবির্ভাব কাল নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন না হইলে, ভাষার ক্রমবিকাশে তাঁহাদের স্থান কোথায়, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। অল্প দিকে যে সকল কথা পরিত্যাগ করিলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার কোন ক্রটি হইত না, তাহার আলোচনা যথেষ্ট আছে। বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে গ্রন্থকার কোন স্বাধীন মত প্রকাশ করেন নাই, বিদ্যাপতির দানপত্র জাল বলিয়া এক কথায় উড়াইয়া দিয়াছেন, দানপত্রের তারিখটা কীটদষ্ট হইয়া থাকিবে ও পরে নূতন তারিখ বসান হইয়া থাকিবে, ইত্যাদি আরোপ করিয়া এবং তাত্রিশাসন কীটদষ্ট হওয়া নহে, স্বরণ না করিয়া, তাড়াতাড়ি বিদ্যাপতির জীবন বৃত্তান্ত সমাপন করিয়াছেন। চণ্ডীদাস বা গোবিন্দদাস, কেতকী বা জ্ঞানদাসের জীবনবৃত্ত জানিবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠ হইয়াছিলাম, তাহা পাই নাই। কিন্তু চৈতন্য মহা প্রভুর জীবনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দিয়া হই-

য়াছে। এইরূপ ক্রটি সম্বন্ধে বলা বাইতে পারে, দীনেশ বাবুর গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষার একটি অমূল্য রত্ন। কাব্য সমালোচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। আমরা একটি চিত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

“কৃষ্ণকমল গোবিন্দীর বাই-উম্মাদিনীই বিশেষ প্রশংসনীয় কাব্য। এই পুস্তকের প্রতি পত্রই চৈতন্যদেবকে শ্রবণ করাইয়া দেওয়ার বিষয় আছে। যাঁহারা চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তক পড়েন নাহ, তাহারা বাই উম্মাদিনীর খাদ ভাল করিয়া পাইবেন না। অক্লিত চিত্রখানা বৃন্দাবনের উম্মাদের নামে নবম্বীপের উম্মাদের। কৃষ্ণকমল পুস্তকের সচনায় বলিয়াছেন “স্বাদিতে নিজ মাধুরী, নাম ধরি গোবহবি, হরি বিরহেতে হরি, কাদি বলে হবি হরি।” আমরা আশ্চর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ দিয়া থাকি, বাহিরের বস্তুতে কে কবে আশ্রয়সমপণ করিয়াছে? বাহিরের বস্তু উপলক্ষ করিয়া আমরা স্বীয় আদর্শরূপেরই সত্তা অনুভব করিয়া থাকি; এইরূপের আদর্শ ব্যক্তিগত, রূপ বস্তুগত হইলে হৃদয় ফুল স্নিগ্ধ পল্লবটী দেখিয়া মাঝুয়ের ন্যায় ইতর প্রাণীগণও মুগ্ধ হইত, জ্ঞাতিগত হৃদয়ে চীনদেশের ক্ষুদ্রপদ দোখরা আমরা স্থখী হইতাম, সমাজগত হইলে দুই প্রতিবাদীর কচি স্বতঃ হইত না। আমরা প্রত্যেকে নিজের মাধুরী দেখিয়া পাগল, সুতরাং ভালবাসাকে একান্ত আশ্রয়মণ বলা বাইতে পারে, নিজের কামনার প্রতিবিম্ব রূপ ধারণ করিয়া আমাদেরই অশ্রুস্রবণ করিয়া থাকে। গৌর অবতারে এই প্রেমলীলা অতি পরিফুট, নিজকে দুই ভাবিয়া এই প্রেমের উদ্ভব, তখন—“দুটি চক্ষু ধারা বহে অনিবার, দুঃখে বসে বার বার, স্বরূপ দেখাবে একবার, নতুবা এবার মরি। ক্ষণে গোরাচাঁদ হৈয়ে দিব্যোন্মাদ, উদ্ভীর্ণ ভাবে ভেবে কালচাঁদ, ধ্বংসে যায় করিয়া দৈজ্ঞ।”

কৃষ্ণকমলের চক্ষে এই বিরহী গৌর চক্ষের মধুর মূর্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহাই তিনি রাই উম্মাদিনীরূপ উৎকৃষ্ট রূপ চিত্রে পরিণত করিয়াছেন। কৃষ্ণ কমল এই প্রেমস্নিগ্ধ গোরাচাঁদের তুলনায় অন্য সমস্ত রূপ অপকৃষ্ট বলে করিয়াছিলেন।

চাদে যে কলঙ্ক আছে

ছি ছি চাঁদকে গোরানাদের কাছে ।

প্রেমিক নিজেই পূর্ণ, তবে বিরহ কেন ?

গোপসার্মী মহাশয় বলিয়াছেন ।

“তবে যে গোপীকার হয় এতই বিষাদ,

তাদেহতু প্রোথিত ভ্রুক। রসাস্বাদ ।”

ক্ষুণ্ণরূপে মুক্তি যখন দেখেন নবনে ।

তখন ভাবেন যুগ্ম এল বৃন্দাবনে ॥

অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছেন মধুপুরী ॥”

এই মিলন-বিরোধী পথের অন্ত-
রায় যযুনা, যাহা অধৈর্য ভাবটাকে দ্বৈত-
ভাবে দিখও কবিতা বিরহের সৃষ্টি করিতেছে,
তাহা আত্মবিস্মৃতি মাত্র ।

কৃষ্ণ-বন্দনের রাধিকা চেতন্য দেবের
ছায়া। তাঁহার প্রেমের আবেগ নিশ্চল,
নিষ্কাম ও আত্মবিস্মৃতি পূর্ণ। রাধিকা
এই প্রেমের আবেশে জড় জগতের স্তরে
স্তরে কৃষ্ণ সত্ত্বা অন্বেষণ করিতেছেন। তাঁহার
প্রেম বিলাপ প্রলাপের ন্যায় অসম্বন্ধ, মধুর
ও আত্মবিস্মৃতির কারুণ্য মাথা। কবি
প্রেমচিত্রের মোহিনী মুগ্ধ, রাধিকাকে তিনি
কৃষ্ণপ্রেমে স্তম্ভিত করিয়া গড়িয়াছেন।
তাঁহার মধুমাথা কণ্ঠধ্বনি ও প্রমাশ্র উদ্বে-
লিত চক্ষুর সৌন্দর্য বঝাইতে কল্পে কি কম-
লের তুলনার আবশ্যক নাই। চন্দ্রাবলী
মুচ্ছাপন্ন রাধিকার রূপ দেখিয়া বলিতেছেন—

“যখন ঝড়র নামে দাঁড়াইত,
আবার হেসে হেসে কথা কত,
তখন এই না মুখে,
মুখে কতই যেন শোভা হত,
তা নৈলে এমন হবে বা কেন,
ঝড় থেকে আমার বন্ধঃস্থলে,
বেদে উঠিও বাধা বলে,”

এইকপ মৌলিক সমালোচনায় বঙ্গভাষা ও
সাহিত্যের প্রত্যেক পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ। দীনেশ
বাবু নিজে কবি। সহানুভূতি শুণে কাব্য-
সমালোচনায় তিনি সহজ-সিদ্ধ। আর্য্য-
লিপির উৎপত্তি, বঙ্গভাষার জননী কে, বঙ্গ-
ভাষা ও বঙ্গলিপি আবির্ভাব কাল নির্ণয়,
ইত্যাদি বিষয়ে দীনেশ বাবুর সহিত
আমাদের মতের ঐক্য নাই, বিদ্যাপতি
চণ্ডীদাস প্রভৃতির বৈষ্ণব কবিগণের জীবন
বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয়ে আমা-
দের যথেষ্ট মতভেদ আছে। যদি অবসর
পাই, সে সকল কথার সমালোচনা সময়াস্তরে
কবা যাইবে। এই সকল মতভেদ আমা-
দের দৃষ্টি অন্ধ করিতে পারে নাই। আমরা
মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, এই গ্রন্থশৃঙ্গে
দীনেশ বাবু অমরত্ব লাভ করিবেন। বীজ
ও প্রফুল্ল কুসুমে যত প্রভেদ, পণ্ডিত রাম-
গতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থ ও দীনেশচন্দ্র সেনের
গ্রন্থে ততই প্রভেদ ।

শ্রীকীর্ত্তনচন্দ্র রায় ।

সাহ আকবর এবং শ্রীমচ্চেতন্য সম্প্রদায় । (১)

(শ্রীধাম নীলাচলবাসী শ্রীযুক্ত ভগবন্ত দাস মোহান্ত মহারাজের পত্রের উত্তর ।)

হিন্দু ভক্তিমালা প্রভৃতি গ্রন্থ এবং পদ
সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত ।

৪০০ শত বৎসরের পূর্বে অর্থাৎ যবনাধি-
কার সময়ে যবন কর্তৃক ধর্ম্মপরিচয় হিন্দু-
দিগের সনাতন ধর্ম্মের প্রতি ঘোরতর অত্যা-

চার এবং যতদূর আত্মতারিতার কার্য্য সংঘ-
টিত হইতে হয়, তা হইয়াছিল ।

যবন সৈন্তগণ যবন-সম্রাটের প্রশ্রয় পাইয়া,
গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে দলে দলে উপস্থিত
হইয়া, হিন্দুধর্ম্ম উচ্ছেদ মানসে এক হস্তে শাবিত

তরবারি অস্ত্র হস্তে কোরাণ লইয়া হিন্দুদিগের ধন প্রাণ, মান সম্ভ্রম, এ সমুদায় হরণ, দ্বিতীয় হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থানের দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও দেবমন্দির ধ্বংস, তৃতীয় ধর্মপুস্তক সকল জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ ও ভাঙ্গরাশি এবং হিন্দুদিগের অতি পূজ্য গৃহপালিত গো, এবং বংশ প্রভৃতি হিন্দুর গৃহেই হত্যা এবং সেই মাংস হিন্দুর পবিত্র গৃহেই পাক এবং আহার করিয়া সেই উচ্ছিষ্ট এবং নিষ্টিবন হিন্দুদিগের গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া অনেক হিন্দু জাতি নষ্ট করিয়াছিল। সেই ধর্মবিপ্লবে ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় রক্ষাকর্ত্তা কেহই ছিলেন না। ইতিহাসের ইহাই সংক্ষেপ বিবরণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্ভাষ্যে স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন ;—

পবিত্রাণ্য সাবনাং বিনাশায় চুচ্চতাং

ধর্ম সংস্থাপনাখ্যে সন্ততামি যুগে যুগে ॥

ঈশ্বরের এই বচনানুসারে মহাজনে বলেন, যিনি সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ আর ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া—ধাকেন। বেদ, উপনিষদে, শ্রীমদ্রায়ণের ধ্যানে ;—

“ধোয়ঃ সদা সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী

নারায়ণ ; সরসিজানন সন্ন্যাসিণঃ

কেয়ুরবান্ কণককুণ্ডলবান্ কিরীটিধারী

হিরণ্ময় বপু” হৃত শম্ভ চক্ৰ ॥

অর্থাৎ বেদের যে অংশে ঈশ্বর নিরূপণ ও গুণাবতারের বৈরূপ নির্দেশ আছে, সেই সর্বব্যাপী সর্বদেবাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভু হিরণ্ময় নরবপু ধারণ করিয়া ১৪০৭ শকে গোড়দেশান্তর্গত শ্রীধাম নবদ্বীপে (মায়াপুরে) অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসীবেশে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি দেশ পরিভ্রমণ কর্ত্তৃক সাজোপাজ

সমভিবাহারে হরিনাম জোরডঙ্কায়, জগৎ কাঁপাইয়া ও মাতাইয়া, ছুটের দমন এবং শিষ্টের পালন এবং যুগধর্ম স্থাপন করিয়া ছিলেন। যথা পুবাণে আছে ;—

“কলোঃ তদ্বোর কীর্তনায়”

কেবল হরিনাম। এই যুগধর্ম স্থাপনান্তে ১৪৫৫ শকে তাঁহার অন্ত্যজ্ঞানে ৯ বৎসর পরেই, ১৪৬৪ শকে আকবরের জন্ম হয়। তিনি ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমে অক্ষুণ্ণ প্রতাপের সহিত ভারতের রাজা হইয়া, ৬৩ বৎসর নির্ঝিল্ল রাজ্যস্থ ভোগ করণান্তর, ১৫২৭ শকে ইহলোক ত্যাগ অর্থাৎ পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। যে সময়ে সম্রাট সাহ আকবর বিবিধরত্ন-খচিত দিল্লীর রাজতক্ষে উপবিষ্ট, সেই সময়ের কিছু পূর্বে কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর রূপাত্ম গাড়-পাতসাহের প্রশংসনীয় মন্ত্রী শ্রীমৎ সনাতন এবং শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী (হুই ভাই) কর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ সমুদায় উদ্ধার এবং সম্রাটের প্রিয় স্নেহ শ্রীযুক্ত মানসিংহ কর্ত্তৃক শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর স্থাপিত শ্রীবৃন্দাবনে যোগপিঠে বিরাজিত শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর প্রস্তর-নির্মিত শ্রীমন্দির সম্রাটের অহুমোদনেই ১৩ লক্ষ মূদ্রা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। সে সময়ে ভক্তিমাল্য গ্রহণেও জাজ্জল্যমান প্রমাণ আছে।

সম্রাট আকবর যদিও যবনকূলে উদ্ভব হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্মে তাঁহার অধিক আস্থা ছিল। এমন কি, তৎপূর্বে কোন বিজাতীয় রাজা তাঁহার শ্রায় হিন্দু সমাজে পূজিত হন নাই। তিনি প্রকৃত জনকের শ্রায় প্রজাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন।

পক্ষপাত রূপ কলঙ্ক কখনই তাঁহার হৃদয়কে

কলুষিত করিতে পাবে নাই। প্রজার মঙ্গল কামনা এবং হিতসাধন তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু কি বৈষ্ণব শাস্ত্র কখনও অবজ্ঞা করিতেন না। আদ-
দের সহিত সর্বতোভাবে মিশ্র, এবং বর্ণ বা ধর্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া লোকের গুণানু-
রূপ এবং পুণ্যকার অরূপ রাজকাৰ্য্যে নিয়োগ ও সম্মান কবিতেন। হিন্দুদিগের জ্ঞান ক্রমজ্ঞ জাতি অতি বিরল, তাঁহারা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কবিতেন কখনই ক্রটি করিতেন না। তিনি এ পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রাতঃস্মরণীয়।

কথিত ও প্রকীৰ্ত্তা আছে—“দিল্লীখরোবা জগদীশরোবা।” কিছু কম ৩০০ শত বৎসর হইল সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে, তথাপি অনেক হিন্দু “শ্রীরামচন্দ্র মোহরের জায়” আক-
বরের স্বর্ণ মোহরের পূজা করেন। সাধা-
রণের ইহা বিশ্বাস যে, উহা গৃহলক্ষ্মীর হাঁড়ির ভিতর থাকিলে লক্ষী অচলা হবেন।

দিল্লীখর, সুযোগ্য অমাত্য মোলবী কৈফু ও আবুল ফজল এবং মিত্র রাজা তোড়ল মল, ও মান সিংহ প্রভৃতি সভা-সদস্যকে লইয়া সর্বদাই রাজ কাৰ্য্যে ব্যাপ্ত থাকি-
তেন। এবং মিত্র রাজাগণের মন্ত্রণা মতে প্রায় সকল কাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহ করিতেন।

ধর্মশাস্ত্র এবং ঈশ্বরের স্তুতিপাঠ, শ্রীমদ্ভ-
গবদগীতা পাঠ এবং সঙ্গীতানুশীলনে তাঁহার অধিক বশ্র ও অহুরাগ ছিল। তাহারই চর্চ্চায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। আরব্য ও পারস্ত বিদ্যার অতি সুদক্ষ ও সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। সকল ভাষাই জানিতেন। সংস্কৃত নল কুমরস্তি ও লীলাবতী প্রভৃতি অনেক গুলি গ্রন্থ পারস্তভাষায় অনু-
বাদিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার দরবারে সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ বিখ্যাত “কালোরাৎ” শিখা তানসেন ও সঙ্গীত-অধ্যাপক সরিমিখা প্রভৃতি সুপ্র-
সিদ্ধ গায়ক ও অনেকানেক বস্ত্রবিৎ বিজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে সমমোচিত রাগ রাগিণী সঙ্গীত আলাপ ও বীণাদি বস্ত্র বাদন দ্বারা সম্রাটের চিত্ত বিনোদন করিতেন।

একদিন, রাজার দরবারে সঙ্গীত চর্চ্চা কালীন তানসেনের গানে রাজা মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, হে কিম্বর! আপনার স্মৃতি-
নিশ্চয় বহু প্রকার ঈশ্বরের স্তোত্র-পাঠ-গীত শুনিয়াছি, কিন্তু বর্তমান কালের গোড়ের ঈশ্বর সঙ্গীত-গুরু শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর স্তুতি-পাঠ শুনি নাই কেন? তাঁহার শিষ্য শ্রীসনাতন গোস্বামী দেব ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে যে একখানি গীতাবলী লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এক সময় পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, তাহা অতি মধুর এবং সর্বোৎকৃষ্ট। সেই পরমার্থ ভাবেব কোন গীত কি আপনার শিক্ষা আছে? সেই গীত শুনিতে আমার অধিক বাসনা। সম্রাট কর্তৃক এই আদেশ হইবা মাত্রই রাজার ইচ্ছা পরিপূরণার্থে তানসেন শিষ্যদিগকে লইয়া তান, মান, লয়, এবং সুসংযোগে;—

রাগিণী কেদার, তাল ধামার।

অখিল কলিমল নাশক। পরদেব। সেবক পালক।
নব ভূমীশ। হে শ্রীগোবিন্দ। নিখিল যুগন্তর-হারক।
জয়তু মানব, ধ্যান-মুনিবৃত্ত, লুপ্তধর্ম বিকাশকঃ।
যোজীং বিতো। কুল সদানন্দ জন-মনোরথপূদকঃ।
পাদপদ্মে স্বাস্ত তুঙ্গ, স্তব নিমজ্জতু, গীতনে,
হুট সঙ্গ। হে হরে। অহি পাছু বর্ষর শৌধকঃ।
বাটমের মেলজ কুন্তল, ভাব বাটক শর্বকঃ।
বিলসতু সদা মন মানসে কলি দুখিতে ভব নাশকঃ।

(গীতাবলী)

রাগ বাগিণীব কোতুক তরঙ্গ দেখাইবাব
কালেই সম্রাট ভাবে বিহবল হইয়া গল্লাদ
কণ্ঠে তানসেনকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা কবি-
লেন ;—হে সঙ্গীতবিৎ! আপনাব সঙ্গীত শুক
কে? তিনি কোথায় থাকেন, এখন কি
কাজে লিপ্ত? তাঁহাকে সঙ্গীত সভায়
আহ্বান কবিলে উপস্থিত হইতে পারেন
কি না? তানসেন উত্তর কবিলেন :—
হে নবজ্ঞ! আমাব শুক শ্রীশ্রীবল্লুবিহারী
দেবেব রূপা পাত্র “আজমাব নিবাসী” স্বামী
হরিদাস। তিনি এখন শ্রীসুন্দাবনে যমুনা-
তটে পর্ণকুটীরে বাস কবেন। শুনিযাছি, মহা
শক্তিসম্পন্ন অতিবদানা শ্রীমৎ সনাতন ও
শ্রীমদ্রূপ এবং শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট প্রভৃতি
গোস্বামী প্রভু পাদগণেব অহুগত। তাঁহাদেব
সঙ্গলাভে, এখন কোথাও যাইতে ও কাহা-
রও সহিত আলাপ কবিতে ভাশবাসেন
না। তাঁহাব জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীহরিবাম বাস
এবং কনিষ্ঠ শ্রীআনন্দ ঘন এবং মধ্যম স্বয়ং
শ্রীহরিদাস স্বামী, অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিষয়
কার্য্য ত্যাগ কবিয়া বৈবাগ্য ধর্ম্ম অবলম্বন
কবিয়াছেন। এমন তাঁহাবা অবধূত বেশে
অর্দ্ধ-উন্মীলিত লোচনে শ্রীশ্রীবাধাকৃষ্ণ নাম
গান ভজনে উন্নত। আনন্দ ঘন (মিবাবাই
তুল্য) একজন বিখ্যাত সঙ্গীত কবি অর্থাৎ
পদকর্ত্তা। জ্যেষ্ঠ হরিবাম রঙ্গ মহলে থাকিয়া
শ্রীশ্রীকিশোর কিশোরী জীর সেবা কবেন।
হরিরামের সেবা হস্তে পিকদানী; আনন্দ
ঘনের সেবা পাদ-সম্বাহন এবং স্বামীজীর
সেবা চামর-ব্যজন।

এস্থলে শ্রীসন্নাতাজী হিন্দি ভক্তমালে
দোহাছন্দে লিখিয়াছেন,—

“নবকুমার চক্রভূড়া কৃপতি সামুরো।” ইত্যাদি।

বঙ্গভূবাদের শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী পদ্য ভক্ত-
মালে লিখিয়াছেন,—

ব্যাগজীর সেবা, সকা পিকদানী হাত।

থাকেন যুগল পার্শ্ব, রঙ্গ মহলেতে ॥

হরিদাস চাকুরের চামর ব্যজন।

আনন্দ ঘনব সেবা, পাদ সম্বাহন ॥

এতেক শুনিয়া রাজা, আনন্দ হইল।

(ভক্তমাল)

প্রভু স্রীসনাতন গোস্বামী যে মহা প্রভাব-
শালী, সম্রাট তা পূর্বেই বাজা মানসিংহের
প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়াছিলেন। তান-
সেনেব মুখে তাঁহাব আবার প্রকিষ্টা এবং
হরিদাস স্বামীব গুণ গান শুনিয়া তাঁহাদের
দর্শন ও গীত শ্রবণেব নিমিত্ত অতিশয় উৎ-
কণ্ঠিত হইলেন। পবন্ত মনেব ভাব কাহা
বও নিকট প্রকাশ কবিলেন না।

পবদিন, শ্রীসুন্দাবনে গমনেব নিমিত্ত
বাজ পবিচ্ছদ ত্যাগ কবিয়া বৈষ্ণব সজ্জায়
সজ্জিত হইয়া বহু মূল্য মণিমাণিকা ও
ভাবে সঙ্গে লইয়া যিয়া তান সেন সম-
ভিবাভাবে পদবজে আশ্রা বাজধানী হইতে
শ্রীসুন্দাবনে যাবা কবিলেন। অস্ত্রাশ্র শি-
কাদি যান, তব, তত্তি, ধদাতি পা-
গমন কবিল। সঙ্গে মণি মাণিক্য শুণ্ড
লইবাব তাৎপর্য্য, কোন দেবাসে-
মাধুর নিকট গমন কবিতো বিস্তরহস্তে
নাট; প্রভু সনাতন বাদ কোন
স্থাপনেব ইচ্ছা কবেন, রাজা ম-
কর্ত্তক শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীব শ্রীমন্দি-
নির্মাণ হইয়াছে, ততোনিক টাকা
মন্দিব স্থাপন কবিবেন, রাজাব
ইচ্ছা। কিন্তু সে কথা অপরের
অপ্রকাশ।

ও
শ্রীহা

স্বামীজীর সহিত কথোপকথন।

নেথরয়ের যুদ্ধে বিখ্যাত বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস । ইনি ধার্মপালীর যশোগৌরব যান কবিতা জগতে মশস্বী হইয়াছেন । ধর্ম্মাধিকরণের অত্যাঙ্কল রত্ন ৬ দ্বারকা নাথ মিত্র ও শ্রীবৃক্ষেশ্বর রমেশচন্দ্র মিত্রের কথা কে না জানে ? বিজ্ঞান-বিভাগে বাবু জ্ঞানদীপ চন্দ্র বসু আজ সমস্ত জগতে খ্যাত । ধর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রে অতীব যশস্বী বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত আমাদের জ্ঞাত বিদ্যাত্মগতিতে যে প্রকার সমুদয় ধর্ম্ম বেদের অমূল্যবাদ এবং সমুদয় হিন্দু শাস্ত্রের মূলমূল্যবাদ সহ সার সংগ্রহ—ওল্ড ও নিউ টেষ্টামেন্টের ন্যায়—সমুদয় শাস্ত্রের মূল সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, ইতিহাস লিখিয়া ব্যাসের মহাভারতের ছায়া আপন মহাভারত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার তুল্য নাম ভারতে আর দ্বিতীয় নাই । কিন্তু আমরা যে কায়স্থ সন্তানের কৃতিত্বের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, তাঁহারও ধীশক্তি কম হইবে না । ইনি পেচুর নামে খ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ । ইহার প্রকৃত নাম নবেন্দ্র নাথ দত্ত । ইনি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পাঠ্যধারী—এমেরিকা ও ইউরোপে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সম্ভ্রান্তি গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন । ইহার সহিত বসুমতী-সম্পাদকের পৌকণ্ডন হইয়াছিল । তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় । ঐ কথোপকথনকাল আমরা নিম্নে উদ্ধৃত হই

প্রঃ—ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্ম এখনও আছে কেন ? ইচ্ছা করি। খ্রীষ্টধর্ম্মে যে রূপ প্রকৃতির উপ-প্রাণ সরলবিশ্বাসী অনেক মহাত্মা আছেন । উহা পৈত্রিক ধর্ম্ম বলিয়া এখানে আজকাল রুজু হইছে ই ধর্ম্ম—শাস্ত্রীয় ধর্ম্মবোধে সরল জ্ঞেয় লোক তদনুসরণ অনুষ্ঠান করে, ইহা না মানিলেও পৈত্রিক আচার মানে মাত্র ।

কি একপন ছুই ছুই ভাব ছিল, না ?
অধেদ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি পর্যন্ত পাঠ করিয়া দেখুন, শাস্ত্র

বর্ণের পাচক গুহ্র হইছিল । এখন ব্রাহ্মণ, কতিয়ের স্পষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন না । আপনারা কি মনে করেন—বাস্তবিক এত লোক মুসলমান হইয়াছিল কেবল তরবারীর জোরে ? বাঙ্গালী মুসলমান জাতিকে সকল নাটকের বদমাঈসের স্থানীয় করিয়া মুসলমান চিত্র বড়ই বিবৃত করিয়া থাকিয়াছে । মুসলমানের সদংশ বাঙ্গালী আদে। দেখিতে পায় না । মুসলমানধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের ইতর প্রাণীর পক্ষে জড়াইবার আশ্রয় স্থান স্বরূপ হইয়াছিল বলিয়া এত মুসলমান হইয়াছিল । আমি দেখিয়াছি, মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ যে পথে যান, চণ্ডাল সে পথে বাহেতে পায় না, কিন্তু সেই চণ্ডাল গাঠান হইলে অবধি সেই পথে যাইতে পারে ।

প্রঃ—যে হিন্দুধর্ম্মে অষ্টভৈরববাদ বিদ্যাস্থি, সে হিন্দু ধর্ম্মে এত ছুই ছুই ভাব দেখি কেন ?

দঃ—খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রোতে আমাদের পাতীয়তা নাশ করিতেছিল, মহাত্মা বাজা বাম মোহন বাবু সেই জাতীয়তা বজায় রাখিয়া তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই মহান উদ্দেশ্য সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জনকয়েক লোক পাশ্চাত্য মত প্রচাৰ দ্বারা আমাদের জাতীয়তাকে কবিত প্ররাদী হইতেছিল, এখনও দুই এক জন কবিত হইতেছে । ইহার বিপক্ষে একটা প্রতিক্রিয়া এখন চলিতেছে । এই ভাব নষ্ট করিবার জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া এক বিপুল আন্দোলন শ্রোত চলিতেছে । তাহাতে শাস্ত্রীয় তত্ত্ব প্রচারের সঙ্গে স্থানীয় আচার-প্রসঙ্গ জাতি-বিবেচনাও প্রচারিত হইতেছে । তাহা আপনি এ সময়ে এই ছুই ছুই ভাবের এত প্রাণবন্ত দেখিতেছেন । এখনও ঠিক সাম্যাবস্থা হয় নাই । আমাদের পক্ষেই যে বংশাবলী আসিতেছে, তাহা ঐ ঠিক শাস্ত্রীয় পন্থার অনুসরণ করিবে । তখন আর ছুই ছুই ভাব থাকিবে না, অথচ সকলে পূর্ণ হিন্দু হৃদয় লাভ করিবে । এই প্রতিক্রিয়া না থাকিলে আমরা এতদিন জাতীয়তা হারাইতাম ।

প্রঃ—সকল বর্ণের কি সম্যাসে অধিকার আছে ?
উঃ—আছে ।

ইউরোপে এখনও খ্রীষ্টধর্ম্ম আছে কেন ?
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তিনি যে প্রকারে হিন্দু ধর্ম্ম-সংস্কারের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা তাহারই নামের উপযুক্ত ; আর বোধ হয় যদি বুধ সাহেব হিন্দু হইতেন, তবে তিনিও ঐরূপ উত্তর করিতেন ।